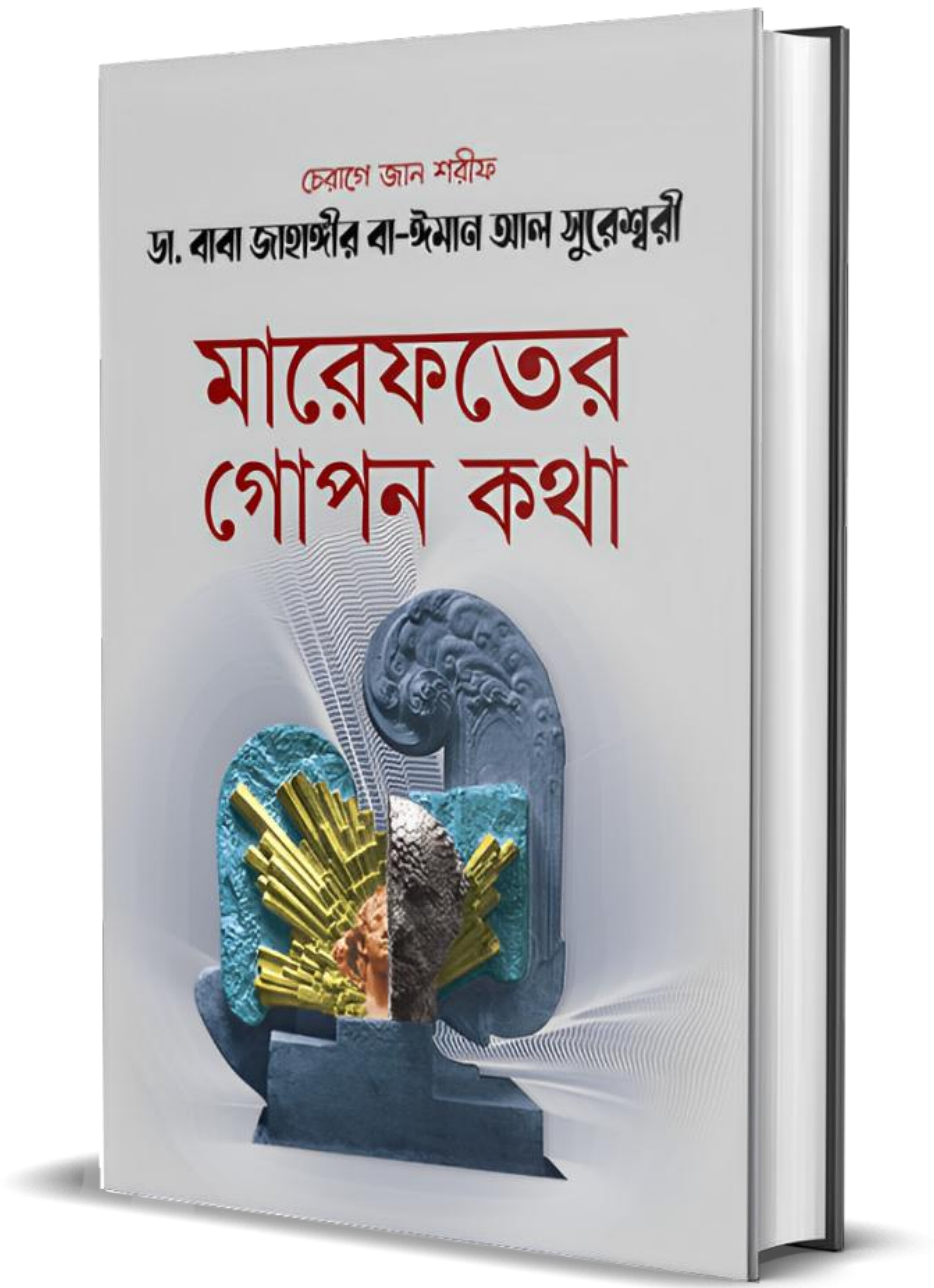

চেরাগে জান শরীফ
ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী
মারেফতের
গোপন কথা

মারেফতের গোপন কথা

চেরাগে জান শরীফ
ডাঃ বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল-সুরেশ্বরী

সুফিবাদ প্রকাশনালয়
প্রযত্নে : বে-ঈমান হোমিও হল
১০৮ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (২য় তলা) ঢাকা-১২০৫
ফোন : ০১৯১১৫৯৭৭৮০, ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

প্রকাশক
নাহিদ সামসেত্তাব্রীজ
বেদম ওয়ারসী
ইনশা আহমেদ
সমনুন মোহেব

সূফীবাদ প্রকাশনালয়
১০৮, নিউ এ্যালিফ্যান্ট রোড (দোতলা), ঢাকা-১২০৫

প্রচ্ছদ
ইনার জনসনের শিল্পকর্ম (১৯৩৯) *এসেন্স (নির্যাস)* অবলম্বনে

প্রকাশকাল
১ম প্রকাশ– ১৯৭৮
২৫ আগস্ট, ২০০৬

বর্ণবিন্যাস
আনোয়ার আল-হাদী
বইপত্র কম্পিউটার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
সালমানী প্রিন্টার্স
১৪, চৌধুরী মার্কেট
নয়াবাজার, ঢাকা

বাঁধাই
রবিন বাইন্ডার্স
১৪, চৌধুরী মার্কেট
নয়াবাজার, ঢাকা।

মূল্যঃ
৩৬০ টাকা

উৎসর্গ

মাওলাউল আলা বাবা জান শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরীর নয়নের মণি নাতি বাবা শাহ্ জালাল নূরী অফিআনহুর নামে। যিঁনি অধম লিখকের পীর ও মুরশেদ কেবলায়ে কাবা। যিঁনি গোপনীয়তার প্রশ্নে পাথরের মত শক্ত এবং মমতায় মোমের মত বিগলিত। শরিয়তের লেবাসের ভেতর এত বড় মারেফতের সূর্য লুকিয়ে রাখার নীরব সাক্ষী যিঁনি। বড় পীর সাহেবের মত সংসার কাজে লিপ্ত অথচ ভেতরে ফকির যিঁনি। প্রথম দর্শনে বাবাজানকে ঘোর সংসারী বলে প্রায় লোকই ভুল করতে পারে, কিন্তু সাধনার কত
উঁচুস্তরে অবস্থান করছেন সেটা ধরতে পারলে বোকা বনে যেতে হয়। বাবা শেখ ফরিদ তাঁর দিওয়ানে বলেছেন, *'নূরে মান্ দার তাঙ্গেনামি তান্ মাজো– আফ্তামাব্ জাররায়ে রওশন না আম'* অর্থাৎ 'আমার দেহের মাঝে নূর খুঁজতে যেও না। কারণ, যে নূরের সূর্য ডুবে আছে তা ক্ষীণ আলোতে বুঝতেই পারবে না।' বাবা শেখ ফরিদের বাণীর প্রতিমূর্তি যিঁনি। খাজা গরীব নেওয়াজ মোনাজাতের সময় অনেক নাম না জানা অলীদের নাম ধরে সালাম দিতেন এবং ভক্তবৃন্দ এই অলীদের নাম শোনেননি বললে খাজা বাবা বলতেন, এই সকল অলীরা আমার চেয়েও বড় কিন্তু তারা বনেই ফুটেছিলেন এবং বনেই ঝরে গেছেন– সেই রকম বনের ফোটা ফুল হয়ে আছেন যিঁনি। খাজা উসমান হারুনী বলেছেন, *'মারেফত উধারই নিস্ত জিধার ভালাই ভি নিস্ত বুড়াই ভি নিস্ত।'* অর্থাৎ 'মারেফতের দেশ সেটাই যেখানে ভাল এবং মন্দের কোন স্থান বা শর্ত নেই।' ভাল এবং মন্দের ঊর্ধ্ব দেশে অবস্থান করছেন যিঁনি। বাবাজান কেবলা যদি ইউরোপ এবং আমেরিকাতে তার সাধন শিক্ষা দিতে পারতেন তবে দশ আনি মানুষ অন্ধের মত ঝাঁপিয়ে পড়তেন কারণ এই গুপ্ত সাধন বিদ্যা কয়জনের জানা আছে আমি বলতে পারবো না। অথচ তিনি বোবা, যেমন বোবা এই প্রকৃতি। বাবাজান বলেন, 'আল্লাহর মধ্যে কথা নেই এবং কথার মধ্যে আল্লাহ নেই।'

সূচীপত্র

একটি ঘোষণা

যে কেহ এই বইটি ছাপাইয়া যে কোন দামে বিক্রি অথবা প্রচার করিতে পারিবেন। ইহাতে লেখক এবং প্রকাশকের পক্ষ হইতে কোন প্রকার আপত্তি রহিল না এবং থাকিবেও না। কারণ এই বইটির মালিকানা লেখক নিজ হইতে সজ্ঞানে মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান এবং অন্য যে কোন ধর্মের অনুসারীদেরকে সমানভাবে দিবার প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া গেলেন। যদি কেহ কোনদিন বইটির মালিকানার মিথ্যা দাবী তোলেন তাহা হইলে সেই মিথ্যা দাবী সর্বস্থানে এবং সর্ব আদালতে বাতিল বলিয়া গ্রহণীয় হইবে। আরো উল্লেখ থাকে যে, এই বইটি পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপিতে পারিবেন।

অনুরোধ করছি বইটি পড়তে

কোরানের শব্দগুলো কিভাবে বিকৃত করেছে, আপনি অবাক হবেন যদি আপনার চোখে ধরিয়ে দেওয়া যায়। অনেকটা ছোট ইঁদুর যেমন লেপ-তোষক কাটে সেরকমভাবে এদের বিকৃত, ভুল, বানোয়াট এবং 'মন যাহা চায়' মার্কা অনুবাদগুলো খুব সাবধানে না পড়লে এদের ধরাই যাবে না। বস্তাপচা একটি পুরনো মালগুদামের তফসিরে 'কোরান' শব্দটিকে 'সালাত' অনুবাদ করতে উপদেশ খয়রাত করেছেন। আর কি! রাজায় নাচতে বলেছে তাই তো এত নাচানাচি। যদি প্রশ্ন করেন যে, কেন কোরানকে সালাত বলে ধরে নিতে যাব? উত্তরটি হবে, তা হলে বাক্যের ভাবটি মিলাতে পারছি না। এরকমভাবে তালকে বেল, আমকে কাঁঠাল এবং আনারসকে কলা মনে করে নেবার মত অনুবাদে হাজারো বিকৃত আদেশ-উপদেশ পাবেন। আর এসব অখাদ্য খেতে বসে আপনার মনে কোরানের উপর যা-তা মন্তব্যের বোবা প্রতিবাদগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে কিন্তু প্রতিবাদ না করতে পারলে বন্দুকের নলই ফেটে যাবার মত আপনিও ফেটে যেতে পারেন।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিস্ময়কর রচনা '*মারেফতের গোপন কথা*' ঘনতমসায় উৎকট আলোর সরল রেখায় উল্কার নেমে আসার নাম '*মারেফতের গোপন কথা*' সংকীর্ণতা, গোঁড়ামী, অখণ্ডতায় খণ্ডতার মানসিক বিকারে বিকৃত লিখন, নোংরামির স্থূলতাকে সার্বজনীন নামের মালা পরাতে নির্লজ্জ, বিশ্বাসঘাতক আখ্যায়িত করে তৃপ্তির পৈশাচিক অবগুণ্ঠনের প্রকাশ্য উন্মোচনের নাম '*মারেফতের গোপন কথা*'। সার্বজনীনতার শৈলীর ঠমক তাল হারায়নি কোন প্রভাবশালীর লাল নয়নের ভ্রূকুটিতে, পাঠক বইটি পড়েই অনেক প্রশ্নের ঝড়ে বদলিয়ে দেয় চিন্তার বাঁধন। বারুদের ধূমায়িত আহত পাখির আহত চাহনির মত দৃষ্টির স্থবিরতা এনে দেয় যে বইটি তার নাম '*মারেফতের গোপন কথা।*' বিকৃত করে

রাখা কোরানের অনুবাদগুলোর গোমর ফাঁক করা ভূমিকম্পের মত প্রচণ্ড নাড়া দেওয়া হয়েছে '*মারেফতের গোপন কথা*' বইটিতে।

ইসলামী ধর্ম-দর্শনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বিমোহিত হবার নাম '*মারেফতের গোপন কথা।*' চিন্তার সাজানো অট্টালিকায় ডিনামাইটের কানফাটা শব্দের মত যার শব্দ তার নাম '*মারেফতের গোপন কথা।*' এতদিন কি সব বস্তাপচা ইসলামের নামে রচিত আবর্জনার আত্মবিরোধের বিকৃত স্তুপের উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকছে, তার নাম '*মারেফতের গোপন কথা।*'

প্রকাশক-
নাহিদ শামসেত্তাব্রীজ
বেদম ওয়ারসী
ইনশা আহমদ
সমনুন মোহেব
গ্রাম- চুনকুটিয়া, ডাক- শুভাঢ্যা, থানা- কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

পাঠকের হৃদয়ে অমর করে রাখলাম যাকে

আমি অবাক চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম। অবাক হবার কারণটি হলো, ওনার বড় বাবা ঢাকার বিখ্যাত অলী বাবু বাজারের হযরত বাবা বাহার শাহ। ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র মতো প্রতাপশালী নবাব সবার সামনে বাবা বাহার শাহের কদম মোবারক স্পর্শ করে সম্মান করতেন। শুনেছি, বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরীর পরম বন্ধু ছিলেন বাবা বাহার শাহ। সেই বাবা বাহার শাহের পুতিন বাবা বিল্লাল শাহ অধম লিখককে খুবই ভালবাসেন। সুফিবাদের উপর আমার লিখনী বাবা বিল্লাল শাহের কাছে এতই ভালো লাগে যে, আমার বাড়িতে এসে ধন্যবাদ জানিয়ে যান এবং লিখনী চালিয়ে যাবার উপদেশ দান করেন। আমার লিখনীর এরকম প্রশংসা করেন যে, তা ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে অহমিকার বিশেষণে ফেলার সম্ভাবনা থাকতে পারে। একটি প্রশংসার ভাষা কতখানি উচ্চমার্গের হতে পারে তার নমুনা তুলে ধরছি। যেমন উনি বলেন,'বর্তমান বিশ্বে সুফিবাদের উপর কোনো লেখকের লিখা তো বহু দূরের কথা, দাঁড়াবার সামান্য ক্ষমতাটুকুও নাই।' বিশ্বাস করুন, এ কথা কয়টি বাবা বিল্লাল শাহের। শুধু কথা দিয়ে নয়, আদেশ-উপদেশ দিয়ে নয়, বরং সর্বপ্রকার আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে পকেট হতে পঞ্চাশ হাজার টাকা বের করে হাতে তুলে দিলেন, আর বললেন, 'বই ছাপাতে যত টাকা লাগে, আপনি একটি ফোন করবেন শুধু।' আমি বিনয়ে হাসলাম। বাবা বিল্লাল শাহ বললেন, 'আপনি হাসছেন! একবার চেয়ে দেখুন না, গাছে কি ফলের পরিচয় দেয়।'

কেন প্রথমেই বললাম যে, আমি অবাক চোখে চেয়ে রইলাম? বাংলাদেশের কোনো পীর-ফকির এবং বিশেষ করে চার পুরুষ ধরে যারা পীর, তাদের কাছে বই ছাপাবার আর্থিক অনুদান পাওয়াটা কল্পনাই করা যায় না। কারণ, বেশিরভাগ পীর সাহেবেরা পেট ভরে খেতে জানে, দুই হাতে অর্থ নিতে জানে, কিন্তু দিতে জানে না। ওহাবীদের প্রচারে দেশ ছেয়ে গেছে, তাই এর মোকাবেলা করতে হলে সেরকম বই দিয়েই মোকাবেলা করতে হবে। প্রায় পীর সাহেব জানেন যে, আমার লিখনীর মূল্যায়ন এবং প্রচারের প্রয়োজনীয়তাটা এবং উৎসাহ দেন, কিন্তু সামান্য আর্থিক অনুদান কোনদিন কোনকালেও দিতে ভুলে যান। অধম লিখকও একজন পীর সাহেব। কম-বেশি সবাই আমার লিখা পড়েছেন এবং প্রশংসা করেছেন, কিন্তু সাহায্যের আবেদন করেও কোন সাড়া পাইনি। তবে হ্যাঁ, পেয়েছি। যারা সাধারণ পাঠক তারাই কম-বেশি সাহায্য করেছেন, যার দরুণ কিছু বই বাজারে পাওয়া যায়। সমগ্র বাংলাদেশে মাত্র দুইজন পীর সাহেব সুফিবাদের প্রচার করছেন। দুজনই ইচ্ছা-করে গরীব পীর। সুফিবাদের দর্শনের সামনে এই দুই গরীব পীরের সামনে কেউ দাঁড়াবার সাহসটুকু পাবে না– এটা সুফিবাদের পাঠকমাত্রেই মেনে নেয়। এই দুই জন পীরের একজন হলেন সুফি সদর উদ্দিন

আহমদ চিশতী। জীবনের সবটুকু বিলিয়ে দিয়ে প্রচার করে চলছেন এবং এতবড় সুফি-দার্শনিক এ যুগে আর একটি পাওয়া যাবে না। অপর জন অধম লিখক– ভক্ত ও মুরীদদের সাহায্য ও সহযোগিতায় প্রচার করে চলছি। অনেকের কোরবানীর চামড়ার টাকা, নিছক দানের টাকায় বইগুলো ছাপিয়ে চলছি। বাবা বিল্লাল শাহের মতো হাতেগোনা কয়েকজন দাতা যদি এগিয়ে আসেন তাহলে মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর *মসনভী শরীফ*, *দিওয়ানে শামসেতাব্রিজ*, *দিওয়ানে বু আলী শাহ কালান্দার*, *দিওয়ানে আমীর খসরু*'র মত পুরাতন পারসী ভাষায় রচিত বইগুলো অনুবাদ করে ছাপিয়ে দিতে পারতাম। এবং এর ফলে ওহাবীদের গোমরগুলো ফাঁক হয়ে যেত এবং দিবালোকের মতো এদের ভ্রান্ত মতবাদ পাঠকের চোখে ধরা পড়তো। অধম লিখকের লিখনীর দেশে যারা বাস করছেন তাদের ভালোবাসার সিংহাসনে ভালোবাসার সম্রাট হয়ে বাবা বাহার শাহের পুতিন বাবা বিল্লাল শাহ অমর হয়ে থাকুন এবং থাকবেন।

অবশেষে দুটি কথা বলতে চাই

এত গাধার খাটুনি আর কোন বই লিখতে করতে হয়নি যতখানি খাটুনি দিয়েছিলাম *'মারেফতের গোপন কথা'* লিখতে গিয়ে। আজ হতে উনচল্লিশ বছর আগে ইংরেজী সাতষট্টি সালে একটানা দিবা-রাত পরিশ্রম করেছি। রোমাঁ রোলাঁর কথায় বইয়ের মত বই হলে একটি বই-ই যথেষ্ট। পৃথিবীতে যতগুলো বিখ্যাত ইসলামের উপর বই রচিত হয়েছে *'মারেফতের গোপন কথা'* নামক বইটিও একটি। কেবল একটিই নয় বরং অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই। শত্রুও একথাটি দুঃখ নিয়ে স্বীকার করেন। কারণ, এই বইটিতে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামে কোন ব্যক্তিমালিকানা নাই। গায়ের জোরে নয় বরং কোরান-হাদিস দিয়ে এমন অকাট্য প্রমাণ দেওয়া হয়েছে যে, কারো পক্ষে সামান্য নাক গলাতে না পেরে সিংহের মত গর্জন করতে হয়েছে। যারা কোরান-হাদিস দিয়ে ব্যক্তিমালিকানার দলিল তুলে ধরেছেন তাদের ব্যাখ্যাগুলো যে মনগড়া, বিকৃত, বানোয়াট তা তুলে ধরা হয়েছে, যা পড়ে পাঠক বিনা বাক্যে মেনে নিয়েছেন। এটাই আমার লিখনীর সার্থকতা। আমি দেখাতে চেয়েছি যে, ব্যক্তিমালিকানা বলাটাই হারাম। কারণ, ব্যক্তি নিজের মালিক নিজেই নন। ব্যক্তি হতে পারে সম্পদের আমানতদার। এই আমানত খেয়ানত করতে গেলেই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। সর্বপ্রকার অপচয়ের জবাব দিতে হবে। এটাই ইসলামের অর্থনীতি। ইসলামী অর্থনীতিতে সাম্য আছে কি নাই সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা নয় কোন অর্থনীতির সঙ্গে কিছুটা মিলে গেল কিনা। বড় কথাটি হল ইসলামের অর্থনীতির মানদণ্ডটি কেমন, তারই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা এবং এই বিষয়টিতে যে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি সেটাই বইটির প্রাপ্য পুরষ্কার।

ডাঃ বাবা জাহাঙ্গীর আল সুরেশ্বরী
গ্রাম: চুনকুটিয়া, পো: শুভাঢ্যা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

বলতে চাই

প্রথমেই বলতে চাই যে, এই বইটি ছাপিয়ে বাজারে ছাড়া হবে এটা ভাবিনি। পাঠকের হাতে বইয়ের আকারে তুলে দেবার ইচ্ছায় লিখলে আরো সুন্দর করার চেষ্টা চালাতাম; কিন্তু সে ইচ্ছা থাকলে ১৯৬৭ ইং সালেই ছাপাতাম। ভক্তদের প্রচণ্ড আগ্রহ এবং পরিশ্রমে এই বইটির যে তৃতীয় মুদ্রণ হবে তা ভাবিনি। ভক্তদের কাছে লোহাও সোনা মনে হয় এবং এই মনে হওয়াটাই প্রেম, কারণ প্রেম যুক্তি আর আইন মানে না। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকাশক এক ব্যক্তি নয়। ইনারা তিন জন। শেষ জনই বোধ হয় কামড় দিয়ে ধরেছেন।

ধর্ম বিষয়ে কিছু লিখতে গেলে সাংঘাতিকভাবে সীমাবদ্ধ স্থানে দাঁড়িয়ে লিখতে হয়। অলিম্পিকের ডিস্ক থ্রোর মত বৃত্তের মধ্যেই নড়াচড়া দিয়ে ছুঁড়তে হয়। একটু এদিক ওদিক হলেই ফাউল।

মনের কথা মন খুলে লিখতে চাইবেন আপনি? ধর্মের দেশে ইহা সম্ভব নয়। সত্য জেনেও অনেক সময় চুপ করে থাকতে হয়। আর যদি চুপ না করে কলম চালিয়ে যান তাহলে প্রথম প্রকাশেই বইটিকে বাজেয়াপ্ত ঘোষণার চরম ধমক খাবার পর হুঁশ আসবে। তখনই বুঝতে পারবেন কতটুকু স্থানে দাঁড়িয়ে কত সাবধানে লিখতে হচ্ছে আপনাকে। কত নকলকে আসলের সুন্দর পোশাক একান্ত অনিচ্ছায়, জোর করে যুবতীকে একটা বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দেবার মত, একটা লম্পট স্বামীকে জেনে শুনে সাধু বলতে বাধ্য হবার মত অনেক ঘটনার অনেক রূপ দিতে হয় এবং বাইরে যাবার কোন উপায় নেই। এতে যদি কোন মহাপুরুষ আমাকে ভণ্ড বলে, অথবা ভণ্ডামী করছে বলে, তাহলে চুপ করেই থাকতে হবে। কারণ, সে যুগে বাধা আসতো ব্যক্তিগতভাবে আর এখন আসবে দলগতভাবে। দলগত বাধার বিষপান করে বেঁচে থাকার যাতনা সহ্য করতে হয়।

ইমাম গাজ্জালীর অমর বই *"এহিয়ায়ে উলুম"* রাজার পাচক তথা বাবুর্চি বুদ্ধি করে পুড়িয়ে ফেলার হুকুম হতে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কোরানের একশত খণ্ডে রচিত তফসীর বাঁচাতে পারলেন না। আজো সেই পোড়া তফসীরের অংশবিশেষ বৈরুতের যাদুঘরে দেখতে পাই। ইমাম গাজ্জালী বলে ছিলেন, 'তিন কুড়ি তের ফেরকার জন্ম যাতে না হতে পারে, তার জন্য অনেক পরিশ্রম করে লিখে গেলাম পৃথিবীর সবচেয়ে আয়তনে বড় একশত খণ্ডে কোরানের তফসীর।' কিন্তু মহানবী যে আগেই বলে গেছেন যে, তাঁর উম্মত তিন কুড়ি তের দলে ভাগ হয়ে যাবে এবং এর মধ্যে মাত্র একদল তার অনুগত হবে এবং বাকি সবাই হবে বিভ্রান্ত এবং পথচ্যুত। মহানবীর কথা সত্য হতেই হবে বলে ইমাম গাজ্জালীর এত খাটুনির ফসল আগুনে দিতে হল।

মহানবী বলেছিলেন যে, উনার পর খিলাফত মাত্র ত্রিশ বছর চলবে এবং ঠিক তা-ই হয়েছিল। একটি দিনও বেশি হয়নি শুনে পাঠক অবাক হবেন। ইমাম হাসান এবং আমীর মুয়াবিয়ার মধ্যে চুক্তির দিনটিই ত্রিশ বছর পূর্ণতার দিন ছিল। যদিও ধর্ম বিষয়ে কিছু লিখতে গেলে একটা সীমিত জায়গায় দাঁড়িয়ে লিখতে হয়, তবে একদিন অবশ্যই সীমার বাঁধ ভেঙ্গে যাবেই এবং সেদিন সব জারিজুরির হবে অপমৃত্যু। সেদিন কবে আসবে? যেদিন বস্তুর বিজ্ঞান সবকিছু একটি একটি করে প্রমাণ করে দিয়ে যাবে। এবং সেদিনের অপেক্ষা হয়তো আর বেশিদিন করতে হবে না। বস্তুর বিজ্ঞান যেদিন উন্নততর হয়ে চরম উন্নতির পাদপীঠে দাঁড়িয়ে আরো অনেক গ্রহে আমাদের চেয়ে উন্নত জীব আছে, যাদেরকে এ গ্রহের কি ভাষায় নাম দেবো তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে এবং সকল রহস্যের দেয়াল ভেঙ্গে দিবে এক এক করে, সেদিনই সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের হবে চির অবসান এবং এরকম দিন অতি কাছে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

এরিক ফন দানিকেন খৃষ্টান ধর্মে জন্মগ্রহণ করেও খৃষ্টান ধর্মের স্বাধীন সমালোচনা করতে পেরেছেন এবং এতে তার বই বাজেয়াপ্ত হয়নি। দার্শনিক নিটশে খৃষ্টান ধর্মের উপর যা মনে লেগেছে তাই স্বাধীনভাবে মন্তব্য করে বই লিখে গেছেন এবং এতে সমস্ত খৃষ্টজগত সাংঘাতিকভাবে দুঃখ পেলেও ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর হাত বাড়ায়নি। নিটশের গলাটিপে ধরেনি অথবা বই বাজেয়াপ্তও করেনি। কিন্তু আমাদের দেশের মত সভ্য দেশে এরকম স্বাধীনতার প্রশ্নই উঠে না। সামান্য কোন বিষয়ের উপর সামান্য স্বাধীন মন্তব্য পেশ করতে চাইলেই সবকটা দাঁত বের করে খেঁকিয়ে উঠবে বিকট বিশ্রী শব্দের ঝাঁকুনি দিয়ে।

বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর বিখ্যাত তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ের লেখক এরিক ফন দানিকেনের ব্যক্তিগত বিচারে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হল দুটো। একটা ইসলাম এবং অপরটি বৌদ্ধ। কত বড় স্বাধীন মনোবল নিয়ে এমন কথা বলতে পারে– সত্যি, ভাবতেও অবাক লাগে।

আমাদের দেশের তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ের উপর কোন লেখক যদি স্বাধীনভাবে বলতে চায় যে, ধর্ম হিসাবে এই এই ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং সাধন রাজ্যের অতি উন্নত পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে মুসলমান সাধকেরা, তাহলে চিৎকার শুরু হয়ে যাবে এবং তাই কোন লেখক এমন কথা ভুলেও লিখতে যাবে না এবং লিখবেও না।

যে জিনিস বা দর্শন বা যে ধর্ম খুব বেশি জনপ্রিয় হয়ে যায় তার মধ্যে নকলের ছড়াছড়ি এবং অনেক দলে বিভক্তির সুযোগটা আপনা আপনি হয়ে পড়ে। পণ্যের প্রশ্নে এককালের চান্দা ব্যাটারীর কথাই ধরুন না কেন? কত রকম মিলানো নামের ছড়াছড়িতে আসলকে উদ্ধার করাই জনতার পক্ষে কষ্টকর হত। এমনকি হুবহু একই নাম দিয়েও ভেজাল মাল বাজারে ছাড়া হত। সেরকমভাবে আমাদের ইসলাম ধর্মের জনপ্রিয়তার প্রকটতায় মওলা আলীর সময়েই কারা মুমিন এবং মোনাফেক তা কাঁচের মত পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ে গেছে। তবু মুমিন এবং মোনাফেকের লাবড়া পাকিয়ে অনাগত কালের মুসলিম ভাইদের পাতে দেবার জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে এই অমৃত নামের বিষ। ইসলামের ইতিহাস পড়লে অনেক কিছু পরিষ্কার বুঝা যায়, আবার অনেক সময় কেমন যেন লুকোচুরির দোলায় দুলতে হয়। কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক তার সিদ্ধান্ত নিতে রীতিমত হিমসিম খেতে হয়।

পৃথিবীর আর কোন ধর্মে এত দল তৈরি হয়নি যত হয়েছে ইসলাম ধর্মে। এটা অপ্রিয় এবং দুঃখজনক হলেও অতি সত্য কথা। অতি প্রথম যে দলটির জন্ম হয় তার নাম "খারেজী"। খারেজীদের দর্শন হল 'আল্লাহ এবং তাঁর বাণী কোরান ছাড়া আর কোনকিছু মানি না।' খারেজীদের দর্শনটি কিন্তু প্রথমেই সবার ভাল লাগার কথা, কিন্তু মওলা আলী তাদেরকে বিভ্রান্ত বলে ঘোষণা করে কঠোর হস্তে দমন করেছেন। মহানবী বলেন, 'আমি যার প্রভু আলী তার প্রভু।' 'আমি জ্ঞানের শহর আলী তার দরজা'। 'আলীর বিরুদ্ধে যে অস্ত্রধারণ করে, সে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, যে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, সে আল্লাহর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।' হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) সঙ্গে মওলা আলীর তুমুল যুদ্ধে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) যখন একরকম নিশ্চিত পরাজয় বরণ করতে যাচ্ছে তখন বল্লমের মাথায় পবিত্র কোরান বেঁধে যুদ্ধ থামাবার আবেদন করা হয়েছিল। এতে মওলা আলী এটাকে এক ধরণের নোংরা চালবাজি বলে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলেছিলেন। তারপরের ঘটনা সবারই জানা আছে। মওলা আলীর পুত্র এবং মহানবীর প্রিয় নাতি ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে শহীদ করেছিলেন হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ)। অধম লেখকের কতটুকু স্বাধীনতা থাকলে মুয়াবিয়ার আগে পিছে দুটো খেতাবী বিশেষণ লাগাতে হচ্ছে।

খারেজীদের দর্শনকেই হুবহু রেখে আর একটু বড় করে আর একটি দলের জন্ম হল। সেই দলের নাম অহাবী। ইসলামের সবচাইতে প্রচণ্ড ক্ষতি যদি কোন দল করে থাকে সেই দলের নাম হল 'অহাবী'। এরা খারেজীদের চেয়ে ভয়ঙ্কর। এই অহাবীদের দর্শন হল, 'আল্লাহ এবং তার বাণী কোরান এবং সহি হাদিস ছাড়া আর কোনকিছু মানি না এবং মহানবী হলেন আমাদের মতই মানুষ। সুতরাং মহানবীর নামে মিলাদ পাঠ করা এবং ইয়া নবী, ইয়া রাসুল, ইয়া হায়াতুন নবী, ইয়া রাহমাতুল্লিল আলামীন বলা সম্পূর্ণ শেরেক, বেদাত এবং নাজায়েজ।' বর্তমান সউদী আরবের খাস অধিবাসীরা সবাই অহাবী মুসলমান। আমরা তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার খারাপ মন্তব্য করতে চাই না। কারণ, আমরা খুবই গরীব, তাই ডলারের প্রয়োজনে অনেক কিছু দেখেও না দেখার ভান করতে হবে– এটাই কুটনীতির আধুনিকতম দর্শন। এরকমভাবে এক আসল ইসলাম তিন কুড়ি তেরটি নামে টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং এক ইসলামের নামে এতগুলো দর্শনও প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচারিত সত্যে পরিণত হল। সিরিয়াতে এবং ইরানে বাহাই নামক একটি দলের জন্ম হল। বাহাউল্লার দেওয়া দর্শনের ভিত্তিতেই এই দলের নামকরণ করা হল বাহাই। ইরানের ইমাম খোমেনী কি আশারিয়া নামক দলের, না শিয়া দলভুক্ত? তবে ইরানের বেশিরভাগই শিয়া দলভুক্ত। আবার এই শিয়ারাও কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে গেছেন। তার মধ্যে ইসমাইলিয়া, নুসাইরী, সাস ইমামী, আসনা আসারী, বৌরী নামক দলগুলো উল্লেখযোগ্য।

এদিকে সব কয়টি দলকে চমক দিয়ে ধমক মেরে অবাক করে বসলেন একটি নতুন দল। সেই দলের নাম হল 'কাদিয়ানী'। এরকমভাবে একের পর একটি করে নতুন নতুন দল নতুন নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করলো। যেমন– আশারিয়া, গাবারিয়া, জাবারিয়া, মালামাতিয়া, মোতাজিলা, নুসাইরী, সাস ইমামী, নাচারি, ইয়াজিদি এবং দ্রুজ ইত্যাদি।

এদিকে অহাবী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল ওহাব নজদীর *'কেতাবুত তাওহীদ'* পাক-ভারতে আমদানী করেন সৈয়দ আহ্‌মদ বেরলভী এবং সৈয়দ ইসমাইল হোসেন। পৃথিবীর বার আনি মুসলমান যে দলভুক্ত সেই আহলে সুন্নাতুল জামাতের ভেতর কৌশলে প্রবেশ করে সুন্নীদের অনেককেই তাদের মতের অনুসারী করে ফেললেন। এরা না অহাবী না সুন্নী। তাই এদেরকে বলা হয় গোলাবী অহাবী। এদের প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত মাদ্রাসার নাম হল দেওবন্দ। কাশেম নানাতুভী, আবদুর রশিদ গংগুহি, মওলানা আশরাফ আলী থানভী এরকম অনেকেই পীর- মুরিদী প্রথাও রাখলেন এবং অহাবী মতবাদও রাখলেন। এই উভয়ের সংমিশ্রণের দরুণই এদেরকে 'গোলাবী অহাবী' বলা হয়।

এত দলের এত দর্শনের গোলক ধাঁধায় পড়ে যায় সাধারণ মুসলমান এবং অন্য ধর্মের পাঠক এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে প্রথমেই অবশ্য ধরতে হবে যে, কোন দলের লিখা বই পড়ছেন? না ধরতে পারলে এক এক দলের এক এক রকম মতবাদ পড়ে লেজেগোবরে দশা হবে। আর একটা কথা– লেখক কোন্ দলভুক্ত হয়ে বই লিখছেন অথবা খবরের কাগজে লিখছেন তা ভুলেও তিনি প্রকাশ করবেন না। ওটা পাঠককে ধরে নিতে হবে। অবশ্য কাঁচা পাঠক হলে ধরা সহজ নয়। যদি কেউ ওরশ পালন, মাজারে যাওয়া, পীরের মুরিদ হওয়া, গান-বাজনাকে হারাম এবং নাজায়েজ বলে খবরের কাগজে অথবা বই লিখে প্রচার করেন তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। কারণ যিনি প্রতিবাদ করছেন তিনি আপনার মাজহাবের নন অথবা তিনি মাজহাবই মানেন না এমন দলেরও হতে পারেন। এরকম প্রতিবাদ, যাকে ফতোয়া বলা হয়, তা আপনার কাছে একদম নতুন মনে হতে পারে, কিন্তু ইহা আদৌ নতুন নয় বরং অতি পুরাতন। এতে আপনার দুঃখ পাওয়া মোটেই ঠিক নয়। এটাকে অতি সহজ এবং সাধারণ মনে করতে হবে। কারণ আমাদের বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী

(রঃ)-কে এক হাজার আলেম(?) কাফের ফতোয়া দিয়েছিল (নাউজুবিল্লাহ)। এরকমভাবে সুলতানুল হিন্দ খাজা মঈনুদ্দিন হাসান চিশ্‌তী আজমেরীকেও কাফের ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল (নাউজুবিল্লাহ)। শুধু কি এ দুজনকেই? হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী, বাবা শেখ ফরিদ, নিজামুদ্দীন, বু আলী শাহ কলন্দর, মনসুর হাল্লাজ, সামসেত্তাব্রীজ, মাওলানা জালালউদ্দীন রুমী, হাফেজ সিরাজী, ওমর খৈয়াম এবং আরো বহু মহাপুরুষকেও কাফের ফতোয়া দিয়েছে ঐ তথাকথিত আরবী ভাষা জানা মহাপণ্ডিতেরা তথা আলেমরা! এই সেদিনও আল্লামা ইকবাল ও কাজী নজরুল ইসলামকে কাফের ফতোয়া দেবার কথা কে না জানে?

এরকম আলেম (?) আর মাওলানা (?)-দের মত বিদ্বানদের ফসলের গন্ধ কি রকম হতে পারে, স্বাধীনতার সংগ্রামে আল বদর, রাজাকার, আল শামসদের কীর্তিকলাপের নমুনা দেখলেই বুঝা যায় যে, এরা সমাজ জীবনে কত মারাত্মক স্লো-পয়জন। অনেকেই হয়তো তুরস্কের জাতির পিতা কামাল আতাতুর্ক এরকম তথাকথিত আলেমদেরকে কি রকম শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন তা জানেন। এ সমস্ত তথাকথিত আলেমদের কথা খারেজীদের মত সুন্দর মনে হবে। 'আমরা আল্লাহ্ এবং আল্লাহর বাণী কোরান পাক ছাড়া আর কিছুই মানি না'-র মত। খারেজীদের এ কথাগুলো আজও যে কোন মুসলমান ভাই মনের অজান্তে খুব সুন্দর কথা বলেছে বলে মনে করবেন। তাই নয় কি? অথচ এই খারেজীরাই ছিল মুসলমান নামধারী মুনাফেক তথা বর্ণচোরা শয়তান। মওলা আলী এদেরকে একটি একটি করে হত্যা করেছেন কিন্তু খারেজীদের প্রেতাত্মা আজো অনেক মুসলমান নামধারীদের মধ্যে আধুনিক খারেজীরূপে অনেক অনেক পাবেন। একটু নিরপেক্ষ গবেষণার দর্শনের মাপকাঠিতে বিচার করতে গেলে আজো এই চরম আধুনিক যুগেও আপনি অনেক খারেজী-মার্কা মুসলমান পাবেন, যারা মওলা আলীর মুখের সামনে আল্লাহ এবং কোরানের দোহাই দেয়, তারা যে কতবড় মারাত্মক জঘন্য শয়তান! এবং এরকম শয়তানদের দ্বারাই পতন হয়েছিল খিলাফত এবং জনসাধারণের সম্পত্তি বায়তুল মাল পরিণত হয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। কল্পনা করতেও কষ্ট হয় সে সব ঘটনার দ্বারা লিখিত ইতিহাসের রূপ দেখে।

আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে বুখারী শরীফের একটি হাদিসের কথা। কত বড় মারাত্মক ধৃষ্টতা হতে পারে সেই হাদিসটি পড়লে বুঝা যায়। হাদিসটির ভাষা ছিল এরকম, ' হে মোহাম্মদ আল্লাহকে ভয় কর এবং ন্যায় বিচার কর।' যারা মহানবীকে এধরণের অশ্লীল কথা বলতে পারে– তারা কি মওলা আলীকে পারে না বলতে? তারা কি ইমাম হাসানকে বিষপান করাতে পারে না? তারা কি ইমাম হোসেনকে কারবালার মাঠে শহীদ করতে পারে না? মওলা আলী, ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসেনকে কোন হিন্দু, কোন খ্রিষ্টান, কোন বৌদ্ধ, কোন ইহুদি, কোন পার্শী শহীদ করেননি। যারা করেছিল তারা মুসলমান লেবাসে নামাজ, কোরান পড়াতে, রোজাতে ভুল করেনি। ভুল করেনি মুসলমান নাম ধারণ করে রসুলের আওলাদদের শহীদ করতে। এরা খারেজীদের মত রসুলের আওলাদদের শহীদ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। তার পরিণাম কি আজকের মুসলমানদের লেজেগোবরে অবস্থা নয়? আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি সেটা কি একবার দেখতে পেরেছি? ইসলামের জন্মলগ্নের ইতিহাসের উজ্জ্বলতম দিনগুলোর মানদণ্ডে আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি, সেটা কি একবারও ভেবে দেখবো না?

"আমরা আল্লাহ্ এবং আল্লাহর বাণী কোরান ছাড়া আর কোনকিছু মানতে রাজী নই" এই বাক্যটির দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছিল খারেজীরা? তারা এই বাক্যটির দোহাই দিয়ে মওলা আলীর নেতৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। খারেজীরা আল্লাহ্ এবং আল্লাহর বাণী কোরানকে পরোক্ষভাবে

না মানারই অভিমত প্রকাশ করেছে মওলা আলীর নেতৃত্বকে অস্বীকার করে। “আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী তার দরজা” মহানবীর এই উপদেশবাণীর কোন মূল্যই দিতে পারেনি খারেজীরা। পরোক্ষভাবে তারা মহানবীকে অস্বীকার করেছে। এই ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্যটি খুবই সুন্দর কিন্তু ভেতরে মাকাল ফলের মত “কিছুই নেই”-এর দর্শন প্রচার করে, “আল্লাহ এবং আল্লাহর বাণী কোরানকে ছাড়া আর কিছুই মানি না।”

আজও এই বিংশ শতাব্দীর বুকে অনেক মুসলমান মনের অজান্তে খারেজীদের দর্শনকে গ্রহণ করে ফেলেছে। ঐ কারবালার মাঠে আজান দিয়ে নামাজ আদায় করে মহানবীর আদুরে নাতি ইমাম হোসেনের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র ধরতে পেরেছে, তারা কি মুসলমান নামের জঘন্য কলঙ্ক নয়? তারা কি অন্য যে কোন ধর্মে বিশ্বাসীদের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়? এরকম মুসলমান নামধারীদের বংশধরেরা আজ কোথায়? তাদের দেওয়া ইসলামের নামে যে জঘন্য দর্শন দেওয়া হয়েছে তাদের মায়াজালে পা ফেলছে সরল সহজ মুসলমানেরা। ছিঃ ছিঃ কত বড় নিষ্ঠুর ঐ সব পাষণ্ড নামধারী লেবাসে ঢাকা মুসলমানেরা, যারা নবীবংশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পেরেছে। সেই সব পাষণ্ডদের বংশধরেরা আজও বেঁচে আছে বহাল তবিয়তে- আজও মুসলমানী লেবাসে আনুষ্ঠানিকতার মেকী অবগুণ্ঠনে জঘন্য মিথ্যা বানোয়াট দর্শন প্রচার করে চলেছে। শয়তান যে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি ধোঁকা দেবার জ্ঞান রাখে এবং এই রকম চাকচিক্যপূর্ণ ধোঁকার গর্তে কত সহজ-সরল মুসলমান পা বাড়িয়ে দিয়ে বেঈমান হয়ে মৃত্যুবরণ করছে তার হিসাব কে রাখে? খারেজীদের এই অমৃত নামের বিষ মাখা মানুষকে বিভ্রান্ত করার টোপটার কথা কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন তো। কত সূক্ষ্ম আর কত নিপুণ ধোঁকাবাজি।

যিশুখ্রিষ্ট বলেছিলেন, ‘যারা আমাকে না মেনে বলে এক আল্লাহকে মানে তারা শয়তানের ইবাদত করে।’ হযরত খাজা গরীব নেওয়াজ বলেছেন, ‘যার পীর নাই তার পীর হল শয়তান।’ নরাধম নরপশু ইয়াজিদ কোরান পাকের একটি আয়াত ইমাম বংশের যে কয়জন বেঁচে ছিলেন তাদেরকে বলে দিলো– ‘আল্লাহ যাকে খুশি তাকেই বাদশা বানান।’ শয়তান ইয়াজিদের মুখে কোরানের বাণী! নরপশু নরাধম ইয়াজিদের প্রশংসাও এই প্রথমবারের মত শুনতে পেলাম বাংলাদেশের টেলিভিশনের পর্দায়। তা-ও আবার আশুরার দিন একজন মহাপণ্ডিতের মুখে। ধর্ম এত সস্তা আর মামুলী হয়ে পড়েছে যে, এর প্রতিবাদটুকু পর্যন্ত কেউ করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। এক ইসলামের মধ্যে তেহাত্তরটি দলের মধ্যে যে দুই-একটি দল এখনো ইয়াজিদের নামের আগে হযরত বসাতে লজ্জা পান না এবং ইমাম হোসেনকে বিদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হয়, সেই দলের তেল-বেচা ডলারের বদৌলতে আহলে সুন্নাতুল জামাতের মুসলমানের মুখেও ইয়াজিদের প্রশংসা শুনতে হয়। হায়রে মালপানি, তোর অঙ্গে কত রূপ আর শক্তি কতই না মোহনীয়। বিবেকের গলায় ছুরি চালিয়ে দিতে পারে এই মোহনীয় ডলার। ব্যক্তি তো তুচ্ছ ব্যাপার– একটা দেশের গোটা সরকার পর্যন্ত মুখ বন্ধ করে থাকে এই ডলারের মোহে। ভাবখানা যেন অনেকটাই এরূপ– মালপানি যখন আপসে পাওয়া যায়, তাহলে না হয় একটু দাঁত-মুখ বুজে সহ্য করতে হয় আর কি! তা সহ্য করুন, তাতে আমরা গরীব বলে না হয় মুখ বুজে রইলাম। কিন্তু নরপশু নরাধম নরপাপী ইয়াজিদকেও ভাল বলাটা কি চুপ করে থাকার সীমা ডিঙ্গানো হচ্ছে না? এরকম কথাও ডলার যদি হজম করাতে চায় তো পরকাল যে ঝরঝরা সে কি একবার এক মুহূর্তের তরে ভেবে দেখেছেন?

আমাদের বাংলাদেশের ইসলামের নামে কয়টি রাজনৈতিক দল আছে। তাদের মধ্যে অনেকেই একটি পোস্টার দেয়ালে লাগিয়ে দেয়। পোস্টারটির ভাষা অনেকটা খারেজীদের আধুনিক সংস্করণ–

'আল্লাহ আমাদের প্রভু, কোরান হল দিকদর্শন এবং হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আমাদের নেতা।' কি সুন্দর কি অপূর্ব অমৃতের নামে বিষ-মাখা টোপ। 'হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আমাদের নেতা' বলে নিজেরা গদিতে বসার অপূর্ব চালাকি। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আমাদের নেতা– এটা প্রতিটি মুসলমান মেনে আসছে। নতুন করে মেনে নেবার উপদেশ দেবার অর্থ হল তারা মহানবীর নাম ভাঙ্গিয়ে গদীতে বসতে চায়। যেন মহানবীর সোল এজেন্ট তারাই হয়ে গেছে আর বাকি সব মুসলমানেরা মাখা তামুক। কত ডিজাইনের ধোঁকাবাজি যে চলছে এবং আরো চলবে তা অনাগত কালই আমাদেরকে জানিয়ে দেবে।

একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই সমস্ত কাঠমোল্লারাই তৈরি করেছিল ইসলামের ইতিহাসের সবচাইতে মূল্যবান ঘটনা বদরের যুদ্ধের নামে 'আল বদর' বাহিনী। নিরীহ এবং বাছাই করা জাতির মাথাগুলোকে রাতের আঁধারে ধরে এনে জলাভূমিতে হাত-পা বেঁধে জবাই করার দায়িত্ব পালন করেছিল এই আল বদর। ছিঃ ছিঃ কি নিকৃষ্টতম মনের বিকৃত পরিচয় দিয়েছে এই কাঠমোল্লারা 'আল বদর' নাম দিয়ে। এক মুহূর্তের তরেও এই সমস্ত কাঠমোল্লাদের মন ও বিবেক কেঁপে উঠেনি– কি পবিত্র নাম দিলাম, কি অপবিত্র একটি দলের– আল বদর বাহিনী।

আমাদের ছয় ঋতুর জলবায়ু ছয় রকম আবহাওয়ার পরশ দিয়ে ছয়বার মনটাকে বদলিয়ে দেয় এক এক রকম। তাই আমরা জাতির সবচাইতে বেদনাদায়ক স্মৃতির ইতিহাস স্বাধীনতার যুদ্ধে 'আল বদর' বাহিনীকে মনে রাখতে পারিনি, একটা দগদগে বুকের ভেতর জ্বালা সৃষ্টি করা আলসারের মত। ভয় হয়– আমাদের এরকম অবহেলায় না আবার এ ঘা ক্যানসার হয়ে আমাদেরই মৃত্যু ডেকে আনে। ভাবাবেগের বশে আমাদের জাতীয় নেতা ক্ষমা করে দিয়েছেন, কারণ তিনি ইতিহাস হতে সেই শিক্ষা গ্রহণ করেননি, যে শিক্ষার কথা আমাদের ইসলামের ইতিহাসে পেয়েছিলাম– মওলা আলী খারেজীদের সমুচিত শিক্ষা দেবার উপদেশ দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন পবিত্র 'আল বদর' নাম দিয়ে এরা কি না অপবিত্র কাজটাই করে গেছে। যেমন খারেজীরা 'আল্লাহ এবং কোরান ছাড়া আর কিছু মানি না' নামের দর্শন প্রচার করে মওলা আলী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আমাদের জাতীয় নেতার ইতিহাসের উপর পড়াশোনার দৌড় হয়তো কম ছিল, আর না হয় উদারতার প্লাবনের উচ্ছলতার মধ্যে ইতিহাসে একটা নতুন কিছু যোগ করতে চেয়েছিলেন– সেই নতুন যোগটার নামই হল পাইকারী ক্ষমা প্রদর্শন।

এরা মহানবীর সবচাইতে যোগ্য সাহাবা এবং জামাতা শেরে খোদা মওলা আলীর সামনে– যিনি হিজরতের সময় নিশ্চিত মৃত্যুর বিছানায় শুয়ে মহানবীকে করলেন মদীনাতে বিদায়– যাকে মহানবী সব সাহাবাকে লক্ষ্য করে বলতেন– 'আলীর মূল্য আমার কাছে ততটুকু, যতটুকু দেহের মধ্যে প্রাণের মূল্য'– যাকে যুদ্ধের ঝাণ্ডা আর বিরাট তলোয়ার জুলফিকার হাতে হায়দরি হাঁক মারতে হত– যার জুলফিকার ইরাকের মিউজিয়ামে দেখে সবাই চমকে যায়– এত বড় আর চওড়া তলোয়ার কত শক্তির অধিকারী হলে হাতে নিতে পারতেন সেই মওলা আলী, যিনি মুমিন নন– মুমিনদের আমীর তথা আমীরুল মুমিনীনের সামনে 'আল্লাহ এবং কোরান ছাড়া আর কিছু মানি না' বলা কত বড় ধৃষ্টতা আর ঔদ্ধত্য প্রকাশ।

ডাঃ বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী
১৭ই মার্চ ১৯৮৬ইং, ৩রা চৈত্র ১৩১২ বাং. ৫ই রজব ১৪০৬ হিঃ

সুরেশ্বরের ওরশ মোবারক

প্রতি বছর মাত্র চারটি দিন আর রাত – ৩১ শে জানুয়ারী এবং ১,২,৩ ফেব্রুয়ারী পালন করা হয় ওরশ। আমরা তর্কে যেতে চাই না। কারণ, এক ইসলাম তিন কুড়ি তের শাখায় বিভক্ত– ইহা তর্কশাস্ত্রের একটি ভাল না হয় মন্দ দান। তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে– গণতন্ত্রের বাণী, সহনশীলতার পরিচয়ের শ্রদ্ধা আর মমত্ববোধ পাই ইসলামে। ইসলামে শক্তিপ্রয়োগের প্রশ্ন থাকলে আজকের পৃথিবীতে অন্য ধর্মের ধারক আর বাহকের অস্তিত্ব থাকতো কিনা সন্দেহ। ইসলাম ধর্মে যদি এরকম একটি মাত্র বলপ্রয়োগের আদেশ থাকতো যে, 'জোর করে মুসলমান বানালে পুণ্য হবে,' তাহলে সভ্য পৃথিবীতে খুব অল্পই অন্য ধর্মের মানুষ পাওয়া যেত– এটা ইতিহাসের একটা বাধ্য-হয়ে-মেনে-নেওয়া নির্মম সত্য। তাই যারা ইসলামের নামে অন্যের ধর্ম-দর্শনের উপর হস্তক্ষেপ করতে চায়, তারা নীতির বৃত্তে অবস্থান করছেন, না চ্যুত হয়েছেন– দর্শনের আয়নায় মনের মুখটা দেখে নিক।

মরা গাধার গালে চড় মেরে তৃপ্তির অবগুণ্ঠনে বিশাল ফাগুনের জোছনার কথা যারা প্রচার করে বেড়ায়, তারা আত্মতৃপ্তির আদিম রস পানে উন্মাদ– তারা ভুল করে ফুল মনে করে হাতে পাথর তুলে নেয়– তারা আলো মনে করে আলেয়ার পিছু ছুটে– তারা মরীচিকার উষ্ণ বালিতে ঊর্মির মেকী প্রেতনৃত্য দর্শন করে আত্মহত্যার দর্শন প্রচার করে। আচার যখন উহার স্বকীয়তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে তখন উহা অনাচারে পরিণত হয়। সংসার ত্যাগ করতে পারলেই বৈরাগ্য হয় না– স্বকীয়তার বৃত্তে পাশবিক আবর্জনা ফেলে দিলেই হয় সত্যিকার বৈরাগ্য। পাথরের নাম ভগবান দিয়ে হিন্দুদের পূজার অশ্রু উপহার নেয়। পাথরের নাম হজরে আসোয়াদ দিয়ে মুসলমান হাজীদের চুমা উপহার নেয়। কারো ভক্তির উপর ইসলাম শক্তিপ্রয়োগ করেনি বরং ঘোষণা করেছে, নেই কোন শক্তিপ্রয়োগ ইসলামের মধ্যে।

দরিদ্রতার যেমন অভিশাপ আছে, ঠিক তেমনি প্রাচুর্যতারও অভিশাপ আছে। একটি প্রকাশ্য এবং অপরটি গোপনীয়। কেউ ধন-সম্পদ পেয়ে মোহমুক্ত হয়, আবার কেউ কবরে যাবার আগেও ধনের মোহে মত্ত থাকে। একের ভেতরই দুই। একটি উত্থান অপরটি পতন। মানুষের ঠোঁটেই স্রষ্টার বাণী আবার মানুষের ঠোঁটেই শয়তানের পচা বচন। বীণের সুরে একটি ফনা তুলে নাচে, অপরটি পালায়।

মহানবী মওলা আলীকে সূরা এখলাসের মারেফাতের রহস্য বুঝিয়ে দেন, আবার উটের রাখাল বেদুঈন সাহাবাকে সূরা এখলাস তিনবার পাঠ করলে একবার কোরান খতমের বাণী শোনান। নবীর বাণী সবার জন্য। কিন্তু দার্শনিকের বাণী সবার জন্য নয়। নবীর বাণীতে উঁচু-নিচু অনেক রকম ধাপ পাওয়া যায়, কিন্তু দার্শনিকের বাণী একরকম। নবীর বাণী আইনস্টাইনকে যেমন উপদেশ দেবে তেমনি ঠেলাগাড়ি চালায় টিপসই মার্কা মানুষটিকেও দেবে। নবীর বাণীতে দেয়াল নেই, অসীম। দার্শনিকের বাণীতে দেয়াল আছে, সসীম। তাই নবীর বাণীর ধারা ও শৈলী বুঝতে দার্শনিকের কষ্ট হয়। আত্মবিরোধের গন্ধ পায় এবং ভুল ধরতে চায়। আসলে উহা দার্শনিকের মনের ভুল। দার্শনিক নিজের মত করে নবীকে মাপতে চায়। মাপতে গেলেই ভুল হয় নিজের অথচ দোষ চাপিয়ে দেয় নবীর উপর। অনেকটা 'অনেক কিছু জানি অথচ কিছুই জানি না'-র মত।

নাস্তি থেকে স্বকীয়তার অস্তিত্ব। বর্ণহীনের রং। প্রকারহীনের আকার। পরিচয়হীনতা থেকে এর পরিচিতি। তাই এক-একটি স্বকীয়তার সুগন্ধী এক-এক রকম। পৃথিবী নামক দোকানে এদের পাওয়া যায়। রুমী, হাফেজ, খৈয়াম, জামি, কান্ট, নিটশে, রাসেল, রবি, নজরুল আরো কত নামের স্বকীয়তা। তাই আসুন– আপনার দাওয়াত। ওরশের প্রচলিত নিয়ম সুরেশ্বরে পাবেন না কিছুই। পাবেন ব্যতিক্রম। দিন-রাত গানের আসর। কাওয়ালী, ফার্সী, উর্দু, ঠেট হিন্দি, বাউল, লালন, মুর্শীদি। আপনার স্বকীয়তার মনঃপুত না হলে ভুলেও কিন্তু আসবেন না। কারণ যুক্তির রাস্তার যেখানে শেষ প্রেমের নদীর সেখান থেকেই শুরু।

সঙ্গীতের অনেক রূপ ও ঝংকারের এক অপুর্ব মহাসমারোহ সঙ্গীত আর গানের বিভিন্নতা দিয়ে শুরু হয় ওরশ পালনের পদক্ষেপ। শেষও হয় সঙ্গীত আর গানের মধ্য দিয়ে। লক্ষ লক্ষ ভক্তের 'আল্লাহু' বলে নেচে নেচে জিকির করার এত বড় বিশাল পরিবেশটা দেখার মত। লালন গীতি হতে শুরু করে হাফেজ সিরাজীর আর জালাল উদ্দীন রুমীর পীর-পূজার ফার্সী কাউয়ালী পর্যন্ত পাবেন। তবে অহাবী আর দেওবন্দী ফেরকার মুসলমান ভুলেও আসবেন না। কারণ, অহাবী এবং দেওবন্দী ফেরকার মতে আমাদের সুরেশ্বরের ওরশ সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও বেদাত।

সঙ্গীত আমাদের ধর্মবহির্ভুত না অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়ের উপর আজও তর্ক-বিতর্কের শেষ হয়নি। তবে ইসলামের কয়টি দল সঙ্গীতকে একদম হারাম বলে মন্তব্য করতেও দ্বিধা করেনি। এমনকি বিবি তালাকের ফতোয়া পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে তাদেরকে যারা সঙ্গীত ভালবাসেন। অথচ অবাক হবেন, সে সব মতাদর্শের অনুসারীদের দেশে রেডিও-টেলিভিশনে দেদার গান-বাজনা চলছে। তবে কি তাদের ফতোয়া তাদের উপরই পড়ছে না? এরকম আত্মবিরোধী ফতোয়া দেখে যদি কেউ হাসে তবে কি বলবেন? নিজে ইসলামের শরা-শরিয়ত সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করছেন কিন্তু সন্তানরা কি সর্বাধুনিক ভি.সি.আর দেখছেন না? অনেক ফতোয়াই এখন তাদের উপর পরোক্ষভাবে কি পড়ছে না?

সঙ্গীত হারাম অথবা নাজায়েজ করা হয়েছে এমন একটি দলিল কি সমস্ত কোরান পাক হতে দেখাতে পারবেন? মনগড়া অনুবাদ ও শব্দের অর্থকে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে গান-বাদ্য করা হয় তবে দোষটা কার? এরকম শব্দের কত হাজারো বিকৃত অনুবাদ করে কোরান পাকের হাজারো বিকৃত অনুবাদ উপহার দেওয়া হয়েছে, তারই পরিণাম কি এক ইসলামের তেহাত্তর ফেরকা নয়?

প্রচলিত নিয়মের বৈশিষ্ট্যে প্রায় প্রতিটি ওরশ পালন করা হয়, কিন্তু সুরেশ্বরের ওরশ সেভাবে মোটেই পালন করা হয় না। কারণ সুফিবাদের মধ্যে দেওবন্দী গন্ধ এখানে পাবেন না। তাছাড়া কেউ ওরশ পালন না করলেও বলার কিছু নেই। কেউ ওরশের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে চাইলেও এক ইসলামের তিন কুড়ি তের ফেরকার চেহারা দেখে কিছু বলার ইচ্ছা আর থাকে না। অনেকে বলেন যে, কোরান পাকের একটি আয়াতের অনেক রকম ব্যাখ্যা হয় এবং যেহেতু এক আয়াতের অনেক রকম ব্যাখ্যা হয়, সেহেতু অনেক রকম চিন্তাধারার প্রতিফলন হয় এবং যেহেতু অনেক রকম চিন্তাধারার প্রতিফলন, সেহেতু অনেক রকম ফেরকার জন্ম হওয়া সাধারণ কথা। একদল বলবে তাদের চিন্তাধারা সঠিক, অন্যদল বলবে ওদেরটা সঠিক। সুতরাং কোন দলের বিরুদ্ধে মন্তব্য সম্পূর্ণরূপে অশোভনীয়। যেহেতু অশোভনীয় সেহেতু নীরব থাকাই সমীচীন।

সুরেশ্বরের ওরশে দিনরাত ঢোলের বাজনা, দোতারা একতারা, সারেঙ্গী, বেহালা, মারেফতী গান, কাওয়ালী অনেকের কাছেই ভাল লাগবে না। দলীয় আইনের তলোয়ার ইসলামের নামে চালাতে চাইবেন, কিন্তু কোন লাভ নেই। কারণ, অতি দুঃখের সাথে মুসলমান ভাইদের বলতে হচ্ছে যে, এক ইসলাম তেহাত্তর ফেরকায় অনেক আগেই ভাগ হয়ে গেছে। যদি ওরশের বিরোধিতা আপনি করেন

তবে অবশ্যই আপনাকে বলবার অধিকার আছে যে, আপনি কোন ফেরকার মুসলমান? অহাবী ফেরকার, না কাদিয়ানী, না শিয়া, না বাহাই, না মোতাজিলা, না আশারিয়া, না গাবারিয়া, না মালামাতিয়া, না জাবারিয়া, বা বাটালভী, না চাক্রালভী, না নাচার, না বৌরী, না ইসমাইলিয়া, না বুরহানিয়া, না নুসাইরি, না সাস ইমামী, না আসনা ইমামী, না খারেজী, না ইয়াজিদি, না দ্রুজ, না দেওবন্দী? এরকমভাবে তিন কুড়ি তের ফেরকার কোন ফেরকার মুসলমান আপনি? যেদিন সবগুলো ফেরকার অবসান ঘটিয়ে এক ইসলামে সবাইকে আনতে পারবেন, সেদিনই আপনার সমালোচনা সাদরে গ্রহণযোগ্য হতে বাধ্য। কারণ আমাদের ধর্ম একটি, কোরান একটি এবং নবীও একটি অথচ লজ্জাজনক তেহাত্তরটি ফেরকা কেন?

সুরেশ্বরের পাক দরবার শরীফের একজন নগন্য ভক্তের দাবীতে–
জাহাঙ্গীর আল সুরেশ্বরী।

আমি যা বলতে চাই

গবেষণা সত্যকে নেংটা করে দিতে পারে। আবার গবেষণা সত্যকে পিছিয়ে দেবার পোশাক পরিয়ে দিতে পারে কি-না জানি না। তবে গবেষণার কাজটিকে মহানবী এতই উৎসাহিত করেছেন যে, ভেবে অবাক হই। গবেষণার আর একটা নাম জ্ঞান অর্জন করা বুঝায়, গবেষণার আর এক নাম যদি ঠুলিপরা চোখ দু'টো খুলে দিতে পারা বুঝায়, গবেষণা যদি একটি চাপিয়ে দেওয়া মিথ্যা খোলস খুলে দিতে পারা বুঝায়, তাহলে সেই গবেষণার আর এক নাম জ্ঞান। নারীর অধিকার চাইবার গবেষণায় যদি প্রাচীর দাঁড় করাতে চান ধর্মের নামে, তাহলে কি ধর্মটি মিথ্যা বলছে? না যে ধর্মের নামে ফতোয়া মারছে সে মিথ্যা বলছে? মোল্লা দিয়ে মোহাম্মদকে যাচাই যারা করতে চায় তাদের গবেষণার মাল-মসলার ভিত্তিগুলো কি নড়বড়ে না শক্ত, তারও গবেষণা হওয়া উচিত মনে করি। কিভাবে মহানবীর নামে মিথ্যা কথার ঝুড়ি বানানো হয়েছে গবেষণার মাধ্যমেই সুন্দর ধরা পড়ে এবং পড়তে শুরু করেছে। তাই মহানবী জ্ঞান অর্জনের জন্য সেই দিনের দুর্গম বলে পরিচিত চীন দেশে যাবারও উপদেশ দিয়েছেন। সেই জ্ঞানের গবেষণার মাধ্যমে কোনটা মিথ্যা আর কোনটা সত্য সেটারই সামান্য বিষয় তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে এই ছোট্ট বইটিতে। এই গবেষণার কাজটিকে জোর করে থামিয়ে দিয়ে গতানুগতিকতায় চলার নির্দেশ দিতে গেলেই বিবেকের গায়ে পড়ে জমিদারীর নির্মম চাবুকের আঘাত। আর তখন? তখন নকলের সাথে আসলটাও বন্যার জলের মত ভেসে যায়। উপসংহার টানে অস্বীকার। একটা চাপা বিদ্রোহ এবং ঘৃণা আর অবজ্ঞায় সমস্ত বিষয়টাকে একটা আবর্জনা মনে করে পৌর করপোরেশনের আবর্জনা ফেলার গাড়িতে তুলে দিয়ে নিস্তার পেতে চায়। এটাই মানব মনের একদম হালকা দর্শন। তখন আর ডেকে এনে নাস্তিক বানাতে হয় না, বরং নাস্তিক আপনি-ই হয়ে যায়। সবকিছুই মনে হয় তখন একটি সুপরিকল্পিত ভণ্ডামীর নীল নকশা।

এই ছোট্ট বইতে দেখাতে চেয়েছি আমার সীমিত গবেষণার ফসল। হয়তো কেউ ছুঁড়ে ফেলে দেবে, আবার হয়তো কেউ আদরে মাথায় তুলে নেবে। এই স্বাধীন নির্বাচনের অধিকার যে জাতি দিতে চায় না, সেই জাতিই মনের অজান্তে সভ্য জাতির দুয়ারে জ্ঞান-ভিক্ষার ভাণ্ড হাতে দাঁড়ায়।

উমাইয়াদের আমলে হাদিস সংগ্রহ শুরু হয়। মহানবীর জাত শত্রুদের শাসনামলে মহানবীর মহাবাণীগুলো আমরা পেয়েছি। এই জাত শত্রুরা মহানবীর বংশধরদের উপর প্রতিটি মসজিদে জুম্মার নামাজের খোৎবা দেবার সময় অভিশাপ আর জঘন্য ভাষায় গালাগালি দেয়া ছিল নিত্যদিনের মত একটি সাধারণ ব্যাপার। যা শুনলে আজকের মুসলমানেরা অবাকের উপর অবাক হয়ে ভাবে, আপন মা সালাম পায় না, ডাকের মা পা বাড়ায়। সুতরাং প্রতিটি হাদিস কোরআনের মানদণ্ডে বিচার করতে হবে। যদি না মেলে তা সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিতে হবে, তা সেই হাদিস যতই নির্ভরযোগ্য বলে দাবী করা হোক না কেন। কারণ, কোরানকে অনুসরণ করবে হাদিস, কিন্তু হাদিসকে কোরান কখনই অনুসরণ করতে পারে না। সূর্য আলো দেবে চাঁদকে, কিন্তু চাঁদ কখনোই সূর্যকে আলো দেবে না।

আমার প্রথম লেখা বইটি ইংরেজী ভাষায় রচিত হয়েছিল। ১৯৬৮ ইং সালে। প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আইয়ুব খাঁ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। কিন্তু বই বাজারে ছাড়া হয়েছিল। বাকিগুলো পুলিশের ভয়ে আমার স্ত্রী বস্তাবেঁধে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিল। ভাগ্য খারাপ, সেই বইটির একটি কপিও এখন আমার নিয়ন্ত্রণে নেই।

আমার দুই নম্বর বইটি ইয়াহিয়া সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল এবং সেই বইটির জন্য বর্তমান ফেনী জেলাতে আমাকে রাজবন্দী করে নোয়াখালীর মাইজদি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিচারে এক বছর কারাদণ্ড হয় এবং প্রায় ছয় মাস জেল খাটার পর মুক্তিলাভ করি।

আমার তিন নম্বর বইটি *(মারেফতের গোপন কথা)* প্রথম ছাপা হয় ১৯৭৭-এ এবং দশ বছর চালু থাকার পর এরশাদশাহী সরকার ১৯৮৭ সালের ২৫শে অক্টোবর বাজেয়াপ্ত করে এবং বিচার করে বেকসুর খালাশ প্রদান করা হয়।

আমার চার নম্বর বই *এলমে মারেফত* এখনো বেঁচে আছে। এই বইটির হায়াত কতদিন থাকে তা আল্লাহপাকই জানেন। তবে কিছু কিছু কঠোর সমালোচনা যে হয়নি, তা নয়। তবে অসুস্থ হলেও মারা যায়নি। আসলে আমার কপালটাই খারাপ। কলম ধরতে গেলেই এলার্জির ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে বার বার হযরত শাকিল বাদাউনি (রঃ)-এর রচিত দু'টি লাইন। ***'চুপ রাহেনা চাহু রায় না সাকু, কুচ কায়না চাহু কায়না সাকু; কিসমত নে হামে মজবুর কেয়া'*** অর্থাৎ 'চুপ করে থাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু থাকতে পারলাম না। কিছু বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বলতে পারলাম না। কারণ, ভাগ্যটাই আমাকে করে দিল একদম অসহায়।'

বাংলাদেশের ভেতর বেশ কিছু পীর-ফকিরদের আস্তানায় যাওয়া আসা করেছি। সবাইকে এক পাল্লায় মাপতে চাইবার ইচ্ছায় নয়। তবে আধুনিক যুগের কিছু কিছু পীর ফকিরের 'হামসে হাম' ভাবখানায় ডুবো ডুবো ভাবখানা দেখতে পেয়েছি। যার দরুণ সুফিবাদের প্রচার যতটুকু হওয়া উচিত ছিল, তার কিছুই হয়নি বলে মনে হয়। আগের দিনের রাজা-জমিদারদের চমৎকার একখানি আদর্শ ছিল- 'খানা লাগাও, বাইজি নাচাও, গান বাজনা শোন, মওতের আগে মন্দির বানাও, বুড়ো বয়সে তপজপ করো এবং হাসতে হাসতে বেহেস্তে চলে যাও।' জ্ঞান-গবেষণা করতে নেই। ওটা ইউরোপ আর আমেরিকানরা করবে। নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করবে। আমরা ওদের থেকে কিনে নেব আর মউজ করবো। সাবাস, সাবাস বলে চাটুকারের দল সায় দিয়ে গেছে আর হুজুরদের দর্শনবাণী শুনিয়েছে, 'হুজুর ওরা গাধা, খাটুনি করে মরছে ইউরোপ আর আমেরিকানরা।'

কিন্তু যে সকল পীর-ফকিরেরা সুফিবাদের ধারক ও বাহক তাদের আস্তানায় গিয়ে দেখতে পেয়েছি একদম সাধারণ অবস্থা। ইচ্ছা থাকলেও বলার উপায় নেই। তাও মরে-পিটে কিছু ছাপাতে গেলে বইগুলোর চেহারা-সুরত এতই নিম্নমানের হয় যে, পাঠক হাতে নিতে চায় না। যুগটাই চমকের। চমকের কিছু আলো, বইটির চেহারায় বিউটি পারলারের উগ্র ফ্যাশনের বাঁধাই না থাক, কিছুটা মোমপালিশ যে দিতেই হয়। যে যুগরে বাবা! বৈঠকখানায় সাজানো ফুলদানিতে থোকায় থোকায় রং-বেরং-এর ফুল-পাতা, একদম তরতাজা, মানে ফ্রেশ, কিন্তু প্লাস্টিকের ফুল-পাতা বলে যখন ধরা পড়ে তখন মনটায় একটা কামড় মারে। হযরত ইমাম বুখারী (রঃ) সাহেব তো এরকম ধোঁকাবাজি দেখতে পেলে একটিও হাদিস বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করতেন না। খালি ধামা দেখিয়ে গাধা ধরার কৌশল দেখে হযরত ইমাম বুখারী (রঃ) একটিও হাদিস গ্রহণ করেননি। বিসমিল্লাতেই ধোঁকাবাজির ম্যাজিক শো দেখে তিনি তাড়াতাড়ি বিদায় নিলেন। অথচ এ যুগে ধামার ভেতর কিছু থাক চাই না থাক, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, ধামাটার ডিজাইন, নকশা-নমুনা এবং চেহারা-সুরতে জেল্লা মারে কি না! নিউজ প্রিন্ট কাগজের বই কিন্তু উপরের মলাট নামক ধামাটায় একটু জেল্লা বসাবার খায়েস থাকলেই কাজ সেরেছে! ফেল আগে মালপানি তারপর লও বইয়ের জেল্লা। যে-ই না বউ তার উপর এক ডজন দাই! যুগের চাহিদা যদিও নিছক আপেক্ষিক সত্য, কিন্তু এই আপেক্ষিকতাকে কোন যুগেই ফেলে দিতে পারিনি। তাই আমরা অনেক সময় আপেক্ষিকতার উপর ভিত্তি করে সার্বিক সত্যটির উপর কসাইয়ের কুড়াল চালাই। ভাবি, মস্ত বড় একটা কাজ করলাম।

আবার ভাষার ব্যাপারে কোলকাতার কথ্য ভাষাটাই হল হাই সোসাইটির ভাষা। প্রতিটি যুগের এলার্জির খান্দানি ধারাটি কোন না কোন কৌশলে টিকে আছেই। সংস্কৃত ভাষা কোন এক যুগে ছিল হাই সোসাইটির ভাষা। তখন কোলকাতার কথ্য ভাষা ছিল সাহিত্যের প্রশ্নে অখাদ্য। তারপর মাইকেল আর বঙ্কিম বাবুদের কাছে 'হাতীর' হাই সোসিয়াল ভাষাটি হল 'ঐরাবত' এবং আরো কত কি যুক্তাক্ষরের ঠেলা। একদিন ফরাসীরা বিলেতের লোকদেরকে চর অঞ্চলের লোক বলে গাল দিত এবং এদের ভাষা মুখে উচ্চারণ করাটাকে পাপ মনে করতো। শুনলে অবাক হবেন, এ যুগের কিছু কিছু ফরাসী আছে যারা ইংরেজী ইচ্ছা করে শেখে না। জানেন কি? ফরাসী বর্তমান প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেরাঁ কি ইংরেজী ভাষা জানেন? আমার মুখে না শুনে একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন না!

শুনেছি, ব্যাকরণ লিখককে অনুসরণ করবে। তাই আমার মত ফইচকা লেখকও ইচ্ছে করেই সাধু ও চলতির মিশ্রণ ঘটিয়েছি। এতে পাঠক যদি ভুল ধরতে চান, ধরবেন। প্রতিবাদ ভুলেও করবো না। কারণ, লিখতে চেয়েছিলাম উপন্যাস আর ছোট গল্প, কিন্তু ঐ যে কিসমতের লিখন। বানাবো শিব হয়ে গেল অন্য একটা। ধর্ম লিখতে ভাষা লাগে না। লাগে দলিল, প্রচুর দলিল। একদম মাপা পথে গাড়ি চালাতে হবে। ট্রেন যেমন মাপা পথে চলে। স্বাধীনতার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এমনকি দলিলের ব্যাখ্যাটুকু লিখতে গেলেও ব্যাখ্যার দলিল থাকতে হবে। কি যে কষ্ট করতে হয়।

বদরের যুদ্ধটি ইসলামের বাঁচা-মরার যুদ্ধ ছিল। তাহলে বদরের যুদ্ধের দাম কতটুকু হতে পারে? অথচ এই পবিত্র বদরের যুদ্ধটির একটি আমা (ডামি) দাঁড় করিয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কারা? গরুর বাচ্চা অকালে মারা গেলে গরুর দুধ পাবার আশায় মরা বাচ্চার চামড়া দিয়ে তৈরি করা হয় একটি ডামি, যাকে চলতি ভাষায় 'আমা' বলা হয়। সেই আমাটির নাম ছিল 'আল বদর' বাহিনী। কি চমৎকার নাম! সেই আমাটি ব্যবহার করে স্বাধীনতার দুধ সংগ্রহ করতে চেয়েছিল যারা, তারা মুসলমান নামের জঘন্য কলঙ্ক। তারা গাধা আর ঘোড়ার মিলনের খচ্চর নামের শঙ্কর ছিল। সেই খচ্চরদের আকাম-কুকামের কথা সবারই জানা আছে। আজো তারা বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে।

সমাজে মাথা উঁচু করে, ধর্মের নামে ভণ্ডামীর ডুগডুগি বাজিয়ে সরল মুসলমানদের যাদুর ভেল্কি দেখিয়ে দলে টানার কত রকম কৌশল তৈরি করে চলেছে একের পর একটি করে। এই পুরাতন খচ্চরেরা ইসলামী নামে কয়টি মাসিক পত্রিকা বের করেছে। তাও আবার 'আল বদরের' মত পবিত্র স্থানগুলোর নামে। ইসলামের নামে মিঠা-মিঠা লিখা দেখলে আপনার মনে হবে, এরা কত বড় গণতন্ত্রের পূজারী। এদের পত্রিকায় কারো নামে অভিযোগ করা হলে আপনার মনে হবে সাংবাদিকতার নীতি অনুসারে প্রতিবাদ করার যে অধিকারটি সর্বজনস্বীকৃত সেটার কোন সামান্যতম প্রয়োজন আছে বলেও এরা মনে করে না। বিবেক পাথর হয়ে যায়। শূকর বনের এক শ্রেণীর পশু, কিন্তু এদের আকাম-কুকাম দেখলে শূকরও শরমে পালিয়ে যাবে। মধ্যপ্রাচ্যের এক নেতার দুইটি শিং মাথার উপর গজানো রাক্ষস মার্কা ছবির পোস্টার ছাপিয়ে দেয়ালে লাগিয়ে দেবার জন্য কোন এক দূতাবাস হতে শত শত রিম দামী কাগজ আর মোটা মালপানি পেয়ে কিছু পোস্টার দেয়ালে লাগিয়ে বাকি কাগজ ও মালপানির খেলাটি হজম। কিন্তু ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে গুঁতাগুতিতে এসব গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। যেমন, শুনি যে ডাকাতেরা সোনাদানা ডাকাতি করার পর সেই সোনাদানার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে ডাকাতে ডাকাতে মারামারি করে। চিন্তা করুন- এরা কি রকম বৈজ্ঞানিক ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে খাসা চিজ! এদের চিড়িয়াখানায় রাখা হলে কিরকম মানাবে? অথচ এরাই যাদেরকে ইয়েলো জার্নালিজমের গালি দিয়ে নাস্তিক নাস্তিক বলে চিৎকার শুরু করে দেয় তাদের সাপ্তাহিক কাগজগুলোতে যে গণতন্ত্রের অধিকারের কথা বলা হয়, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি গণতন্ত্রের কথা পাওয়া যায় পরিষ্কার পানির মধ্যে। এমনকি সেইসব সাপ্তাহিক কাগজগুলোর বিরুদ্ধে জঘন্য ভাষার গালাগালিগুলো পর্যন্ত হুবহু ছাপিয়ে দেয়। যদিও রাজনীতির কিছুই বুঝি না এবং বুঝবার আগ্রহটিও নেই, তবুও বড় ছেলের কিনে আনা পত্রিকাগুলো যেমন, *পুর্বাভাস, খবরের কাগজ, আগামী, এই সময়* ইত্যাদি অলস সময়ে হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করি এবং অবাক হয়ে অনেক কিছু ভাবতে বাধ্য হই। সম্ভবত আমার মেয়ের বয়সের এক মা'র লিখা কয়টি লাইন বুকে দাগ কেটে আছে। এত সুন্দর আর এতই ভাল লেগেছে যে আমি অধম তাকে প্রায়ই দোয়া করি। খাজা বাবার মাজারে দাঁড়িয়ে চোখের জলে কিছু চাইতেছিলাম। এমন সময় সেই মেয়েটির লিখা মনে ভেসে আসতেই তার জন্য খাজা বাবার কাছে কিছু চাইলাম। অথচ আমি তো সেই মহান মা'কে আজো দেখিনি! সেই মায়ের লিখা কয়টি লাইন হুবহু তুলে ধরলাম' ***'ধর্মের দালান-কোঠা যদি মানুষে-মানুষে ভালবাসা নষ্ট করে- তবে এই পৃথিবী থেকে ধ্বংস হয়ে যাক মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও প্যাগোডার সকল অস্তিত্ব। ইট-সুড়কির চেয়ে মানুষ বড়। ইট সুড়কির চেয়ে ভালবাসা বড়।'*** মায়ের একথাগুলো যদি অধর্ম হয়ে থাকে, তাহলে আমার মত ক্ষুদ্র ইসলাম গবেষকের জানা নেই ধর্মের ভাষা কোনটি। না দেখা সেই মাকে আমন্ত্রণ জানালাম, আসুন আমাদের গবেষণা কেন্দ্রে। আপনার মনের কথাটি বলুন। আমাদের গবেষণার কাজে সহায়ক হতে পারে হয়তো।

ধর্মের পুকুরটি বড় বড় টাগই (কচুরিপানা) দিয়ে এমনভাবে ঢেকে আছে যে, ওটাকে দূর হতে পুকুর মনে না করে সবজির ক্ষেত মনে হতে পারে। দু'চারটা টাগই উঠালেই দেখতে পাবেন পানি। আজ ধর্মের নামে এত টাগই জমে গেছে যে, পানি আছে বলে মনে সায় দেয় না। আসুন, যদি মনে করেন এই টাগই কিছুটা নিজ হাতে তুলে ফেলে পানি আছে বলে দেখিয়ে দিতে পারেন তবে সরল মানুষগুলো কিছুটা তো ঠাহর করে নিতে পারবে। পারবে নিজেদের ভুলগুলো শুধরিয়ে নিতে। যদি মনে করেন অধম লিখকের বইটির বহুল প্রচার হওয়া উচিত তাহলে সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য করুন। আর যদি মনে করেন, না! এটার প্রচার হতে নেই, তাহলে আমাকে অভিশাপ দেবেন বলে আশা

রাখি। আপনাদের ছোট ছোট সাহায্যই একত্র করে যদি এক লক্ষ বই বিনামূল্যে বিতরণ করে দিতে পারি, তবে আশা করি কিছুটা কম্পন শুরু হয়ে যাবে। অথবা আপনি নিজেও ছাপিয়ে বিক্রি অথবা প্রচার করতে পারেন, কারণ আমার লিখিত যে কয়টি বই আছে ও থাকবে তার সবরকম স্বত্ব (কপি রাইট) সবাইকে দিয়ে দেবার কথা প্রকাশ্যে আগেই ঘোষণা করা হয়েছে।

তাছাড়া অলী আল্লাহদের যারা প্রেমিক কেবলমাত্র তাদের কাছেই আমার অনুরোধ রইলো যে, পোকায় খাওয়া দাঁত যেমন সাড়াঁশি দিয়ে তুলে ফেলা হয় সে রকমভাবে বাতেল ফেরকাগুলো সমাজে যে পোকা খাওয়া দাঁতের মত যন্ত্রণা তৈরি করছে, সেই দাঁতগুলো তোলার জন্য আপনারা আমাকে আর্থিক সাহায্য করুন। আওলাদে রসূল শহীদে কারবালা মাওলা ইমাম হোসায়েন তো আসল কারা আর নকল কারা এই ভাগ করে দেখিয়ে দিতে গিয়ে সবকিছু লুটিয়ে (কোরবানী) দিলেন। আর আমরা তাদেরই ভক্ত বলে কিছু সামান্য আর্থিক সাহায্যের জন্য দরাজ দিলে এগিয়ে আসবো না? আপনাদের ছোট ছোট দান একত্র করে লক্ষ লক্ষ বই প্রয়োজনে সমাজের জ্ঞানী-গুণী হতে শুরু করে সবার মাঝে বিনামূল্যে নতুবা নামমাত্র মূল্যে এমনভাবে ঢালাও প্রচার চালাবো যেন বাংলাদেশের প্রায় ঘরে বইগুলো পাঠাতে পারি। আশা করি এতে বাতেল ফেরকাগুলোর বুকে একটা কম্পন শুরু হয়ে যাবে। যদি সাহায্য করাটা আপনাদের বিবেক ফরজ বলে সায় দেয় তাহলে নিচের ঠিকানায় আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা এবং অন্যান্য পরামর্শ দেবেন বলে আবেদন জানিয়ে কিছু কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে পাঠকগণের উপর দিতে বাধ্য হলাম। আর সেই সঙ্গে এই সর্বপ্রথম আমার ডাক্তারী পেশার ঠিকানা দিলাম।

ডাঃ বাবা জাহাঁঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী,
বে-ঈমান হোমিও হল, ১০৮ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ২য় তলা (বাটা সিগন্যাল সংলগ্ন) ঢাকা, বাংলাদেশ।

বিধান না দর্শন?

যারা মোটরগাড়িটাকে বিশ্রাম দেবার জন্য, রোদ-বৃষ্টি হতে বাঁচাবার জন্য তৈরি করে ইটের তৈরি ঘর, তাদের কাছে শোষিত বেকার যুবক, ঘর-নেই মানুষের রাস্তার ধারে ঝুপড়ি বানিয়ে শিশু-সন্তানদের নিয়ে কি মন-কাঁদানো অবস্থায় জীবনটাকে খড়-কুটা ধরে বাঁচার মত বেঁচে আছে- এদের কতটুকু দাম থাকতে পারে? কতটুকু নিম্নমানের পশুর চেয়েও নিম্নমানের হলে পৃথিবীর কোন জীব-জন্তুদের সঙ্গেও তুলনা দেবার নিদর্শন নেই বলেই এরা 'আসফালুস সাফেলীন' অর্থাৎ উদাহরণ দেবার মত বিশেষণ ছাড়া একদম নিউ মডেলের পশু। এই সম্পদ জমাকারীরা ধনের নেশায় ভয়ঙ্করভাবে নেশাগ্রস্ত। এই নেশার তুলনা নেই, এ নেশা হিরোইন আর প্যাথেড্রিনের মত মৃত্যুর নেশাকেও হার মানায়। হিরোইন আর প্যাথেড্রিন তো একটা যুব শক্তির মূলে আঘাত হানে। কিন্তু সম্পদ জমাকারীদের নেশা একটি দেশের অধিকাংশ মানুষের নিচতম মানবিক শক্তির উপরই প্রচণ্ড আঘাত

হানে না, বরং সামান্যতম বিবেকের বিন্দুটিকে পায়ের তলায় পিষিয়ে মারছে। যখন দেখতে পাই প্রাণহীন লৌহের তৈরি মোটরগাড়িটা থাকে ইটের তৈরি দালানে, আর আল্লাহপাকের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষগুলো থাকে ফুটপাতের পাশে ঝুপড়িতে। হযরত ইমাম শাফী (রঃ) একবার দুঃখ করে বলেছিলেন যে, 'পাক পাঞ্জাতন (মহানবী, আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হোসায়েন)-কে ভালবাসতে গিয়ে যদি 'শিয়া' অপবাদ মাথায় তুলে নিতে হয়, তবে খোদার কসম! আমার চেয়ে বড় শিয়া আর কেউ নাই।' অধম লেখকও হযরত ইমাম শাফীর (রঃ)-মত চিৎকার করে বলতে চায় যে, এই নিঃস্ব, এই রিক্ত, এই এতিম, মিসকিনদের অধিকারের কথা বললে যদি 'কমিউনিস্ট' অপবাদ মাথায় তুলে নিতে হয়, তাহলে খোদার কসম! অধম লেখককে 'কমিউনিস্ট' বলে গাল দিতে পারেন। এবং সেই সঙ্গে একথাটি বলে দিতে চাই যে, অনাগত যুগই এর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে যাবে। আমরা বালির বাঁধের মত অনেক বই-পুস্তকের বস্তা দিয়ে বাঁধ দিতে চেষ্টা করছি মাত্র। এই সব বই-পুস্তক আমাদের প্রজন্ম 'খাক-থু' করে একগাদা থু থু নিক্ষেপ করে ঘৃণিত বেঈমান জানবে। হিরোইন জমাকারীর যদি মৃত্যুদণ্ড নামক শাস্তিই যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তাহলে যারা সম্পদ জমা করে এহেন অবস্থা তৈরি করে তাদের জন্য কি শাস্তি?

খলিফা উমর ফারুক জেরুজালেম যাচ্ছেন উটের পিঠে চাকরকে বসিয়ে। তারপর? মার্কস, লেনিন আর মাও সেতুং-এর বিবেকের চোখে বোবা বিস্ময়! সেই উটের রশি ধরে টেনে চলেছেন একশত বাংলাদেশের চাইতেও বড় দেশের প্রধান। দুটি মিনিট নেগেটিভ চিন্তার দর্শন মন হতে সরিয়ে চিন্তা করুন তো! চিন্তা করুন বাংলাদেশের উঁচু (?) পদের একজন সরকারী কর্মচারীর পক্ষেও কি এই আচরণ প্রদর্শন করা সম্ভব? ভাতের হাঁড়ির সাম্যের সামনে পদমর্যাদার সাম্য নির্ঘাত আত্মহত্যা, নয়তো পদত্যাগ পত্রের প্রশ্নটি কি অবধারিত? মাওলানা ভাসানী যখন উমর ফারুকের এই ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিলেন মাও সেতুংকে, তখন মাও সেতুং কেবল একটি কথাই বলেছিলেন, বিবেকের সাম্যবাদকে গ্রহণ করা আরো জটিল। হ্যাঁ তাই। মানুষের রক্ত শোষণ করে যারা সম্পদের পাহাড় তৈরি করে উপাসনালয়ে বাঁচার আশ্রয় গ্রহণ করে। আর তারা তখন? তখন ঐ জনতার একটি কণ্ঠস্বর শ্লোগানের ভয়ঙ্কর ঢেউ তুলে 'যে ঘরে তোদের মত শোষক, জালেম আর সম্পদ জমাকারীরা আশ্রয় গ্রহণ করে সে ঘর আর যাই হোক না কেন, ওটা কখনোই আল্লাহর ঘর হতে পারে না।' এক সের হিরোইনসহ ধরা-পড়া আসামীর দিকে যে রক্তচক্ষু নিয়ে তাকায়, সে তাকানোর ভাষা হল মৃত্যুদণ্ড। আর যারা দশের আমানত বেমালুম হজম করে বসে আছে তাদের দিকে তাকাবো কিভাবে? বলবেন কি? বুকে হাত রেখে বলুন, কি ধরণের উপহার পাবার যোগ্য তারা? এই বিবেকের দাঁড়িপাল্লায় উঁচু-নিচু হবার ঝড় বইতে চায়। আল্লাহপাক আমাদের সাহা রগের চেয়েও নিকটে আছেন, আছেন রবরূপে, আছেন আদিল তথা সূক্ষ্ম বিচারকরূপে আমাদেরই একান্ত কাছে-কাছে। আছেন আমাদেরই অস্তিত্বের প্রতিটি সূক্ষ্মতম কোষে-কোষে। কি অপূর্ব কোরানের আটষট্টি নম্বর সূরা কালাম। কি বিজ্ঞানময় সূক্ষ্ম ভাষার গাঁথুনি সূরা কালামে। পৃথিবীতে এই বিজ্ঞানময় কোরানের তুলনা করা হাস্যকর। কারণ, কোরানই হল একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন।

মার্কসবাদ হাঁড়ির ইতিহাস তৈরি করতে গিয়ে নাস্তিকতাকে কোলে তুলে নিয়েছে। হাঁড়ির ইতিহাস আত্মার গবেষণাকে ফেলে দিয়ে মুক্তির বাণী শোনায়। কিন্তু অসম্ভব আপেক্ষিক (কিছু দিনের জন্য) সত্যরূপে প্রতিভাত হলেও সার্বিক (সবসময়ের জন্য) সত্যের সামনে মার্কসবাদ মাথা নিচু করে কাঁদে। কাঁদতে হবে-ই এটা অমোঘ সত্য। তাই তো মার্কসের 'হাঁড়িইজম' বার বার রোগা হচ্ছে আর পরিবর্তনের ইনজেকশন দিয়ে তাকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে। কিন্তু যেদিন বিশ্বনবীর কণ্ঠ হতে নির্গত

আল্লাহর মহাবাণী কোরানের মর্মবাণী উদ্ধার করা হবে, উদ্ধার করা হবে সর্বযুগের জীবন ব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন, সেদিন মার্কসবাদ এইড্স রোগে আক্রান্ত হতে বাধ্য। যেদিন হযরত বাবা শাহ সুফি লালন ফকিরের অতি সহজ শব্দের গাঁথুনিতে রচিত পদ্যে কোরানের ব্যাখ্যা বাহির করতে পারবে। কারণ আধ্যাত্মবাদের মধ্যেও যে একটি আধ্যাত্মসাম্য থাকতে পারে তারই সম্রাট হলেন লালন ফকির। যেদিন ইমাম হোসায়েনের ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে, যেদিন এজিদের রঙ-চড়া চোখ-ধাঁধানো মরীচিকার ইমিটেশন মার্কা এজিদী ইসলামকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করতে পারবে, সেইদিন কি হোসায়নি ইসলামের হাঁটি হাঁটি পায়ে চলার বাস্তব রূপটি কোথাও প্রতিফলিত হবে?

দৈহিক মৃত্যুই যেখানে সবকিছুর শেষ সিদ্ধান্ত বলে ধরে নেওয়া হয়, ধরে নেওয়া হয় এই পৃথিবীর জীবনটাই একমাত্র সত্য, সেখানে কেবল মার্কসবাদই নয়, বরং যে কোন নব্য আর পুরাতন মতবাদে (ইজম) রূপ আর যুক্তির নাচানাচির ঢং যতই আপাতত নিখুঁত বলে মনে হোক না কেন, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে যখন গর্তে পড়ে হাত পা ভাঙ্গার অনেক দৃশ্য দেখতে পাবে, তখনই চালানো হয় ঔষধ আর বেন্ডেজ লাগাবার নতুন নতুন প্রয়োগ ব্যবস্থা। কারণ, আপেক্ষিক সত্যের প্রশ্নে এরা দৈহিক মৃত্যুটাই সবকিছুর শেষ বলে সিদ্ধান্ত নেবার ঘোষণা করেনি। বরং সার্বিক সত্যরূপে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার ঘোষণা করা হয়েছে। যার দরুণ প্রয়োগ-পদ্ধতিটাই মুখ্য এবং এই প্রয়োগ-পদ্ধতিটারই যতই নতুন নতুন ধরন-ধারণ বাহির করা হোক না কেন, উহা হয়ে পড়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শনের পরিবর্তে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। 'একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান' -বার বার এই ভুলটি এত বেশি প্রচার করা হয়েছে, যার দরুণ মগজ ধোলাই করার মত 'পূর্ণাঙ্গ দর্শন'-এর চেহারার ভুল নাম 'পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান' বলা হয়। এজন্যই এর ফলটির অনেক রকম নাম হতে পারে- যেমন বস্তুসর্বস্ববাদ, যান্ত্রিক জীবন, আইন সর্বস্ব ধমক দেবার বাহার, আত্মকেন্দ্রিকতাবাদ। এরকমভাবে অনেক নাম দেওয়া যায় এবং যার ফলে, আধ্যাত্মবাদ, মরমীবাদ, সুফিবাদ, ফকিরি ইত্যাদি নামের পরকালভিত্তিক দর্শনগুলোকে কেমন করে গ্রহণ করা যায়, এ চিন্তা না করে বরং ছুঁড়ে মারে যত সব জঘন্য গালাগালির বিশ্লেষণ- যেমন অজ্ঞেয়বাদ, গাঁজাখুরি, ভণ্ডামি, ফুল বাবুর চিন্তাধারা, অলস মাথার বিকৃত ফসল ইত্যাদি।

মৃত্যুর পরও জীবন আছে, পুরস্কার আর শাস্তি আছে। যদিও এগুলো সাদা চোখে মোটেই ধরার উপায় নেই। তবুও এই আধ্যাত্মবাদকে কেউ মারতে পারবে না- এটা সারাজীবন নাস্তিক্যবাদের পূজারী ও প্রচারক হবার পর দৈহিক-মৃত্যুর সামনে এসে অকারণেই আধ্যাত্মবাদের কুয়াশা কাঁদায়। এটা যেন আগাছা মনে হলেও আপনিই গজায়। জীবনে কোন দিন চাষ করা তো দূরে থাক, মনেও করতে চায়নি। সেই আধ্যাত্মবাদ মৃত্যুর সামনে এসে আগাছার মত আপনিই গজিয়ে উঠবে। হ্যাঁ-গজাবেই। কারণ, এটাই যে জীবনের পূর্ণাঙ্গ দর্শন যা সে নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং সামাজিক জীবন ব্যবস্থায় আত্মবিরোধ দেখে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু মানুষের দৈহিক মৃত্যু যতদিন থাকবে, ততদিন আধ্যাত্মবাদকে কেউ মেরে ফেলতে পারবে না। কারণ, এটা এমনই এক জিনিস যা কেউ ঝেঁটিয়ে চিরবিদায় করে দিতে চাইলেও আবার আপন ঘরেই বুমেরাং-এর মত ফিরে আসে। লৌকিকতার অবগুণ্ঠনে অস্বীকার করছে, কিন্তু মৌনতার অবগুণ্ঠনে আধ্যাত্মবাদের দরজার সামনে মাথা নিচু করে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সত্যিই আল্লাহ পাক, তুমি মহান না নিষ্ঠুর জানি না, জানার জন্য চেষ্টাও করিনি কোনদিন। কিন্তু আজ বিদায় বেলায় কেন মনের একান্ত গর্তে তোমার কথা মনে হয়? যিশুর মহাক্ষমার দর্শন- 'একগালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও', 'আল্লাহ, তুমি ওদের ক্ষমা করে দাও, ওরা যা করছে তা ওরা নিজেরাই জানে না, এরকম কত উপদেশকে কত রকম কুৎসিত

আর জঘন্য বিশ্লেষণের কাপড় পরিয়েছি, কিন্তু মৃত্যুর শেষপ্রান্তে এসে অকারণেই বুকে জড়িয়ে ধরে সবার অলক্ষ্যে মাথা নিচু হয়ে যাচ্ছে।

তবে কি ঐ ক্ষমার বাণীই সার্বিক সত্য? যদিও আপেক্ষিক অর্থে এতকাল জেনেছি অন্যরকম।

মারেফত কি ও কেন?

আরবী আরাফা শব্দ হতে মারেফত। আরাফা অর্থ হল জানা, জ্ঞান লাভ করা। 'মারেফত অর্থ লব্ধজ্ঞান।' মারেফত দিয়ে জগত ও জীবনের যে কোন বিষয়ের সম্যক জ্ঞান জানা যায়। স্থুল দর্শন প্রকৃত দর্শন নয়। সূক্ষ্ম দর্শন প্রকৃত দর্শন। জ্ঞানীগণ সূক্ষ্মতা অবলম্বন করে জীবন ও জগতকে দেখেন, ইহাই মারেফত। লোকেরা যাকে মারেফত বলে মনে করে, আসলে উহা মারেফত নয়। কারণ অজ্ঞাত বিষয় জানাটাই মারেফত। অজ্ঞাত বিষয়টা অজ্ঞাত থেকে যায় বলে মারেফত জ্ঞান লাভ হয় না। মারেফতের মূল কেন্দ্রভুমি আপন দেহ-মন। আপন দেহ-মনের পরিচয় পেলে মানুষ তার রবের পরিচয় পায়। রবের পরিচয় পেলে সে তার সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকর্তার সম্যক পরিচয় লাভ করে। যতদিন পর্যন্ত মানুষ এই রবের পরিচয় না পায়, ততদিন সে দুঃখচক্রের আবর্তে নিজের দুঃখ নিজে সৃজন করে ঘুরতে থাকে। এজন্য কোরান বলছে, ***'ওয়াত্তাকু রাব্বাকুম'*** তোমরা তোমাদের রব সম্বন্ধে সাবধান হও। ইহাই মারেফতের গোপন কথা।

অতএব, বাজারের বিতর্কমূলক তথাকথিত শরিয়তের ধোঁকায় পড়ে পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত হয়ো না। আপন দেহ হতে আপন রবের মারেফতের দ্বার উদঘাটন করে আল কেতাবের শরিয়ত বুঝে লও, তবেই সকল বিতর্কের অবসান ঘটবে। মারেফতের গোপন কথা আসলে গোপন নয়। সম্যক গুরুর প্রতি ভক্তিযোগ অথবা জ্ঞানযোগের পথ ধরলেই গোপন কথার তালা খুলে আল কেতাবের দ্বার খুলে যাবে।

ভাল করে জেনে রাখুন

হাল আমলে বিশেষ করে কিছু মাদ্রাসায় পাস করা আলেম এবং মুফতিরা কথায় কথায় সরল মুসলমান ভাইদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়ে বসেন। অথচ তারা জানেন না যে, *'ফতোয়াই দারুল উলুম (৪৪০/১২)'* ফতোয়া বিষয়ে কি উপদেশ দিয়ে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। 'কাফের ফতোয়া দেবার প্রশ্ন উঠলে দেখতে হবে যে, যদি শতকরা নিরানব্বই ভাগ কাফের বলার অবকাশ থাকে, কিন্তু মাত্র এক ভাগ কাফের না বলার সম্ভাবনা থাকে তবে অবশ্যই মুফতি এবং কাজী কাফের ফতোয়া দিতে পারবে না।' *আদ দুরুল মুখতার* নামক ফতোয়ার কেতাবের মুর্তাদ অধ্যায়ের (৩৯৯/৩) ফতোয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, 'কাফের ফতোয়া দেবার যদি অনেক কারণও থাকে, তবুও যদি মাত্র একটি কারণ কাফের না হবার জন্য বাহির করা যায়, তাহলে কোনমতেই মুফতি এবং কাজী কাফের ফতোয়া দিতে পারবেন না।' এটা অত্যন্ত বেদানাদায়ক একটি বিষয় যে, ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত কিছু আলেমরা একে অপরের উপর যা-তা মন্তব্য করে গেছেন। যেমন আমাদের সুন্নী জামাতের হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-কে *'তারীখ-ই খতিব'* নামক কেতারের লেখক খতীব

বাগদাদী দাজ্জাল বলেছেন। হযরত ইউসুফ সাউরী জঘন্য এবং অপাঠ্য সমালোচনা করে গেছেন ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-কে। এরকমভাবে হযরত ইমাম মালিক (রঃ)-কে কঠোর সমালোচনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এবং ইবনে আবি যিব। হযরত ইমাম শাফেয়ীকে ইবনে মুইন। ইত্যাদি বহু নমুনা তুলে ধরা যায়।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, হানাফিরা শাফেয়ীদেরকে, আবার শাফেয়ীরা হানাফীদেরকে যেমন কঠোর সমালোচনা করেছেন, তেমনি মালেকীরা হাম্বলীদের এবং হাম্বলীরা উপরের বর্ণিত তিন মহান ইমামদেরকে কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং একে অপরকে গুমরাহ বলেছেন।

মহানবীর প্রিয় সাহাবা এবং আপন চাচাত ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সুন্দর একটি উপদেশ দিয়ে গেছেন এই বলে যে, 'যেখানেই জ্ঞান পাবে তা অর্জন করে নিও। আর ফিকাহ্ শাস্ত্রের পণ্ডিতদের ঝগড়া এবং সমালোচনা গ্রহণ করতে যেও না। কারণ, এরা খোঁয়াড়ে বাস করা মানুষরূপী ভেড়ার দল। এরা একে অন্যের উপর চড়াও হয়।'

কবর ও মাজার বিষয়ে আলোচনা

মাজার পবিত্র স্থান। কারণ ইহা কবর নয়। কবর এবং মাজারের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অবশ্য ধর্মীয় পরিভাষার। কেননা, মৃত মানুষের জন্য কবর। জীবিতের জন্য নয়। অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহতে যিনি ফানা তথা নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছেন ইসলাম তাকে সর্ব সময়ে জীবিত বলে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছে। সুতরাং যিনি সর্ব সময়ে জীবিত তাঁর আস্তানাকে কবর না বলে মাজার বলা হয়। ইসলামে কবর-পূজা নিষেধ। কারণ, কবরে মৃত ব্যক্তি থাকেন। যদিও আজকাল আমরা মাজার এবং কবরের সূক্ষ্ম প্রভেদ না বুঝে সমাজের অনেক গন্যমান্য ব্যক্তি ও নেতাদের কবরকেও মাজার বলি। ইহা আমাদের একান্ত অনিচ্ছাকৃত ভুল। তাছাড়া পবিত্র এক ইসলাম ইতোমধ্যেই ৭৩ (তেহাত্তর)-টি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এই ৭৩ (তেহাত্তরটি) ভাগের মধ্যে প্রত্যেক ভাগের আবার নিজস্ব দর্শন আছে এবং প্রত্যেক ভাগের অনুসারীরা তাদের দর্শনই কোরান এবং সুন্নাহ ভিত্তিক বলে দাবী করেন এবং অনেক সময় এই দাবীর যুক্তিযুক্ততা নিয়ে ঝগড়া এমনকি খুনাখুনি পর্যন্ত হয়ে গেছে এবং এখনও হয়। কখনো সুন্নী ও কাদিয়ানীদের মধ্যে, আবার কখনো সুন্নী এবং শিয়াদের মধ্যে, আবার কখনো সুন্নী এবং অহাবীদের মধ্যে।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নামে যদি সৌদী আরবে মিলাদুন্নবী পাঠ করেন তবে সঙ্গে সঙ্গে চাবুকের আঘাত খেতে হবে। কারণ সৌদী আরবের শ্রদ্ধেয় ভায়েরা প্রায় সবাই অহাবী এবং অহাবীরা নবীর নামে মিলাদ পাঠ করাকে শেরেক, বেদাত এবং নাজায়েজ মনে করেন। একমাত্র সুন্নী মুসলমানেরাই মাজারকে সম্মান করেন। মুসলমানদের মধ্যে এমন দলও আছেন যারা মাজার বলে কোন কিছু মানতে একদম নারাজ। এইরকম একটি দলের নাম অহাবী। শ্রদ্ধেয় অহাবী ভায়েরা সংখ্যায় অনেক কম হলেও সুন্নীদের মধ্যে প্রবেশ করে সুন্নীদের ধর্মদর্শনের ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছেন। হাইকোর্টের মাজার শরীফে যিনি আছেন তাঁর নাম হযরত খাজা শরফুদ্দীন চিশতী (রঃ)। ইসলামের অন্য কোন দল অথবা তরিকায় গান-বাদ্য জায়েজ থাকুক আর নাই থাকুক কিন্তু চিশতীয়া

তরিকা ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। চিশতীয়া তরীকার মধ্যেই কাওয়ালী, গজল, নাত, মুরশিদী বিভিন্ন প্রকার গান-বাদ্য হয়ে আসছে। বিভিন্ন সুরের স্রষ্টা হযরত নিজাম উদ্দীন আওলিয়া (রঃ) -এর প্রধান শিষ্য হযরত আমীর খসরু চিশতী (রঃ) তার উজ্জ্বল এবং বিস্ময়কর প্রমাণ।

সমগ্র কোরান শরীফের কোথাও গান-বাদ্যের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি। কেবলমাত্র দুইটি শব্দের শাব্দিক ব্যাখ্যা নিয়ে অনুবাদকারীর বিভিন্ন মতামত প্রতিফলিত হয়েছে। সমগ্র কোরান শরীফে যে দুইটি শব্দকে ভিত্তি করে অনেক শ্রদ্ধেয় ভাইয়েরা গান-বাদ্য না-জায়েজ করেছেন, সেই শব্দ দুটো হল ***'লাহওয়াল হাদীস'***। উহা সূরা লোকমানের ছয় নম্বর আয়াতে আছে। আরবী ভাষায় লাহওয়াল শব্দের অর্থ হল বাজে তথা অসাড় এবং হাদীস শব্দের অর্থ হল কথা। দুটো মিলে শাব্দিক অর্থ দাঁড়ালো বাজে কথা। এই 'অসাড় অথবা বাজে কথা'কেই মূলধন করে কেউ গান-বাদ্যকে বুঝিয়েছেন, আবার কেউ কবিতাকে বুঝিয়েছেন, আবার কেউ গান-বাদ্য এবং কবিতা দুটোর একটিও বুঝায়নি বলে মন্তব্য করেছেন। আবার অনেকে বলেছেন যেহেতু হযরত দাউদ নবী (আঃ) গান-বাদ্য করতেন এবং তার মধুর সুরে এমনকি পশু-পাখি পর্যন্ত আসতো সেই হেতু 'লাহওয়াল হাদীস' বলতে গান-বাদ্যকে বুঝানো হয়নি, যেহেতু তিনিও একজন অতি সম্মানীয় নবী ছিলেন। অনেকে আবার এই বলেও মন্তব্য করেছেন যে, যেহেতু গান-বাদ্যের আরবী ভাষায় প্রতিশব্দ হল 'গেনা' সেই হেতু গেনা শব্দটি কোরানের কোথাও একটিবারের জন্যও বলা হয়নি এবং যেহেতু বলা হয়নি সেই হেতু লাহওয়াল শব্দটি যার অর্থ অনর্থক-বাজে-অসারের দ্বারা গান-বাদ্যকে বুঝানো হয়নি। অনেকটা নানা মুনির নানা মতের মত শোনায়।

হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রঃ) এবং হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া চিশতীর (রঃ) মাজারে সব সময় কাওয়ালী, গজল, নাত ইত্যাদি হয়ে আসছে এবং মাজার শরীফের পাশেই নামাজ পড়ার জন্য মসজিদও আছে। এশার নামাজ শেষে দিল্লীতে অবস্থিত হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া চিশতীর (রঃ) মাজারে গানবাদ্য শুরু হয় কিন্তু আজমীরে অবস্থিত খাজাবাবার মাজারে এইসব টাইম টেবিলের খুব কমই খেয়াল রাখা হয়। কারণ, সেখানে শত শত কাওয়াল একই সময়ে গান গেয়ে চলেছে। শত শত বাদ্য-বাজনার দল একই সময়ে বাজিয়ে চলেছে। হাজার হাজার লোক একই সময় জিকির করছে, হাজার হাজার লোক একই সময়ে কোরান পড়ছে, মিলাদ পড়ছে, দাঁড়িয়ে নেচে-নেচে জিকির করছে, চিৎকার করে কাঁদছে ইত্যাদি। এ যেন এক আজব দরবার। এখানে যেন সব নদীর মিলনস্থল মহাসমুদ্র এবং মহাসার্বজনীন। এত বড় সার্বজনীনতার বিশাল প্রকাশ পৃথিবীর এমন কোন নবী অলীর মাজারে আছে কিনা আমার জানা নেই। কারণ, এখানে পৃথিবীর এমন কোন সম্প্রদায়ের লোক নেই যে, আসা যাওয়া না করেন। সুতরাং খাজা বাবারই আপন ভাগিনা বলে কথিত হাইকোর্টের মাজারে যিনি আছেন সেই হযরত খাজা শরফুদ্দিন চিশতীর (রঃ) মাজারে কাওয়ালী, গজল, নাত, মারফতী এবং মুরশিদী গান বহু পূর্ব হতেই শুরু হয়েছে। কিন্তু এখন বলে মাজার কমিটিতে অন্য গোত্রের কয়েকজন শ্রদ্ধেয় খাদেম প্রবেশ করে যে স্থানটিতে সব সময় কাওয়ালী হত সেই স্থানটিকে মসজিদের ভিতর ফেলে দিয়েছেন এবং এখানেই ইহার শেষ না করে সমস্ত স্থানটিকে বেড়ীবাঁধের মত আটক করে সেই স্থান হতে কাওয়ালীর নাম-গন্ধ পর্যন্ত উঠিয়ে দিয়েছেন। যদিও মাজার কমিটির ভেতর কয়েকজন শ্রদ্ধেয় খাদেম ইহাতে আপত্তি তোলা সত্ত্বেও কোন ফল হয়নি।

মাজার আল্লাহর পাগলদের ঘর। এখানে বিচিত্র ধরনের আল্লাহর আশেক আসবে এবং বিচিত্রভাবে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করবে। এখানে 'গোলাপ'ই একমাত্র ফুল তাই অন্য ফুলের স্থান নেই, গন্ধ নেই, বলার মত বোকামী থাকতে পারে না। বিচিত্র ধরনের ফুল এবং এক এক ফুলের এক

এক রকম রূপ ও সুগন্ধীর বৈচিত্রতার বিকাশের নাম হয় ফুলের বাগান। এই বহু ফুলের বিভিন্ন রূপ এবং বিভিন্ন গন্ধ একেরই আদর্শ প্রচার করে। বৈচিত্রতার মধ্যে একত্বের তথা তৌহিদের সৌন্দর্য যে বুঝতে পারেননি তারই বা দোষ কিসের? পৃথিবীর আনুমানিক চারশো কোটি মানুষ প্রত্যেকে আমি বলার মাঝে এক মহা-আমির দর্শন লুকিয়ে আছে। প্রতিটি মানুষের আমি বলার মাঝে যে মহা-আমির শরীর তাতে তুমি, তোমরা, সে, তাহারা শব্দগুলো ডাক দেবার তথা আহ্বান জানাবার কেবলমাত্র স্টাইল তথা শৈলী। আসলে এ শব্দগুলোর কোনই অস্তিত্ব নেই। চারশো কোটির মহা আমি পৃথিবীটাতে বিভিন্ন ভূখণ্ডে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দেশ নাম ধারণ করে বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন আকৃতির আঙ্গিক বিকাশের বিভিন্ন রূপের কান্তি দিয়ে কি এক অপরূপ ডানা মেলে রেখেছে! এই চারশো কোটি মানুষের মহা আমির মধ্য হতেই আমাদের মত মানুষের মুখের শব্দেই আমরা তথা মানবজাতি পেয়েছি আল্লাহর কথা।

মানুষ মোহাম্মদ (দঃ), মানুষ ঈসা (সঃ), মানুষ মুসা (সঃ), মানুষ দাউদ (সঃ), মানুষ ইব্রাহিম (সঃ) এরকমভাবে কয়েক লক্ষ আমাদের মানুষের মুখে কেন আল্লাহর কথা পেলাম? কেন মানুষের ঠোঁটকেই আল্লাহ একমাত্র কথা বলার মাধ্যম অথবা অবলম্বন করে নিলেন? কেন মানুষের চেহারা (ইমেইজ)-কেই আল্লাহর চেহারা বলে ঘোষণা করা হল? মানুষই আল্লাহর রহস্য এবং আল্লাহ মানুষের রহস্য বলে কেন আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হল? আল্লাহকে যারা দেখেন তারা মানবের আকারেই দেখে থাকেন বলে কেন বলা হল? মানুষের মধ্যে যিনি আল্লাহতে ফানা হয়ে যান তথা আপন আমিত্ব তথা অহংবোধ (ইগো) সম্পূর্ণ বর্জন করে তাঁর হয়ে যান তাকে আল্লাহর চেহারা তথা অয়াজহুল্লা তথা বান্দা নেওয়াজ তথা নর নারায়ণ বলে কেন ঘোষণা করা হল?

দেহ যদি রূহ তথা আত্মা না হয় তবে রূহ তথা আত্মার আকার আছে কি? আত্মা দেহ হতে বিদায় গ্রহণ করলে দেহের নাম লাশ দেওয়া হয় কেন? দেহের আকার ধরে নিলাম সাড়ে তিন হাত কিন্তু আত্মার আকার কি? আত্মার যদি কোন আকার না থাকে তবে আত্মা কি নিরাকার? তবে কি মানুষও নিরাকার? আল্লাহ তো নিরাকার এটা অতি সাধারণ মানুষও জানে, কিন্তু মানুষের যে কোন আকারই নেই একথা কয়জন বুঝতে পারে? ঠেলা গাড়ি চালায় যে-মানুষটি আর বস্তুর বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন মানুষটির জৈবিক চাহিদা এক হলেও বিদ্যা-বুদ্ধিতে কি আকাশ-পাতাল ব্যবধান পাই না?

দেহ যদি আত্মার পোশাক হয় তবে পোশাকটাই কি আত্মা বলবো? কাপড় যেমন দেহের পোশাক তাই বলে কি কাপড়ের পোশাককে দেহ বলে চালিয়ে দেব? আত্মার বিজ্ঞানী হযরত মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী হুসাইনী আল হাসানী তার পবিত্র *'মখতুবাতে খাজা'* নামক পুস্তকে ঘোষণা করলেন, ***'চুঁজুমলা ফানা গাশতে বতু হে চুনামুন্‌দা খাহে কে আনাল্‌লাহে বগু খাহে কে হু আল্লাহ'*** অর্থাৎ 'যদি তুমি সম্পূর্ণ আল্লাহতে ফানা হয়ে যেতে পার তখন ইচ্ছা হয় বল তুমি আল্লাহ না হয় আমি আল্লাহ। একই কথা?' আত্মার বিজ্ঞানী হযরত বু আলী শাহ্ কালান্দর তার *'দিওয়ানে'* ঘোষণা করলেন, ***'বা শাকলে শায়খে দিদাম মোস্তফারা, না দিদাম মোস্তফারা বালকে খোদারা।'*** অর্থাৎ 'আপন পীরের আকৃতিতে নবী মোস্তফাকে দেখলাম এবং উহা নবী মোস্তফা নন বরং স্বয়ং আল্লাহকে দেখলাম' বলে কেন ঘোষণা করলেন? এরকম হাজার হাজার আত্মার বিজ্ঞানীদের আত্মাকে জানবার বিজ্ঞানময় ফরমুলা আমরা পেয়ে আসছি। এত কিছু পাবার পরও আমরা বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন প্রকার ধর্মের সাইনবোর্ড কাঁধে নিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করছি কিন্তু সাইনবোর্ড ফেলে দিয়ে সত্য সন্ধানের দৃঢ় মনোবল নিয়ে কয়জন

এগিয়ে এসেছি? কুসংস্কার, সংকীর্ণতা, গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকা, নিজ নিজ বাপ-দাদার ধারা প্রকাশে গর্ববোধ করি, কিন্তু নিরপেক্ষ মনোবল নিয়ে সত্যের সন্ধান কি করতে পেরেছি?

আল্লাহ তো সর্ববিষয়েই ক্ষমতাবান বলে অনেকবার ঘোষণা করেছেন। তবে আল্লাহর কথা কেন আকাশে মেঘের গর্জন করার মত শব্দ করে আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন না? না হয় বিজলী চমকানোর মত আলোর বিচিত্র রেখা দিয়ে আল্লাহর কথা কেন লিখে দিলেন না? না হয় বরফের টুকরো শিলার পতনের মত তাঁর লিখিত বাণী কেন পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে আমাদেরকে জানালেন না? হেলিকপ্টার আকাশে উড়ে বিজ্ঞাপন ফেলার মত ফেরেস্তাদের দিয়ে কেন ফেলে দিলেন না? মানুষের ঠোঁটেই যদি আল্লাহর কথা পেয়ে থাকি, এবং তাই আমরা পেয়ে আসছি, তাহলে নিঃসন্দেহে কি বলতে পারি না যে, মানুষই আল্লাহর রহস্য?

সৃষ্টি রহস্যের আলোচনা

অক্সিজেন যদি থিসিস হয় তবে হাইড্রোজেন হয় এন্টিথিসিস এবং উভয়টার সংমিশ্রণে তথা সিনথেসিস যদি পানি হয় তবে কি বলতে পারি না যে, ফেরেস্তা থিসিস এবং শয়তান এন্টিথিসিস এবং উভয়ের সংমিশ্রণে তথা সিনথেসিসে আমরা পাই মানুষ? মানুষের গুণগত বৈশিষ্ট্যকে যদি ভাগ করি তবে ফেরেস্তা তথা সম্পুর্ণ পবিত্র এবং শয়তান তথা সম্পূর্ণ অপবিত্র উভয়টারই সংমিশ্রণ পাই। একই মানুষের আকারের মধ্যে আল্লাহর অলীকেও পাই আবার একই মানুষের আকারের মধ্যে শয়তানকেও পাই। এই দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণের ব্যাপ্তিটাই হল সমস্ত পৃথিবীতে বাস করা মানুষগুলো, যেন একটা না থাকলে অন্যটার সৌন্দর্য ফুটে উঠে না। আল্লাহ মানুষের পূর্বে ফেরেস্তাদের তৈরি করলেন। চরিত্রের বিশ্লেষণে ফেরেস্তা হল সম্পূর্ণ ভাল (এ্যাবসোলিউট গুড)। এই সম্পূর্ণ ভাল ফেরেস্তাদের অপবিত্র কাজ করার কোন অধিকারই দেওয়া হল না। কিন্তু এই সম্পূর্ণ ভালটাই তথা ফেরেস্তাদের আল্লাহর কাছে সম্পুর্ণ ভাল লাগলো না। তিনি বানালেন শয়তান। শয়তান হল সম্পূর্ণ অপবিত্র (এ্যাবসোলিউট ব্যাড)। এই সম্পূর্ণ অপবিত্র তথা শয়তানকেও আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ খারাপ লাগলো। তাই তিনি সম্পূর্ণ খারাপ শয়তানের সংমিশ্রণে বানালেন মানুষ। এই ফেরেস্তা এবং শয়তানের মিশ্রিত রূপ মানুষই আল্লাহর কাছে সবচাইতে প্রিয়। তাই মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব তথা আশরাফুল মাখলুকাত (ক্রাউন অফ দি ক্রিয়েশন) বলে ঘোষণা করলেন। নির্দিষ্ট সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি (লিমিটেড ফ্রি উইল এন্ড চয়েজ) দেওয়া হল। এই ইচ্ছাশক্তি তথা আমিত্ব বর্জন করে আল্লাহতে ফানা হয়ে যাবার ফরমুলা দিলেন। আমিত্ব বর্জন করলেই আল্লাহর জাতের সঙ্গে মিশে যাবার সর্বোচ্চ পুরস্কার পাবার কথা ঘোষণা করলেন।

এক ফোটা পানি অনেক পানির মধ্যে ফেলে দিলে যেমন সম্পূর্ণরূপে মিশে যায়, সেই নির্দিষ্ট পানির ফোটাটি আর খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি একের মধ্যে মিশে একাকার হয়ে যাবার একমাত্র উপদেশ দিলেন। সেই একমাত্র উপদেশটি আমরা বহুপূর্ব হতেই পেয়েছি এবং ইসলাম অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, যে নিজেকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রভুকে তথা আল্লাহকে চিনতে পেরেছে। এখানে আল্লাহকে চিনে নেবার তাগিদই দেওয়া হয়নি বরং নিজেকে চেনার উপদেশ

দিয়েছেন এবং এ-ও বলা হয়েছে যে, আপনাকে চিনতে পারলেই আল্লাহকে চেনা হয়ে গেছে। সমস্ত ইসলামী দর্শনের মূল ভিত্তি তথা স্বত:সিদ্ধ সত্য (একশিয়োমেটিক ট্রুথ) হল নিজেকে চেনা (নো দাই সেলফ)। কোন উপদেশই আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া হয়নি, হোক না যদিও সেই উপদেশ কয়েক লক্ষ অথবা কয়েক কোটি, যা ইসলামী দর্শনের মূল ভিত্তিকে কেন্দ্র করে বলা হয়েছে। মরার আগে মরে যাও, তাহলে আর মৃত্যু নেই। কারণ, প্রত্যেকটি মানুষকে মাত্র একটিবারের জন্য অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে ঘোষণা করলেন। মরার আগে কেমন করে মারা যাব? প্রশ্নটিও তিনি করলেন আবার প্রশ্নের উত্তরটিও তিনিই দিলেন এই বলে যে, তোমার আমিত্ব তোমা হতে সম্পূর্ণ দূর করে দাও, ইহাই হল মরার আগে মরে যাবার উপদেশ।

আত্মার বিজ্ঞানী হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রাঃ)-কে তাঁর এক মুরীদ প্রশ্ন করেছিলেন যে, কি রকম লোকের সহবাসে থাকবো? তার উত্তরে তিনি এটুকুই বলেছিলেন যে, যার মধ্যে আমি এবং তুমি নেই।

আত্মার বিজ্ঞানী মনসুর হাল্লাজ (রঃ)-এর 'আনাল হক' 'আমিই একমাত্র সত্য' ঘোষণার গভীরতম রহস্য এখানেই লুকিয়ে আছে।

আত্মার বিজ্ঞানী শামসেত্তাব্রীজ (রঃ)-এর 'আমিই সর্বপ্রথম, আমিই সর্বশেষ, আমিই একমাত্র প্রকাশ্য এবং আমিই একমাত্র গোপনীয়' বলার মাঝে এই গভীরতম রহস্যের ইঙ্গিত বহন করেছে।

আত্মার বিজ্ঞানী হযরত শেখ ফরিদ (রঃ)-এর 'আমিই অলী, আমিই আলী, আমিই নবী, আমিই মাওলানা, আমিই বীরপুরুষ এবং আমিই মন্দিরের ব্রাহ্মণ পুরোহিত' বলার মাঝে গভীরতম রহস্য এখানেই লুকিয়ে আছে।

আত্মার বিজ্ঞানী শামসেত্তাব্রীজ (রঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তিনি কি মুসলমান? তার উত্তরে তিনি এটুকুই বললেন যে, 'তিনি অগ্নি উপাসকও নন, খ্রিস্টানও নন, ইহুদীও নন, এবং মুসলমানও নন, তিনি জীবনের মধ্যে নেই, মুত্যুর মধ্যেও নেই, তিনি পানিতেও নেই, মাটিতেও নেই, তিনি আগুনও নন, বাতাসও নন, মাটিও নন, পানিও নন, তিনি পুরুষও নন, তিনি মহিলাও নন, এবং ফেরদৌস নামক বেহেস্তের ফেরেশতাও নন।' যদি আমরা প্রশ্ন করি, তবে আপনি কে? উত্তরটি সহজ যা হযরত মনসুর হাল্লাজ (রঃ) বলেছিলেন।

কোন একজন আত্মার বিজ্ঞানী আল্লাহর অলীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তার কি মৃত্যু নেই? তিনি উত্তর দিলেন, না, অলী আল্লাহ কখনোই মরেন না। *(অলী আল্লাহি লা ইয়া মুতু)।* আবার প্রশ্ন করা হল, কেন মরেন না? তিনি সুন্দর একটি উত্তর দিলেন, যেহেতু মৃত্যুর স্বাদ কেবলমাত্র একবারই গ্রহণ করতে হয়, দুইবার নয়, সেহেতু অলী আর মরেন না। যেহেতু মারা যাবার আগেই অলী মারা যান, সেহেতু পুনরায় মরার প্রশ্নই আসে না।

আত্মার বিজ্ঞানী হযরত আবদুল কুদ্দুস (রঃ) বলেছিলেন, *'গুফতে কুদ্দুসি ফকিরী দার ফানা ওয়া দার বাকা খুদবাখোদ আজাদ বুদি খোদ গেরেফতার আমদী।'* অর্থাৎ, বলে দাও, ফকিরের তথা আল্লাহর অলীর লয় এবং স্থিতি ইচ্ছাকৃত এবং দেহধারণ ও দেহত্যাগ তার ইচ্ছাকৃত অর্থাৎ এখানে লাশটি পড়ে আছে, কিছু দূরে সেই একই সময়ে আবার সেই একই দেহ নিয়ে পরিচিত লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন। এই আত্মার বিজ্ঞান শিক্ষার তাগিদ দিতে গিয়ে ইসলাম ঘোষণা করলেন, যাকে বিজ্ঞানের তথা হেকমতের জ্ঞান দান করা হয়েছে তাকে যথেষ্ট কল্যাণদান করা হয়েছে। বিরাট বিরাট যুক্তির অকাট্য প্রমাণ দিয়ে অনেক কিছু করা যায়, একজনের মুখে তালা মেরে দেওয়া যায়, আনন্দ আর আত্মতৃপ্তিতে মনকে ভরিয়ে তোলা যায়। যুক্তির মাধ্যমে সত্যের কাছাকাছি এগুনো যায় অথবা

সত্যের আলোর সন্ধান পাওয়া যায়। বিরাট বিরাট বিজ্ঞানের আবিষ্কারে মানুষকে অবাক করে দেওয়া যায়। মানুষ কোনদিন যা ধারণাও করেনি সেই নতুন ধারণার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারা যায়। বোতামে টিপ দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা একটা দেশকে বোমার আঘাতে মানচিত্রের চেহারা বদলিয়ে দেওয়া যায়, মনে করুন আরো অনেক অনেক কিছু করা যায়, মনে করুন মানুষটাকে কেটে জোড়া লাগানো যায় কিন্তু তবুও তো একটি প্রশ্ন একটি জিজ্ঞাসা থেকে যায়। যেদিন এই সামান্যতম একটি জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যাবে সেইদিন আমার মনে হয় মানুষ পাবে প্রকৃত শান্তি। এর আগে মানুষ শান্তি পেতে পারে কিনা সন্দেহ। (অবশ্য ইহা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ধারণা, সুতরাং আমার ধারণা ভুলও হতে পারে।)

সেই ছোট্ট জিজ্ঞাসাটি, ছোট্ট প্রশ্নটি হল, দেহতে যে আমিটি বাস করছে, যে আমিটি কথা বলছে, যে আমিটি দেখছে, যে আমিটি অনুভব করছে- সেই আমিটা কে? সেই আমিটার নাম কি? সে আমিটার পরিচয় কি? এত জ্ঞান-বিজ্ঞান যে আধসের (?) মাথার মগজে গুঁজে রাখা হয়েছে সেই মগজের মালিক আমিটা কে? গোঁজামিলের উত্তর, আত্মতৃপ্তির উত্তর নানা মুনি নানা রকমে বুঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং বৈজ্ঞানিকদের আকুল আবেদন করছি, আপনারা মানুষ মারার নতুন নতুন ফাঁদ আবিষ্কার না করে গবেষণা করে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করুন যে, এই হাড়-মাংসের তৈরি মানব দেহটাতে যে আমিটা তথা রূহ তথা আত্মাটা বাস করছে সে কে? কি তার পরিচয়? কিভাবে তার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে তার ফরমুলা দান করুন। বিদ্যুতের শক্তির মতো এত গতির অধিকারী তো আমিটা নয়। যদি ধরে নেই, দেহের সবকিছুর মিলিত সিনথেসিসটাই আমি নামক প্রাণটা, তবে ইহা কি একটা বিরাট, গোঁজামিলের ফাঁকি মারা হয় না? এই ফাঁকি মারা যতদিন চলতে থাকবে, যে কোন ইজমের দোহাই দিয়েই হোক না কেন, তাতে কি পৃথিবীতে শান্তি আসতে পারবে? 'দারিদ্রতার যেমন অভিশাপ আছে প্রাচুর্যতারও তেমনি অভিশাপ আছে'– এই দর্শন ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে। তাহলে শান্তি কোথায়? একটা অজানা অতৃপ্ত কামনা-বাসনার স্রোতে ভেসে চলেছি। অহঙ্কার, আত্মগরিমা অনেক সময় সাময়িক শান্তি দেয়, আবার সেই একঘেঁয়ে অহঙ্কার এবং আত্মগরিমাটাও ভাল লাগে না। কোথায় যেন নিজেকে সমর্পণ করতে পারলে আরাম পেতাম, পেতাম শান্তি এরকম প্রশ্ন বুকের ভিতর বোবার মত কেঁদে উঠে।

প্রাচুর্যতার অভিশাপে ইউরোপ-আমেরিকার তরুণ-তরুণীরা দিশেহারা হয়ে শান্তি খোঁজে। রাশিয়ার দর্শন (ফিলোসফি)– খাদ্যই সবকিছু, আর কিছু নেই, ভেটো মারা কথাতেও শান্তি নেই, গণতন্ত্রেও শান্তি নেই, রাজতন্ত্রেও শান্তি নেই, জাতীয়তাবাদেও শান্তি নেই, তবে শান্তি কোথায়?

এই বিরাট অথচ অতি ক্ষুদ্র এবং অতি পরিচিত প্রশ্নের উত্তর যেদিন মানবজাতি আবিষ্কার করতে পারবে, যেদিন আমিকে চিনবার কোন সার্বিক বৈজ্ঞানিক ফরমুলা দিতে পারবে, যার দ্বারা আমিকে চেনা যায়, সেদিনই পৃথিবীর মানুষগুলো প্রকৃত শান্তি পাবার আশা করতে পারে।

প্রথম মানব আদম (আঃ) হতে একটিমাত্র ধর্ম ইসলামের জন্ম, আর সেই একটিমাত্র ধর্মের একটিমাত্র কথা, একটিমাত্র উপদেশ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষদেরকে বিভিন্ন মহাপুরুষ তথা অবতারদের দিয়ে একটিমাত্র হেদায়েত করে গেছেন। সেই একটিমাত্র হেদায়েতের নামটি হল– নিজেকে চেনা (নো দাই সেলফ)।

তাই ইসলাম ঘোষণা করেছেন যে, প্রত্যেক জাতিকে হেদায়েত করার জন্য অবতার তথা নবী পাঠানো হয়েছে এবং প্রত্যেক অবতার বা নবী একটিমাত্র ধর্ম প্রচার করে গেছেন। সেই একটিমাত্র ধর্মের নাম হল ইসলাম ধর্ম।

ভালবাসাভিত্তিক ইসলামের রূপরেখা

আল্লাহ অসীম। সীমার দেয়ালে তিনি নেই। জ্ঞান অসীম। সীমার দেয়ালে জ্ঞান নেই। যদি জ্ঞানের এখানেই শেষ বলে ঘোষণা করা হয় তবে আল্লাহরও এক স্থানে এসে শেষ হয়ে যাবার প্রশ্নটি আসে। নতুন নতুন বস্তুর বিজ্ঞানের আবিষ্কার এই অসীমতার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। বস্তুর বিজ্ঞানের যেখানে শেষ বলে কোন কথা আসে না, সেখানে আত্মার বিজ্ঞানের প্রশ্নটি তো আরো ব্যাপক এবং জটিল এবং ইহারও শেষ নেই। কোরান শরীফ আল্লাহর তথা অসীমের কথাসমষ্টি। অসীমের কথাও অসীম। মানুষ তার সম্পূর্ণ অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা কোনদিনও দিতে পারে না। কারণ, অসীমের গুণাবলীর শেষ নেই এবং যেহেতু গুণাবলীর অন্ত নেই, সেহেতু তার ব্যাখ্যারও শেষ নেই।

আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালনের মধ্যে যত সুন্দর এবং পরিপূর্ণ রূপই থাক না কেন উহা হল আইন তথা সৈনিক ধর্ম। আইনের ভেতর আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালনের সুন্দরতম সামাজিক শৃঙ্খলা পেতে পারি এবং পেতে পারি সুন্দরতম নৈতিক আদর্শ, কিন্তু প্রেম কখনোই পাওয়া যায় না। কারণ, আইন প্রেমকে সহ্য করে না। ঠিক তেমনি প্রেমের ভিতর আত্মাহুতি দেবার বৈচিত্র পেতে পারি, কিন্তু আইন কখনোই পেতে পারি না। প্রেমের ভেতর জোর করে আইনকে ঢুকানোই যায় না। যেই মুহূর্তেই এমনি করলেই প্রেম হয় অমনি করলে প্রেম হয় না বলা হয়, সেই মুহূর্তেই প্রেম সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে। তাই আইনের যেখানে আপনি সুন্দর একটি কবর দেখতে পাবেন, ঠিক সেখান থেকেই দেখতে পাবেন প্রেমের আরম্ভ। কারণ, প্রেম কোনদিনও বাঁধাধরা রেললাইনের উপর দিয়ে চলে না এবং চলতেও পারে না। লাইলীর রাস্তায় কুকুরের গায়ে মজনু লাইলীর গন্ধ পাচ্ছে তাই কুকুরকে চুমু খাওয়া যায়, এটা আইন কোনদিনও মানতে পারে না। হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর দাঁত যুদ্ধে ভেঙ্গে গেছে বলে সব মুসলমানদেরই দাঁত ভেঙ্গে ফেলতে হবে, এটা আইন কখনই গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং প্রেমের বাজারে আইনের পণ্য জোর করে বিক্রি করাটা অন্যায় নয় কি? আইনের আনুষ্ঠানিকতার সৌন্দর্য অন্যস্থানে কি ভাল মানায় না? যেমন বনের পশুকে বনে মানায় আর শিশুকে মানায় মায়ের কোলে।

পাগলদের নাচানাচি করবার গণতান্ত্রিক অধিকারটা কেন হরণ করে নিচ্ছেন? যদিও কিছু শ্রদ্ধেয় ভাইদের কাছে এই আবোল-তাবোল নাচানাচি মোটেই ভাললাগার কথা নয়। ভণ্ডামী করা হচ্ছে বলে মনে হবে। বেদে বীণ বাজালে সব জাতের সাপ কিন্তু ফণা তুলে নাচে না। জাতি সাপের সামনে বীণ বাজালেই আর কথা নেই। ছোট মুখটাকে দশগুণ ফুলিয়ে জজবায় আত্মহারা হয়ে নাচতে থাকে। এখন কেউ যদি জাতি সাপকে প্রশ্ন করে যে, বেদের মনে বেদে বীণ বাজায়, তাতে তুই কেন ফণা তুলে নাচিস? এই প্রশ্নের উত্তর নেই। কারণ, প্রশ্নের শেষ যেখানে, সেখানে তো প্রেম। আবার বোড়া সাপের সামনে যদি সারাদিনও বীণ বাজান, সে ফণা তুলে নাচা তো দূরে থাক বরং বিরক্ত হয়ে পালিয়ে যেতে চাইবে। শ্রেণীতে এরা সবাই সাপ, কিন্তু চরিত্রের বিশ্লেষণে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সেরকম কি একই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এরকম আকাশ-পাতাল প্রভেদের বিভিন্নতা আমরা পাই না? এই বিভিন্নতাও সর্বশক্তিমান আল্লাহরই সৃষ্টি, তাই আপনি কাকে দোষারোপ করতে যাবেন? এই বৈচিত্রের লীলাখেলা তো তাঁরই খেলা। তাই আপনি কাকে গালমন্দ করবেন? অতি উঁচু স্তরে যখন আপনার চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে, দেখতে পাবেন যে, গালমন্দ করার স্থান কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না।

মানুষকে ধোঁকা দেয় কে? মানুষকে পাপের রাস্তায় কে টেনে নিয়ে যায়? নাম তার শয়তান। এই এক শয়তানই বহুরূপ ধারণ করে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে, কুমন্ত্রণা দিয়ে, বিভিন্ন প্রলোভনের মাধ্যমে পাপের পথে নিয়ে যায়। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করেই ফেলেন যে, শয়তানের আগে তো কোন শয়তানই ছিল না, তাহলে তাকে কে শয়তান বানালো? শয়তান তো আগে অতি সম্মানীয় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। শয়তান তো আগে সমস্ত পবিত্র ফেরেস্তাদের ইমাম তথা সরদার ছিলেন। তবে তাকে শয়তান বানাবার দায়িত্বটা কার? আমরা না হয় শয়তানের ধোঁকায় পড়ে শয়তানকে গালমন্দ করি, কিন্তু ফেরেস্তাদের ইমাম কার ধোঁকায় পড়ে শয়তানে পরিণত হল? সে কাকে গালমন্দ করবে?

আল্লাহই তো বলেন যে, তাঁর আদেশ বিহনে একটি গাছের পাতারও নড়বার শক্তি নেই। এইরকম প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সবকিছু একেরেই খেলা বলে ধারণা জন্মাতে চায়। তাহলে গালমন্দ করবোটা কাকে? তাই কারটা ভণ্ডামী করা হচ্ছে আর কারটা খাঁটি হচ্ছে এর জবাব সর্বশক্তিমান আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিলেই কি ভালো মানায় না? 'তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে' এরকম উপদেশ কি আমাদের ধর্ম-দর্শনে নেই? 'ধর্মে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ নেই' বলে কি একটি পরিচিত বাক্য মনে পড়ে না? 'জোর করে মুসলমান বানাও নতুবা হত্যা কর' এরকম কোন একটি বাক্য যদি ইসলামে থাকতো তবে সেই দিনের পরিচিত পৃথিবীতে একটি ভিন্ন ধর্মের মানুষকে ভর্তা বানিয়ে খাবার মতও পাওয়া যেত না। কিন্তু তা নয়। কারণ ইসলাম সাংঘাতিকভাবে পরধর্মের উপর সহনশীলতার ধর্ম। তাই বলতে ইচ্ছে করে যে, পৃথিবীতে যদি কোন বড় পাপ থাকে সেই পাপটার নাম হল 'আমি সব কিছু বুঝে গেছি, সব কিছু জেনে গেছি।' তাই নয় কি?

বস্তুর বিজ্ঞান আর আত্মার বিজ্ঞান দুটো সম্পূর্ণ আলাদা দর্শন। উভয়টারই প্রয়োজন অত্যধিক। কোনটাকেই ছোট করা অথবা হেয় প্রতিপন্ন করাই যায় না। অবশ্য অপ্রিয় হলেও অতি সত্য কথা যে, আত্মার বিজ্ঞানীদেরকে অনেকটা 'ফুল বাবুর চিন্তাধারা' বলে যদি গালমন্দ করেন তবে তিক্ত হলেও কিছু বলবার নেই। কারণ, আত্মার বিজ্ঞানীদের কাছে আমরা বস্তুর বিজ্ঞান পাই না এবং পাবার আশাই করা যায় না। পক্ষান্তরে বস্তুর বিজ্ঞানের অলী, দরবেশ, পীর, ফকির পাবেন ইউরোপ এবং আমেরিকাতে। কারণ, বস্তুর বিজ্ঞান অনেকটা চরম পর্যায়ে এনে পৃথিবীর মানুষগুলোকে তারা অবাক করে দিয়েছেন। কিন্তু আত্মার প্রকৃত শান্তি কি দিতে পেরেছেন? প্রাচুর্যতার স্রোতেও আত্মার শান্তি না পেয়ে নৈরাজ্যের আঁধারে হাজার হাজার বুড়ো-যুবক-যুবতীরা আত্মহত্যা করে চলেছেন। কেন? কারণ, আত্মার বিজ্ঞান নিয়ে তারা যতটুকু গবেষণা করা দরকার তার কিছুই করেননি বরং করার প্রয়োজনও অনুভব করেননি। কারণ, ধর্মের বিভিন্নতার অভিশাপ এদেরকে উৎসাহ যোগাতে পারেনি। তাই মানুষ প্রাচুর্যতার মধ্যেও শান্তি খুঁজে পায় না। আমরা আত্মার বিজ্ঞানীর কাছে নিজেকে কেমন করে চেনা যায়, জানা যায় সেই ফরমুলাটুকুই পাই।

হাদীসভিত্তিক শরিয়ত ও মারেফতের পরিচয়

বুখারী শরীফ একটি বিরাট হাদীসের বই। যিনি হাদীসগুলো সংগ্রহ করেছেন তাঁর নামেই হাদীস বইটি পরিচিত। ফৌজদারী আইনের যে রকম ধারাবাহিক নম্বর থাকে সেই রকমভাবে এক দুই করে সাজানো রয়েছে। তা সহজেই বুঝা যায়। এই বিরাট হাদীস বইটিতে আমরা অনেক মূল্যবান আদেশ-উপদেশ যে হুজুরপাক (সঃ) দিয়ে গেছেন তার পরিচয় পাই। এই কয়েক হাজার হাদীসের মধ্যে একটি হাদীস এক অপূর্ব এবং বিস্ময়কর স্থান জুড়ে সূর্যের আলোর মত জ্বলজ্বল করে আমাদের চোখে ধরা পড়ছে। হাদীসটা হুজুর পাকের (সঃ) বাণী নয়, অথচ হাদীসের মর্যাদার আসন পেয়েছে। সাহাবাদের মধ্যে বিশেষ জ্ঞানী-গুণি যারা তিনি তাদেরই একজন। সেই সাহাবার কথা কয়টি হাদীস না হওয়া সত্ত্বেও হাদীসের মর্যাদার স্থান পাওয়া কম কথা নয় এবং নিঃসন্দেহে স্থান পাবার মত যোগ্যতা বহন করে। সেই বিশেষ সাহাবার নাম হল হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)। আবু হোরায়রা তাঁর আসল নাম নয়। তিনি খুব বিড়ালপ্রিয় ছিলেন বলে হুজুর পাক (দঃ) একদিন 'বিড়ালের বাবা' বলে ডাকলেন। সেই থেকে তাঁর আসল নাম মুছে গিয়ে আবু মানে বাবা এবং হোরায়রা মানে বিড়াল তথা 'বিড়ালের বাবা' বলেই মুসলিম জাহানে সুপরিচিত। হুজুর পাকের (দঃ) বেশিরভাগ বাণী আমরা পেয়েছি এই মহান সাহাবার নিকট। তাঁর এই মহান দান আমরা অতি তাজিমের সাথে মনে করি। তবে সবচাইতে বেশি তাজিম করি তাঁর নিজের কয়েকটি অপূর্ব কথা মনে করে, যা বুখারী শরীফের পঁচানব্বই নম্বর হাদীস। তিনি অকপটে শিশুর মত সরল-সহজভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হুজুর পাক (দঃ) হতে তিনি দুই প্রকার জ্ঞান অর্জন করেছেন। একটি জ্ঞান বাহিরের অপরটি ভেতরের তথা একটি জাহেরী এবং অপরটি বাতেনী। একটি সবাইকে বলা তো দূরে থাক একদম বিশেষ জ্ঞানী ছাড়া বলাই যায় না এবং সকলের সামনে এই গুপ্তজ্ঞান প্রকাশ করলে তা তিনি ব্যক্তিগতভাবে অন্যায় মনে করেছেন এবং তাই তিনি বলেছেন যে, এই গুপ্তজ্ঞান তথা ইলমে মারেফত সকলের সামনে প্রকাশ করলে তাঁর গলা কাটা যাবে। এখানে গলা কাটা মানে একদম খুন করা অর্থে তিনি বুঝাননি। এখানে 'গলা কাটা' একটি বাগধারার মত ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ এই ইলমে মারেফত কখনোই সবার জন্য সমান বোধগম্য নয় বলেই প্রকাশ করা সমীচীন নয়। তাই তিনি অকপটে স্বীকার করলেন যে, ইলমে মারেফতের জ্ঞান তথা গুপ্তজ্ঞান, যা হুজুর পাক (দঃ) হতে পেয়েছেন, তাঁর বিরাট ভাণ্ডটি গুপ্তই রেখে গেলেন, তথা প্রকাশ না করে একটি সুন্দর রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন। এই বিরাট গুপ্তজ্ঞানভাণ্ডটি হযরত আবু হোরায়রার মত বেশ কিছু সাহাবাদের জানা ছিল, যার পরিণতিতে ইসলামের মধ্যে সুফিবাদ তথা ফকিরী প্রকাশ পেল। যদিও ইহা সুফিবাদ তথা ফকিরী নামে আলাদাভাবে সুপরিচিত, আসলে ইহা মোটেই আলাদা নয়। নাম রাখা হয়েছে আলাদা কিন্তু কর্মে ইহাই ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। প্রাণকে বাদ দিয়ে দেহের মূল্যায়ন করতে গেলেই আমরা বিভিন্নতার মধ্যে হাবুডুবু খাই। সত্যকে আমরা মরা কুকুরের মত উপেক্ষা করি হাজার বার সব মামুলি বুলি উচ্চারণ করে এবং সত্যকে কাঁধ ঝাঁকিয়ে তুচ্ছ এবং বাজে বলতেও লজ্জা পাই না, যদিও আমরা পিছনের দিকে পা টেনে টেনেই চলতে সাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছি বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করি।

আল্লাহ যেমন রহস্য আদমও তেমনি রহস্য এবং আজাজিল তথা শয়তানও আল্লাহর একটি উদ্দেশ্যমূলক রহস্য। একের ভেতর তিনের গুপ্তরহস্য প্রকাশিত হলে রহস্যের সৌন্দর্য অতি প্রকটরূপে প্রকাশিত হয় এবং ইহার সৌন্দর্যে অবগাহন করতে পারলেই শেরেকরূপ পরদা দূরীভূত হয়।

আজাজিল ওরফে শয়তান কিসের তৈরি? ইসলামী দর্শন বলছে, শয়তান এমন এক বিশেষ প্রকার আগুন দিয়ে তৈরি যে-আগুনের ধোঁয়া নেই তথা ধূম্রবিহীন অগ্নির দ্বারা সৃজিত। কোন অস্তিত্বের নিজস্ব সত্তা নেই আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া। কারণ, তিনি একের মধ্যেই একক। ধূম্রবিহীন অগ্নির মৌলিক কোন সত্তা না থেকে থাকে তবে উহাও কি একের ভিতর একক? যদি বলি হ্যাঁ, তবে সৃজনের মধ্যেই স্রষ্টা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে প্রকাশিত ও বিকশিত হয়ে চলেছেন। তাঁর এই প্রকাশ এবং বিকাশের ধারা প্রতিটি সেকেন্ডে যদি কয়েক হাজার কোটি ভাগ করা হয় এবং সেই ভাগে যতটুকু পরমাণুরূপ ক্ষুদ্রতম সময়ে কয়েক হাজার কোটি সম্পূর্ণ নতুন রূপ দেখিয়ে চলছেন এবং সেই ক্ষণিকতম সময়ে বিশাল রূপটি আর কোনদিনও দেখান না, তাই তিনি সব সময় নব নব রূপে বিকশিত হয়ে চলেছেন। আর যদি বলি না, ধূম্রবিহীন অগ্নি তাঁর সম্পূর্ণ পৃথক সত্তায় সত্তবান। তাহলে ইহা শেরেকেরই নামান্তর। কিন্তু সৃষ্টিতে শেরেক বলতে কিছু নেই আবার আছেও, অনেকটা শুনতে আত্মবিরোধী মনে হয়। আসলে অতি গভীরে প্রবেশ করলে কোন আত্মবিরোধী ভাবধারার সমাবেশ তো দূরে থাক, সবই একেরই অনেক রূপের মধ্যে তিনি একক রূপে খেলে চলেছেন। মূলত চরম সত্য কথা বলতে গেলে, তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। তাই আমাদেরকে দেখতে এবং মর্মে-মর্মে বুঝতে চেষ্টা করার তাগিদ দিয়েছেন এই বলে যে, বল আল্লাহ নিজেই আহাদ।

আল্লাহ এক ও এককের বিষয়ে আলোচনা

আহাদ শব্দটি অতি মারাত্মক এবং গুপ্তরহস্যপূর্ণ কথা। আহাদের সার্বিক অর্থ হল ‘তিনিই সব কিছু’ অথবা ‘যা কিছু আছে সবটুকুই তিনি’ অথবা তিনিই অখণ্ড অথবা স্বয়ম্ভু (এবসোলিউট) অথবা একটি অণুও বলতে পারবে না যে, সে আল্লাহ হতে আলাদা সত্তা নিয়ে বিরাজিত। যদি বলতে পারে বলা হয়, তবে এই অণু যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, অসীম আল্লাহর সঙ্গে শেরেক করছে তথা অংশিত্বের দাবী নির্ভয়ে ঘোষণা করছে। সুতরাং এই অণু-পরমাণুও অখণ্ড সত্তা হতে আলাদা নয়। মহা এককের মধ্যেই নিমজ্জমান। তাই তিনি আহাদ।

তাই তিনি বলছেন যে, দুই পূর্ব এবং দুই পশ্চিমের যে দিকে তাকাও না কেন, কিছুই দেখতে পাবে না কেবলমাত্র তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত। এই দুই পূর্ব এবং দুই পশ্চিম বলে ঘোষণার অর্থ হল, কোথাও তিনি ছাড়া কিছুই নেই। তাহলে আমাদেরকে “লা” শব্দটি উচ্চারণ করতে কেন বললেন? “লা” দিয়ে কেবলমাত্র আপনার মধ্যে যে অংশীত্বের ভুল ধারণার ছায়া পড়ে আছে তা দূর করে দেওয়া। আয়নার ভিতরে আপনার মুখের ছবিটার মতই “লা”-এর ভ্রান্ত ধারণা লুকিয়ে আছে। উহা দূর করতে বলা হচ্ছে। কেবলমাত্র মুখের বলা “লা” শব্দটির কোন মূল্যই থাকতো না যদি সত্যিই কোন অংশীদার থাকতো। কারণ, যদি কোন অংশীদার সত্যি সত্যিই থাকতো, সে যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তার আকৃতি সব চাইতে ক্ষুদ্র পজেট্রনও যদি থাকতো তবে কখনোই তার অংশীত্বের দাবী ছেড়ে দিত না এবং দিতে পারে না। আসলে “লা” এর ভ্রান্ত ধারণার অপর নাম আমিত্ব তথা হাস্তি বা খুদি। এই আমিত্বের জন্ম কর্ম করার মধ্য হতে আসে না। কারণ কর্ম কোনদিন আমিত্বের বন্ধন হতে পারে না। কামনাটাই কর্মের বন্ধন।

তাই কামনা আসলেই কর্ম কলুষিত হয়। কামনা আবার আপন হতে আসে না এবং আসতেও পারে না। ছয়টি রিপুর মাধ্যম হতে কামনা আসে। এই কামনাই পরদা। ইহা অতি সূক্ষ্ম পরদা। পুলসেরাতের পুলের মত চিকন এর রূপ এবং তীক্ষ্ণ তরবারির চেয়ে অনেক ধারালো এই কামনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ইহাই আমিত্ব। এই আমিত্ব তথা কামনা বর্জন করতে আদেশ দিচ্ছেন "লা" শব্দের দ্বারা। এই "লা" নামক ছায়া দ্বারা এক রং ও রূপকে বহু রূপে দেখা হয়। এই এককে বহু রূপে দেখাটাই শেরেক তথা অংশীত্বের রূপ। সাত রং দেখা যায় এমন কাঁচের মধ্যে চোখ রাখলেই মনে হবে। চোখ সেই কাঁচ হতে সরিয়ে ফেলুন আর সাত রঙয়ের সমাহার আপনি খুঁজেও পাবেন না। অনেকটা কাঁচের ভেতর এত রূপ দেখার মত এই কামনা। এই কামনা দূর করতে পারলেই সমস্ত কিছু 'তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই' প্রত্যক্ষ করার দর্শন লাভ হয়। তাই কর্ম কোনদিন বন্ধনের হেতু হয় না। কামনা যখন কর্মের ওপর আরোপিত হয় কেবল তখনই হয় বন্ধন এবং ইহাই আমিত্ব এবং ইহাকেই দূর করে দেবার জন্য এত লক্ষ কোটি উপদেশ আমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে।

সব উপদেশেরই মূল লক্ষ্য বা কেন্দ্রবিন্দু হল আমিত্ব পরিত্যাগ করা। তাই তিনি এই কথাও বললেন, যে তার আমিত্ব ত্যাগ করতে পেরেছে, সে তার প্রতিপালক আল্লাহপাকের দর্শন অবশ্যই পেয়েছে। এখানে 'অবশ্যই' শব্দটি যোগ করে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ আর কোন সন্দেহের অবকাশই থাকবে না। গৃহ পরিত্যাগ করতে পারলেই বৈরাগ্য হয় না। আমিত্ব ত্যাগ করতে পারলেই হয় সত্যিকার বৈরাগ্য। কারণ, বৈরাগ্যের মাধ্যমেই ইসলামের সত্য উপলব্ধি করতে হয়। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসারে থেকেও বৈরাগ্য পালন করা যায়, আবার বিবাহ না করেও করা যায়, এতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এই বৈরাগ্য রোহবানিয়াতের মত নির্দিষ্ট কোন অবশ্য পালনীয় নির্দেশ নয়। ইহা ব্যবহারিক পদ্ধতি। নীতি নির্ধারণ পদ্ধতি নয়, ব্যবহারিক পদ্ধতির পরিবর্তন আছে, কিন্তু নীতি নির্ধারণ পদ্ধতির কোন পরিবর্তন নেই। *সুন্নাতাল্লাহে লা তাবদিলা* অর্থাৎ *আল্লাহর আইন বদলায় না।* প্রাকৃতিক নিয়মকানুন যুগ যুগ ধরে একই নিয়মের অধীনতায় আবদ্ধ। সমস্ত মানুষ একই নিয়মের উৎস হতে তৈরি, ইহা নীতি নির্ধারণ পদ্ধতি। অবশ্য ইহারও একটিমাত্র ব্যতিক্রম আল্লাহপাক করেছেন হযরত ঈসা রূহুল্লাহকে, পিতা ছাড়া তৈরি করে। তাই হযরত ঈসা রূহুল্লাহ মায়ের পেট হতেই রূহুল্লাহ, তাই তিনি আজীবন রূহুল্লাহ। কামনার বন্ধন তাঁর মধ্যে জীবনেও এক মুহূর্তের তরেও আসন নিতে পারেনি।

আত্মতত্ত্ব জানলেই বা পড়লেই আত্মজ্ঞ হওয়া যায় না। আমিত্ব ত্যাগ তথা কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করতে পারলেই আত্মজ্ঞ হওয়া যায় অর্থাৎ প্রতিপালকরূপী আল্লাহকে চেনা হয়। আল্লাহ অনেক গুণের অধিকারী বলে জানি অর্থাৎ এই নিরানব্বইটি অথবা তিন শত ষাটটি গুণের একের ভেতর অনেকগুলো বিশেষ গুণ এবং এক একটি গুণের এক এক রকম রূপ আছে। তাই তিনি কখনো ওয়াহেদ আবার কখনো আহাদ। অর্থাৎ কখনো তিনি একের মধ্যে বহু তথা একক। তাই তিনি কখনো নিজেকে 'আমি' বলেছেন আবার কখনো 'আমরা' বলেছেন। 'আনা' তথা 'আমি' এবং 'নাহনু' তথা 'আমরা'। যেমন রেজেক-বণ্টন ব্যবস্থার কথা, রূহ ফুৎকার করার পরিবেশে, হেদায়েত করার সময় 'আনা' তথা 'আমি' শব্দটি কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। ব্যবহার করা হয়েছে 'নাহনু' তথা 'আমরা' শব্দটি। ইহার সৌন্দর্য এত বিশাল, এত বিজ্ঞানময় এবং রহস্যপূর্ণ যে, ইহার গভীরে প্রবেশ করলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়।

আত্মতত্ত্ব জানলেই আত্মজ্ঞ হওয়া যায় না। ঔষধের নামতালিকা পাঠ করলেই রোগের লক্ষণ ধরা যায় না। রোগের লক্ষণ ধরতে হলে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তাই *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'*-

'তিনি ছাড়া কিছুই নেই' মুখে পড়তে বলা হয়নি। কারণ মুখের স্বীকৃতির কোন মূল্য নেই, যদি কর্মে উহা প্রয়োগ না করা হয়। যেমন 'শয়তানের ধোঁকাবাজি হতে আশ্রয় চাইছি' বললেই শয়তান তাকে মোটেই ছেড়ে দেবে না এবং শয়তানের ধোঁকাবাজি হতে মুক্তিও পাবে না। যে পর্যন্ত না কর্মের মাধ্যমে শয়তানকে বিদূরিত করতে পারবে। মুখের হাজার কথায়ও শয়তান চলে যায় বললে হাস্যকরই শোনায়, কারণ মুখের কথায় শয়তান চলে যেতে পারে না, যতক্ষণ না একাগ্র চিত্তে আল্লাহ-সাধন পদ্ধতির ফরমুলায় ফেলে সাধনায় সিদ্ধি লাভ না করা হয়। মৌখিক স্বীকৃতি তিনি গ্রহণ করেন না বরং অন্তরের স্বীকৃতিটাই তিনি দেখে থাকেন এবং গ্রহণ করেন। আল্লাহ আমাদের কথা, চেহারা এবং আমল দেখেন না, তিনি দেখে থাকেন আমাদের নিয়ত অর্থাৎ অন্তরের স্বীকৃতি এবং একনিষ্ঠ সাধনায় ব্রতধারী কিনা উহা তিনিই ভাল করে জানেন। তিনিই বুঝতে পারেন যে, আমাদের নিয়তরূপ সাধনার হাতের তলায় কামনার ইট লুকিয়ে আছে কি না। বিচারক এখানে আমার আমি নই, তাতে যত সাধনাই করি না কেন। বিচারক তিনি, তিনিই বিচার করে যখন দেখতে পাবেন যে, আমার নিয়ত একদম তার দিকে ছাড়া আর কোথাও নেই, সেদিনই তিনি রহিমরূপে বিশেষ দান করবেন তার পরিচয়ের গুপ্তরহস্য। 'রহমান' রূপে নয়। কারণ 'রহমান' রূপে যে দান উহা সাধারণ দান। 'রহীম' রূপের দান আমিত্বের বর্জনপূর্বক দান। তাই তিনি গফুরুর রাহিম। গফুরুর রহমান নন। 'রহিম'রূপী দানপ্রাপ্ত হলেই আল্লাহর আহাদরূপের সম্যক জ্ঞান হয় এবং তখনই সে তৌহিদে বাস করে এবং 'আইনুল ইয়াকিন' তথা প্রত্যক্ষ দর্শন হয়ে যায়। 'আইনুল ইয়াকিন' না হওয়া পর্যন্ত এবাদত কর বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে।

ইসলাম কি অপূর্ব সুন্দর রূপে আহ্বান করছে, হে অদৃশ্যে ঈমান আনার লোকেরা, তোমরা ঈমান আন অর্থাৎ মৌখিক 'বিল গায়েবে' তথা অদৃশ্যে ঈমান আনার দল, এখন তোমরা আইনুল ইয়াকিনের দিকে এগিয়ে যাও তথা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন কর। যারা অদৃশ্যে ঈমান এনেছে তাদেরকেই ঈমান আনতে বলা হয়েছে। তাহলে ঈমানকে মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। একটি মৌখিক ঈমান অপরটি প্রত্যক্ষ ঈমান। প্রথমটির যে কোন মুহূর্তে হারিয়ে যাবার সম্ভবনা আছে আর দ্বিতীয়টির হারিয়ে যাবার আর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, যেহেতু প্রত্যক্ষ জ্ঞান তথা আইনুল ইয়াকিন তার হয়ে গেছে। তাই ইসলাম ঘোষণা করেছে, এবাদত সেই পর্যন্ত কর যে পর্যন্ত না আইনুল ইয়াকিন হয়। অর্থাৎ 'আইনুল ইয়াকিন' হবার পর এবাদতেরও শেষ হয়ে যাওয়া বুঝায়। কারণ, মৌখিক ঈমানের কোন দৃঢ় ভিত্তি নেই। মৌখিক ঈমান হল সদা চঞ্চলগতিসম্পন্ন। এই ঈমান কথায় কথায় ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এই ঈমান বিভিন্নতার মধ্যে ছুটাছুটি করতে ভালবাসে। এই ঈমানের অধিকারীদের মতামত অনবরত বদলাতে থাকে। এই প্রকার ঈমানের অধিকারীদের কাছে আজ যা সত্য বলে ধারণা জন্মায়, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই আবার উহা মিথ্যা বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ মৌখিক ঈমানের এক কথায় কোন স্থিরতাই নেই। কিন্তু 'আইনুল ইয়াকিন' তথা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করলেই আর কোন প্রকার চঞ্চলতা, অস্থিরতা এবং সন্দেহ প্রকাশ পাবে না। ইসলাম এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনকারীকেই প্রকৃত শান্তি লাভ করেছে বলে তথা ইতমেনান লাভ করেছে বলে ঘোষণা করেছে এবং এদের জন্যই জান্নাতের সুসংবাদ এরা পেয়ে গেছেন বলেও ঘোষণা করা হয়েছে।

হযরত মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী তাঁর *মকতুবাতে খাজা* নামক বইতে হযরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীকে উপদেশ দিচ্ছেন এই বলে যে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ আল্লাহ জিকির করছে, জেনে রাখ, সে আল্লাহকে পায়নি এবং ইহাও জেনে রাখ যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে পেয়েছেন তিনি আর কখনোই আল্লাহ আল্লাহ জিকির করবেন না। ইহা কেমন কথা বলে তুমি আমায় প্রশ্ন করতে পার এবং যদি প্রশ্ন

কর তবে তার উত্তর হল যে, তোমার কোন প্রিয়জনকে দূরে দেখতে পেলে ডাক দেবে, কিন্তু যখন সে তোমার অতি নিকটে তখন আর ডাক দেবার প্রশ্নই আসতে পারে না। অর্থাৎ যখন তুমি আল্লাহর পরিচয় প্রত্যক্ষরূপে পেয়ে যাবে তখন তোমার জন্য আর ইবাদত নেই বললেই চলে। তখন তুমি এবাদতের বহু ঊর্ধ্বে এবং এবাদতের আনুষ্ঠানিকতা এখানেই শেষ। যদিও তোমার মধ্যে আল্লাহপ্রাপ্তির পর এবাদত করতে কেউ দেখে, সেই এবাদত তোমার নিজের জন্য নয়, উহা তোমার মুরীদানের শিক্ষা দেবার জন্য। হুজুর পাক (দঃ) এবাদতের অনেক ঊর্ধ্বে। অথচ তাঁকে এবাদত করতে দেখা যেত, তার মানে এই অর্থ নয় যে, সেই এবাদত তাঁর নিজের জন্য বরং সেই এবাদত তাঁর অনুসারী সাহাবাদের শিক্ষার জন্য। শিক্ষক যদি ছাত্রের বিদ্যার ওপরে না হয়, তাহলে ছাত্রকে শিক্ষক কি শিক্ষা দেবেন? শিশুকে ক,খ,গ, পড়াতে গেলে শিক্ষকের সেই অক্ষর উচ্চারণ করতে হবে বার বার। এই বার বার ক,খ,গ উচ্চারণের মাধ্যমে শিশু অক্ষরজ্ঞান পাবে, কিন্তু শিক্ষক এর অনেক ঊর্ধ্বে, যদিও তিনি ঐ অক্ষরগুলো শিশুর সঙ্গে বার বার উচ্চারণ করছেন। একজনের শিক্ষা হচ্ছে, অপরজনে শিক্ষা দিচ্ছেন।

খাজা গরীব নেওয়াজ তাঁর *'মকতুবাতে খাজা'* বইতে আর একটি সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, তুমি যদি অনেক পয়সা খরচ করে দামী পোলাও-কোরমা পাকিয়ে দশমাসের শিশুকে খেতে দাও তবে সেই শিশুর জন্য সেই দামী খাদ্যই হবে বিষতুল্য। যদিও উহা তোমার নিকট উপাদেয় খাদ্য বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে দশমাসের শিশুর জন্য যে দুধের শিশি তা যদি এনে দাও তবে উহা হবে তাদের জন্য অপমানজনক একপ্রকার ঠাট্টা-তামাশা। কারণ, তোমার বন্ধুরা দুধের শিশিতে ঠোঁট লাগানোর বয়স অনেক আগেই ফেলে এসেছেন। তাই যারা দুধের শিশিতুল্য জ্ঞানের উপযোগী , তাদেরকে পোলাও-কোরমার মত অতি উঁচুস্তরের জ্ঞান দিও না। কারণ, তা সবার জন্য সমান প্রযোজ্য নয় এবং সবাইকে সমানভাবে বিতরণ করাও সমীচীন নয়।

খাজা গরীব নেওয়াজ অতি উঁচু পর্যায়ের অলী। তিনি এমন কথাও বলেছেন যা অলীদের অবাক করে। যেমন একস্থানে তিনি বললেন যে, '(হযরত) ঈসার (নবীর) সানিই আমি তথা আমিই দ্বিতীয় ঈসা। কারণ, তাঁর কাছে যে রূহুল কুদ্দুস সেই একই রূহুল কুদ্দুস আমার কাছেও।' ফারসী ভাষায় তাঁর এই অপূর্ব কথা আমরা দেখতে পাই যেমন, *'দাম বা দাম রুহুল কুদ্দুস আন্দার মঈনে মি দামাদ্–মান নামিদানাম মাগার মান ঈসায়ে সানি শুদাম।'*

হযরত শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মুনীরি ওরফে মখ্দুম শাহ্ বিহারীর *'মকতুবাতে সাদি'* নামক বইতে ইলমে মারেফতের অতি উঁচু স্তরের কয়টি উপদেশ আমরা পাই এবং তাঁর একটি উপদেশ নিচে তুলে ধরলাম। তিনি তাঁর জনৈক মুরীদকে বলছেন যে, 'জেনে রাখ বাবা, দুনিয়ার সবচাইতে বড় পাপী বলে গণ্য ব্যক্তিটি দুনিয়ার সবচাইতে উত্তম ব্যক্তিটির মাথা লাঠির দ্বারা আঘাতে জখম করলো বলে দেখলে, কিন্তু সেই আঘাত পাপী ব্যক্তিটি করেনি। তুমি বলবে, তবে? আমি এখন যা বলবো উহা তোমার বিশেষ তথা খাস বন্ধু ছাড়া কাউকে বলবে না। জেনে রাখ, সেই লাঠির আঘাত সেই পাপী ব্যক্তিটি করেনি। কারণ, আল্লাহর ইশারা ছাড়া তার পক্ষে লাঠি তোলা অসম্ভব। তুমি বলবে, এটা কেমন কথা? আমি বলবো, বাবা তুমি পরদার ভেতরে আছ, পরদা যদি খুলতে পার তবে দেখতে পাবে সব তারই রহস্যময় লীলাখেলা। তুমি দেখতে পাবে যে, তিনিই বিচারক, তিনিই কৌশুলী তথা উকিল, তিনিই বাদী এবং তিনিই বিবাদী। কারণ, তিনি ছাড়া কিছুই নেই।' আহাদ রূপের গুপ্ত দর্শন এখানেই। যা তোমার কাছে অমিল-বেমিল এবং কেমন যেন খাপছাড়া মনে হবে। মোকামে তৌহিদে না যাওয়া পর্যন্ত আহাদ রূপটি মৌখিক স্বীকৃতিরই নামান্তর।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নবম শক্তিতে ঔষধের কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। তাহলে এক হাজার শক্তিতে কি থাকতে পারে? অথবা একলক্ষ কিংবা দশলক্ষ শক্তিতে? ঔষধের কোনই অস্তিত্ব নেই, কিন্তু অস্তিত্বহীন ঔষধ রোগের মূলে গিয়ে আঘাত করছে। ঔষধ নেই অথচ শক্তি আছে– এ কেমন কথা?

এক ফোঁটা ধাতুর (সিমেন) মধ্যে কোটি কোটি শুক্রকীট (স্পারমাটোজা) হতে একটি কীটের ক্রমবিকাশের পূর্ণাঙ্গ রূপটি হল মানুষ। আরো একটু তলিয়ে দেখি, দেখি এই ধাতু কোথা হতে এল? শ্বেত (এ্যালবুমিন) ও লৌহ কণিকার (হিমোগ্লোবিন) মিশ্রিত রূপ রক্ত হতে ধাতুর জন্ম। রক্ত কোথা হতে এল? খাদ্যদ্রব্য হতে রক্তের জন্ম। খাদ্যদ্রব্য কোথা হতে এল? মাটি, পানি, আলো এবং বাতাস হতে খাদ্যদ্রব্যের জন্ম। মাটি, পানি, আলো এবং বাতাস কোথা হতে এল?

এভাবে পর পর চিন্তা করলে, আসল মূল কোথায়, এর উত্তর খুঁজতে গেলেই নিজেকে চেনার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, নিজেকে চিনতে পারলেই আল্লাহকে চেনা হয়ে যায় বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে এবং ইহাই ইসলামের একমাত্র উপদেশ। দ্বিতীয় কোন উপদেশ ইসলাম দেয়নি। আল্লাহ এক কিন্তু তাঁর গুণাবলী অনেক। অনেক গুণাবলীর মধ্যে সবচাইতে প্রিয় গুণটি তাঁর কি? 'ইচ্ছা' তাঁর সব চাইতে প্রিয় গুণ। সব গুণগুলোই 'ইচ্ছা' নামক গুণের অধীন। 'ইচ্ছা' হল সকল গুণের নেতা বা সরদার। কিন্তু এই শীর্ষস্থানীয় 'ইচ্ছা' গুণটিও একদম বেকার হয়ে পড়ে কখন, কোথায় এবং কার কাছে? তিনটি প্রশ্নের একটি ছোট্ট উত্তর হল প্রেমের তথা ইশকের কাছে 'ইচ্ছা' বেকার হয়ে পড়ে। প্রেমের তথা ইশকের আগুন যখন প্রেমিকের তথা আশেকের মনে দাউদাউ করে জ্বলে উঠে, 'ইচ্ছা'র দৃঢ় বাঁধনও তাকে থামিয়ে দিতে পারে না। মৃত্যুর যাতনাও প্রেমের কাছে তুচ্ছ। আইন-কানুন, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, ছোট-বড়, রাজা-প্রজা কোন কিছুই প্রেমকে বেঁধে রাখতে পারে না। যেন একটি জ্বলন্ত আগুনের টুকরো। কে এগিয়ে যাবে নীতির আঁচলে প্রেমকে বেঁধে রাখতে? সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একাকার করে দেয় এই প্রেম। তাই তো জেনে-শুনেই সত্যদ্রষ্টা আদম খেয়েছিলেন নিষিদ্ধ গাছের ফল। জেনে-শুনেই আজাজিল ওরফে শয়তান গলায় নিয়েছেন কলঙ্কের মালা।

বিশ্ববিখ্যাত অলীয়ে কামেল হযরত শামসেত্তাব্রীজ এরকম অতি গুপ্ত কথা তাঁর *'দিওয়ানে'* বলে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের বলার অধিকার নেই। সত্য যে উলঙ্গ হয়ে পড়ছে, আবরণী আর যে থাকছে না। কামনার মায়াকাননে বাস করে কিছুই জানলাম না, বুঝলাম না। যত শিখি, যত পড়ি, তাতে আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে নিজের অজ্ঞতা। তবে কি নৈরাজ্যের আঁধারে হিংসা, আত্মগরিমা, লোভ আর কামনাই জানলাম? তবে কি আমাদের মত আমিত্বের রশিতে বাঁধা জীবনে এটুকুই জানতে পারি যে, জীবনটা সত্য, মৃত্যুটাও সত্য এবং এর মাঝখানের ছুটোছুটিটা একটা ফাঁকা, বিরাট শূন্য। হিসাব মিলাতে গিয়ে দেখি কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মত অনেক পথ বেয়ে একই স্থানে দাঁড়িয়ে আছি, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম।

রক্তের সম্পর্ক ইসলাম স্বীকার করলেও পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়নি। পূর্ণ স্বীকৃতির স্বাক্ষর পাই প্রেমের সম্পর্কে। রক্তের সম্পর্কে হুজুর পাকের (দঃ) আপন চাচা আবু লাহাব ছিলেন বিরোধীদের মধ্যে একজন জঘন্যতম শত্রু। 'ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হাত দুটো', কোরান পাকের এই ঘোষণা রক্তের সম্পর্ককে সোজাসুজি বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে। অন্যান্য চাচাদের মধ্যে আবু জাহেলের বিরোধিতা এত প্রকট ছিল যে, সাধুর বিপরীত শব্দ শয়তানের মত তার ভূমিকা ইসলামের বিরুদ্ধে ছিল। জীবনভর ইসলামের বিরোধিতাই ছিল হুজুর পাকের (দঃ) চাচা আবু জাহেলের নৈতিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

শ্রদ্ধেয় শিয়া সম্প্রদায়ের ভাইদের অনেকেই আমার কথায় একমত নাও হতে পারেন। কারণ, তাঁদের অনেকেই বলে থাকেন যে, 'আবু সুফিয়ানের হাত দুটো ধ্বংস হোক'-কে আবু লাহাবের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রদ্ধেয় শিয়া ভাইয়েরা, আপনারা একটু তলিয়ে দেখুন তো, হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) কি হুজুর পাকের (দঃ) বংশেরই একজন কিনা? অবশ্য অপ্রিয় হলেও মানতে হচ্ছে যে, এই হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) জীবনভর হুজুর পাকের (দঃ) বিরুদ্ধে জঘন্য শত্রুতা করে গেছেন এবং অবশেষে অনেকটা বাধ্য হয়েই শেষ কাতারের হালকা ঈমানওয়ালা মুসলমান রূপে পরিচিত হয়েছেন। আপনারা মওলা আলীকে বড় করতে গিয়ে অনেক গণ্যমান্য সাহাবাদের ওপর জঘন্য অপবাদ ছড়াতেও লজ্জাবোধ করেননি। হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এবং হযরত ওসমান (রাঃ)-কে এত নীচে নামিয়ে কি যে আদিম তৃপ্তি পান তা আপনারাই ভাল করে বুঝেন। অথচ এই তিন মহান সাহাবারাও কয়েক পুরুষ আগে একই বংশের তথা নবীবংশের এবং দু'জন হুজুর পাকের (দঃ) আপন শ্বশুর এবং একজন আপন জামাতা। এরই নাম বোধহয় ঘাড় মোচড়ামি। 'শিবাজী তাজমহল বানিয়েছে' এরকম উদ্ভট আবিষ্কার আপনাদের মগজের মধ্যেই পাওয়া যায়। মা'র চেয়ে মাসির দরদের বহর প্রকাশ করতে গিয়ে মূল শিক্ষাকে হারিয়ে তথা নিজেকে চেনার শিক্ষাকে বাদ দিয়ে বগল বাজিয়ে কুৎসিত আনন্দ পেতে পারেন, কিন্তু এতে সত্য-সুন্দর রূপের মাঝে অবগাহন করা যায় না।

ইসলামের একটি মাত্র শিক্ষা হল, *'মান্ আরাফা নাফসাহু ফাকাদ্ আরাফা রাব্বাহু'* তথা যে তার নিজেকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রতিপালককে তথা আল্লাহকে চিনতে পেরেছে। অনেক প্রকার ঔষধের যেমন একটি মাত্র উদ্দেশ্য থাকে এবং সে উদ্দেশ্য হল ইহারা আকারে, প্রকারে এবং গুণের দিক দিয়ে অমিল থাকলেও সবাই রোগ মুক্তির জন্য তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয় কোন প্রকার শিক্ষা ইসলাম দেয়নি। যাহা আছে বলে মনে হয়, ইহা আসলে 'নিজেকে চেনার' মূল শিক্ষাকে অনুধাবন ও গ্রহণ করার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে। কে অনেক ছোট এবং কে অনেক বড় এবং পবিত্র, সাহাবাদের চরিত্রের কুৎসা গাইবার শিক্ষা দেওয়া হয়নি। কারণ উহাতে নফসরূপ পাগলা ঘোড়া মাতালের মত লাফাইতে পারে এবং একটি মজবুত দলকে বিভিন্ন গোত্রে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে এবং একে অন্যের উপর ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ির মারহাবা পেতে পারেন, কিন্তু একমাত্র শিক্ষাকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে উজবুকের মত দেখেও না দেখার ভান করতে পারেন। তাই খাজা বাবাকে একবার শ্রদ্ধেয় শিয়া ভাইয়েরা এজিদ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে বলাতে খাজা বাবা বলেছিলেন যে, তিনি ইমাম হোসেনের মধ্যে এমনভাবে ডুবে আছেন যে এজিদ সম্বন্ধে চিন্তা করার সময়ই পাননি। যদিও আমরা দলমত নির্বিশেষে এজিদকে একটি নরপশু বলতেও ঘৃণা বোধ করি। ঝগড়া কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্যে সত্য নেই।

আসল সত্য হল সাধনার দ্বারা নিজেকে চেনা, যাহা আল্লাহর অলীরা গ্রহণ করেছেন। একজনকে বড় করেই বা আমার কি লাভ আর একজনকে ছোট করেই বা আমার কি ক্ষতি। অবশ্য ঐতিহাসিকভাবে যে বা যারা ধিক্কৃত তথা আদ্ ও সামুদ জাতির মত, তাদের বিষয় স্বতন্ত্র। এই নোংরামি ও ইতরামির মধ্যে যারা ডুবে থাকে থাকুক, কিন্তু যখন ইহাই রক্তাক্ত খুনাখুনির রূপে জাহির হয় তখনই এদের শিক্ষা দেবার কি পরিণাম হতে পারে তাহা মর্মে মর্মে বুঝা যায়। এদের এই প্রকার শিক্ষারূপ পর্বত যখন ইঁদুর প্রসব করে তখন জনতা মুখে রুমাল চেপে হি হি করে হাসতে থাকে। জনতা একে অপরকে বলতে থাকে, এদের বাদ্যযন্ত্রে কি সুর বাজে আর এরা কি গান গায়? এদের সুর থাকে একদিকে, গান থাকে অন্যদিকে। হায়রে আমার শ্রদ্ধেয় শিয়া ভাইয়েরা, বকাবাজি করা আর

'হাম সব কুছ জানতা হায়, বাকি সব বিয়াকুব' এবং আমাদের দেওয়া কোরানের ব্যাখ্যাই একমাত্র ব্যাখ্যা তা শিবাজীর তাজমহল বানানোর মত উদ্ভট শোনালেও কিছু যায় আসে না, আর হাদীস সংগ্রহকারীদেরকে বিশেষ করে ইমাম বুখারী ও ইমাম মোসলেমকে তো দালাল, মিথ্যুক ইত্যাদি বলে আগেই মন্তব্য করে ফেলেছেন, যদিও আপনারা প্রয়োজনে মাঝে মাঝে এদের দোহাই দিতে বাধ্য হন। আপনাদের জেল্লা-মারা বাক্কা কথাবার্তায় কত সহজ-সরল-প্রাণ মুসলমান যে ঈমান হারিয়ে ফেলবে তা কি বুঝতে পারেন না?

আপনারা প্রথমে হাত দিয়ে পাহাড় ঠেলতে শুরু করে দেন, যখন পাহাড় নড়ছে না তখন পাছা দিয়ে ঠেলা শুরু করে দেন। কি বিচিত্র রং-এ রঙ্গীলা আপনারা। হাদীস তো সব বাদই দিয়ে ফেলেছেন, এখন রইলো একমাত্র সম্বল কোরান। সেই একমাত্র সম্বল কোরানকেও মাঝে মাঝে বেয়াদব বলে যে চড়-থাপড় মেরে বসেন তা আপনাদের লেখা পড়লেই বুঝা যায়। আপনাদের চেয়ে এক ডিগ্রী গলা উঁচু করে লেখেন যারা তারা হলেন 'গোলাবী শিয়া'। এই গোলাবী শিয়াদের বিকৃত মস্তিষ্কের ফসলে এত দুর্গন্ধ যে নাকই রাখা যায় না। এরা আবার কোরানের ভেতর অনেক মানুষের কথা ঢুকে গেছে বলে মন্তব্য করেন। যে মন্তব্য কোরানের ঘোরতর শত্রুও করতে পারেনি। কারণ, হুজুর পাকের (দঃ) সময়ই ত্রিশ হাজার কোরানে হাফেজ জীবিত ছিলেন। খেজুর পাতা, চামড়া অথবা শিলালিপি নষ্ট করা যায় কিন্তু বুকের ভিতর যাহা মুখস্থ করে রাখা হয়েছে তাহা কেমন করে নষ্ট করা যায় ইহা এই গোলাবী শিয়ারাই ভাল করে জানেন। কবি রবি ঠাকুরের একটি কবিতা বাল্যকাল হতে মুখস্থ আছে। সেই কবিতাটিতে যদি এতটুকু বিকৃত করে লিখা হয় উহা কি আমার চোখে ধরা পড়বে না? যেমন 'আমার বড় নদী চলে হু হু করে বৈশাখ মাসে তার সাঁতার জল থাকে।' এই কবিতার লাইনে কোথায় কতটুকু ভুল হয়েছে উহা হুবহু বলে দিতে পারবো। কারণ, ইহা আমার মুখস্থ আছে। সুতরাং যদি কোরানের কোথাও কোন বিকৃতি ঘটতো তবে সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশ হাজার হাফেজ সাহাবার চোখে ধরা পড়তো। ধরে নিলাম, দুই চারজন হাফেজ সাহাবা নীরব রইলেন, কিন্তু ত্রিশ হাজার হাফেজের পক্ষে নীরবতা পালন করা অসম্ভব। এটা বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরার মত শোনায়।

শ্রদ্ধেয় শিয়া ভাইয়েরা, বুকে হাত রেখে বলুন তো, ভিন্ন মত ও পথের অনুসারীদের কয়জনকে মুসলমান বানাতে পেরেছেন? গজনীর সুলতান মাহমুদ পাক-ভারতে মুসলমান বানাতে আসেননি অথবা আপনাদের মত বিদ্বান পণ্ডিতগণও মাশাল্লাহ মুসলমান বানাতে পারেননি। সমগ্র পাক-ভারতে যাঁরা মুসলমান বানিয়েছেন তাঁদের আমাদের মত অন্ধ পণ্ডিতের বিদ্যার কচকচানি ছিল না। আমাদের মত বিদ্যার সাগরদের দিয়ে কাগজের পৃষ্ঠায় লিখিত কোরানের লিখিত ব্যাখ্যায় পাক-ভারতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। এরকম তফসীর আমাদের মত গাধার পিঠেই বোঝা হয়ে রইলো। অন্য কোন দল ও মতের ব্যক্তিদের ঝাঁকেঝাঁকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করাতে পারিনি এবং মাশাল্লাহ কোনদিন যে পারবো না তা আমাদের উভয় পা দুটো দেখলেই বুঝা যায় যে, আমাদের ওজনে জয়পাল সাধুর মত বটগাছ নড়বে কিনা। দশহাজার মণ ওজনের পাথরটি তারাগড় পাহাড়ের উপর হতে আমাদের ওপর গড়িয়ে দেওয়া হলে আমরা আমাদের মোটা মোটা এলমের বই দিয়ে রুখে ফেলবো! যেমন চড়ুই পাখির পা দুটো দেখলে বুঝা যায় যে ইহার বিশাল (?) পায়ের ভারে বটগাছ নড়বে কি না। তবে বটগাছ নড়ছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। কিন্তু কাহাকেও বিশ্বাস করানো যায় কিনা উহা আমরা সকলেই বুঝতে পারি। লিখিত বই-পুস্তক দিয়ে ধর্মপ্রচার হয় কিন্তু ধর্ম গ্রহণ করানো যায় না। তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়াজ। ইচ্ছা করলে তিনিও আরবী ভাষায় কোরান পাকের তফসীর করে যেতে পারতেন। কিন্তু উহার মূল্য কতটুকু হবে ভেবেই তা করেননি।

তিনি নূরী কোরানকে, যে কোরান কাগজ অথবা শিলালিপিতে কলম অথবা হাতুড়-বাটালে লিখা হয় সেই কোরান নয়, যে কোরান পবিত্র না হয়ে পাঠ করা তো দূরের কথা স্পর্শই করা যায় না *(লা ইয়া মাস্‌সাহু ইললাল্‌ মুতাহ্‌হারুন)* সেই নূরী কোরানকে নিজের জীবনের ওপর তফসীর করেছেন। যে নূরী কোরান সাত হরফের দ্বন্দ্বের মধ্যে নেই এবং সেই তফসীরের ফলে সারা পাক-ভারতে যে মুসলমানদের অস্তিত্ব অনুভব করি তার অধিকাংশই তাঁর নেয়ামতের দান। মুখের কথায় ‘শয়তান হতে আশ্রয় চাই’-এর যেমন কোন মূল্য নেই তেমনি কাগজে লিখিত কোরান তফসিরের দ্বারা মানুষকে অনেক বিষয়ে অবগত করানো যায়, কিন্তু দীক্ষিত করা যায় না। যদি দীক্ষিতই করা যেত তবে দুনিয়াতে অনেক হিয়া বড় বড় তফসীর অনেক করা হয়েছে, কিন্তু খাজা বাবার লিখিত কয়টি চিঠি ও কবিতা ছাড়া আর কিছুই নেই। তেমনি বাংলাদেশের মধ্যেও মুসলমান করে গেছেন বাবা শাহজালাল এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দ। কোন রাজা জমিদার এবং আমাদের মত বাক্যবাগীস আরবী জানা শিয়া ও সুন্নী পণ্ডিতরা মুসলমান করে যাননি। আমরা উভয়েই আমাদের লিখিত চিন্তাধারা দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ফেরকার ভেদাভেদ বানাতে ওস্তাদ। আমরা উভয়েই আমাদের এমন সব আজব বেমিল এবং অসংযত কথা ও লিখনি দ্বারা মুসলমানদের সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়ে মারহাবা কুড়িয়েছি। আমাদের লিখনির ফসল জগাখিচুড়ি আর সেই খিচুড়ি পরিবেশন করে কত প্রকার রোগের যে জন্ম দিয়ে ফেলেছি তার হিসাব দিলে, আমাদের উভয়ের ছেঁড়া জুতার সুন্দর মালা পাবার পুরস্কার ঘোষণা করবেন। নানা মুনির নানা মতের মত আমাদের চিল্লাচিল্লিতে মুসলমানের কত বড় ক্ষতি হয়েছে তা অন্য দল ও মতের দ্বারা এর শতাংশের একাংশও হযনি। আমরা উভয়ে নিজেদের কুঠার নিজেদের পায়ে মারার বিদ্যা শিখেছি কিন্তু ইলমে মারেফতের ধারে কাছেও যাইনি। কারণ উহাকে যে আগেই ফতোয়া মেরে দিয়েছি। আমরা এক ইসলামকে তেহাত্তরটি ইসলামে পরিণত করেছি। ইহা কি কম কথা? ইহা কি আমাদের বিদ্যা হাসেল করার কম সুন্দর নমুনা? অথচ যে সকল অলী-দরবেশ, পীর-ফকিরেরা মুসলমান বানিয়ে গেলেন, তারা বলে আমাদের দৃষ্টিতে কোরানই ভাল করে বুঝতে পারেননি। একেই বোধহয় বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে বলে মনে হয়। জাহেরী ইলম দিয়ে ইসলামের তাবলিগ হয় না। বাতুনি ইলম অর্জন করতে পারলেই হয় ইসলামের তাবলিগ। জাহেরী ইলম দিয়ে মুসলমান মুসলমানকে তাবলিগ করতে পারেন, কিন্তু একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন মতের অনুসারীদেরকে ইসলাম গ্রহণ করানো যায় না।

হযরত মুজাদ্দেদ আল ফেসানী তাঁর মকতুবাতে লিখেছেন যে, মওলা আলী বলেছেন, যারা তাঁকে হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমরের ওপর প্রাধান্য দেয় তারা মিথ্যুক এবং স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে বাস করে।

আমি ভাল করেই জানি, আপনারা এই কথা মোটেই বিশ্বাস করবেন না। মনে করুন, ধরে নিলাম ইহা মওলা আলী বলেননি, কিন্তু মুজাদ্দেদে আল ফেসানী তো বলেছেন। তাঁর মত বিশ্বখ্যাত অলীর নাম আপনাদের জানারই কথা। কিন্তু আপনারা সঙ্গে সঙ্গে তাকে অলী বলা তো দূরের কথা আপনাদের আদিম চরিত্রের রূপটাই জাহির করে ফেলবেন। কিন্তু আপনারা তো জানেন না যে, বেলায়েতের সামনে নবুয়ত একটি বিন্দু এবং আংটি বিশেষ। হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত খিজির (আঃ)-এর ঘটনাগুলোর উপরই মুসা (আঃ) নবী প্রাথমিক শর্ত ধৈর্যই ধারণ করতে পারলেন না।

বেলায়েতের প্রাণকেন্দ্র হুজুর পাক (দঃ)-কে প্রথমেই কিন্তু রসুল বলা হয়নি। প্রথমে বলা হয়েছে ‘আবদুহু’ তথা আল্লাহর দাস এবং ইহাই বেলায়েত এবং পরে বলা হয়েছে ‘রসুলুহু’ তথা আল্লাহর রসুল। আমি জানি, হাজারোবার যদি বুঝাতে চেষ্টা করি, তাতে কোন ফল হবে না। কারণ, যারা সব

কিছু বুঝে গেছেন, তাদেরকে আর নতুন করে বুঝানো যায় না এবং 'শিবাজী তাজমহল বানিয়েছে' যাদের নব আবিষ্কারের সাইনবোর্ড কাঁধে মরা কুকুরের মত ঝুলছে, তাদেরকে বলার মত কিছুই থাকতে পারে না।

আরব দেশ হতে বহু দূরে আফ্রিকার কালো আদমী নিগ্রো বলে যারা আমাদের কাছে সুপরিচিত সেই কাফরী হযরত বেলাল (রাঃ) চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত হয়েও হুজুর পাকের (দঃ) প্রেমের সম্পর্ককে অস্বীকার করলেন না বরং জীবনের বিনিময়েও প্রেমের সম্পর্ক যে সবচাইতে বড় সম্পর্ক, সেই আদর্শ আমাদের কাছে তুলে ধরলেন। আপন ঘরের সন্তানেরা করে বিরোধিতা আর যাদের সঙ্গে রক্তের কোন সম্পর্ক নেই, যাদের সঙ্গে পরিচয় কিছুদিনের তারা কি করে প্রেমের সম্পর্কের কাছে জীবন বিলিয়ে দিতে পারে তারই এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে ভরপুর।

আপন ঘরের সন্তান হয় কাফের। শুধু কি কাফের? হেন অকর্ম নেই যা তাদের দ্বারা করা হয়নি। অথচ দূরের সন্তানরা হয় প্রেমিক। যুদ্ধের ময়দানে নিজের রক্ত-মাংসের বুকটাকে ঢাল বানিয়ে তীরের আঘাতে ঝাঁঝরা করে নিশ্চিত মৃত্যুকে করেছে আলিঙ্গন, তবু হুজুর পাকের (দঃ) পবিত্র দেহ মোবারকে একটি আঘাত যাতে না লাগে তার জন্য চলেছে প্রাণপণ চেষ্টা। ওহোদের যুদ্ধের কোন একটি বিশেষ পরিবেশে পর পর কয়জন রসুল-প্রেমিক জেনে শুনে আপন বুকটাকে বানিয়েছে তীরের আঘাত খাওয়া ঢাল, যার পরিণাম অবধারিত মৃত্যু। প্রেমের সামনে মৃত্যু কত তুচ্ছ কত নগণ্য বলে বিবেচিত হতে পারে, তারই অবাক করা নমুনা রয়ে গেল স্মৃতির ইতিহাসে। ইসলামে প্রেমের সম্পর্ককেই হুজুর পাকের (দঃ) উত্তরাধিকার তথা নিজ বংশের বলে ঘোষণা করেছেন। এই সম্পর্কের বাঁধন ঘর-বাহির, সীমার নৈকট্য এবং দূরত্বের দ্বারা হয় না। কারণ প্রেমের কোন বাঁধাধরা আইন নেই। আইনের অভ্যন্তরে প্রেম থাকলে হুজুর পাকের (দঃ) বংশের ভেতর জঘন্য কাফের হতে পারে না। নবীর পুত্র, নবীর স্ত্রী তাহলে কাফের হতে পারে না, আর মূর্তি পুজারক আজরের পুত্র হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কখনো নবী হতে পারে না, হযরত নুহ্ (আঃ)-এর পুত্র কেনান কখনো কাফের হতে পারে না এবং হযরত লুত (আঃ)-এর স্ত্রীও কখনো কাফের হতে পারে না।

ধর্মের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা

যত কথাই বলা হোক না কেন, যত ভাষার লালিত্যে আর ছন্দের কণ্ঠকুনিকায় বহুরূপী সুর বিধুত হোক না কেন, যত কল্পনার আবেশের আবির ছড়ানো হোক না কেন, যত কান্না-মিশ্রিত আবেগ আর যন্ত্রণার মূঢ় অনুভুতি জড়িয়ে রাখা হোক না কেন, প্রেমের আসল আদি রূপটা মনে হয় উলঙ্গ হয়ে কোনদিনও ধরা দিতে চায় না। বিচিত্র রহস্যের অবগুণ্ঠনে ঢেকে থাকা প্রেমের রূপটি ধরা দিচ্ছে বলে মনে হয়, কিন্তু সবটুকু যেন ধরা গেল না। তৃপ্তি পাওয়ার ভেতরও লুকিয়ে আছে অদৃশ্য অতৃপ্তি, একটা বোবা নেশার অতৃপ্ত পিপাসা। এই পিপাসার ভাষা নেই, কথা নেই, নেই কোন শব্দ। অনুভূতির মাঝেও যেন হারিয়ে যায়। কত গহীনে, কত গভীরে যে প্রেমের অস্তিত্ব, ধরাটাই ভয়ঙ্কর কষ্টকর। এই গভীরতা মাপতে যেয়ে মানুষ তার আপন সত্তাকে পর্যন্ত অবহেলা করতে শেখে, অবহেলার চরমতম

রূপটি অনেক সময় নিজেকে তিলে তিলে বলি দিতে দিতে পেতে চায়। তখন পায় কিনা জানি না। শুধু জানার মাঝে এতটুকুই জানতে পারলাম– জানতে পারলাম অতি প্রাচীন অতি পুরাতন একটি একঘেঁয়ে নিঝুম নিশির থেমে থেমে চাপা কান্নার সুর– পৃথিবীতে এলাম, পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলাম, এটাই বোধহয় সত্য, এটাই বোধহয় আঁধার আকাশে তারার আলোর মত সত্য, যেন পয়সার এপিঠ আর ওপিঠ। এই দুইয়ের মাঝখানে পথের পুলটা যার দৈর্ঘ্য অনেক বড়, অনেক ঝামেলায় ভরা। অভিজ্ঞতার সুশ্রী ও বিশ্রী, রূপ আর অরূপের খেলাটাই চলে জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে। এই মাঝখানের যে বিচিত্র পথটা এর দাম কত? তুমি কি জান? মনে হয় এর দাম খুব বড় একটা শূন্য অথবা খুব বড় একটা দীর্ঘশ্বাস।

ইসলাম কি অপূর্বরূপে তার দর্শন প্রকাশ করেছে! আকাশ আর মাটিতে যা কিছু আছে সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে। আকাশ আর মাটি বলতে সমস্ত সৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। তাই বলতে হয়, সমস্ত সৃষ্টি জগতই ইসলামকে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছে একমাত্র ধর্মরূপে। এই কথার উপর যাতে কোনপ্রকার হেঁয়ালী না থাকে এবং না থাকে কোনপ্রকার সন্দেহের অবকাশ, তাই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হল, ***'ওয়ালাহু আস্লামা মান্ ফিস সামাওয়াতে অল্ আরদ্'*** অর্থাৎ 'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে।' তাই সমগ্র সৃষ্টি জগত স্রষ্টার গুণগান গাইছে তথা তসবি পাঠ করছে তথা ইবাদত করছে তথা আত্মসমর্পণ করছে। সেহেতু সমগ্র সৃষ্টি জগত আত্মসমর্পণ করছে তথা ইসলাম গ্রহণ করেছে সেই হেতু সবাই মুসলমান। অন্যস্থানে ইসলাম ঘোষণা করছে ***'ইউসাববেহু লিল্লাহে মা ফিস্ সামাওয়াতে অমা ফিল্ আরদ্'*** অর্থাৎ সমস্ত আকাশ এবং জমিনের যা কিছু আছে সবাই তসবি পাঠ করছে তথা গুণগান করছে'।

তবে কি মানুষ এবং জ্বিন জাতিও সৃষ্টি জগতের ভেতরে? না বাহিরের? মানুষ এবং জ্বিন জাতিও প্রথমে সৃষ্টি জগতের ভেতরেই থাকে তথা প্রথমে ইসলাম ধর্মকেই গ্রহণ করে, কিন্তু যৌবনের প্রান্তে যখন এসে দাঁড়ায় তখন আমিত্ব নামক ষড়রিপু হতে আগত ছায়া তাকে ইসলাম হতে মনের অজান্তে দূরে সরিয়ে ফেলে। তাই মানুষ শিশুরূপে যখন একটি বিশেষ পর্যায়ে থাকে তখন সে মুসলমান। সেই শিশু যে কোন মত ও পথের অনুসারীর ঘরেই জন্ম নিক না কেন। কিন্তু যখন ভাল-মন্দ বুঝবার পূর্ণ বুদ্ধি অর্জনের সময়-সীমার মধ্যে এসে পড়ে শিশুটি, তখন তার মধ্যে হতে ইসলামও ধীরে ধীরে দূরে সরে পড়তে থাকে এবং একসময় সেই শিশুটি সম্পূর্ণরূপে ইসলাম হতে দূরে সরে পড়ে। এক কথায় আমিত্বের উদয় ইসলামের অস্ত। কারণ আত্মসমর্পণকে কিছুতেই মেনে নিতে চায় না আমিত্ব। আমিত্ব সইতে পারে না আত্মসমর্পণ। তাই বিদ্রোহ ঘোষণা করে এই আমিত্ব। দুরন্ত বাঁধনহারা ষাঁড়ের মত চেঁচাতে থাকে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাষার ভেল্কীবাজি আর কথার গোলক ধাঁধা দিয়ে। এই বিদ্রোহের দেয়ালটাই অন্ধকার। স্রষ্টার নিকট এগিয়ে আসার পরদাই এই বিদ্রোহ। যার পরিণাম শাস্তি। এ শাস্তি অনুভূতির বিবেকও সহজে ধরতে পারে না। তাই ইসলাম ঘোষণা করছে, ***'অমা খালাক্তুল্ জ্বিননা ওয়াল ইন্সা ইল্লা লিয়াবুদুনি'*** অর্থাৎ 'মানুষ এবং জ্বিনকে আমার এবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।' যেহেতু ইবাদত না করার ক্ষমতা তথা সাময়িক ইচ্ছাশক্তি দান করা হয়েছে কেবলমাত্র দুটো প্রাণীকেই এবং সেই প্রাণী দুটো হল মানব এবং জ্বিন, সেহেতু উভয়কে মনে করিয়ে দেওয়া হল এই বলে যে, তাদের ভুলে গেলে চলবে না, কারণ ইবাদত করার জন্যই তাদেরকে তৈরি করা হয়েছে। সৃষ্টি জগতের মধ্যে এই কথা আর কাউকে বলা হয়নি (অবশ্য আমার জানামতে) যেহেতু কোন সৃষ্টিকেই সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয়নি, সেহেতু এরকম আদেশ উপদেশ অপরকে দেবার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

তাই দ্বীন হল মাত্র দুই প্রকার। একটি আল্লাহর দ্বীন আর অপরটি হল মানুষের দ্বীন। আল্লাহর দ্বীন এক, অখণ্ড এবং অনন্ত, কিন্তু মানুষের দ্বীন বহু, বিচিত্র এবং ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহর দ্বীনের বদল হয় না তথা পরিবর্তন নেই, কিন্তু মানুষের দ্বীনের প্রতিদিন বদল হচ্ছে তথা পরিবর্তন হয়ে চলেছে। তাই মানুষের দ্বীনকেই বলা হয় দুনিয়া এবং এই দুনিয়াতে বাস করাকেই বলে আমিত্ব নিয়ে বাস করা। এই দুনিয়া মানুষের মনের ভেতরের একটি নিজস্ব বানানো অবস্থা যা জীবিত অবস্থায় ফেলে দিতে না পারলে মৃত্যু নামক ঘটনা দিয়ে ফেলে দিতে একদিন বাধ্য করবে।

মৃত্যু-ঘটনা আবার দুই প্রকার। একটি জীবিত অবস্থায় ঘটে, অপরটি দেহবিনাশের দ্বারা ঘটে। জীবিত অবস্থার মৃত্যু-ঘটনা ঘটাতে পারলেই আর মৃত্যু নেই এবং ইহাকেই আমিত্বের মৃত্যু বলা হয় এবং এই মৃত্যুতে যে জীবন দান করা হয় সেই জীবনের আর মৃত্যু নেই, তথা অনন্ত জীবনের অধিকার লাভ করা, তথা আল্লাহর অখণ্ড দ্বীনের রাজ্যে প্রবেশ লাভ করা। মানুষের মনের ভেতরে আপন খেয়াল-খুশি মত বানানো অবস্থাকেই ইসলাম দুনিয়াতে বাস করা বুঝিয়েছে এবং এই প্রকার দুনিয়া বলতে পৃথিবীকে বুঝায়নি। আমরা অনেকেই দুনিয়া বলতে চট করে পৃথিবীকে বুঝে ফেলি। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় দুনিয়া এবং পৃথিবী বলতে দুইটি সম্পূর্ণ আলাদা দর্শন বুঝায়। তাই ইসলাম ঘোষণা করছে, ***'আত্ তালেবু দুনিয়া মর্‌দুদ'*** অর্থাৎ 'যে দুনিয়া খুঁজে বেড়ায় সে শয়তান।' দুনিয়ার বিরুদ্ধে (পৃথিবীর বিরুদ্ধে নয়) কয়েক ডজন কোরান পাকের আয়াত এবং কয়েক শত হুজুর পাকের (দঃ) বাণী তথা হাদীস আছে। আমরা দুনিয়া এবং পৃথিবী বলতে এক বুঝে নিয়ে এমন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে বসি যে নিজের আত্মবিরোধী কথার প্যাঁচে নিজেই আটকা পড়ে যাই এবং তখনই আবোল-তাবোল বকা-বাজি এবং গোঁজামিলের পাহাড় বানিয়ে বসি। অবশ্য ইহা আমাদের উপলব্ধির অভাবেই তৈরি হয়।

সেজদার প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা

কোরান পাক বলেছে, ***'অয়া নাজ্‌মু ওয়াশ শাজারু ইয়াস্‌জুদান'*** অর্থাৎ '(আকাশের) তারাগুলো এবং গাছগুলো সেজ্‌দা করছে'। তাহলে সেজদার অর্থ কি? সেজদা বলতে কি বুঝায়? আমরা যাকে সেজদা বলে জানি তথা প্রচলিত কথায় যাকে সেজদা বলে সবাই মেনে নেই উহাই কি সেজদা? সেজদার অর্থ হল আত্মসমর্পণ। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়া। আপন সত্তাকে পরম সত্তার কাছে নির্বাণ করা তথা বিলীন করে দেওয়া। আপন ইচ্ছায় তথা নিজের স্বাধীনতায় না চলাকেই সেজদা বলে। আকাশের তারা এবং জমিনের গাছপালা আল্লাহর অনন্ত বিধানে তথা আইনের মধ্যে সম্পূর্ণ দাসত্ব করছে। ইহাদের আপন ইচ্ছামত, নিজের খেয়াল-খুশিমত চলাফেরার অধিকার নেই। আপন খেয়াল-খুশিমত না চলার অধিকার ইহাদের মত সমস্ত ফেরেস্তা জাতিকেও দেওয়া হয়নি। এই অধিকার না থাকাটাই সেজদা তথা আত্মসমর্পণ। সুতরাং সমগ্র সৃষ্টিজগত অনন্ত বিধানে তথা আইনের আওতায় আবদ্ধ। এই মহাবিধান তথা মহা আইন ভঙ্গ করা তথা অমান্য করে চলার অধিকার নেই এবং অধিকার দেওয়াও হয়নি। যেহেতু সমস্ত সৃষ্টিজগতের নেই কোন নিজস্ব স্বাধীনতা, সেহেতু এরা সবাই সেজদায় আছে তথা আত্মসমর্পণ করেছে। সেজদার অর্থ আমরা প্রচলিত নিয়মে মাথা নত

করাকে বুঝি, কিন্তু মাথা নত করাকে কোথাও সেজদা বলা হয়নি। 'শয়তানের ধোঁকাবাজি হতে সাহায্য চাই', হাজার বার মুখে পড়লেও শয়তানের ধোঁকাবাজি হতে যেমন রেহাই পাওয়া যায় না, ঠিক সেরকম হাজার বার মাথা এবং কপাল জমিনে রেখেও যে সেজদা আমাদের মাঝে প্রচলিত আছে সেই সেজদায় প্রকৃত তথা আসল তথা ইসলামে বর্ণিত সেজদা হয় না। কেবল জমিনে মাথা ঠোকাই সার যেমন শয়তান হতে আশ্রয় চাইছি বলার মত। মুখে শয়তানের শয়তানি হতে আশ্রয় চাওয়ার মূল্য যেমন শূন্য, তেমনি মাথা এবং কপাল জমিনে রেখে লৌকিক সেজদা তথা আনুষ্ঠানিক সেজদার মূল্যও তেমনি শূন্য।

মাথা নত করাটাই যদি সেজদা বলে ধরে নেই তবে গাছপালা কেমন করে মাথা নত করে সেজদা করে? চাঁদ, সুরুজ আর তারা কেমন করে করবে সেজদা? অথচ এরা সবাই আল্লাহকে সেজদা করছে বলে ইসলাম স্পষ্ট ঘোষণা করছে। তবে এটা সত্যি যে, আসল সেজদাকে ধর্মবিধানের প্রয়োগপদ্ধতিতে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য আনুষ্ঠানিক সেজদার প্রচলন করা হয়েছে এবং লৌকিক সেজদার প্রয়োজন আছে। যাতে মানুষ তার সত্তাকে সম্পূর্ণ আল্লাহর কাছে বিলীন করে দিতে পারে তারই প্রাথমিক শিক্ষা দেবার কৌশলী সেজদা হল মাথা নত করা। কারণ মাথা ঠিকই নত করে দিলাম লৌকিক সেজদার মত, অথচ মনটি সেখান হতে দূরে সরিয়ে রাখলাম, তাতে কি সেজদা হবে? তাই মনটাই সেজদার মুখ্য অংশ, মাথাটা নত করা সেজদার গৌণ অংশ। তাই আচার যখন তার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে, কেবলমাত্র মাথা নত করলে উহার অর্থ এবং মূল্য কতটুকু থাকে তা আপনারাই বিচার করে দেখেন।

আদমের আনুগত্য গ্রহণ করতে তথা সেজদা দিতে আল্লাহ পাক ইবলিসকে বলেছিলেন। ইবলিস অপূর্ব যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, আদমের আনুগত্য গ্রহণ করা তথা আদমকে সেজদা করা অন্যায় এবং শেরেক তথা আল্লাহর অংশ স্বীকার করারই নামান্তর। যেহেতু আল্লাহর অংশ স্বীকার করাই শেরেক এবং ইহা জঘন্য পাপ সেহেতু আদমকে সেজদা করা অন্যায় এবং স্পষ্ট শেরেক। যেহেতু আদমকে সেজদা করা শেরেক সেহেতু ইবলিস জেনে-শুনে এই হুকুম তথা আদেশ পালন করতে পারে না। যেহেতু আদমকে সেজদা করার হুকুম যদিও আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া হয়েছে এবং যেহেতু সেজদা করার হুকুম একটি অন্যায় (?) হুকুম সেহেতু ইবলিস এরকম অন্যায় (?) হুকুম পালন করতে প্রস্তুত নহে। যেহেতু আল্লাহ পাক আগেই ঘোষণা করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া সেজদা করা সরাসরি শেরেক, সেহেতু পূর্বঘোষণা অনুযায়ী আদমকে সেজদা করা আল্লাহ কর্তৃক পূর্বঘোষণাকে সরাসরি অমান্য করা হয় এবং সেহেতু ইবলিস আদমের আনুগত্য গ্রহণ করতে পারে না। যেহেতু ইবলিস তার নিজস্ব ধারণা ও নিজস্ব দর্শনের মাপকাঠিতে বিচার করে দেখলো এবং যেহেতু আল্লাহ পাককে একটি বারের জন্যও এই প্রশ্নটি করতে ভুলে গিয়েছিল যে, আয় আল্লাহপাক, আমার মত ইবাদত-বন্দেগী কয়জন করেছে এবং তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি যে, এই মাটির আদমের ভেতর কি কোনকিছু রেখেছ? এবং যেহেতু এই প্রশ্ন যদি ইবলিস করেই ফেলতো তবে অবশ্যই আল্লাহ পাককে বলতে হতো যে, এই আদমের ভেতর আমি স্বয়ং লুকিয়ে আছি এবং তাহলে ইবলিস সেই মুহূর্তেই আদমকে সেজদা দিতো তথা আনুগত্য গ্রহণ করতো।

যেহেতু ইবলিস ফেরেস্তা নন এবং যেহেতু ইবলিস ধূম্রবিহীন অগ্নির সৃষ্টি জ্বিন সেহেতু তার ভেতরে আমিত্ব তথা কর্তৃত্বাভিমান তথা খুদি তথা হাস্তি তথা অহং তথা বিবেক তথা ইগো আছে। যেমন মাটির তৈরি মানুষেরও আছে। কারণ, এই জ্বিন এবং মানুষকেই আমিত্ব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে তথা সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রদান করা হয়েছে। যদি ইবলিস এই আদম-রহস্য আগেই জানতে

পারতো এবং যদি সেজদা দিয়েই ফেলতো তবে কি আদমকে দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হত? এবং আদমের বংশবৃদ্ধির দ্বারা কি আমাদের মত কোটি কোটি মানুষের জন্ম হত? আমরা কি দুনিয়াতে কোনদিন আসতে পারতাম? তবে কি ইবলিসের এই ঘটনার প্রতিক্রিয়াতেই আমাদের আগমন? দুনিয়া কি আমাদের জন্য একপ্রকার সিজজিন তথা কারাগার নয়? দুনিয়া কি আদম সন্তানদের জন্য বিরাট একটি মহাপরীক্ষা নয়? এই মহাপরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তথা ফেল মারলে কি জাহান্নামে যেতে হবে না? তবে এই কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হলাম কার পাপে? ইবলিস না আদম? বেহেস্তে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল তথা রূপক গন্দম আদম আর হাওয়া খেয়েছিলেন বলেই কি তাদের দুনিয়াতে আগমন এবং তাদেরই কি বংশধর এই মানব সন্তানরা নই? এই গন্দম খাবার তথা আল্লাহর হুকুম অমান্য করার দায়িত্বটা কার? আদম না ইবলিসের? ইবলিসের প্ররোচনায় পড়ে এবং হাওয়ার অনুরোধে ভুল করতে পারেন? তবে কি ইহা ইচ্ছাকৃত অথবা গুপ্ত ইলমের আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ? তবে কি ইহা খিজিরের তিনটি কর্মের মত, যা মুসার মত নবীও অনুধাবনই করতে পারেননি?

যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ইহা আদমের সীমালঙ্ঘন এবং যেহেতু কোরান পাকের ভাষায় ইহা আদমের সীমালঙ্ঘন, সেহেতু বেহেস্ত হতে দুনিয়াতে আগমন। এবং যেহেতু এই সীমালঙ্ঘনও একপ্রকার পাপ তথা অন্যায়, কারণ ইহাও আল্লাহর হুকুম অমান্য করা, সেহেতু দুনিয়াতে আগমনের শাস্তিটা আইনতঃ প্রাপ্য। যেহেতু আল্লাহ বলেছেন যে, যার-যার পাপের বোঝা সে-সেই বহন করবে এবং একজনের পাপের বোঝা অন্যের কাঁধে দেওয়া হবে না, অথবা অন্যে বহন করবে না এবং একজনের পুণ্য আর একজনকে দিয়ে দেওয়া হবে না অথবা একজনের পাপ অন্য আর একজনকে দিয়ে তার পুণ্যটা পাপী ব্যক্তিকে দেওয়া হবে না, অর্থাৎ এক কথায় যার-যার পাপ-পুণ্যের হিসাব তাকেই দিতে হবে, অন্যজনকে দিতে হবে না এবং যেহেতু আদম এবং তার স্ত্রী হাওয়া খেয়েছেন নিষিদ্ধ গাছের ফল তথা রূপক ভাষায় গন্দম এবং সেহেতু তাদের উভয়ের হুকুম অমান্য করার পাপটি আমরা তথা মানব সন্তানরা কেন বহন করবো? আমরা তো বেহেস্তে গন্দম খাইনি, তবে আমরা কেন আদম এবং হাওয়ার পাপ বহন করার জন্য এই দুনিয়াতে কঠিন পরীক্ষা দিব? অথবা আমরা কেন এই কঠিন পরীক্ষার রাজ্যে এসে পরীক্ষার মুখোমুখি হব?

আমরা আবার আদম এবং ইবলিসের সেজদা সংক্রান্ত ঘটনার মধ্যে ফিরে যাই। যেহেতু কোরান পাক ঘোষণা করেছে যে, আদমকে সকলেই সেজদা দিলেন একমাত্র ইবলিস ছাড়া, এই 'একমাত্র ইবলিস ছাড়া' কথাটির দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, তার উপরও সেজদা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ইবলিসকে আদেশ প্রদান না করা হলে 'একমাত্র ইবলিস ছাড়া' সবাই সেজদা করলেন কথার কোন মানেই হয় না। শিক্ষক ক্লাসের সবাইকে দাঁড়াতে আদেশ করলেন এবং ইহাতে সবাই দাঁড়ালেন একমাত্র একটি ছাড়া। ইহাতে বুঝা যাচ্ছে যে, যে একমাত্র ছাত্রটি দাঁড়ায়নি তার উপরও দাঁড়াবার আদেশ হয়েছিল এবং যদি দাঁড়াবার আদেশ না হত তবে 'একটি মাত্র ছাত্র ছাড়া' বলার কোন মানেই হয় না। এই বক্তব্যের অবতারণা পুনরায় এজন্যই করতে হল যে, কেউ কেউ মনে করেন যে, ইবলিসকে সেজদা করার হুকুম দেওয়া হয়নি। যার যতটুকু বুঝবার শক্তি, সে ততটুকুই বুঝতে পারে, সুতরাং কোন প্রকার মন্তব্য অশোভনীয়। উপলব্ধির বিভিন্নতা ও দর্শনের বৈচিত্র থাকবেই, সুতরাং কারো উপর কোন প্রকার গালমন্দ করাটাই অশোভনীয়। যেহেতু আল্লাহ বলেন যে, তিনি নিজেই কাল তথা সময় তথা টাইম এবং এই কালকে গালমন্দ করতে বারণ করা হয়েছে, সেহেতু কোন প্রকার অশোভন মন্তব্য করা সমীচীন নয় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে গালমন্দ করার স্থানই নেই। আদম এবং ইবলিসের গুপ্তরহস্য অনুধাবন করতে পারলে গালমন্দ তো দূরের কথা, নীরবতা প্রদর্শন

ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। তাছাড়া একজন মানুষের কাছে যে রূপটি একটি নিরেট সত্য বলে তার নিজস্ব দর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই একই রূপটি অপর আর একটি মানুষের কাছে ডাহা মিথ্যা বলে তার নিজস্ব দর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে। রূপ কিন্তু মূলতঃ একটিই, কিন্তু দর্শন হয়ে পড়লো দুটি এবং সম্পূর্ণ বিপরীত। একটি মানুষের জীবনবোধের কাছে যাহা সত্যরূপে ধরা দেয় তাহাই আবার অন্য একটি মানুষের জীবনবোধের কাছে ডাহা মিথ্যা রূপে ধরা দেয়। এই দৃষ্টির বিভিন্নতার মধ্যে দ্বান্দ্বিক দর্শনের পূর্ণ স্বীকৃতি পাই।

চোখ দুইটি ইহার একান্ত নিজস্ব শক্তির দ্বারা কখনো কিছুই দেখতে পারে না, যে পর্যন্ত না আলোর মিলন হয় এবং সেই আলো সূর্যেরই হোক কিংবা নিশির কোন প্রদীপেরই হোক, দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় সাহায্য তথা অবলম্বন গ্রহণ করতেই হবে। অন্যথায় কোনকিছু চোখে দেখা অসম্ভব।

মানুষ এবং জ্বিন কেবলমাত্র এই দুটি প্রাণীকেই (আমাদের জানামতে কারণ অন্য কোন গ্রহের জীবনের পরিচয় জানা নেই, যদিও কোরান পাক আকাশ সমূহ এবং ভূমি সমূহের সকল জীবের রেজেক-দাতা বলে বেশ কয়েকবার ঘোষণা করেছেন। সেহেতু সেই সমস্ত গ্রহের জীবেরা কি মানুষ ও জ্বিনের মত ব্যক্তিস্বাধীনতা পেয়েছে কিনা, এবং পেয়ে থাকলে তাদের বিধান আছে কিনা এবং বিধান থাকলে উহা কিরূপ বিধান নানারূপ প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়, কিন্তু যেহেতু ইহাদের বিষয়ে আমরা এখন পর্যন্ত কিছুই জানতে পারিনি, সেহেতু আলোচনা অথবা সমালোচনার কোন প্রশ্নই আসে না) সীমিত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এবং স্বাধীনতা পরিত্যাগ করে আল্লাহতে ফানা তথা বিলীন হবার উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। যিনি আপন আমিত্ব ত্যাগ করে আল্লাহতে ফানা তথা বিলীন হয়েছেন সেই সাধারণের মধ্যে অসাধারণ তথা অলী তথা মুর্শেদ তথা বান্দা নেওয়াজ তথা নর নারায়ণের আনুগত্য তথা শিষ্যত্ব গ্রহণের মাধ্যমেই আল্লাহতে ফানা হওয়া যায় একথা প্রত্যেক অলীই একবাক্যে ঘোষণা করেছেন। তাই খাজা গরীব নেওয়াজ তার *'মখতুবাতে খাজা'*-তে বলেছেন যে, যার পীর নেই শয়তানই হল তার পীর। সুতরাং আনুগত্য গ্রহণ করতেই হবে তথা সেজদা দিতেই হবে এবং ইহা রূপক সেজদা তথা মাথা নত করার মত রূপক সেজদা নয়। কারণ, মাথা নত করা কোন সেজদাই নয় এবং যেহেতু আল্লাহর অলীকে আসল সেজদা দিতেই হবে তথা আনুগত্য গ্রহণ করতেই হবে, সেহেতু অলীর মধ্যে ফানা না হয়ে তথা ফানা ফিশ্ শায়েখ না হয়ে ফানা ফিল্লাতে পৌঁছানোর প্রশ্নই আসে না। যার মধ্যে আল্লাহর জাত নূর প্রকাশিত হয় তিনিই আল্লাহর অলী। যেমন আদমের মধ্যে আল্লাহর জাত নূর ছিল বলেই ইবলিসকে সেজদা করার আদেশ হয়েছিল, নতুবা সেজদার আদেশ প্রদানের প্রশ্নই অবান্তর, যাহা ইবলিস বুঝতেই পারেনি। এবং না বুঝার দরুণ লাইন ছেড়ে বে-লাইনের কথাবার্তা বলে ফেললো। ইবলিস বলে ফেললো যে, সে আদম থেকে অনেক উত্তম কারণ আদম ঠনঠনে মাটিতে তৈরি আর সে ধোঁয়া ছাড়া সূক্ষ্ম আগুনের তৈরি এবং এরূপ কথাবার্তা সত্যকে খোঁজার আন্তরিকতার অভাব এবং আত্মঅহঙ্কার প্রকাশের পরিষ্কার প্রমাণ।

আদমের মধ্যে যেহেতু আল্লাহর জাত নূর বর্তমান, সেহেতু আদমকে আল্লাহর আকৃতিতে তৈরি করা হয়েছে। এতকাল শুনে আসছি, আল্লাহর আকার নেই। কিন্তু আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, আদম হল তাঁর আকৃতি তথা সুরাত। যেহেতু আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে আদম তাঁর আকৃতি তথা সুরাত, সেহেতু আল্লাহর বিশেষ ধরণের আকৃতি তথা সুরাত আছে বলে পরোক্ষভাবে ঘোষণাই করে ফেললেন যে, তিনি কেবলই নিরাকার নন তাঁর আকারও আছে তথা সুরাতও আছে এবং সেই আকারই হল আদমের আকার। যেহেতু আদম আল্লাহর আকার বে হুজুর পাক (দঃ) ঘোষণা করেছেন, এবং যেহেতু এই একই ঘোষণা হযরত ঈসা (আঃ)-ও করেছেন, সেহেতু নিরাকার

আল্লাহকে সাকাররূপে দর্শন লাভ হতে পারে, তথা দিদার লাভ করতে পারে, আদমের মধ্যে এবং সেহেতু নিরাকার আল্লাহরই একটি সাকার রূপ হল আদম।

এই আদম-আকৃতি সাধারণ মানুষের আকৃতি নয়। যে পর্যন্ত সাধারণ মানুষ তার ভেতরের বীজরূপী রূহকে পূর্ণ বৃক্ষে পরিণত করতে না পারবে তথা আল্লাহর জাত নূরে নূরময় হতে না পারবে সেই পর্যন্ত তাকে সাধারণ মানুষই বলা হবে এবং যখনই পারবে তখনই এই সাধারণ মানুষকে সাধারণের মধ্য থেকেই অসাধারণ তথা মানুষের মধ্যেই আদম বলা হবে। আদম সাধারণের ভেতরই অসাধারণ। নরের মধ্যেই নারায়ণ, যাকে রবরূপ বলা হয়। আপন রব হতেই বিশ্বরবের পরিচয় মেলে। তাই বলা হয়, রাববুল আলামিন তথা বিশ্বরব। বান্দার মধ্য হতেই তিনি বান্দানেওয়াজ। ওয়াজে ইনসান হতেই তিনি ওয়াজহুল্লাহ তথা আল্লাহর চেহারা। সুতরাং নূরের বিকাশ ধারায় আদম দশের ভেতরে এক নয়, দশের বাহিরে আদম এগারো, তথা সাধারণের ভেতর থেকেও অসাধারণ। যেমন বেলায়েতের মধ্যমণি হুজুর পাক (দঃ) বললেন, 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ।' আমাদের ভেতর থেকেও তিনি আমাদের মত নন, কারণ তাঁর কাছে আল্লাহর অহি নাজেল হত। জৈবিক চাহিদার দিক দিয়ে হয়তো বা ধরে নিলাম আমাদের মতই। তাই জাত নূরে নূরময় আদমকে সেজদা করতেই হবে নতুবা আল্লাহকে পাওয়া অসম্ভব। যদিও আমাদের অবাধ্য এবং ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান কখনোই আদমকে সেজদা করতে চায় না এবং যেহেতু অবাধ্য এবং ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানটাই ইবলিসের খান্নাসরূপী জ্ঞান, যেহেতু ইবলিস আমাদের ভেতরই তার পূর্ণরূপ নিয়ে বিরাজিত সেহেতু আমরা ইবলিসের মত আদমকে সেজদা না করে সোজাসুজি আল্লাহপাককে সেজদা করতে ইচ্ছুক। এই সোজাসুজি আল্লাহকে সেজদা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রহণযোগ্য হল আদমের মাধ্যমে। ইবলিস এই আদমের মাধ্যমটাকেই অস্বীকার করে এবং যেহেতু ইবলিস আমাদের মধ্যেই বর্তমান সুতরাং আমরাও ইবলিসি জ্ঞান প্রয়োগ করে উহা অস্বীকার করি। তাই আল্লাহপাক ইবলিসকে বলেছিলেন আদমকে সেজদা করতে। নতুবা এই রকম আদেশ সম্পূর্ণ শেরেক।

সেই ইবলিস এখন কোথায় আছে? প্রশ্নটি অতি মারাত্মক এবং বুঝবার জন্য গভীর চিন্তাসাপেক্ষ। ইবলিস বাহিরে নেই। ইবলিস আমাদের মত মানুষের ভেতরই আপন মূর্তিতে বিরাজমান। মানুষ ছাড়া ইবলিসের নিজস্ব কোন আকার নেই। মানুষ ছাড়া ইবলিস সম্পূর্ণ আকারবিহীন তথা নিরাকার। তাই মানুষ যেমন আল্লাহর রহস্য তেমনি ইবলিসের রহস্যও এই মানুষ। তাই ইবলিসের মত আকাম-কুকাম সব মানুষের আকৃতির মধ্যেই প্রকাশ পায় এবং এই মানুষ দিয়েই ইবলিসের যত আকাম-কুকাম করানো হয়। মানুষের দেহ এবং রক্তে ইবলিস এমন নিখুঁতভাবে মিশে যায় যে তাকে আর ধরবার উপায়ই থাকে না। তখন সে মানুষের আকৃতিতে ইবলিস। চিনে নিতে বড় কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যে, সে কি মানুষরূপী আদম না মানুষরূপী ইবলিস। সুতরাং, এই মানুষরূপী ইবলিস কখনোই চায় না মানুষরূপী আদমকে সেজদা করতে তথা আনুগত্য গ্রহণ করতে, কিন্তু আল্লাহপাক ঘোষণা করছেন যে, আদমের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যাবে না, তথা ফানা ফি শায়েখ না হয়ে, তথা আপন পীরের মধ্যে ফানা না হয়ে ফানা ফিল্লাতে যাওয়া যাবে না, তথা আল্লাহতে ফানা হতে পারবে না। তাই খাজা বাবা বলেছেন যে, যার পীর নেই শয়তান হল তার পীর। কারণ শয়তান পীরকে তথা আদমকে সেজদা তথা আনুগত্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে যেমন আমাদেরই মধ্যে যারা নররূপী শয়তান তারা পীরকে তথা আদমকে সেজদা না দিয়ে তথা আনুগত্য গ্রহণ না করে সোজাসুজি আল্লাহকে পেতে চায় এবং এই চাওয়া যে ইবলিসের চাওয়ার সঙ্গে হুবহু মিল তথা সাদৃশ্য

রয়েছে জ্ঞানীজনেরা সহজেই বুঝতে পারেন এবং ইহাও বুঝতে পারেন যে মানুষ ছাড়া শয়তানকে পাওয়া যায় না তথা মানুষ ছাড়া শয়তান হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ নিরাকার।

হুজুর পাক (দঃ) একবার সাহাবাদেরকে বলেছিলেন যে, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গেই একটি করে শয়তান দেওয়া হয়েছে। এই কথা শুনে একজন সাহাবা হুজুর পাককে (দঃ) প্রশ্ন করেছিলেন যে, তাহলে কি আপনার সঙ্গেও একটি শয়তান? হুজুর পাক (দঃ) বলেছিলেন যে, হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গেও একটি শয়তান দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি সেই শয়তানকে মুসলমান বানিয়ে ফেলেছেন।

হুজুর পাক (দঃ) একবার সাহাবাদের বললেন যে, বেহেস্তের সীমানা আসমান-জমিনে ব্যাপ্ত। তখন একজন সাহাবা প্রশ্ন করেছিলেন যে, তাহলে দোজখের স্থান কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব উত্তর দিলেন হুজুর পাক (দঃ): রাত্রির অন্ধকার এলে দিন কোথায় যায় এবং দিন আসলে রাত্রি কোথায় যায়?

আমিত্ব তথা অহং তথা অহঙ্কারই আল্লাহতে বিলীন হওয়া তথা ফানা হবার পথের একমাত্র পরদা তথা আবরণ তথা দেয়াল। এই অহঙ্কারের দরুণই ফেরেস্তাদের নেতা আজাজিল শয়তানে পরিণত হল। তাই কোরান পাক ঘোষণা করছেন, 'অহঙ্কারী ব্যক্তি বেহেস্তে যাবে না। তাদেরকে বলা হবে নরকে প্রবেশ করতে এবং সেখানে থাকতে। এটাই অহঙ্কারী মানুষদের পরিণতি।'

হুজুর পাক (দঃ) বলেন, 'যার ভেতরে এক সরিষা পরিমাণ অহঙ্কার আছে সে বেহেস্তে যাবে না।'

হুজুর পাক (দঃ) বলেন, 'আমি কি নরকের অধিবাসীদের খবর তোমাদের দেব না? প্রতিটি অহঙ্কারী ব্যক্তি।'

হুজুর পাক (দঃ) বলেন, 'আগুন যেমন কাঠ খেয়ে ফেলে অহঙ্কার তেমনি মানবীয় গুণগুলো খেয়ে ফেলে।'

হুজুর পাক (দঃ) বলেন, 'অহঙ্কার সত্যকে বিনাশ করে এবং মানুষকে হেয় করে।'

হুজুর পাক (দঃ) বলেন, 'একটি উট যদি সূঁচের ফুটো দিয়ে যেতে পারে তাহলে একটি অহঙ্কারীও বেহেস্তে যেতে পারবে।' হুজুর পাক (দঃ) বলেন, 'অহঙ্কারী লোকদের "ইউলুস" নামক নরকের কুঠরিতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং নরকের আগুন তাদেরকে আক্রমণ করবে।'

হুজুর পাক (দঃ) বলেন, 'যাকে কলুষিত নফস পথ ভুলিয়ে দেয়, সে তো মন্দ।'

সুতরাং প্রতিটি মানুষকেই আপন অহং পরিত্যাগ করে আদমের আনুগত্য গ্রহণ করতে হবে তথা আদমকে সেজদা দিতে হবে। আদমের মধ্য দিয়েই আল্লাহতে বিলীন হতে হবে। ইহা আল্লাহর নীতি নির্ধারণী আইন এবং এই আইনের বদল নেই তবে হযরত ঈসা রূহুল্লাহর মত যদি নীতি নির্ধারণী আইনের বদল কোন কোন ক্ষেত্রে করেই ফেলেন তবে উহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা এবং একান্ত বিশেষ শান এবং আল্লাহ পাক যে, 'যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।' 'তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন' 'যাকে ইচ্ছা তাকেই নেয়ামত দান করেন' অবশ্য ইহা দুনিয়ার মালপানিকে প্রকৃত পক্ষে বুঝানো হয়নি, আবার দুনিয়ার মালপানিকেও বুঝানো হয়েছে, কারণ একদিক দিয়ে সাম্যবাদের সর্বপ্রথম ডাক শুনি ইসলামেই, আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এবং অপ্রিয় হলেও অতি সত্য কথা যে, অন্য কোন ইজমে এ ডাকটুকু অন্তত শুনতে পাইনি।

প্রচলিত সাম্যবাদ ও ইসলামী সাম্যবাদের স্বরূপ

যদিও শতবর্ষ আগের মার্কসবাদকে সাম্যবাদ বলা হয়, আসলে ইহা সাম্যবাদের নামে এ্যাটমের মত অতি সূক্ষ্ম ধোঁকাবাজি এবং এত সুন্দর নিখুঁত ভণ্ডামী যা চোখেই ধরা পড়ে না। আর এরকম মারাত্মক ভণ্ডামী দ্বিতীয় একটা জন্মলাভ করেছে বলে তো মনে হয় না। এবং ভেটো-মারা হামবড়া ষাঁড়ের গুঁতো-মারা বিদ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, মানবের আসল উদ্দেশ্যকে সরাসরি অস্বীকার করা হয় এবং এই রকম তথাকথিত সাম্যবাদীরাই সব কিছু বুঝে ফেলেছেন ভাবখানা ইঁচড়ে পাকার মত প্রকাশ করেন। এদের ভাবখানা হল, পেট ভরে খানা খেয়েছো তো আবার কিসের চিন্তা? আত্মা-টাত্মা বা প্রেম-ভালবাসা এসব হল একদম গুলমারা বিদ্যা। খাবে আর ফসল ফলাবে,এছাড়া আর কিছুই নেই। অনেকটা মানুষকে জানোয়ার বানানোর বিদ্যা বললেই ভাল মানায়। তবে ইহা অপ্রিয় হলেও অতি সত্য কথা যে, মার্কর্সবাদকে যদি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রয়োগব্যবস্থার একটি সাধারণ সূত্র বলে ধরে নেওয়া হয় এবং সেই অর্থনৈতিক সূত্রটিকে সুষ্ঠু ও সুন্দররূপে যদি প্রয়োগ করা যায় তবে পুঁজিবাদের মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠবে এবং ধনীদের রক্তশোষণ করার বিভিন্ন যাদুমাখা কৌশলগুলো একদম মাঠে মারা যাবে। তাই মালপানি যাদের আছে তারা এই অর্থনৈতিক সূত্রটির নাম শুনলে ভূত দেখার মত ভয় পায়। পাবার কারণ হল, গরীবের ঘাড়ের উপর কাঁঠাল রেখে কোষ খুলে খাবার মজাটা আর থাকছে না। এই অর্থনৈতিক সূত্রটি অনেকটা অর্থনৈতিক সমতা এনে দেয় বলেই উঁচু-নিচু শ্রেণীগুলোকে ড্রেজার দিয়ে সমান করে দেবার প্রচেষ্টা চালায়।

কিন্তু ইসলামের সাম্য মার্কসবাদের চেয়ে অনেক গুণ সুন্দর এবং সর্বাঙ্গীন। তাছাড়া মার্কসবাদের কোন নেতার কখনো খলিফা উমর ফারুক (রাঃ)এর মত চাকরকে উটে চড়িয়ে নিয়ে যাবার কথা বাস্তবে তো দূরে থাক কল্পনাও করতে কষ্ট হবে। কারণ নাস্তিকের দ্বারা জংলী সাম্য আসতে পারে, কিন্তু নৈতিক এবং অধ্যাত্মবাদের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যে সাম্য আসে উহা আশা করাই যায় না। মাকর্সবাদীদের নৈতিক মান এত নিচু পর্যায়ের যে, এক নেতার আদর্শ কিছুদিন পরেই অন্য নেতার কাছে গ্রহণীয় হয় না। নাস্তিক্যবাদের ভেতর এরচেয়ে কিই বা আশা করতে পারেন। দূর থেকে এই মাকর্সবাদীদের রূপখানা আপনার খুব ভাল লাগবে, কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করে যদি দেখতেন তবে বুঝতে পারতেন যে এদের নৈতিকতার মান কত নিচে নেমে আছে। এদের উপরটা অনেকটা বেদের মাথায় ফুলের নকসী আঁকা বাক্স, যা দূর থেকে দেখতে আপনার ভালই লাগবে, কিন্তু যদি একবার কাছে গিয়ে বাক্সের ডালা খানা খুলতে বলেন তবে দেখতে পাবেন যে সদ্য বিষদাঁত তোলা কালসাপ ফোঁস ফোঁস করছে। তাই মার্কর্সবাদকে জানোয়ার তৈরি করার সাম্যবাদ বললে সার্থক হয়। কারণ, আধ্যাত্মবাদকে এরা গ্রহণ করার প্রাথমিক শর্তটুকুও মেনে নিতে পারেনি। কত বড় ঘাড়মোঘড়া এরা।

দেড় হাজার বছর আগে ইসলামের সাম্য ধীরে ধীরে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিল সেই যুগের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিচার করে, কিন্তু হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) ইহার কবর রচনা করে গেলেন। ‘যাকে ইচ্ছা তাকেই নেয়ামত দান করেন’ এই কথার দ্বারা ধন-সম্পদও যে একটি তাঁরই বিশেষ নেয়ামত এবং এই ধন-সম্পদ কালে কালে বিভিন্ন পদ্ধতিতে যে ভাগ-বন্টন করার ব্যবস্থা করেছেন ইহাও তাঁর একটি বিশেষ শান। একজন অফুরন্ত ধন-সম্পদ পেয়েও ভোগবিলাসে রত না থেকে সাধারণ জীবনযাপন করে গেছেন এবং ইহা একটি ঐতিহাসিক নিষ্ঠুর সত্য কথা এবং ইহা আল্লাহর একটি বিশেষ শান। আবার একজন অফুরন্ত ধন-সম্পদ পেয়েও চরম ভোগবিলাসে নিজেকে লাগামহীনভাবে

ভাসিয়ে দিয়েছে এবং এর ফলে সমাজ জীবনে নেমে এসেছে অসহ্য যন্ত্রণা, ইহাও একটি ঐতিহাসিক নিষ্ঠুর সত্য কথা এবং ইহা আল্লাহর একটি বিশেষ শান। মানুষ যে অদৃশ্য শক্তির কাছে কত অসহায়, আবার সেই মানুষই যে অদৃশ্য শক্তির কাছে কত সহায় এই দুই বিপরীতের এক অপূর্ব দর্শনের অপূর্ব বৈপরীত্য ঐতিহাসিক সত্যে ভরপুর। কারো কাছে আল্লাহ প্রিয়, কারো কাছে অপ্রিয়, কারো কাছে অস্বীকারের আস্ফালন আবার কারো কাছে স্বেচ্ছাচারিতার খেলা। 'কিছুই নেই তিনি ছাড়া' এই সর্বস্ববাদ, এর সৌন্দর্য, বহু সম্পূর্ণ বিপরীতের খেলা চলছে তাঁর নব নব বিকশিত হবার ধারায় বলেই তিনি সর্বস্ব তথা আহাদ।

নাইজেরিয়ার জঙ্গলে গেরিলা পাওয়া যায় বলে বাংলাদেশের সুন্দরবনেও গেরিলা পাওয়া যাবে এই দর্শনে যারা বিশ্বাসী, তাদের দর্শনের সৌন্দর্যে সম্পূর্ণ আত্মবিরোধী ভাবের সমাবেশ না থাকতে পারে এবং দর্শনের ভাষার ছক্কা-পাঞ্জার মারপ্যাঁচে একদম নিখুঁত সত্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ইহা হল সম্পূর্ণ কেতাবী দর্শন যা বাস্তব জগতের সঙ্গে মিলাতে গেলে আত্মবিরোধের ছকে বাতিল বলে তারাই উড়িয়ে দেবেন এবং তাই এরূপ দর্শনকে কেতাবী দর্শন বলা হয়। এবং এরূপ কেতাবী দর্শনে বাস্তব জগতে এই দার্শনিকদের দর্শনের প্রতিফলন পাওয়া যায় না। অনেকটা কাজীর গরু কাগজে লিখা আছে কিন্তু গোয়াল ঘরে নেই-এর মত অপূর্ব দার্শনিক মতবাদ। সুতরাং রাজতন্ত্রও তারই একটি বিকশিত রূপ, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম, প্রিমিটিভ তথা আদিম কমিউনিজম, মাতৃতন্ত্রবাদ, কোন ইজম ছাড়া সময় ইত্যাদিও তাঁরই এক এক সময়ের ক এক রকম এবং একই সময়ে বিভিন্ন প্রকার বিকশিত রূপ তাঁরই নিজস্ব রূপ। সুতরাং মতের অমিলটাই স্বাভাবিক এবং মিলটাই অস্বাভাবিক। ইহাই সর্বস্ববাদের সর্বস্ব পরিচয় এবং তাই তিনি কোরানের ভাষায় আহাদ তথা সর্বস্ব। এবং তিনিই যে ***'আলা কুললে শাইয়িন কাদির'*** তথা 'সমস্ত বিষয়ের উপর তিনিই একমাত্র ক্ষমতাবান' ইহা তাঁরই অদ্বিতীয় গুণাবলী তথা লাসানী শান তথা যে শানের সানী নেই তথা দ্বিতীয় নেই।

মার্কসবাদের বকুনি দিয়ে যে থুথু নিক্ষেপ করলাম, না জানি অদূর ভবিষ্যতে সেই থুথু নিজের গায়েই এসে পড়বে। নিজের গায়ে পড়ার মওকাটাই বেশি। কারণ ইসলামের নামে শোষণবাদ চালু থাকলে যত দোহাই দিয়েই বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোতের উপর ধর্মের বাঁধ দেই না কেন, উহা বালির বাঁধের মত ভেঙে খান খান হয়ে যাবে। তার কিছুটা আলামত যে আমরা সবাই বুঝি না এমন কথা নয়। আমরা নাকের উপর কয়টি ফেরেস্তা বসতে পারে তা নিয়ে ঝগড়া ও দল তৈরি করতেই ব্যস্ত এবং ফতোয়ার ছড়াছড়িতে একে অপরকে কাফের, মুনাফেক বানিয়ে মুসলমানশূন্য দেশ বানিয়ে ছাড়ি। ইহা আমাদের নৈতিক চরিত্রের বিরাট দোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে নিচতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে এখনো আমরা একতায় আসতে পারিনি এবং ভবিষ্যতে পারবো কিনা তাও জানি না। আমাদের অনৈক্য থাকবেই এবং এই অনৈক্যের সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে যখন মার্কসবাদ সশরীরে আস্তানা গেড়ে ফেলবে তখন আমাদের নাকি কান্নার সুর বেজে উঠবে। এই নাকি কান্নার মধ্যে অবশ্য সবাই শিয়ালের হুক্‌কা হুয়া ডাকের মত একত্র হব এবং তখন আর কোন দলমত থাকবে না, ইহা ভাল করে জানি। আমাদের অবস্থা অনেকটা অপারেশন সাকসেসফুল কিন্তু রুগী পরপারের টিকিট কেটে বসে আছে-র মত হবে। কোন লাভ হবে না তখন। নিজেদের ভাগ্য নিজেরা পরিবর্তন করতে পারলাম না, কেবল দলাদলি আর ফতোয়া মারার স্টাইল আর কোন কাজে আসবে না, আল্লাহপাকও আমাদের ভাগ্য ফিরিয়ে দেবেন না। ধর্ম তখন আমাদের নাকি কান্নার পরিবেশে মহাপ্রস্থানের মহাপথে

পাড়ি জমাবে। কারণ, আমি ভাল করেই জানি, আমার এই লেখা, আমার এই নাকি কান্না মুসলমান ভাইদের কানে গেলেও একতার মাঠে সমবেত হতে পারবো না।

কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূত্রটি ধরে মার্কসবাদ এগিয়ে আসবেই। একে রুখতে হলে লাঠিসোটা দিয়ে নয়, বরং ইসলামের দেওয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যত শীঘ্র চালু করে। পাঁচ ওয়াক্ত পবিত্র নামাজের মধ্যে যে ইসলামের সাম্য দেড় হাজার বছর পুর্বে পরোক্ষভাবে প্রচার হয়ে আসছে এবং আজো সেই সাম্য সেই ধনী-গরীব কোন ভেদাভেদ না রেখে একই কাতারে দাঁড়িয়ে আল্লাহ পাকের কাছে জানাই পূর্ণ আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিক ভাব। কোন ভেদাভেদ না রেখে সবার ভাতের সানকিতে সেই সাম্য তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, নতুবা জানোয়ার বানাবার সাম্য মার্কর্সবাদ ঐতিহাসিক সত্যরূপে আমাদের আঙ্গিনায় হি হি করে হেসে হেসে আসতে বাধ্য। তখন ছালাও হারাবো, মাথায়ও হাত দিব। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমরা এই শিক্ষার গুরুত্ব দেখেও না দেখার ভান করছি, যার দরুণ এত অপূর্ব সুন্দর নামাজ পড়ার ব্যবস্থা, যা অন্য কোন মতের মধ্যে নেই সেই সুন্দরতম ব্যবস্থাটিও আজ প্রাণহীন কাঠের মত দাঁড়িয়ে আছে।

প্রস্রাব-পায়খানার মত প্রকৃতির ডাকে আগে সাড়া দিতে বলেছেন ইমামে কেবলা তাইনে (দঃ) তারপর নামাজ পড়তে বলেছেন। কারণ, তাতে নামাজের একাগ্রতা নষ্ট হতে পারে। সেরকম পেটের ক্ষুধা আর হাজার অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত মানুষের কাছে মার্কসবাদ উঁকি-ঝুঁকি মারবেই এবং সুযোগ পেলেই। এবং আমাদের অবহেলায় সুযোগ তারা পাবেই। এবং একবার যদি আসতে পারে তবে কুইনাইনের মত তেতো হলেও চোখের জলে গিলতে হবেই, তা যত কষ্টই হোক না কেন। কারণ, সমস্ত ফেরকা ও ফতোয়া ভুলে গিয়ে আমাদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলা অনেকটা সাত মণ তেলও হবে না আর রাধাও নাচবেন না-র মত। মার্কসবাদের কুইনাইন অবশেষে বাধ্য হয়ে গিলতেই হবে এবং এই কুইনাইন গেলার সময় যে সকলে এক হয়ে যাব তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই ঐক্য হবে খুবই বেদনাদায়ক এবং আমাদের নাকি কান্নার যে সুর বেজে উঠবে তাতে তবলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেখবো কি সুন্দর আপনিই তাল মিলে যাচ্ছে। রাশিয়া একটার পর একটা করে দানবের মত দেশগুলো গিলে খাচ্ছে। পৃথিবীর ম্যাপটার দিকে একটু নজর করে দেখুন তো? আর আমেরিকা? অসভ্য বলে নতুন বধূর মত অভিমানের সুরে গাল দিচ্ছে। ব্যস, ঐ পর্যন্তই। তারপর লম্বা লম্বা দুই তিনটি ডিগবাজি মেরে আপন ঘরে পুরাতন স্বভাব দেখিয়ে প্রবেশ। এখন হয়তো টের পাচ্ছি না। কারণ, বাতাস সে রকম গায়ে লাগেনি। যখন মার্কসবাদের শীতল বাতাস গায়ে লাগবে তখন হাড়ে হাড়ে টের পাব, আর তখন টের পেয়ে কোন লাভ হবে না। কারণ, অপারেশন করতে কোন ভুল হয়নি, তবে রুগী মারা গেছেন। তাই আসুন, এখনও সময় আছে, সবকিছু ভুলে গিয়ে এক হয়ে যাই এবং শোষণমুক্ত ইসলাম প্রতিষ্ঠা করি, কারণ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান।

পবিত্র কোরানের অনুবাদের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা

একটি নতুন খবর আপনাদেরকে শুনাতে চাই। খবরটি পুরাতন কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের চোখে ধরা পড়েও ধরা পড়ছে না, তাই খবরটা নতুন করে বলতে হল। আরবী ভাষা আপনার জানা না থাকলেও আপনি প্রাচীনকাল হতে আধুনিককালের বিশ-পঁচিশখানা কোরান পাকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা একসঙ্গে পড়ে দেখলেই দেখতে পাবেন, কারো অনুবাদ ও ব্যাখ্যার সঙ্গে মিল পাচ্ছেন না। কোন কোন স্থানে আকাশ-পাতাল ব্যবধান পাবেন আবার কোন কোন স্থানে হুবহু মিল পাবেন। হুবহু মিলটা পাবেন সেখানেই, যেখানে দেখবেন কোরান পাকের আয়াতগুলো বুঝে উঠা খুবই কঠিন। 'খুবই কঠিন' যেখানে, সেখানেই পাবেন সবার মধ্যে এক রকম ব্যাখ্যা ও অনুবাদ। এর কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, ঠিকমত বুঝে উঠতে না পারায় অন্য একটার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা হুবহু মেরে দেওয়া তথা একদম চুরি করা। অবশ্য কোন উপায় নেই বলেই এরকমটা করতে অনেকটা বাধ্য হন। আবার অনেক সময় নিজের মতামত থাকা সত্ত্বেও উহা ইচ্ছা করেই বাদ দিয়ে অপরেরটা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। একটি ছোট্ট নমুনা তুলে দিলাম।

কোরান পাকে আল্লাহ তাঁর নিজের কথা *'আমি বলছি'* আবার *'আমরা বলছি'* দুই রকমেই পাবেন। এই দুই রকমকে প্রায় অনুবাদকারীরাই একরকম করে দিয়েছেন। অনুবাদকারীরা যেখানে *'আমরা বলছি'* আছে সেখানে তার নিজস্ব ভাষার অনুবাদ করার সময় *'আমরা'*-কে *'আমি'* কেন অনুবাদ করলেন উহার এক বস্তাপচা পাণ্ডিত্যের বুলি আপনাকে শুনিয়ে দেবেন। আল্লাহ পাক যেন *আমি* কে *আমরা* বলতে গিয়ে কত বড় ভুলই না করে ফেলেছেন। তাই অনুবাদক তার পাণ্ডিত্যের ভাষায় আল্লাহকে কোন প্রকার দোষারোপ না করে বুঝিয়ে দেবেন যে, আরবী ভাষায় অনেক সময় এই এই কারণে *আমিকে* তথা একবচনকে *'আমরা'* তথা বহুবচনে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং যেখানে আমরা শব্দটি আছে অনুবাদক পাঠকের সুবিধার জন্যই *আমি* করে ফেলেন। যাতে পাঠক শেরেক না করেন। *'আমরা'* থাকলে শেরেকের ভয় আছে সুতরাং পাঠককে শেরেক করা হতে রক্ষা করতেই হবে। আহা– কি বাক্কা দরদের বাহার যেন উপচিয়ে পড়ছে। মুখের কথায় শেরেকের খৈ ভাজলে বোধ হয় আসল খৈ ভাজা হয়ে গেল। 'আউজু' বলে 'আশ্রয় চাই' শয়তান হতে বললেই বুঝি মুক্তি পাওয়া যায়– এরকম হলে তো মাশাল্লাহ আমরা সবাই ইনসানে কামেল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অনুবাদক কি কোরান পাকের আক্ষরিক অনুবাদের হুবহু রাখলেন? অনুবাদক কি খোদার উপর খোদকারী করলেন না? আল্লাহ কি *আমরা* বাদ দিয়ে সবখানেই *আমি* বলতে পারতেন না? তবে আপনি কে এবং কোন অধিকারে *আমরাকে আমি* অনুবাদ করলেন? এই অধিকার আপনাকে কে দিল? এত বড় ঔদ্ধত্য আর সাহস আপনি কোথা হতে পেলেন? ইহা কি সূক্ষ্ম সীমালঙ্ঘন নয়? মনের অজান্তে কি আপনি সীমালঙ্ঘনকারী রূপে বিবেচিত হবেন না? আপনি হাজারো যুক্তির সেতু দাঁড় করিয়ে বুঝাতে চান না কেন, তবু একটি প্রশ্ন যদি করা হয় যে, আল্লাহ কি সবখানে আমি বলতে পারতেন না? আপনার ধারালো যুক্তিগুলো কি ঐ একটি প্রশ্নের কাছে হার মানবে না? তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছার মতই কি আপনার অনুবাদ জনতার হাতে তুলে দিচ্ছেন না? সাধারণ পাঠক বিশেষ করে আরবী ভাষা না-জানা সহজ-সরল পাঠকদের আমি শুধু এটুকুই বুঝিয়ে দিতে চাই যে, *আমি* এবং *আমরা* অতি সাধারণ বিষয়টাতেই অনুবাদকরা কি চমৎকার ওলোটপালট করে দিয়েছেন। এরকমভাবে কোরান পাকের হাজার হাজার শব্দের অর্থকে যা মনে লেগেছে তাই করে

রেখেছেন, সেগুলো পাঠকদেরকে কেমন করে বুঝাই– কেমন করে বুঝাই যে, গোঁজামিলের পাহাড় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে এবং এর থেকে প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা যে কত কঠিন বিষয় উহা কেমন করে পাঠক ভাইদেরকে বুঝাই? *আমি* এবং *আমরা* না হয় পাঠক ভাইয়েরা অতি সহজেই বুঝতে পারবেন কিন্তু এরচেয়ে অতি মারাত্মক হাজারো গোঁজামিলগুলো একটি একটি করে আক্ষরিক অনুবাদ করে বুঝাতে গেলে উহা যে কত বড় বইয়ের আকার ধারণ করবে উহা সহজেই বুঝা যায়। এরচেয়ে সমগ্র কোরান পাকের আক্ষরিক অনুবাদ করাটাই সমীচীন এবং উহা করতে গেলে বহু আয়াত আছে যা এই অধম লেখক এখনো তফসীর তথা ব্যাখ্যা করতে পারবে না এবং আক্ষরিক অনুবাদের নিচে 'আমি উহা বুঝিতে পারিলাম না' অনেকবার লিখে দিতে হবে। কিন্তু এরকম কথা লিখতে গেলে সত্য কথার অপ্রিয় স্বীকৃতি হয়, কিন্তু পাঠকবৃন্দের নিকট মহাপণ্ডিত বলে বিবেচিত হওয়া তো দূরের কথা অপদার্থ বলে পরিচিত হবার সমূহ ভয় আছে। আমাকে অপদার্থ বলে গাল দেবে– ইহা কি কমটি কথা, ইহা রীতিমত অপমানজনক কিছু একটা নয়? সুতরাং না বুঝলেও যা ইচ্ছে তাই গোঁজামিল মেরে দাও। যদি সময় সুযোগ এবং আল্লাহ পাকের রহমত হয় তবে ইনশাল্লাহ কোরান পাকের আক্ষরিক অনুবাদ যত শীঘ্র পারি আমরা করবো।

কোরান পাকের আর একটি আয়াতের নমুনা তুলে দিলাম। যেমন কোরান পাক বলছেন, ***'লা ইয়ামাস্‌সাহু ইল্লাল মুতাহ্‌হারুন'*** অর্থাৎ 'কেহই উহা স্পর্শ করে না একমাত্র পবিত্র ছাড়া।' এখানে অনুবাদক মহা ফাঁপড়ে পড়ে যান। কারণ 'মাস্‌সাহু'-এর অর্থ হল উহা স্পর্শ করা, উহা ধরা, উহা ছোঁয়া, সুতরাং ইহার শব্দের অর্থ বদলিয়ে না দিলে কোন অপবিত্র অথবা অবিশ্বাসী যদি কোরান পাক স্পর্শ করে ফেলেন এবং বলে ফেলেন যে, তোমাদের কোরান তো স্পর্শ করলাম অথচ কোরান নিজেই বলছেন যে, অপবিত্র ইহা স্পর্শ করতে পারবে না। তাহলে তো অনুবাদক আর কোন উত্তর দিতে পারবে না। তাই অনুবাদক নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করেন। কেহ অনুবাদ করেন পবিত্র না হয়ে স্পর্শ করা উচিত নয়; আবার কেহ অনুবাদ করেন, অজু করে পাক সাফ হয়ে কোরান পাক ধরা উচিত। আবার কেহ অনুবাদ করেন যে, অপবিত্র ব্যক্তিরা ইহার অর্থ বুঝতে সম্পূর্ণ অক্ষম ইত্যাদি। প্রথম দুটিতে 'উচিত' শব্দটি আমদানী করা হয়েছে এবং এই 'উচিতের' আমদানী-রপ্তানীটাই বেশিরভাগ অনুবাদক তাদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় গ্রহণ করেছেন এবং তৃতীয়টিও অনেক অনুবাদক গ্রহণ করেছেন। অপবিত্র ব্যক্তি বলতে যদি অন্য মত ও পথের লোকদের বুঝানো হয়ে থাকে তবে বহু ভিন্ন মতের অনুসারীরা কোরান পাকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখেছেন এবং তাদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আমাদের মত পবিত্র (?)-দের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি উন্নতমানের হয়েছে। এখন উপায়? অগত্যা আর উপায় নেই তাই গোঁজামিল দেওয়া পর্যন্তই সার এবং এইভাবেই সমগ্র কোরান শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গোঁজামিলের বস্তা বানিয়ে রেখেছেন।

সূরা আল মারেজের এক স্থানে আছে ***'বিরাব্‌বিল মাশারেকে ওয়াল্‌ মাগারেবে'*** 'অগণিত পূর্ব দিক ও অগনিত পশ্চিম দিকের রব' এই অনুবাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাচীনকাল হতে আধুনিককালের প্রায় সব অনুবাদকই হুবহু একই ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। কারণ, বিষয়টি খুবই কঠিন বলে এইরকম করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, বিষয়টি কেন কঠিন এবং কেমন করে বিষয়টি কঠিন হল? কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে পৃথিবীর একটি পূর্ব এবং একটি পশ্চিম দিক থাকা সত্ত্বেও কেন অগণিত পূর্ব এবং পশ্চিম দিকের কথা কোরান পাকে বলা হল? এই অগণিত পূর্ব এবং পশ্চিম দিকগুলো কোথায়? যেহেতু পূর্ব এবং পশ্চিম বলতে পৃথিবীতে একটিই সেহেতু এত অগণিত পূর্ব এবং পশ্চিম বলতে এখানে কি বুঝাতে চেয়েছে? প্রাচীনকাল হতে আধুনিককালের চাঁদে মানুষের যাবার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের

স্পষ্ট ধারণা ছিল না যে, প্রতিটি গ্রহ এবং উপগ্রহের নিজস্ব একটি করে পূর্ব এবং পশ্চিম দিক আছে এবং কোন গ্রহ এবং উপগ্রহের একটি নিজস্ব পূর্ব এবং পশ্চিমের সঙ্গে অপর যে কোন গ্রহ এবং উপগ্রহের পূর্ব এবং পশ্চিমের কোন মিলই নেই তথা এক কথায় যার যার পূর্ব ও পশ্চিম দিক তার একান্ত নিজস্ব দিক, যাহার অন্যটির সঙ্গে কোন মিলই নেই এবং মিল না থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ, প্রত্যেকটি ভাসমান অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তার একান্ত নিজস্ব আয়তন নিয়ে এবং সেই আয়তন অন্যটির চেয়ে চাই ছোট হোক কি চাই বড় হোক। এবং সেহেতু সকলের মধ্যে মিল থাকাটাই অস্বাভাবিক। সব কয়টি গ্রহ সূর্যকে ঠিক একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘুরে আসে না। পৃথিবীর ঘুরতে যতদিন সময় লাগে অন্য যে কোন গ্রহের ঠিক ততদিন লাগে না, তথা কম-বেশি সময় লাগে, যদিও প্রতিটি গ্রহ এবং উপগ্রহ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হল, সূর্যের নামে পরিচিত সৌরজগতে কয়টি গ্রহ এবং উপগ্রহ আছে? তা সংখ্যায় যতই থাক না কেন এবং দিনে দিনে যত সংখ্যার দিক দিয়ে বেড়ে চলুক না কেন এবং গ্রহ ও উপগ্রহ মিলে আমরা শ' দেড়েক পূর্ব এবং পশ্চিম দিক পাই এবং প্রত্যেকের পূর্ব এবং পশ্চিম তার একান্ত নিজস্ব দিক। একটি সৌর জগতে যদি দেড়শত পূর্ব এবং পশ্চিম দিক পাই তাহলে কতটি সৌরজগত আছে? যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, এই তেত্রিশ হাজার কোটি সৌর জগতের কতটি ছেলে-মেয়ে তথা গ্রহ-উপগ্রহ আছে? তখনই বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে উহা অগণিত। তাহলে অগণিত গ্রহ ও উপগ্রহের অগণিত পূর্ব ও পশ্চিম দিক আছে এবং তাহলে কোরান পাকের ঘোষণা 'অগণিত পূর্ব ও পশ্চিম দিকের রব'-এর সত্যতার স্বাক্ষরকে কে অস্বীকার করতে পারে?

এই অতি ছোট আকৃতির ব্যাখ্যা পাঠক ভাইদের পড়তে অনুরোধ করছি। জগাখিচুড়ির বাহার এবং গোঁজামিলের ধাঁধায় চক্ষু চড়কগাছ। আরবী জানা হিয়া বড় বড় রুই কাৎলাই ভিরমি খায় আর সাধারণ পাঠক তো কোন ছাড়। অতি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, এইসব অনুবাদকারী পণ্ডিতের দল, অসীম আল্লাহর অসীম জ্ঞানের সবটুকু পানি মনে করে এক চুমুকে খেয়ে বসে আছেন। ভাবখানা যেন, মাত্র এইটুকু! অসীম জ্ঞানের ভাণ্ড কোরানের একটি স্থানেও 'ইহা বুঝিতে পারিলাম না' অথবা 'ইহার অর্থ আমি জানি না' এরকম একটি অকপট স্বীকৃতির নাম-গন্ধও যদি থাকে। কারণ অসীম আল্লাহর সবটুকু তারা বুঝে ফেলেছেন। সুতরাং ব্যাখ্যা দিতে আবার কিসের কষ্ট? দশের কথায় বলে প্রকৃত সাধুকেও ভণ্ড বনে যেতে হয়। তাই তো খনার বচনটি আজো আমাদের মুখে মুখে ঘুরছে– 'দশ চক্রে ভগবান ভূত'। এবং সত্যি বলতে কি হয়েছে তাই।

আর একটি হের-ফের করা অনুবাদ পাঠকের কাছে তুলে ধরলাম।

'ইজা কামু ইলাস সালাতে কামু কুসালা ইউরাউনান নাসা অলা ইয়াজ কুরুনাল্লাহা ইল্লা কালিলা' অর্থাৎ 'যখন তারা সালাতের দিকে উঠে দাঁড়ায়, খুবই অলসতার সঙ্গে দাঁড়ায়, মানুষকে দেখাবার জন্য। অন্তর তাদের আল্লাহকে স্মরণ করে না অল্প কিছু লোক ছাড়া।'

পাঠক ভাই, আপনি প্রায় অনুবাদেই একটি ছোট্ট ভুল দেখতে পাবেন। ভুলটি হয়তো আপনার দৃষ্টিকে ফাঁকিও দিতে পারে, আবার একটু মনোযোগ সহকারে দেখলেই ছোট্ট ফাঁকিটা আপনার চোখে ধরা পড়ে যাবে। ফাঁকিটা ছোট হতে পারে কিন্তু এর অর্থ হয়ে পড়ে মারাত্মক ঘোলাটে। 'ইজা কামু ইলাস সালাতে' যার হুবহু অর্থ হল 'যখন সালাতের দিকে দাঁড়ায়', কিন্তু এর হুবহু অনুবাদ না করে তারা অনুবাদ করেন 'যখন সালাতের জন্য দাঁড়ায়'। 'যখন সালাতের জন্য দাঁড়ায়' যদি কোরান পাকে লিখা থাকতো তাহলে ইহার হুবহু আরবী ভাষাটা হত 'ইজা কামুলে সালাত'। কারণ, আরবী ভাষায় ইলার অর্থ হল দিকে এবং লে অর্থ হল জন্য। এখন আপনিই বলুন কোথায় ইলা আর কোথায় লে।

অথচ জোর করেই এরকম হাজার হাজার উল্টাপাল্টা করে রাখা হয়েছে। অবশ্য পাণ্ডিত্যের অজুহাতে ব্যাকরণের ঘেউ ঘেউ আর চিল্লাচিল্লির দাঁত খিঁচুনির দর্শন মিলবে অনেক, আর বার বার চোখের কাছে আসবে ভিরমি এবং তাতে ভুলের গর্তে পা রেখে বিপদে পড়তে পারেন। সম্ভবত এরকম ভুলের গর্তে পা ফেলে এক ইসলামকে তেহাত্তর ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আরো মজার কথা কি, কোন অলী-দরবেশ-পীর ফকিরের দ্বারা কিন্তু এক ইসলামকে এত ভাগে ভাগ করার মহান কর্তব্য সাধিত হয়নি। এত ভাগে ভাগ করার সাধনার ফলটি আমরা পেয়েছি আরবী জানা বড় বড় পণ্ডিতের মাধ্যমে। পীর-ফকির, অলী-দরবেশরা মুসলমান বানিয়েছেন, আর আরবী জানা পণ্ডিতেরা মুসলমানদেরকে তেহাত্তরটি ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন।

লাগ ভেল্কি লাগের মত আপনার মনে, মাথায় আর চোখে সুন্দর ভেল্কি লাগিয়ে দেবে শ্রদ্ধেয় আরবী জানা পণ্ডিতেরা, অথচ অনুবাদ আর ব্যাখ্যাগুলো হবে লেজকাটা।

সালাত বলতে যদি নামাজ পড়াটাকেই বলা হত তবে 'যখন সালাতের জন্য দাঁড়ায়' ইহাই হত প্রকৃত অনুবাদ। কিন্তু তারা দাঁড়ায় সালাতের দিকে, এর কারণ, এই দাঁড়ানোটা হল সালাতের দিকে অনুশীলন, যাকে আমরা ট্রেনিং নেওয়া হচ্ছে বলি। সুতরাং ইহা সালাত নয়, সালাতকে কামিয়াব করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা মাত্র। দেহের বিভিন্ন উঠা, নামা, বসা, হাত তোলা এবং মাথা নত করা ইত্যাদি অঙ্গভঙ্গিগুলো মোটেই সালাত নয়। কারণ, এই অঙ্গভঙ্গিগুলো যদি সালাতই হবে তবে 'মানুষকে দেখাবার জন্য' এই বাক্যটুকু কোরান পাক আমাদেরকে বলে দিতেন না। এই কথাটুকু বলার মধ্যে তেমন অর্থ বহন করতো না। কারণ, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যম ছাড়া মানুষকে কিছু দেখানো যায় না। আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ করাকেই বলা হয় সালাত এবং এই সালাত তথা যোগাযোগকে করতে হয় কায়েম অর্থাৎ স্থায়ী। এই সালাত কায়েম করতে হয়, তাই বলা হয়েছে 'ওয়াকিমুস্ সালাত' অর্থাৎ (আল্লাহর সঙ্গে) যোগাযোগ স্থায়ী করতে 'একরা' করতে নয়, অর্থাৎ পড়তে নয়। কারণ, 'একরা সালাত' অর্থাৎ সালাত পড় বলে কোরান পাকে একটি বারও বলা হয়নি। (তাই বলে কেউ যেন ভুল করে না বসেন যে, অধম লেখক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে বারণ করছে। কারণ, এখানে নীতি নির্ধারণের আলোচনা হচ্ছে, প্রয়োগ পদ্ধতির আলোচনা নয়)।

আল্লাহর কাছে দেহের হাজিরা দেওয়াটাকে হাজির হওয়া বলে বিবেচিত হয় না। মনের হাজিরা দেওয়াটাকেই আল্লাহর কাছে হাজির হওয়া বুঝায়। সুতরাং কেবলমাত্র দেহের হাজিরা দেওয়ার নামাজকে সালাত বলে গণ্য করা হয় না। কারণ, সালাত মনের সঙ্গে জড়িত এবং মন দিয়েই সালাতের কারবার। দেহ নিয়ে নয়। কারণ, দেহ মুসলমান এবং দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুসলমান, কিন্তু মনটি মুসলমান বানাতে হবে। তারই জন্য সমগ্র কোরান পাক একটি উপদেশাবলীর বিরাট গ্রন্থ। তাই অমুসলমান মনটির মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান দেহটিকে সাময়িক কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই মুসলমান দেহটি দিয়ে মানবজাতির কল্যাণেও আসতে পারে আবার অকল্যাণেও নিয়োজিত হতে পারে– ইহাই একটি মনের সাময়িক স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। তাই মনের চৈতন্যের সঙ্গে আল্লাহপাকের মহাচৈতন্যের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হলেই সালাতের আবির্ভাব হয় এবং তখনই হয় দুনিয়ার ষড়রিপুর মায়ায় তৈরি অচৈতন্যের তিরোভাব। মেরাজের অবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকে এই সালাতের কাছে এবং এই সালাতের যিনি সাথী তাকেই বলা হয় মুমিন। কারণ, মুমিনের সালাতই হল মেরাজ। তাহলে প্রশ্ন আসে, যার সালাত কায়েম হয়নি তার কি মেরাজ হয়েছে? না। কারণ, তার সালাত হল মানুষকে দেখাবার জন্য। মাত্র সামান্য কিছু লোক ছাড়া প্রায় সকলেই আল্লাহকে অন্তর দিয়ে স্মরণ করে না– একথা আমার কথা নয়, একথা স্বয়ং আল্লাহ পাকের কথা এবং

স্পষ্ট ঘোষণা। সুতরাং অতি অল্প লোকেই কোরান পাকের গুপ্ত রহস্য অনুধাবন করতে পারে এবং বাকি সবাইকে উহা বলে লাভ নেই। সবাই সত্যকে গ্রহণও করতে পারে না এবং সত্যকে উপলব্ধিও করতে পারে না। কেবলমাত্র অল্প কিছু লোক ছাড়া– ইহাই কোরান পাক আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীলোকেরা এই কথার গুপ্ত রহস্য বুঝতে পারেন।

ছয়টি রিপুর মেকী মায়ার ঝাঁটা-খাওয়া সদাচঞ্চল জীবনটাই হল বেঈমানের জীবন। এই বেঈমান জীবনের উপর যখন ঈমানের প্রচণ্ড আঘাত পড়ে এবং এই ঈমানের প্রচণ্ড আঘাতে যখন বেঈমানের ক্ষণস্থায়ী রূপগুলো একে একে ধ্বংস হতে থাকে তখন সালাত আপন রূপ নিয়ে ধীরে ধীরে জীবনের উপর পূর্ণরূপে ধরা দেয়। সম্পূর্ণ ধ্বংস আহ্বান জানায় সম্পূর্ণ নতুনত্বের। ছয়টি রিপুতে তৈরি তিনশত ষাটটি (চান্দ্র বৎসরের হিসাবে) মূর্তি ধ্বংসকারীগণ হল এই মুমিন। বুৎসেকান্দ অর্থাৎ মূর্তি ধ্বংসকারীকেই বলে মুমিন। এই সালাতের গুরুত্ব কতটুকু তা সহজেই বুঝা যায়। নিজের পরিজনদেরকে সালাতের মুল্য জানিয়ে দিতে বলেছেন পাক কোরান। ***‘ওয়ামুর আহলাকা বিস্‌সালাতে’*** অর্থাৎ ‘তোমার পরিজনদেরকে সালাতের নির্দেশ দাও’ ***‘অস্‌তাবির আলাইহা’*** অর্থাৎ ‘তুমি নিজেও উহাতে নিরত থাক’ ‘লা নাস আলুকা রেজকা’ অর্থাৎ ‘আমরা তোমার কাছে রেজেক চাই না’ ***‘নাহ্‌নু নারজুকুকা’*** অর্থাৎ ‘আমরা তোমাকে রেজেক দান করি।’

ভুল করার চেয়ে ‘আমি জানি না’ বলে মেনে নেওয়া অনেক ভাল। কারণ, আপনার একটি ভুল জন্ম দেবে অগণিত ভুলের। পরিণতি হবে মারাত্মক এবং ভয়াবহ। এই ভুলের পথ দিয়ে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরেরা এগিয়ে যাবে ভুল পথে, যার ফলে আসল লক্ষ্যে পৌঁছানো অধিকাংশের পক্ষে অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়বে। এক ভুলের পেটে অনেক ভুলের সন্তান নেবে জন্ম এবং জন্ম দেবে বিভিন্ন দল ও মতের এবং এরই মধ্যে এক ইসলাম তেহাত্তর ফেরকার জন্ম দিয়ে ফেলেছে। পাণ্ডিত্যের মান-সম্মান বজায় রাখতে গিয়ে এমন গোবর-গনেশী-মার্কা ভুলকে কেমন করে গ্রহণ করা হচ্ছে? সত্যি! ভাবতেও অবাক লাগে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এরকম ভুল-ধরা অসম্ভব এবং এই ভুলের বিভ্রান্তির জন্য দায়ী কে বা কারা? ‘কোরানাল ফাজরে’ অর্থাৎ ‘ভোরের কোরান’-কে ‘ফজরের তথা ভোরের নামাজ’ অনুবাদ করা হয়েছে। হায়রে আমাদের কপাল! কোথায় ফজরের কোরান আর কোথায় ফজরের নামাজ! বেহায়াপনারও একটা সীমা থাকা দরকার। মাতালের খিস্তির মত এরা যা মনে লেগেছে তাই করে গেছেন। শুধু কি ফজরের কোরানকেই ফজরের নামাজ বলে চালিয়েছেন? কোরান পাকে উল্লেখিত মসজিদকেও অনুবাদে নামাজ বানিয়ে ছেড়েছেন এবং সেজদাকেও নামাজ বানাতে তাদের মন ও কলম থেমে যায়নি। বিবেক এক মুহূর্তের তরেও তাদের দংশন করেনি। বাংলা ভাষায় কোরান পাকের যত অনুবাদ হয়েছে, সবচাইতে জঘন্য অনুবাদ হয়েছে শ্রদ্ধেয় মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেবেরটা। শ্রদ্ধেয় মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেবেরটা ভুল বললেও সুন্দর মানায়, কিন্তু উহা একটি পণ্ডিত-পাগলের বস্তাপচা খিস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আগাগোড়া সব মনগড়া অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় ভরপুর। কিন্তু ইসলামিক ফাউন্ডেশনেরটা হল তিন বস্তা ভুলের ঝুলি এবং উহা তিন খণ্ডে বাঙ্গালীকে দিয়েছেন উপহার। তাও আবার এই অনুবাদের ফ্যাশনটা অতি উঁচু মার্গের। একটি দুটি নয়, একেবারে হাতে-গোনা চৌদ্দজন মহাপণ্ডিতের মিলিত ফসল। এই চৌদ্দ পণ্ডিতের নাম যদি একটি অনুবাদে থাকে তবে সাধারণ পাঠক তো দূরে থাক, হিয়া বড় বড় সমঝদারদেরও ভিরমি খাবার জোগাড়। শ্রদ্ধেয় জনাব মাওলানা বেলায়েত হোসেনের নামের আগে যে আশ্চর্যজনক মেডেলটি ঝুলছে উহার নাম ‘শামসুল উলামা’ অর্থাৎ ‘উলামাদের সূর্য’। এই ‘উলামাদের সুর্যের’ মেডেলটি দর্শন করলে কার বুকের পাটা আছে যে, প্রতিবাদ করবেন? বিদেশ হতে আগত হিয়া বড় আলেম শ্রদ্ধেয় জনাব

মাওলানা কাশগড়ী সাহেবের নামও আপনি পাবেন। এই জাতীয় চৌদ্দটি রুই-কাতলার মত বড় পদার্থের উপর প্রায় সকলেরই বিশ্বাস থাকার কথা। এনারা সবাই মিলে বহু গবেষণা করে 'ফজরের কোরানকে' 'ফজরের সালাত' অনুবাদ করে আবার একখানা টিকায় তফসীরে কাশ্শাফের দোহাই দিয়েছেন। তফসীরে কাশ্শাফ আল্লামা জমখশরীর একটি বস্তাপচা অনেক আগের তফসীর। সেই বস্তাপচা তফসীরে কাশ্শাফের মত অনেক তফসীর আরবী, ফার্সী এবং উর্দু ভাষায় আছে। সবচাইতে বেশি দুঃখ লাগে যখন হাকিমুল উম্মত নামক অতি মূল্যবান মেডেল পাওয়া হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেবও ঐ একই ভুল করেছেন তাঁর তফসীরে।

সুরা বনি ইস্রায়িলের ৭৮ নম্বর আয়াতটি এখন পাঠক ভাইদের কাছে তুলে ধরছি– *'আকিমুস্সালাতা লিদুলুকিশ শামসে ইলা গাসাকিল্ লাইলে ওয়া কোরআনাল্ ফাজরে। ইন্না কোরআনাল্ ফাজরে কানা মাশ্হুদা।'*

অর্থাৎ, 'সালাত কায়েম কর সূর্য ঢলে যাবার কারণে, রাতের আঁধারে ঢেকে যাবার কারণে এবং ফজরের কোরানের জন্য। নিশ্চয়ই ফজরের কোরান হল প্রমাণিত।'

ইহার প্রচলিত এবং বিকৃত অনুবাদ করা হয় এইভাবে– 'সূর্য হেলিয়া পড়িবার পর হইতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করিবে এবং কায়েম করিবে ফজরের সালাত। ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।' অনুবাদের চরিত্রই যখন বিকৃত তখন ব্যাখ্যার চরিত্র কেমন হবে? অধম লেখক এই আয়াতটুকুর ব্যাখ্যা দিচ্ছি– সূর্যকে এখানে একটি মানবজীবনের সঙ্গে তুলনা করে বলছে যে, সালাত কায়েম কর- কারণ যখন সালাত কায়েম হয়ে যাবে তখনই দেখতে পাবে প্রথম কোরানের প্রথম পরিচয়। সূর্য যেমন উদয় হয়ে ধীরে ধীরে পূর্ণতায় এসে পুনরায় অস্ত যেতে থাকে তথা ঢলে যেতে থাকে এবং একসময় রাতের আঁধার ঢেকে যায়, ঠিক একটি মানুষের জীবন সূর্যটারও ঐ একই গতি। বাল্যের জীবন সূর্যের উদয়ের মত ধীরে ধীরে পূর্ণতায় এসে তথা পূর্ণ যৌবনে এসে পুনরায় বুড়ো হতে থাকে তথা ঢলে যেতে থাকে এবং এক সময় মৃত্যুর আঁধারে ঢেকে যায়, সূর্য যেমন রাতের আঁধারে ঢেকে যায়। জীবন সূর্যটি যে থমকে দাঁড়িয়ে নেই। প্রতিটি মুহূর্তে এ যে ঢলে যাচ্ছে। কোথায়? এক ঘন অন্ধকারের মাঝে। তাই জীবনরূপ সূর্যের ঢলে যাবার কারণে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে সালাত কায়েম করতে। কারণ, সালাত তথা যোগাযোগ কায়েম তথা স্থায়ী হয়ে গেলেই আপন পরিচয় প্রথম মেলে তথা ভোরের কোরানের যে রহস্য উহার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। কোরানের সঙ্গে পরিচিত হবার কি সুন্দর এবং অপূর্ব ডাক দিচ্ছেন। এই কোরান কাগজ অথবা শিলালিপি অথবা চামড়া বা যে কোন জিনিসের উপর কালির নকশা আঁকা কোরান নয়। কারণ, ইহা আসল কোরানের পরিচয় পাবার কতগুলো অক্ষরের বাঁধন। এই অক্ষরের বাঁধন, যেটাকে আমরা প্রায় সবাই কোরান বলে জেনে আসছি, উহা হলে, বিদ্যা শিক্ষার মাধ্যম ছাড়া অসম্ভব। অথচ একজনও নবী বা রসুল মাদ্রাসায় অথবা এই জাতীয় কোন বিদ্যালয় হতে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তাঁরা উম্মী, তথা অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত নন। সুতরাং যাহার সঙ্গে নবী ও রসুলরা পরিচিত নন উহা কখনই একমাত্র ধর্তব্য হিসাবে গণ্যই করা যায় না অর্থাৎ এই জাতীয় বিদ্যালয় হতে শিক্ষা না নিলেও আসল কোরানের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে। কারণ, আসল কোরানে কোন অক্ষরের বালাই নেই। কারণ, উহা নূরী কোরান। তাই কোরান নিজেই ঘোষণা করছে যে, পবিত্র না হয়ে তথা আমিত্ব ত্যাগ না করে তথা যোগাযোগকে স্থায়ী না করে তথা সালাত কায়েম না করে কেহই কোরানকে বুঝা তো দূরে থাক, কেবলমাত্র স্পর্শ করারও কারো ক্ষমতা নেই। ***(লা ইয়ামাস্সুহু ইল্লাল্ মুতাহারুন)।*** এরপরেও কি আমরা কাগজের লিখিত কোরানকে আসল কোরান বলে ভুল করবো? তাই অনেক সময় আমরা বিপাকে পড়ে যাই,

যখন দেখতে পাই মাদ্রাসা অথবা বিদ্যালয়ে না-পড়া একজন নিরক্ষর (?) আল্লাহর অলী বলে সুপরিচিত।

লিখাপড়া না জেনে আল্লাহর অলী হওয়া যায় না– এই মারাত্মক ভুল কথাটি মাদ্রাসায় পাস-করা আলেমরাই এমনভাবে প্রচার করে ফেলেছেন যে, মিথ্যাটাই বারবার উচ্চারিত হবার দরুণ জনতার কানে সত্য বলে মনে হচ্ছে এবং জনতা তখন মারাত্মক ভুল করে বসেন। জনতা তখন মনে করেন যে, মাদ্রাসায় যখন পড়া হল না তাহলে আর সাধনা করেই বা কি লাভ। এই যে মারাত্মক ভুল ধারণা, ইহার অবসান আমাদেরকেই করতে হবে, না হলে এক ইসলামের ভেতর ডজন ডজন দল ও মতের ভুল ধারণার অবসান কোনদিনও হবে না। মাদ্রাসার আলেম ভাইয়েরা এরকম মূর্খ (?) মজবুর, উলঙ্গ হয়ে পড়ে থাকা অলীদেরকে অলী বলা তো দূরে থাক অহঙ্কারের বাণ ছুঁড়ে বিপথগামী বলতেও জিহ্বা কাঁপে না– হায়রে বিদ্যার কচকচানি– তাই কমলিওয়ালা (দ) বলেন, ***‘আল এলমুল হেজাবুল আকবার’*** অর্থাৎ ‘এলেম তথা বিদ্যা হল (সত্যকে জানবার পথে) সব চাইতে বড় পরদা তথা দেয়াল।’ এই সেই বিখ্যাত ভারতবর্ষ, তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর দেশ। এই মহাভারতে যিনি মুসলমান বানিয়ে গেলেন সেই সুমহান সুলতানুল হিন্দ খাজা বাবা তো আক্ষরিক কোরানের একটি তফসির করে যেতে পারতেন। সত্যকে পাবার জন্য ইহার প্রয়োজন কতটুকু গুরুত্ব বহন করে ইহা ভেবেই তিনি তা করেননি। হিয়া বড় কোরান তফসির করলাম, মাহফিল জমিয়ে সাত রাত সাত দিন কোরান তফসিরের বিরাট আয়োজন করলাম, কিন্তু জীবনেও একটি অন্য ধর্মের মানুষকে মুসলমান বানাতে পারলাম না– আমার মূল্য কতটুকু? আমার মূল্য জিরো তথা শূন্য বললেও দাম দেওয়া হয়। জিরো মাইনাস ফাইভ তথা শূন্য হতেও পাঁচ বিয়োগ দিলে যা হয় সেই দামই আমার। একবার ভেবে দেখুন তো– একটা সম্পূর্ণ অন্য ধর্মের মানুষকে মুসলমান বানানো কত কষ্টসাধ্য ব্যাপার! ভেবে দেখুন তো খাজা বাবার কথা! কত বড় শক্তির অধিকারী হলে পাক-ভারতে লক্ষ লক্ষ হিন্দুদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন। আর আমার মত মাওলানারা? আরবী ভাষার জাহাজ বলতে পারেন। কোরান শরীফকে অক্ষরে অক্ষরে ভেঙ্গে ভেঙ্গে অনুবাদ করার যাদুকরী শক্তি অর্জন করেছি। হিয়া বড় মাহফিলের আয়োজন করে জনতাকে কোরানের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা শুনিয়ে চমক লাগিয়ে দিচ্ছি। বাহ্বার পর বাহ্বা কুড়াচ্ছি কিন্তু সেই তফসিরের মাহফিলে কয়জন অন্য ধর্মের মানুষের আগমন হয়েছে? মাশাল্লাহ! সেটা বলতে গেলে ভীষণ লজ্জা পাব। যদিও বড় বড় পীর-ফকিরদের চৌদ্দ গোষ্ঠি শেরেক-বেদাতের কাল্পনিক ফতোয়াবাজির আঘাতে জর্জর করে সাধারণ মুসলমান ভাইদের চোখ অন্য দিকে সরিয়ে নিচ্ছি। নিজের বিবেক ও ঐতিহাসিক সত্যকে ফাঁকি দিয়ে যাই।

গজনীর সুলতান মাহমুদ সতের বার পাক-ভারত আক্রমণ করেছিলেন মুসলমান বানাবার জন্য নয়– সোমনাথের মন্দিরে রক্ষিত মালপানির লোভে। কোন রাজা-বাদশা, উজির-নাজির, কোন মাওলানা-মুফতী, কোন আরবী ভাষা জানা পণ্ডিত এদেশে মুসলমান বানায়নি। মুসলমান যারা বানিয়ে গেছেন, ইতিহাস যাদের কথা ঘোষণা করে, তাঁরা হলেন, দাতাগঞ্জে বক্স, খাজা বাবা, শেখ ফরিদ, নিজামুদ্দীন আউলিয়া, খান জাহান আলী, শাহ জালাল, শাহ্ পরান, চাটগাঁয়ের বাবা মহসীন আউলিয়া, আরো অনেক অনেক। আর আমরা তথা মাওলানারা? এক ইসলামকে ফতোয়া মেরে মেরে তিন কুড়ি তের টুকরা করে দিয়েছি। এটা কি কম বড় কথা? কত কষ্ট হয়েছে আমাদের!

আমার মত মাওলানাদের মুখ দিয়ে খই ফুটতে থাকে। সাধারণ বিষয়ের কথা না হয় বাদই দিলাম, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কোন মন্তব্য রাখতেও বড় বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করি না। কারণ, সবকিছু জেনে ফেলেছি, বুঝে গেছি, সুতরাং অত ভাবনা-চিন্তা কিসের? অথচ অতি সাধারণ একটি

বিষয় নিয়ে একবার একদল শিয়া খাজা বাবার কাছে গিয়েছিলেন এজিদ সম্বন্ধে মন্তব্য রাখতে। খাজা বাবা এই বলে শিয়াদেরকে বিদায় করে দিলেন যে, ইমাম হুসাইনের চিন্তায় তিনি এত বিভোর যে এজিদের কথা এক মুহূর্তও ভাবতে পারেননি।

আমিত্বের অন্ধকার যখন সালাত কায়েমের দ্বারা দূর হয় তখনই প্রথম পরিচয় হয় আসল কোরানের তথা নূরী কোরানের। এখানে আসল কোরান বলতে বাধ্য হলাম। যদিও আসল বললে নকল কথাটি এসে পড়ে। প্রচলিত ভুল ধারণার জন্যই কোরানকে আসল বলতে বাধ্য হলাম। না হলে কোরান একটিই। যেহেতু কোরান একটিই সেহেতু আসল এবং নকল বলার প্রশ্নই আসতে পারে না। যেহেতু কোরান কাকে বলে বলতেই আমরা প্রায় সবাই ভুল করে বসি, কারণ ভুল ধারণাটাই আমাদের ভুল প্রচারণার দরুণ হয়েছে, সেহেতু 'আসল কোরান' শব্দটি ব্যবহার করতে অনেকটা বাধ্য হলাম।

আসল কোরানের সঙ্গে যখন প্রথম হয় পরিচিত সেই পরিচয় কতই না মধুর। রাতের আঁধার কেটে যখন দিনের আগমন হয় এবং সম্পূর্ণ দিনটির প্রথম আগমনীর বার্তাকে আমরা দিনের ভোরবেলা বলি। সেরকম সম্পুর্ণ কোরানটির প্রথম আগমনীর বার্তাকে বলা হয়েছে ভোরের কোরান তথা ফজরের কোরান। সালাত কায়েম কর ফজরের কোরানের জন্য- কি অপূর্ব ভাষার লালিত্য! যারা মাদ্রাসায় পাঠ করেননি অথবা অন্য কোথাও, তারা কি করে সালাত কায়েম করবেন? অথচ কোরান সবাইকে ডাকছে, সবাইকে বলছে প্রথম কোরানের দিদারের জন্য- প্রথম মানেই ভোরবেলার কোরানের জন্য। তাই ভোরবেলার কোরানকে পেতে চাইলে সবাইকে বলছে সালাত কয়েম কর তথা যোগাযোগ স্থায়ী কর। রাত পেরিয়ে যখন দিনের প্রথম আগমন হয় এবং সেই আগমনের সত্যতা যেমন যাচাই করার কোন সাক্ষীর প্রয়োজন ও প্রশ্নই থাকে না এবং উহা আপন মূর্তিতে সত্যসহ আপনা আপনি প্রমাণিত, ঠিক সেরকমভাবেই সাধনার দ্বারা আমিত্বের অন্ধকার পেরিয়ে আপন পরিচয়ের প্রথম পরিচয় লাভ করে, সেই পরিচয়ের আর একটি নামই হল ফজরের কোরান– এই কোরানের পরিচয় যে লাভ করেছে তার আর সাক্ষী-প্রমাণের কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ, তার সাক্ষী ও প্রমাণ সে যে নিজেই। তাই ফজরের কোরান হল সত্যরূপে প্রমাণিত। আর আমিত্বের বাঁধনে যারা জড়িয়ে আছে, যারা ছয়টি রিপুর তাড়নার তাড়া খেয়ে রিপুর কোলে ঘুমিয়ে আছে, তারা কি এই ফজরের কোরানকে পারবে স্পর্শ করতে? কারণ, এই কোরানের ওজন যে সাংঘাতিক ভারী– তাই তো পাহাড়-পর্বত আর সাগর নিতে চায়নি কোরানের আমানত। মানুষ বোকা, তাই এর আমানত গ্রহণ করেছে। তাই হে মানুষ, তুমি যে কোরানের আমানত নিলে, তোমার যে জীবনসূর্য ঢলে যাচ্ছে মৃত্যুর আঁধারে, তাই কায়েম কর সালাতকে– সালাত কায়েম হলেই কোরানের সুপ্রভাত হবে এবং এই কোরানের সুপ্রভাতের জন্য তুমিই সত্যরূপে তোমার নিজের কাছে প্রমাণিত এবং তখনই তুমি কোরানওয়ালা।

যে কোন মানুষের জীবনে যদি 'ফজরের কোরান' তার রবের ইচ্ছায় তথা আল্লাহর ইচ্ছায় লাভ করতে পারেন তবে ইহাই তার জন্য 'মাকামে মাহমুদা'-তে তথা প্রশংসিত মাকামে স্থান পাবার সৌভাগ্য এনে দেয়। এখন সূরা বনি ইস্রাইলের আয়াতগুলো পড়ে দেখুন তো, মিল পান কিনা।

ওয়ামিনাল্ লাইলে ফাতাহাজ্জাদ বিহি নাফিলাতাল লাকা– আছা আইয়াবেআসাকা রাববুকা মাকামাম মাহমুদা (সূরা বনীইস্রাইল ৭৯ নং আয়াত)।

অর্থাৎ 'এবং রাত্রি হতে কিছু সময় সুতরাং উহাতে তাহাজ্জুদ কর– একটি লাভ তোমার জন্য– হয়তো অচিরেই এমনও হতে পারে যে, তোমার রব তোমাকে উঠিয়ে নেবেন মাকামে মাহমুদাতে।'

কাগজ, পাথর এবং চামড়ার উপর লিখিত কোরান যদি কয়েক মণ হতে হাজার মণের মত ওজনও হয় এবং উহা পাহাড়-পর্বতে যদি রাখা হয়, তাতে কি পাহাড়-পর্বত ধ্বংস হবে অথবা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে? না, তা হবার প্রশ্নই আসে না। তাহলে কোরান পাক এ কেমন কথা বলছে? কাগজের কোরানকেই যদি ধরে নিলাম ইহাই একমাত্র কোরান, তাহলে তো পাহাড়-পর্বত এবং সাগরের এরূপ অবস্থা হতেই পারে না। যেহেতু এরূপ অবস্থা, যাহা কোরানে বর্ণিত হয়েছে, হতেই পারে না সেহেতু কাগজের কোরান কোরান নয় বরং ইহা আক্ষরিক কোরান। নূরী কোরানই প্রকৃত কোরান এবং একমাত্র কোরান এবং ইহা আমিত্ব তথা স্বকীয়তা নামক অন্ধকার সালাত কায়েম দ্বারা দূর করে অর্জন করতে হয় এবং ইহা অর্জন যার হয়ে গেছে তার আত্মপরিচয় লাভ করা হয়ে গেছে।

মাওলানা আবদুল হাকীম এবং মাওলানা আলী আহসান কোরানের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাটি এমনভাবে বিকৃত করে ফেলেছেন যে, অবাক হতে হয়। কত প্রকার অনুবাদ ও তফসিরের দোহাই যে উনারা দিয়েছেন নিজেদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাকে সহি বলে প্রমাণিত করার প্রয়াসে। অথচ ইনারা ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন রচিত অনুবাদের কঠোর এবং জঘন্য অপাঠ্য সমালোচনা করেছেন। উহা এই উভয় পণ্ডিত কর্তৃক রচিত অনুবাদ হতে শতগুণে ভাল, যদিও ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের অনুবাদে হাজারো একই ভুল দেখা যায়। শ্রদ্ধেয় মাওলানা হাকিম ও আলী আহসান 'ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন' নামটিকে জনৈক বলতেও লজ্জা পাননি। এইবার এই উভয় মাওলানার অনুবাদ হুবহু তুলে দিলাম। পাঠকই ইহার বিকৃত করার নমুনাটা ভালভাবে বুঝতে পারবেন। 'সূর্য অস্ত-পথে অবনমিত হইবার পর রজনীর অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর এবং প্রভাতে কোরান পাঠ কর, এবং প্রভাতের কোরান পাঠ সাক্ষীস্বরূপ হইবে।' 'ফজরের কোরান' কে 'কোরান পাঠ কর' – নতুন মাল আমদানি করা হল। এই বাক্য মাল কোথা হতে আমদানি করা হল– পাঠকের প্রশ্ন। ইহা তো গেল অনুবাদের শ্রী। এবার উভয় মাওলানা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পাঞ্জেগানা ফরজ নামাজের কথা এই আয়াত হতে 'সোনার খনি পেয়েছি' বলার মত আবিষ্কার করে ফেললেন। এই আবিষ্কারের গাম্ভীর্য বজায় রাখতে গিয়ে বলেছেন যে, এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আবিষ্কার তারা করেননি। ইহার আবিষ্কার করেছেন এত্যা বড় তফসীরে ইবনে আব্বাস, তফসীরে জরীর, কবির, হাক্কানী ও মোহাম্মদ আলী। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এই আটাত্তর নম্বর আয়াত হতে পেয়ে গেছেন। ইহারই নাম বোধহয় আমাদের দুর্ভাগ্য। আটাত্তর নম্বর আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কথায় যে কতখানি গোঁজামিল দেওয়া হয়েছে তার নমুনা তুলে ধরছি। এই সুরাটি তথা বনী ইস্রাইল সূরাটি মক্কাতে নাজেল হয়েছে এবং নাজেলের ধারাবাহিক নম্বর হিসাবে এই সূরার নম্বর হল পঞ্চাশ এবং হযরত উসমানের দেওয়া ধারাবাহিক নম্বর হল সতের। আনুষ্ঠানিক পাঁচ অথবা (তাহাজ্জুসহ) ছয় ওয়াক্ত নামাজ পড়ার আদেশ হিজরতের পর মদীনায় নাজেল হয়েছিল। যেহেতু আনুষ্ঠানিক পাঁচ অথবা ছয় ওয়াক্ত নামাজের আদেশ মদীনায় নাজেল হয়েছিল সেহেতু মক্কায় আনুষ্ঠানিক সালাত পালন করার আদেশ দেবার কোন প্রশ্নই উঠে না। যদিও আমরা মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর মধ্যে সালাত কায়েম করার আদেশ অনেকবার পেয়েছি। কিন্তু এই সালাত কায়েম করার অর্থ নীতিগত সালাত, আনুষ্ঠানিক জমাতবন্দী সালাত নয়। এই নীতিগত সালাতের মত যাকাত বিষয়টিও একই রকম নীতিগত যাকাত। আয়ের শতকরা আড়াই ভাগ বিশেষ কয়টি মানবকল্যাণের জন্য ব্যয় করার যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, কোরান পাক ইহাকে যাকাত বলেনি। যাকাত বলতে মানবীয় আমিত্বের অথবা মানবের স্বকীয়তার পরিপূর্ণ উৎসর্গ বুঝায় এবং এই কারণে সালাত এবং যাকাত এক সঙ্গে ঘোষণা করার কথা প্রায় ত্রিশবারের মত পাওয়া যায়। এই নীতিগত সালাত এবং যাকাত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও নয় এবং আয়ের শতকরা আড়াই ভাগ খাজনা আদায়ও নয়। শতকরা

আড়াই ভাগ খাজনা, যাকে আমরা যাকাত বলে মনে করে থাকি, ইহার প্রচলন শুরু হয়েছে মদীনায় এবং এই প্রকার খাজনাওয়ালা যাকাতকে কোরান যাকাত নামটিও প্রদান করেনি বরং সাদকা নাম দিয়েছে এবং যেখানেই খাজনার যাকাতের কথা পাবেন সেখানেই সাদকা শব্দটি অবশ্যই পাবেন কিন্তু যাকাত শব্দটি একটি স্থানেও পাবেন না। পাঠক ভাই, ইহা অতি চমকপ্রদ। একটু গভীরে গিয়ে চিন্তা করে দেখুন তো কোথায় যাকাত আর কোথায় হল সাদকা। কিন্তু মাশাল্লাহ! ভুলের পাহাড়ে যাকাতের সৌন্দর্য ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং লেজকাটা রূপটি মুসলিম সমাজে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এখনো চলে আসছে। এই সাদকাকেই যাকাত নাম দিয়ে রাষ্ট্রীয় খাজনাগুলোর একটি খাজনার নামকরণ করা হয়েছে– অর্থাৎ সাদকাকেই খাজনাতে যাকাত নামে পরিচিত হয়েছে। দুই চোখই কানা অথচ পদ্মের মত সুন্দর চোখের মালিক পদ্মলোচন নাম রাখা হয়েছে কানা ছেলের নাম। এখন চোখ না থাকুক– নাম তো রাখা হয়েছে পদ্মলোচন। যাকাত এবং সাদকার ভুলটা অনেকটা এরকম। যাকাত নামের সাদকা মানুষের স্বকীয়তার যাকাত তথা উৎসর্গ নয়- ইহা মালের যাকাত। কারণ যাক্‌কা শব্দ হতে যাকাত শব্দের উৎপত্তি। যাক্‌কা অর্থ পবিত্রকরণ। সালাত এবং যাকাতের মত কোরানকেও ঐ একই রকম অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ কোরান যে নূরী কোরান, কাগজের কোরান নয়, একথা আমরা জানবার সুযোগ পেলাম না। পাহাড়কে ভয়ে বিচূর্ণ অবস্থায় দেখার প্রশ্নই আসতে পারে না যদি নূরী কোরানকে কাগজী কোরান বলে ধরে নেওয়া হয় এবং সত্যিই যদি নূরী কোরানকে পাহাড় এবং সাগরে অথবা যে কোন স্থানের উপর নিক্ষেপ করতেন তবে কি অবস্থা যে হত উহার একটি নমুনা আমরা শুনতে পাই– শুনতে পাই যে, আল্লাহর নূরের অতি সামান্য একটু অংশ তুর পাহাড়ের উপর পতিত হবার পর তুর পাহাড়ের কি শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল। অবশ্য কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, উহা তো আল্লাহর নূর এবং নূরী কোরান নয়, তাহলে অবশ্যই তার প্রশ্নের সঙ্গে আমিও একমত হতে বাধ্য হব বিশেষ কয়টি কারণে, যদিও আগুনের শিখা আগুন হতে আলাদা নয়, তেমনি নূরী কোরান আল্লাহর নূরের সঙ্গে একই সূত্রে বাঁধা এবং মোটেই অবাক হবার কিছু নয় যদি আল্লাহ সত্যি সত্যিই কোরানকে পাহাড়ের উপর নিক্ষেপ করতেন।

(সূরা হাসর ২৯ আয়াত) ***‘লাও আনজাল্‌না হাজাল্‌ কোরানা আলা জাবালিল্‌ লারাইতাহু খাশিয়াম মুতাসাদদেয়াম মিন খাশিয়াতিল্‌লা। অতিল্‌ কাল আমছালু নাদরেবুহা লিন্‌ নাসি লা আল্লাহুম ইয়াতাফাক্‌কারুন।’*** অর্থাৎ ‘যদি আমরা এই কোরান পাহাড়ের উপরে নাজেল করতাম অবশ্যই ইহাকে দেখতে পেতে আল্লাহর ভয় হতে ভয়ে বিচুর্ণ অবস্থায়। এবং এসকল মেসালাই আমরা মানবজাতির জন্য দিচ্ছি যেন তারা চিন্তা করে।’

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। আল্লাহ এই আয়াতে ‘আমি নাযেল করতাম’ বলেননি- বলেছেন, ‘আমরা নাযেল করতাম’। এই ‘আমরা’কে প্রায় অনুবাদেই ‘আমি’ পাবেন। আর একটি কথা পাঠক ভাইদের লক্ষ্য করতে বলি যে, নাযেল করার সময়, হেদায়েত করার সময়, রেজেক বণ্টন করার সময়, রূহ ফুৎকারের সময়, ইত্যাদি কয়টি বিশেষ ক্ষেত্রে আপনি একবারও ‘আমি’ শব্দটি পাবেন না। অঙ্কের হিসাবের মত ‘আমরা’ অবশ্যই পাবেন। ইহার সৌন্দর্য, এত বিস্ময়কর এই রহস্য যে, ইহার আলোচনা করতে গেলে তৌহিদ একেবারে উলঙ্গ হয়ে পড়ে। ইহার আলোচনা আল্লাহ চাহে তো করা হবে- তবে এক কথায় প্রত্যেক-আমরা-রূপী আল্লাহ আমি আল্লাহর আমরার দলের সদস্য এবং প্রত্যেকে পূর্ণ হেদায়াতপ্রাপ্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে এই আমরার দলের সদস্যরাই ধর্মে দীক্ষিত করেন। কারণ, কেহই সহজে চান না বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করতে। ধর্মমত পড়তে এবং গবেষণা করতে একজন সহজেই এগিয়ে আসে, কিন্তু উহাকে বরণ করার প্রশ্ন উঠলেই প্রচণ্ড আঘাতের

প্রয়োজন। এই মানসিক প্রচণ্ড আঘাত এক পীর-ফকির ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না, ধর্ম গ্রহণের ইতিহাস এই কথাই আমাদেরকে জানিয়েছে। আমার এই অনুবাদ ও ব্যাখ্যার যুক্তি যত সুন্দরই হোক না কেন, হোক না যত বড় অকাট্য দলিলপ্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত, কিন্তু ইহার মূল্য চারটি পয়সাও আমি দেব না। যদি কোন অলীয়ে কামেল বলেন যে, ফজরের কোরান বলতে পাঁচওয়াক্ত নামাজের কথাই বলা হয়েছে, তবে অবশ্যই উহা আমি মেনে নেব। কারণ, আমার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আমিত্ব ও স্বকীয়তার মধ্যে থেকে করা, অলীয়ে কামেল যে রকম অনুবাদ ও ব্যাখ্যাই দিক না কেন, উহা যদি আমার মত আমি-ওয়ালাদের কাছে পছন্দ ও যুক্তিসঙ্গত নাও হয় তাতে কিছুই যায় আসে না। কারণ, যত বড় বিদ্যার কচকচানিই আমাদের থাক না কেন, অলীয়ে কামেলের সামনে আমাদের কোন মূল্য আছে বললেও অতীব লজ্জার কথা। আমাদের মূল্য আমরা এত বেশি দিয়ে ফেলি যার দরুণ ইসলাম ধর্মের এমন অবস্থা। আমরা জীবনে বোধ হয় একটি মুসলমানও বানাতে পারিনি বরং মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি আর ফতোয়া মারতে পারি, তা এই অধম লেখকের লিখা দেখলেও বুঝা যায়। কত বড় বাক্কা পণ্ডিত এই অধম লেখকের লিখা পড়লেই পাঠক বুঝতে পারবেন। কিন্তু আসল পদার্থ তথা কামালিয়াতের 'ক'-ও অর্জন করতে পারিনি। কামালিয়াত অর্জন না করে কলম হাতে নিলে কোন অধিকারে? যদি আল্লাহ পাক প্রশ্ন করেন তবে কোন উত্তরই দিতে পারবো না বরং চোখের জলে ক্ষমা চাইতে হবে এবং ক্ষমা পাব কি না তা-ও জানি না। কারণ, আল্লাহকে পাবার পথে বিদ্যা হল সবচাইতে বড় পরদা- ইহা অধম লেখকের কথা নয়, ইহা আহমদে মুখতারের (দঃ) কথা। অধম লেখকের কলমের শক্তি কতটুকু, পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারবেন এবং এই লিখনির মায়াজালে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলেছি যে, নিজের ষাঁড়ের মত স্বকীয়তা হতে মুক্তি পাই কি না জানি না, যদি কোন অলীয়ে কামেলের একান্ত দয়া হয় এবং নেক নজর থাকে এবং পদসেবা করতে পারি, তবে হয়তো অলীয়ে কামেলের নূরী বীর্যের যে ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে উহা হতে অলীর ইচ্ছায় পেতে পারি। অলীয়ে কামেলের নূরী বীর্যের যে ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে উহাকেই বলা হয় কাওসার। এই কাওসার শব্দটি সমগ্র কোরান পাকে মাত্র একটিবার উচ্চারিত হয়েছে। কাওসার শব্দটি সাংঘাতিক গুপ্ত রহস্য। ইহার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করা শরীয়তে অশোভনীয়। ইহা নূরী বীর্যের একটি প্রবহমান ধারা। প্রতিটি বীজের মধ্যে প্রতিটি গাছের স্বভাব-চরিত্র লুকিয়ে থাকে। নিমগাছের ছোট বীজটাতে নিমগাছের গুণাবলী সুপ্ত অবস্থায় আছে। আমগাছের বীজের মধ্যে আমগাছের গুণাবলী ঘুমিয়ে আছে। আমের ছোট বীজটির মধ্যেই বিরাট আমগাছটির সবকয়টি গুণাবলী লুকিয়ে আছে। যখন এই বীজটি চারাগাছ হতে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং অবশেষে একটি বিরাট গাছে পরিণত হয় তখন বুঝা যায় যে, এই বিরাট গাছের সবগুলো গুণই ঐ ছোট বীজটির মধ্যে লুকিয়ে ছিল– ভাবতেও অবাক লাগে যে, এত বড় গাছটার সমস্ত গুণাবলী কেমন করে এতটুকু বীজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে– যে গাছের কাঠ দিয়ে নানারকম জিনিসপত্র তৈরি হয়– খাট, পালং, চেয়ার, টেবিল, আলমারী ইত্যাদি– এই ফার্নিচারের মূলেও সেই ছোট বীজটি। গাছের ফল দিয়ে নানারকম উপাদেয় খাদ্য তৈরি হয়– আচার, আমট, মোরব্বা ইত্যাদি– এই উপাদেয় খাদ্যের মূলেও ঐ একই বীজ– আবার ইহার শিকড় ও পাতায় তৈরি হয় রোগমুক্তির বিভিন্ন ঔষধ– মূলে ঐ একই ছোট বীজ। একবার একটু ভেবে দেখুন তো একটি ছোট বীজের ক্রমবিকাশের ধারার বিভিন্ন রূপগুলো কত বিচিত্র এবং বিস্ময়কর।

সামান্য একটি বীজ হতে যেমন বিরাট একটি গাছের জন্ম তেমনি এক ফোঁটা বীর্যের মধ্যে নিহিত কোটি কোটি অতি ক্ষুদ্র বীর্যকীট যাহা চোখে ধরা যায় না, সেই একটি বীর্যকীট হতে একটি বিরাট মানুষের জন্ম। এই বিরাট মানুষটির দেহটি প্রথমে এতই ছোট ছিল যে, উহা খালি চোখে দেখা যায়

না– দেখতে হলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে চোখ রাখলেই বুঝা যায় এর আয়তন কতটুকু। সাধারণ বীর্য তথা শুক্রের প্রবহমান ধারাকে কাওসার বলা হয়নি। নূরময় বীর্য তথা শুক্রের প্রবহমান ধারাকেই বলা হয়েছে কাওসার। কি সুন্দর রূপকতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে– সাত বেহেস্তের যাবতীয় নালাগুলো বলতে একটি নূরময় মানবদেহ এবং দেহের ভেতর নূরী বীর্য চলাচলের বিভিন্ন পথগুলোকে বুঝানো হয়েছে। একটি জ্যোতির্ময় দেহই যে বেহেস্ত এবং একটি নয় সব কয়টি বেহেস্ত তথা সাতটি বেহেস্তের পূর্ণ অবস্থান, উহাকেই রূপক ভাষায় কাওসার বলা হয়েছে। এই রূপকতার মধ্যে সত্য উপলব্ধি করতে যেন ভুল না করি তার জন্য কি সুন্দর করে পৃথিবীর মাটির সুগন্ধি আছে এই বেহেস্তের কাওসারে। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, বেহেস্তের কাওসারের মধ্যে আবার পৃথিবীর যে মাটি তার গন্ধ কেন এবং সেই গন্ধ আবার সাধারণ গন্ধ নয়– সুগন্ধিযুক্ত গন্ধ? রূপক ভাষায় সত্যটিকে আরো স্পষ্ট করা হয়েছে এই বলে যে, সেই কাওসারের পানির রংটা কিন্তু পানির মত নয়– সাদা দুধের চেয়েও সাদা এবং হরিণের নাভি অপেক্ষা সুগন্ধী। আমরা জানি সাধারণ বীর্যের রং সাদা এবং গন্ধযুক্ত। তাই এখানে আমাদের মত সাধারণ বীর্যের কথা বলা হচ্ছে না– বলা হচ্ছে অতি অল্পসংখ্যক মহাপুরুষের তথা ফানাফিল্লাহর পর্যায়ের অলীদের বীর্যের কথা কারণ, তারা আমাদের মত সাধারণত্ব ডিঙ্গিয়ে গেছেন তাই তাদের বীর্যের রূপ দুধের চেয়েও সাদা। এই দুধের চেয়েও সাদা এবং মৃগনাভির চেয়েও সুগন্ধী বলতে আর একটি রূপকতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ আমাদের মত সাধারণ বীর্য এটা নয়। কারণ, এই বীর্যের ধারার মধ্যে মহাপুরুষ জন্ম নেয়– আমাদের মত নিটিক-ফিটিক জন্মাবে না। আরে ভাই, দুনিয়ার জিন্দিগীতেও আমরা দেখতে পাই, সাধারণত প্রতিভাবানের ঘরেই প্রতিভাবান জন্মায়। যেমন গাছ তেমন তার ফল– এটা কাওসারের মত উঁচু পর্যায়ের দর্শন নির্ণায়ক না হোক কিন্তু আমাদের সাধারণ জীবনেও অনেকটা বাস্তব সত্য। কিন্তু দুঃখ হল কি, চরম সত্য কথা কোরান পাকের যেখানেই প্রকাশ করেছে সেখানেই এক ঝুড়ি রূপকের চিকমিক করা কাগজে মুড়ে দিয়েছেন– তাই আসল সত্যটি সহজে ধরাই যায় না। তাই প্রায় সব তফসীরকারেরাই বাধ্য হয়ে অনেকটা পাগলের মত আবোল-তাবোল যা ইচ্ছা তাই লিখে দায় সারেন। অনেকটা আদম-হাওয়ার গন্ধম খাবার রূপকের মত। প্রায় সবাই আবোল-তাবোল কথার পাহাড় তৈরি করেছেন– কিন্তু আসলে উহা হল যৌনমিলন। কারণ, গম দেখতে অনেকটা নারী জাতির লজ্জাস্থানের মত। অসম্ভবপ্রকার শালীনতার আশ্রয় গ্রহণ করতে গিয়ে রূপকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে আর তারই দরুণ অনেকেই এর আসল অর্থটা বুঝে উঠতে পারেন না।

তাই নূরী বীর্যের প্রবহমান ধারার একটি চিরস্থায়ী অমরত্বের বৈশিষ্ট্য আতা করলেন তথা দান করলেন, কে? 'আমি'-আল্লাহ নয়, 'আমরা'-রূপী আল্লাহ। একবচনে দান করেননি– দান করেছেন আল্লাহ পাক বহুবচনে। যারা আল্লাহর দাস তাদেরকে নিয়ে তিনি 'আমরা'। একটি মোমবাতির আলো দিয়ে হাজার বাতি আলোকিত করা যায়, তাতে প্রথম মোমবাতিটির আলো এতটুকু কমবেও না বাড়বেও না। হাজার বাতির আলোর নাম 'আমরা' আলো– কিন্তু বহুবচন ব্যবহার হলেও আলো আসলে এক এবং অদ্বিতীয়। হাজারের মধ্যেও তিনি, অগণিতের মধ্যেও তিনি, আবার একের মধ্যেও তিনি– কি অপূর্ব বিজ্ঞানময় সুন্দরম সত্যম, সেকেন্ড টু নান।

এত বড় দান যা সমস্ত কোরান পাকের সাতাত্তর হাজার নয়শত তেতাল্লিশটি শব্দের মধ্যে মাত্র একটি শব্দ– সেই আকাঙ্ক্ষিত শব্দটির নাম 'কাউসার' যাহা আতা করলেন অবশ্যই শব্দটি যোগ করে, সুলতানে আম্বিয়া (দঃ)-কে আরবী ভাষার কোরানে এই বলে– *ইন্না আতোয়াইনা কাল্ কাউসার*– নিশ্চয়ই আমরা আতা করলাম আপনাকে কাউসার। এত বড় অমূল্য সম্পদ আপনি পেয়েছেন সুতরাং

সালাত করুন আপনার রবের জন্য– এখানেও আরবী কোরানের ভাষার সৌন্দর্য অপূর্ব বিজ্ঞানময় কারণ, এখানে সালাত কায়েম করতে বলেননি। কারণ, সুলতানে আম্বিয়া (দঃ) সালাত কায়েমের বহু উর্ধ্বে, তাই বলা হচ্ছে *ফাসাললে লে রাববেকা* এবং কোরবানী করুন তথা *ওয়ানহার*। একমাত্র উট ছাড়া অন্য কোন পশুকেই এই কোরবানী করার মধ্যে সম্পূর্ণ রূপকভাবে গ্রহণ করা হয়নি। কেন? উটকেই এখানে কোরবানী করার প্রতীকরূপে কেন বলা হল? এ আবার আরেক রহস্য। উটকে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রথমে বর্শা ফলক ছুঁড়ে মারতে হয় বুকে এবং কণ্ঠনালীতে। দাঁড়ানো অবস্থায় উটের বুক ও গলা দিয়ে রক্ত হু হু করে বেরিয়ে যেতে থাকে। ওহোদের যুদ্ধে সুলতানে আম্বিয়ার (দঃ) পবিত্র রক্ত ঝরেছে, অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে ছিলেন কিন্তু শাহাদাৎ বরণ করেননি। *'হুসায়েন মিননি, ওয়া আনা মিনাল হুসায়েন।'* সুলতানে আম্বিয়ার (দঃ) কি বিস্ময়কর ঘোষণা– কি বিস্ময়কর মর্যাদার সর্বোচ্চশৃঙ্গ। নিরপেক্ষ দৃষ্টির নিরপেক্ষ দর্শনের পাল্লায় মওলা আলীর চেয়েও উচ্চ মর্যাদার পূর্ণ ইঙ্গিত– সেই দানবীয় উচ্ছ্বাসের প্রেতনৃত্য নূরী বীর্যের পবিত্রতম পঞ্চধারার উপর যখন ইট-পাথরের তৈরি মসজিদের মিম্বরে অভাবনীয়, অচিন্তনীয় অভিসম্পাত বর্ষণ করা হত প্রতি জুম্মার নামাজের খোতবায়– ভাবতেও শরীর ঘৃণায়, লজ্জায় রি রি করে উঠে। সেই সময়ের সংগ্রহ করা এই সেই মূল্যবান হাদীসটি। যাদের মুখে মুসলমান শুনবে লক্ষ হাদীস তাদের মুখে শব্দ নেই কেন? যারা হাদীস সংগ্রহ করেছেন তারাও প্রাণের ভয়ে মাওলা আলীর বর্ণিত হাদীস খুব বুঝে শুনেই গ্রহণ করতেন– হাল্কা মুল্যের কোন প্রয়োগ-পদ্ধতির হাদীস হলে। কারণ, তাতে দেহের মধ্যে মাথাটি নাও থাকতে পারে।

সুলতানে আম্বিয়ার (দঃ) সাহাবাদের আমরা একই তাজিমের দৃষ্টিতে দেখি। ছোট-বড় মর্যাদা থাকলেও আমরা সবাইকে অতীব শ্রদ্ধার সহিত তাদের নাম নেই। আল্লাহ পাক নবীদের মধ্যে পার্থক্য করতে যেমন বারণ করে দিয়েছেন আবার উঁচু-নিচুও করে রেখেছেন তিনি নিজেই। আল্লাহ পাক আরবী কোরানে দিবালোকের মত স্পষ্ট ভাষায় সকল নবীর চেয়ে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে যে সর্বোচ্চ আসনে স্থান দিয়েছেন উহা প্রায় তফসিরকারকদের আজ পর্যন্ত নজরেই পড়েনি। দলিল-প্রমাণের দ্বারা প্রমাণ না করে অনুবাদকারীরা গায়ের জোরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাইছেন। পাঠক এবং অনুবাদকারী শ্রদ্ধেয় ভাইদেরকে অনুরোধ করি সূরা আলে এমরানের একাশি নম্বর আয়াতটি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে। এই একাশি নম্বর আয়াতেই হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী উহার জ্বলন্ত প্রমাণ। আরবী কোরানের আর একটিও আয়াত নেই যার দ্বারা সুলতানে আম্বিয়ার (দঃ) শ্রেষ্ঠত্বের এত সুন্দর অকাট্য দলিলরূপে বিবেচিত হতে পারে। অধম লেখকের সবচাইতে বড় দোষ হল যে, সে সাংঘাতিকভাবে নিরপেক্ষ। ধর্মের সাইনবোর্ডে সে বিশ্বাসী নয়। কারণ, সাইনবোর্ড মনে আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু সত্যের দেশে নিয়ে যেতে পারে না। সে কারো দিকে তাকিয়ে কিছু লিখতে জানে না– এতে পাঠক বেজার অথবা খুশি যাই হোক তাতে তার কিছুই যায় আসে না। তবে সংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীতে হযরত ঈসা (আঃ) তথা জেসাস ক্রাইস্ট তথা যীশু খৃষ্টের উম্মত সবচাইতে বেশি। উম্মত তথা অনুসারী কোন নবীর সবচাইতে বেশি বলে প্রশ্ন করলে হযরত ঈসার (আঃ) নামই হবে প্রথম এবং যদি বেশি উম্মত যার তিনিই শ্রেষ্ঠ এই মানদণ্ডে বিচার করা হয় তবে হযরত ঈসাকে (আঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসন দিতেই হবে। কারণ সত্য অপ্রিয় হলেও সত্য।

আল্লাহপাক যেমন নবীদের মর্যাদার উঁচু-নিচু নিজে করে নিজেই আমাদেরকে ছোট-বড় করতে বারণ করে দিয়েছেন, ঠিক সেরকম সরদারে হাশেমী, ইমামে কেবলাতাইন (দঃ)-ও সাহাবাদের মধ্যে মর্যাদার উঁচু-নিচু করে নিজেই আবার তা বারণ করে দিয়েছেন। কারণ, ইলেকট্রিসিটি তথা বিদ্যুৎ

মূলত এক, অখণ্ড কিন্তু বাল্বগুলো বিভিন্ন প্রকার এবং অখণ্ড একক বিদ্যুতের ধারণ ক্ষমতার প্রকারভেদ থাকতে পারে এবং উঁচু-নিচু মর্যাদায় আলো ছড়াতে পারে, কিন্তু বিদ্যুৎ এক এবং ইহার ভাগ করা যায় না, তাই ইহা আহাদরূপে বিরাজমান। নবীরাও আহাদরূপে বিরাজমান, তাই নুফাররেকু তথা পৃথক করা যায় না। তাই যে যার নবীর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে, তাঁর ব্যক্তি স্বাধীনতা ও দর্শনকে শ্রদ্ধাই জানাবো। কারণ, মূলত নবীরা সবাই এক। সিরাজুম মুনিরার (দঃ) মর্যাদার হাদীসগুলো পড়লে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, ইমাম হোসেনকেই শ্রেষ্ঠত্বের তাজ মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন, তারপর মওলা আলীকে, তারপর মা ফাতেমাকে এবং তারপর ইমাম হাসানকে এবং তারপর অন্যান্য সাহাবাদেরকে। (অবশ্য ইহা অধম লেখকের নিজস্ব মত এবং আমার মত ভুলও হতে পারে।) এঁদের মর্যাদার সামনে হযরত আবুবকর সিদ্দিক, হযরত উমর ফারুক এবং হযরত উসমান ধারে-কাছেও ভিড়তে পারবেন না। কারণ, পাক পাঞ্জাতন কাওসারের দাতা, আর তাঁরা হলেন গ্রহিতা। বিজ্ঞজনের জন্য এই একটি বাক্যই বুঝবার জন্য যথেষ্ট। ইহা অতি অপ্রিয় হলেও অতি সত্য কথা। কারণ, ইহা অধম লেখকের কথা নয়– স্বয়ং সরকারে দো আলমের (দঃ) কথা। ***‘হুসায়েন মিননি ওয়া আনা মিনাল হুসায়েন’*** এই একটিমাত্র হাদীসই যথেষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণের জন্য। যদিও আরো অনেক মর্যাদার হাদীস ইমাম হোসেনের উপর আছে। হাদীসটির বাংলা অনুবাদ হল ‘আমা হতে (হযরত মুহাম্মদ হতে) হুসায়েন এবং আমি (হযরত মুহাম্মদ) হুসায়েন হতে।’ ‘আমা হতে হুসায়েন’ ইহা অতি সহজেই বুঝা যায় এবং ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু ‘হুসায়েন হতে আমি’ ইহা খুবই সাংঘাতিক কথা এবং ইহা বুঝাতে গেলে মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরায় এবং ইহা খুবই অস্বাভাবিক মনে হয়। কারণ, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কেমন করে হুসায়েন হতে, এই প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে কিনা জানি না, তবে অধম লেখক ইহার রহস্য বহু চেষ্টা করে আজো পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারিনি– কেমন যেন সব গুপ্ত রহস্যের ধূম্রজাল ছেয়ে আছে।

‘ওয়ানহার’ এর মত স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কারবালার মাঠে হুসায়েন নামক পবিত্র নামের উপাধি ধারণ করে, নাভিমূল হতে মাথা পর্যন্ত মুহাম্মদী সুরত নিয়ে, মুহাম্মদের তরবারি হাতে নিয়ে, মুহাম্মদী পাগড়ী মাথায় ধারণ করে, অসত্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে আলী আকবর, আলী আসগরসহ প্রায় সবাই বুক আর কণ্ঠে তরবারির আঘাতে পূত-পবিত্র রক্ত মোবারক কারবালার উষ্ণ বালিতে ঝরিয়ে বরণ করলেন শাহাদাৎ। ‘আনা মিনাল হুসায়েন’ ‘আমি হুসায়েন হইতে’ তবে কি কারবালার মাঠে ইমাম হুসায়েন শহীদ হননি? তবে কি গণনায় দুইটি পবিত্র দেহে একই একমাত্র কাওসার? তবে কি ‘কাওসারের’ মত সর্বশ্রেষ্ঠ দানের প্রতিদান এই ***ফাসাল্লে লে রাব্বেকা ওয়ান্‌হার*** তথা যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ দান কাওসার (সেহেতু) সুতরাং আপনার রবের জন্য সালাত করুন এবং কোরবানী করুন? এই কারবালার প্রান্তরে যুদ্ধরত অবস্থায় যে বা যারা আপনার পাশ হতে কেটে পড়ে সে বা তারা কাওসার তথা নূরী বীর্যের প্রবহমান ধারার মহানেয়ামত হতে বঞ্চিত, অর্থাৎ আপনাকে যারা এড়িয়ে যায় তারা নিঃসন্তান। এই ‘নিঃসন্তান’, এই ‘আবতার’ তথা লেজকাটা শব্দটি আর একটি সাংঘাতিক গুপ্তরহস্যপূর্ণ কথা। কারণ, যারা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বিরুদ্ধে ছিল এবং আছে তাদের কি ছেলে-মেয়ে নেই? হ্যাঁ, সত্যিই তাদের কোন সন্তান নেই। তাদের একেকজনের ডজন-ডজন ছেলে-মেয়ে থাকতে পারে, তবু তাদের কোন সন্তান নেই। কেন? কারণ, সেইসব সন্তানদের মধ্যে নূরী বীর্যের প্রবহমান ধারা নেই– এই নূরী বীর্যের ধারা হতে তারা বঞ্চিত। সুতরাং তারা আকারে যদিও মানুষের মত কিন্তু প্রকৃতই তারা পশু। তাদের ভাগ্যে পশুজন্ম ছাড়া আর কি থাকতে পারে? যদিও মানুষের মত হুবহু দেখতে, তাই মানুষ বলে ভ্রম হয়। যারা মানুষ জন্ম দেয়নি, দিয়েছে

মানুষরূপী পশু, তারা কি নিঃসন্তান নয়? তারা কি অপুত্রক নয়? এই পৃথিবীতে যত প্রকার আল্লাহর দান আছে তার মধ্যে কি সৎ পুত্র তথা নূরী বীর্যের পুত্র লাভ করা কি সর্বশ্রেষ্ঠ দান না? সুতরাং নিশ্চয়ই যে আপনাকে এড়িয়ে যায় সে নিঃসন্তান। এই আপনি বলে ডাকছে যে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে, তিনি কে? তিনিই নূরে মোহম্মদী রূপে বিকশিত হয়ে ছুটে চলেছেন নূরী বীর্য দান করতে। কাকে? যে বা যিনি আপন আমিত্ব তথা আপন স্বকীয়তা পরিত্যাগ করে নূরে মোহাম্মদীতে ফানা তথা বিলীন হতে পেরেছেন তাকে এই মহানূরী বীর্য দান করতে। তাই প্রতিটি অলীয়ে কামেলের মধ্যে এই নূরী বীর্য ধারণ করে আছে নূরে মোহাম্মদের একমাত্র কাওসার হতে।

মুহাম্মদ নামক নূরের মোমবাতি হতে যত হাজার নূরের মোমবাতির আলো ছড়িয়ে পড়ুক না কেন উহা এককের মধ্যেই এক নূর। আল এমরানের একাশি নম্বর আয়াতের ভাষায় নূরী মোহম্মদী মোমবাতি হতে যে হাজার নূরী বাতি একই আলোয় আলোময় হয়ে আছে তাদের আলোর সামনেও পূর্ববর্তী নবীদের মর্যাদা একই রকম। কারণ 'হুসায়েন যেমন মোহাম্মদ হতে তেমনি মোহাম্মদও হুসায়েন হতে'-এর গুপ্ত রহস্য যিনি উপলব্ধি করেছেন তিনি আর চেঁচামেচি করবেন না।

মাওলা আলী এবং ইমাম হোসেনের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য নির্ণয় করা বোকামী এবং বেয়াদবী। কারণ নূরী সাগরের সবাই এক একটি নূরী মাছ। অবশ্য এই নূরী মাছের আয়তনে বড়-ছোট থাকতে পারে এবং কে বড় এবং কে ছোট ইহার গবেষণা না করে নিজে কেমন করে নূরী বীর্যের অধিকারী হয়ে নূরী মাছে পরিণত হতে পারবো সেই ফিকিরে থাকাই আমাদের অবশ্য এবং একমাত্র কর্তব্য। তবে যদি সাহেবে মেরাজ (দঃ) মর্যাদার পার্থক্য করে যান, উহার কেবলমাত্র বর্ণনা দিতে পারি কিন্তু মন্তব্য অশোভনীয়। আমিত্বের আঁধারে থেকে এই বর্ণনা করতে গিয়েও ভুল এবং বেয়াদবীর সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে। তবে খুব সতর্ক এবং নিরপেক্ষ হয়েই করতে হচ্ছে। আমরা হযরত সাহেবে মেরাজের (দঃ) হাদীস হতে যা পেয়েছি কেবল উহারই বর্ণনা করছি। যদিও প্রায় লোকেই জানেন যে, হুজুর পাকের (দঃ) সাহাবাদের মধ্যে সবচাইতে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হলেন মাওলা আলী। কয়টি হাদীসের গভীরতা দেখলেই উহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। যেমন হুজুর পাক (দঃ) বলছেন, 'আমি যার মওলা, কোন সন্দেহ নেই আলীও তার মওলা', আবার বলছেন, 'আমি জ্ঞানের শহর, আলী তার দরজা' এবং আবার বলছেন, 'আলীর মুল্য আমার কাছে ততটুকু, দেহের মধ্যে জীবনের মুল্য যতটুকু', আবার বলছেন, 'যে আলীকে সাহায্য করে সে আমাকে সাহায্য করে এবং যে আলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়,' আবার বলছেন, 'আলী আমার কাছে সেরকম, যেরকম মুসার কাছে হারুন, যদিও আমার পর নবী নেই', আবার বলছেন, 'যে আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, সে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং যে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, সে আল্লাহর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে।'

হযরত ইমাম বুখারী সাহেব তাঁর বোখারী শরীফ সংগ্রহ করতে যেয়ে তিনি হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এক স্থানে অতি স্পষ্ট ভাষায় হযরত মুয়াবীয়া (রাঃ)-কে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন এবং তার প্রকাশ্যে প্রাণদণ্ড প্রদান করেছেন। যদিও হযরত মুয়াবীয়া (রাঃ)-এর অনেক পরে এই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। কারণ, তখন তিনি জন্মগ্রহণই করেননি। অনেকটা ইংরেজ দার্শনিক রাসেলের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়ার মত। আফ্রিকার সোমালিয়া নামক দেশে রক্ষিত ইমাম বুখারীর ব্যাখ্যাসহ বুখারীর ম্যামত ওয়ার্কসে হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) বিরুদ্ধে এরকম ফতোয়ার ইতিহাস জানতে পারি। অবশ্য এই ফতোয়াটি বাদ দেওয়া হয়েছে এবং আমার মতে বাদ দিয়ে ভালই করা হয়েছে। কারণ, ইহাতে অশ্লীলতা এবং বিভেদের কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি হবার ভয় আছে। কারণ ইমাম বংশ হল করুণার

কাওসার। গলায় ছুরি হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন, তবু আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেননি। কারণ, ফরিয়াদ করলে বিরুদ্ধদল সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যেত। আঘাতের বিনিময়েও প্রেম বিতরণ করাই ইমাম বংশের আদর্শ। নবী আর ইমাম ধ্বংস করতে আসেন না। তাঁরা আসেন গড়তে। হাসিমুখে প্রাণ বলি দিয়ে প্রেমের মূল্যবোধকে দাঁড় করাতে। যীশু যদি নির্মম-নিষ্ঠুর আঘাতের বিনিময়ে হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে ক্ষমা করে দিতে পারেন তবে পাক পাঞ্জাতন কি সেরকম ক্ষমা করতে পারেন না? তাঁদেরকে কি তবে মনের অজান্তে ভাবপ্রবণ হয়ে পৃথিবীর কাছে সূক্ষ্মভাবে খাটো করা হচ্ছে না? শ্রদ্ধেয় শিয়া ভাইয়েরা এই ব্যাপারে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস দেখাতে গিয়ে অনেকখানি খাটো করে ফেলেছেন অথচ তারা মনে করেন যে খুব একটা প্রেম প্রদর্শন করলাম। অবশ্য তাদের প্রেমের উপর কটাক্ষ করার ঔদ্ধত্য আমার নেই। কারণ, প্রত্যেকের মন্তব্য করার ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে। একবার ভেবে দেখুন তো! অবশ্য বেয়াদবী না করে নিরপেক্ষ মন নিয়ে। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর আপন পুত্রকে কোরবাণী করতে গিয়ে হাত থর থর করে কাঁপছে। মমতার কাছে উৎসর্গ হার মানতে চাইছে। তাই কাপড়ে চোখ দুটো বেঁধে নিতে হল, অথচ ইমাম হুসায়েন নামক হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কারবালার মাঠে একটি একটি করে সন্তানদের কোরবাণী দিয়ে চলছেন। পা হতে মাথা পর্যন্ত একদম হুবহু হযরত মুহাম্মদের সঙ্গে মিল আলী আকবর, যার কণ্ঠস্বর শুনতে হযরত মুহাম্মদের (দঃ) কণ্ঠস্বর বলে ভুল হয় সেই সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত আলী আকবর শহীদ হলেন। শহীদ হলেন দুধের শিশু আলী আসগর, তবু তো আল্লাহ পাকের কাছে করেননি কোন ফরিয়াদ। কোন কাতর যাঞ্চা। ভেবে দেখনু তো, একটু চোখ বন্ধ করে চিন্তা করুন তো সেই কারবালার দৃশ্য। সেই পানির পিপাসায় ছাতি-ফাটা আলী আসগরের শহীদ হবার দৃশ্য। তুলনা করতে গেলে কি হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) কোরবাণী প্রদীপ হাতে সূর্য খোঁজার মত তুলনা হয় না? দেহের মৃত্যু প্রেমের জীবন। যুক্তির কবর প্রেমের প্রাণ। যে হাতের প্রেমের স্পর্শে প্রেম প্রজ্বলিত হয়ে বিকিরণ করে প্রেম সেই হাতে পার্থিব সম্মানের মৃত্যু হিমশীতল হয়ে বিকিরণ করে মহাক্ষমা। সেই মহাক্ষমার বেদীতে পুষ্পের অর্ঘ্য করতে গিয়ে কেবলই পুষ্পার্ঘ্য করতে পারে না, সঙ্গে চোখের অশ্রুও মনের অজান্তে দিয়ে ফেলে উপহার। ফুল তখন পাথর মনে হয়। মনে হয় তবে কি পাথর উপহার দিলাম? আবেগের ঢেউ তোলা উচ্ছ্বাসে নিজেকে সামলিয়ে নিতে পারেননি হযরত ইমাম বুখারী। তাই কাফের আর মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়া দিয়ে চরম ঘৃণা প্রকাশ করলেন হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) বিরুদ্ধে।

সবচাইতে বেদনাদায়ক অপ্রিয় সত্য কথা হল, যারা হুজুর পাকের (দঃ) সঙ্গে দৈনন্দিন সংসার জীবনের সঙ্গে ছিলেন নিবিড়ভাবে জড়িত, যারা রসুল পাকের (দঃ) আপন পরিজন, তাদের মুখে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা যে তুলনায় মুসলিম জাহান আশা করেছেন তার হাজারভাগের একভাগও নেই বললেই চলে। এত অতি নগণ্য সংখ্যক হাদীস পাওয়া যায় যাহা প্রতিটি বিজ্ঞ মানুষকে অবাক করে এবং শত প্রশ্নের শত জিজ্ঞাসা হাঁ করে থাকে। যে কোন মহাপুরুষ তাঁর পরিবার পরিজন ও দেশের পরিবেশের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন না। বিশ্ব মানব জাতির জন্য একজন মহাপুরুষ হলেও এই পরিবেশের প্রভাব কিছুটা প্রকাশিত হবেই। সুতরাং রসুল পাকের (দঃ) পারিবারিক জীবনের সঙ্গে যারা ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন তাদের নিকট আমরা অনেক মূল্যবান হাদীস পেতাম। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ইহা হতে একদম নিরাশ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাছাড়া হুজুর পাকের (দঃ) হাদীসগুলো এমন এক সময় সংগ্রহ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল যখন জুমার নামাজের খোৎবায় নবীবংশের উপর এতটুকু করুণা প্রদর্শন করা তো দূরে থাক বরং যাহা চিন্তাই করা যায় না, যাহা মনের মধ্যে ধারণা হতেও ঘৃণা এবং বিদ্রোহ করে, সেই অভিশাপ বর্ষণ করা হত। নবীর বংশের

উপর অভিশাপ বর্ষণ করা— তাও আবার আল্লাহর ঘর বলে কথিত ইট-পাটকেলের মসজিদে (কারণ ইট-পাটকেলের মসজিদকে কোরান পাকের কোথাও মসজিদ বলা হয়নি। হৃদয়ের ভেতর যে মানবসত্তা বিরাজমান উহাকেই আল্লাহর মসজিদ বলা হয়েছে) জুমার নামাজে যে খোৎবা পাঠ করা হয় সে খোৎবায়। যারা নামাজ পড়তে যেতেন তারা তো আমাদের মতই মুসলমান, কিন্তু নবী বংশের উপর এই অভিশাপ বর্ষণ করা কেমন করে হজম করে নিতেন ইহা ভাবতে গেলে অবাকের চেয়েও বড় অবাক হতে হয়। উমাইয়া বংশের খলিফা নামধারীদের এহেন কীর্তিকলাপ সত্যই কলঙ্কিত করেছে ইসলামের ইতিহাস।

জনৈক নাস্তিক জাঁদরেল লেখক তাই হয়তো ইসলামের সাম্যে মুগ্ধ হয়ে আক্ষেপের সহিত মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিল এই বলে যে "যদি আমীর মুয়াবিয়ার বিশ্বাসঘাতকতায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে জনসাধারণের বায়তুল মাল মুষ্ঠিমেয় খলিফা নামধারীদের পরিবার পরিজনদের হাতে চলে না যেত, যদি খলিফা উমরের 'উটের পিঠে যতটুকু খলিফার বসে যাবার অধিকার ততটুকু চাকরের আছে' এই আদর্শ সর্বকর্মে বিরাজ করতো, তবে কার্ল মার্কস কোন দিন গরীব সর্বহারার অর্থনৈতিক মুক্তির সনদ '*ক্যাপিট্যাল*' রচনা করার কল্পনাও অনুভব করতেন না। আজ হয়তো ইসলামের আলোতে মর্ত্যের মাটি মিথ্যার খুলি চুরমার করে দিত।'

আঘাতের বিনিময়ে আঘাত প্রদান করা হল সামাজিক আইন। কিন্তু আঘাতের প্রতিদানে ক্ষমা করতে পারলে হয় প্রেম। কারণ, আল্লাহ পাক ছাড়া কিছুই নেই। সুতরাং প্রেমও তিনি, আঘাতও তিনি, তাই তিনিই পরম দয়ালু এবং চরম শাস্তিদাতা এবং চরম সত্যে তিনিই দাতা, তিনিই গ্রহীতা, তিনিই আশেক, তিনিই মাশুক, তিনিই প্রেমের মধু মিলন, আবার তিনিই প্রেমের বিরহে বিরহী। কারণ, তিনি ছাড়া কিছুই নেই। তাই তিনি আহাদ তথা এবসোলিউট তথা অখণ্ড একক। অবশ্য সামাজিক আইনের মানদণ্ডে হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) দ্বারা মোহাম্মদী ধর্মের যত বড় ক্ষতি হয়েছে এবং মওলা আলীর বিরুদ্ধে সিফফিনের যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে যে কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছেন তাতে তাঁর উপর যে কোন ধরণের শাস্তির ফতোয়া দেওয়া চলে এবং এই ফতোয়ার সঙ্গে আমিও ঐক্যমত পোষণ করি।

যারা হুজুর পাককে (দঃ) আমাদের মত সাধারণ মানবরূপে বিবেচনা করেন এবং কোরান পাকের বাণী "*আনা বাশারুম মিসলেকুম*" এর দোহাই দিয়ে যা ইচ্ছা তাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন তাদের সঙ্গে অনেকেই একমত হতে পারেন এবং ইহাতে আপনাকে বলার মত কিছু নেই কারণ চিন্তার স্বাধীনতা অবশ্যই আপনার আছে, তবে আমি অধম লেখক এর মধ্যে থাকতে চাইনা। কারণ জীবনে আমি কিছুই শিখতে এবং জানতে পারিনি। কেবলমাত্র একটি বিষয় ভাল করে জানলাম বলে অহঙ্কার করতে পারি এবং সেই বিষয়টি হল, 'জ্ঞান অর্জনের শেষ জ্ঞানটির নাম কি তুমি জান? শেষ জ্ঞানটির নাম হল, *আমি জানি না*, কারণ জ্ঞানের কোন সীমা নেই এবং আল্লাহ পাকেরও কোন সীমা নেই।'

দর্শনের ব্যাপকতাভিত্তিক আলোচনা

কবরে যাবার আগে মানুষের শেষ কান্নাটির নাম কি তুমি জান? সঙ্গীত তার নাম। কারণ, সবকিছু এলোমেলো চিন্তার বাঁধনে সঙ্গীত উপহার দেয় একটু বিশ্রাম, একটু জিজ্ঞাসার আড়ালে বেদনায় মিশ্রিত বুক হাল্কা করার চোখের জল, না হয় একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস। আমার কলমের দাগগুলো কারো মনে দাগ না কাটুক। কারণ, যুক্তি ও অভিজ্ঞতা আপনাকে উপহার দেবে ন্যায়ের আইন কিন্তু প্রেম ও সত্য দিতে পারবে না।

চোখ খুলে দেখা এবং চোখ বুজে দেখা — এই দুটো দেখাকে আমরা ভাগ করে নেই। কারণ, খোলা চোখে দেখার নাম বাস্তব এবং চোখ বুঝে দেখার নাম স্বপ্ন বা কল্পনা। বাস্তবকে বলি সত্য এবং স্বপ্নকে বলি অবাস্তব বা মিথ্যে। দর্শন কিন্তু একটি। নাম দিলাম দুটি। অনেকটা সঙ্গীতের সুরের মত। শ্রবণ কিন্তু একটি। নাম দিলাম দুটি। একটি কান দিয়ে শুনা অপরটি হৃদয় দিয়ে শোনা। বেদনা কিন্তু একটি। নাম দিলাম দুটি। চোখ দিয়ে জল পড়ার বেদনা একটি, আর অপরটি হল অন্তরের ভেতর তুষের আগুন জ্বলার মত বোবা বেদনা। একটি দেখা যায় অপরটি দেখা যায় না। আর্ট কিন্তু একটি। নাম দিলাম দুটি। সাদা চোখে আর্টের এক ভাব, আর হৃদয়ের অনুভূতিতে এক ভাব।

তবে কি প্রত্যেকটিরই বাহির এবং ভিতর আছে? তবে কি চোখের দেখাটা বাহির এবং চোখ বুজে দেখাটা ভেতর? তবে কি আমি দেখি না, আমার চোখ দেখে? চোখ হল লাইটের বাল্বের মত। বাল্ব ফিউজ তথা অন্ধ হলে আলোকিত হবে না। আলোর ফোকাস বেরুবে না। চোখ ফিউজ তথা অন্ধ হলে দেহেতে জীবন থাকলেও দেখা যাবে না। চোখ এবং জীবন উভয়টি ঠিক থাকলে দর্শন হয়।

মৃত্যু একটি অবস্থা বা পরিবেশ। একরূপ হতে অন্যরূপ ধারণ করে এই মৃত্যুর মাধ্যমে। মৃত্যু বলতে "কিছুই নেই" (নন একজিসটেনস) নয়। মৃত্যু বলতে কোন কিছু একদম নেই হয়ে যাওয়া বুঝায় না। একদম নেই কোন কিছুই হয় না, হতেই পারে না — এটা বিজ্ঞানের এই পর্যন্ত জ্ঞানসাধনার যে ফল তারই সিদ্ধান্ত। তবে শত কিংবা হাজার বছর পর আবার কি রায় বা সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান দেবে, না এই সিদ্ধান্তই বলবৎ থাকবে, তা আমি জানি না। কারণ, এরই মধ্যে কোন কোন বিষয়ের উপর যে পূর্বসিদ্ধান্ত ছিল উহা কোন কোন ক্ষেত্রে আংশিক আবার সম্পূর্ণও বদল হয়ে গেছে। জ্ঞানরাজ্যে 'এখানেই সব জ্ঞানের শেষ', এক উন্মাদ ছাড়া কেউ বলতে পারে না।

এক কথায় মৃত্যু হল পরিবর্তন। মানুষ প্রথমে একটি সদ্যোজাত শিশু। ইহা একটি বিশেষ রূপ বা অবস্থা। বার বছর পর সম্পূর্ণ আর এক রূপ। কারণ, এখন সেই সদ্যোজাত শিশুটি হাঁটতে পারে, দৌড়াতে পারে এবং কথা বলতে পারে। আমরা বলতে পারি যে, সদ্যোজাত শিশুরূপটির মৃত্যু হয়েছে তথা পরিবর্তন হয়েছে এবং বালকরূপ ধারণ করেছে। এরকমভাবে একটা ধরা-বাঁধা গতিতে রূপ বদলাতেই থাকবে। অবশেষে এক সময় সেই বালকটি বৃদ্ধের রূপ ধারণ করবে। এ আবার আর এক রূপ। বালকরূপের এখানে হয়েছে মৃত্যু তথা পরিবর্তন। বৃদ্ধরূপ হতে সেই সদ্যোজাত শিশুটির আত্মা যখন বিদায় নিল তথা মৃত্যু হল তখন আর প্রাণটিকে দেখতে পাই না। আমরা কেবল এতদিন মাটির দেহটারই পরিবর্তন দেখে আসছি। ছোট থেকে কেমন করে আস্তে আস্তে বড় হল তারপর বুড়ো হল — শুধু এই পরিবর্তনটাই দেখে এসেছি। প্রাণহীন দেহ আর চলতে পারে না এবং তখনই বুঝতে পারি যে, দেহটাই আসল বা মূল নয়। মূল যেটা এতদিন ছিল উহা আর নেই। উহা দেহ ছেড়ে চলে গেছে। দেহটির মাপ সাড়ে তিন হাত পেলাম, কিন্তু যাহা দেহ ছেড়ে পালিয়ে গেছে উহা কয় হাত? উহার মাপ

কত? তবে কি উহা মাপের বাইরে? উহা কোথায় চলে গেল? এই প্রশ্নটির যে উত্তর উহার নাম অজ্ঞেয়বাদ। দেহের যাহা মূল, যাকে আমরা আত্মা বলি সেই মূলটি কিন্তু দেহতে দৃশ্যমান থাকা অবস্থায়ও চিনতে পারিনি যে উহা কি? দেহতে বিরাজ করা অবস্থায় যেহেতু চিনতে পারিনি সেই হেতু দৃশ্যমান জগতেও উহা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়। দেহ ছেড়ে অদৃশ্যমান জগতে বিচরণ করাটা তো স্বাভাবিকভাবেই অজ্ঞেয়বাদ। কিন্তু দেহের মধ্যে বিরাজ করে দৃশ্যমান জগতেও তাকে চিনতে পারলাম না তথা সেই অজ্ঞেয়বাদের অপবাদই রয়ে গেল। তা হলে অজ্ঞেয়বাদ বলে যে এত বাহাদুরী করছি সেই জ্ঞেয়বাদ বলে কি কিছু রইল? তা হলে কি জ্ঞেয়বাদ কথাটাই আমাদের কাছে অজ্ঞেয়বাদ তথা স্বপ্নের মতই মনে হয় না? যে "আমি"-কে নিয়ে এত হুড়াহুড়ি, এত সাজ সাজ রব, এত বানানো বিধান, সেই আমিটাই কিনা রয়ে গেল অজ্ঞেয়বাদের অন্ধকারে। এমনকি এই দৃশ্যমান জগতে আমারই বিচরণ হচ্ছে বলে বিশ্বাস করি। তবে কি বিশ্বাসটারই নাম কুসংস্কার নয়? তবে সংস্কার কাকে বলবো? অবিশ্বাস? অবিশ্বাসের আর এক নাম কি স্বপ্ন নয়? তবে কি দৃশ্যমান জগতে বিচরণ করাটাও স্বপ্ন আর অবিশ্বাস? তবে বাস্তব কোনটি? তবে কি অসীমের (ইনফিনিট) একটি কার্যের অবস্থার মধ্যেই স্বপ্নের সৃষ্টি হয়? তবে কি অসীমের একটি কার্যের কারণে অবস্থার মধ্যেই বাস্তবের সৃষ্টি হয়? 'আমি'-টাই যেহেতু সকল অবস্থাতেই অজ্ঞেয়বাদের কলঙ্ক বহন করে চলছে সেই "আমি"-টাকে চিনবার, জানবার জন্য যে সকল মহাপুরুষ আমাকে দেবে প্রয়োগ-পদ্ধতি তথা এ্যাপলাইড নলেজ, তারা পৃথিবী গ্রহের যে কোন দূরত্বের মধ্যে যে অবস্থাতেই থাক না কেন, উহা আমাকে গ্রহণ করতেই হবে। কারণ, সেই আমার প্রকৃত বন্ধু যিনি আমাকে শিক্ষা দেবেন কোরান পাকের একমাত্র শিক্ষা ***"আপনাকে চেন।"*** তাঁকে নবী, রসুল, অলী, পীর, মুরশেদ, দয়াল, অবতার, দার্শনিক, বিজ্ঞানী-তা যে নামেই ডাকা হোক না কেন সেই আমার প্রকৃত বন্ধু। কারণ, নিজেকে চেনার প্রয়োগ-পদ্ধতির আশায় যারা নিজেকে চেনার প্রয়োগপদ্ধতি না দিয়ে অন্য রাস্তায় যেতে বলে তারা যত বড় মহান, জ্ঞানী আর মহাপুরুষ রূপেই বিরাজ করুক না কেন, আমার কাছে ততটুকু গ্রহণীয় নয়। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির নিরপেক্ষ চিন্তায় সবচাইতে সুন্দরতম নিজেকে চেনার প্রয়োগপদ্ধতি যাঁর মধ্যে পাওয়া যায় তাঁর নাম হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। কিন্তু আপসোস! অবিকৃত কোরান পাকের এত বিকৃত আর মনগড়া নোংরা জাতিভেদের ব্যাখ্যায় স্তূপীকৃত কাগজের আবর্জনায় মাণিক ছাই-চাপা পড়ে গেছে।

সেই সদ্যোজাত শিশুরূপের মধ্যে যে 'আমি' তথা আত্মা একদিন এসেছিল এখন সে কোথায় গেল? সে এবার কিরূপ ধারণ করবে? এবার সে কোথায় থাকবে? যেখানেই থাক না কেন সেখানেই কি দিন-রাত্রির হিসাবে কোটি কোটি বছর থাকবে? না আরো বেশি? না আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসবে? আসলেও কোন রূপ ধারণ করে আসবে? না আর আসবে না? "আমি" নামক আত্মাটি আবার আসুক বা না আসুক, কিন্তু পৃথিবীতে দেহ নামক পদার্থের গঠনের মধ্যে যতদিন থেকে গেছেন সেইসব বাস্তব ঘটনাগুলো যা সে এতকাল দু' চোখ ভরে দেখেছেন, শুনেছেন, অনুভব করেছেন সেগুলো কি তার কাছে এখন চোখ বুজে আমরা যেমন স্বপ্ন দেখি সেরকম মনে হচ্ছে না? এই দেহ নিয়ে বাস করা জীবনটাকে ঘুমে স্বপ্ন দেখে জেগে উঠার মতই কি তার কাছে মনে হচ্ছেনা? আজ যা তার কাছে কঠিন বাস্তব বলে মনে হচ্ছে কাল তাই তার কাছে সম্পূর্ণ স্বপ্ন মনে হবে না? তাকে আমরা আর দেখতে পাই না। তার কারণ? দেহ নামক কবর হতে সে বিদায় নিয়েছে। (আসলে ইসলাম দেহটিকেই কবর বলেছে। মাটির গর্তকে কোথাও কবর বলা হয়নি। তবে সাধারণ মানুষ যদি বলে মাটির গর্তটিই কবর তবে আমি তাদের সঙ্গে একমত)। এমন অনেক কিছুই আছে যা চোখে দেখা না গেলেও সব সময় আছে। যে দধি আমরা খাই উহার সম্বন্ধে কি আপনি কিছু জানেন? অনুবীক্ষণ যন্ত্র

দিয়ে দেখলে দেখতে পাবেন অগণিত পোকা কিলবিল করছে। এই বাক্কা দৃশ্য দেখার পর অনেকেই তওবা তওবা করে দধি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। যেহেতু এই পোকাগুলো চোখে ধরা পড়ে না, সেইহেতু মনের উপর তেমন কোন রেখাপাত করে না।

যেহেতু দেহ হতে আমি বিদায় নিয়েছি এবং যেহেতু আমি আর চোখে ধরা পারছি না, সেইহেতু "আমি" কে জানার সীমানা যেন শেষ হয়ে গেল মনে হয়। জানবার সীমানা দেবার অধিকার আপনার নেই, বরং বলতে শিখুন, "আমি জানি না।" এখানে এসেই দেখতে পাই অনেক বিদ্বান ব্যক্তি ভণ্ডামী করে বসেন। জানি না বলে অকপটে দার্শনিক সক্রেটিসের মত খুব কম পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন। পণ্ডিত ভাইদেরকে আবার অনুরোধ করবো, আপনারা ভুল করুন তাতে তেমন দোষ নেই, কিন্তু "এখানেই শেষ, আর নেই" বলে ভণ্ডামী করবেন না। আপনি মানুষ। ভুল আপনার স্বাভাবিক, কিন্তু ভণ্ডামীটাই কি অস্বাভাবিক নয়? যেহেতু আপনি যা আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে বুঝলেন উহাই সত্য তথা সহি, আর যেহেতু যা আপনি আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝতে পারলেন না উহাই ভুল তথা জয়িফ বলে রায় অথবা সিদ্ধান্ত টানা ঔদ্ধত্য আর অহঙ্কার। সেই ঔদ্ধত্য আর অহঙ্কার বহু পণ্ডিতের মন-মগজে বিরাজ করতো বলেই হযরত মুহাম্মদের (দঃ) বহু গোপন বিজ্ঞানময় রহস্যপূর্ণ বাণীগুলোকে অসত্য তথা জয়িফের অপবাদ দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ইসলামের ইতিহাস এই কথাই আমাদেরকে জানায়।

অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দই-এর রূপ অসংখ্য পোকার একটি কিলবিল করার ভাগাড় যেখানে দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে কি একটি পোকাও আপনি দেখতে পাবেন? তবে কি পোকা-টোকা নেই বলে সীমানা দিয়ে ফেলার অধিকার আপনার আছে? তা হলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, চোখে না দেখার বাইরেও অনেক রহস্য আছে। অতি সাধারণ আর একটি উপমা দিচ্ছি। যেমন ধরুন বেতারের কথা ও গান ইথারে ভেসে বেড়ায়। অথচ আপনি রেডিও নামক যন্ত্র ছাড়া সেই কথা সেই গানের সুর শুনতেই পান না। ইথারে ভাসা কথা ও গানের সুর বিশেষ একটি মাধ্যম ছাড়া শুনা যায় না। অথচ কত দেশের কত কথা ও গানের সুর আপনারই অতি নিকটে ভেসে বেড়ায়। যন্ত্রের মাধ্যমে যখন কথাগুলো শব্দ করে আপনার কানের পর্দায় ধরা দেয় তখনই বিশ্বাস করেন। যিনি কানে একেবারেই শুনতে পান না তিনি কি আমাদেরকে মিথ্যুক বলবেন? যেহেতু সে কিছুই শুনে না সেইহেতু কেহই শুনতে পায় না বলে যদি সিদ্ধান্ত টেনে ফেলে তবে আমরা কি সেই বধিরের জ্ঞানের বহর দেখে হাসবো না? আমাদের হাসি দেখে বধির যদি বলে, যেহেতু আমি শুনতে পাই না কিছুই সেই হেতু কি করে বিশ্বাস করবো যে, তোমরা শুনতে পাও? তোমরা শুনতে পাও বলে যে বিশ্বাস করতে বল, উহা যদি আন্তরিকতা না হয়ে হঠকারিতা হয়?

সসীম (ফিনিট) কি করে অসীমের (ইনফিনিট) রহস্য বুঝবে? মানুষ কি করে আল্লাহর রহস্য বুঝবে? দেহের ভেতর বিরাজিত "আমি" কি করে "অনন্ত আমি"র রহস্য বুঝবে? এই কথাগুলির মধ্যেও কি ভেটো প্রয়োগ করছি না? ঔদ্ধত্যের সীমানায় দেয়াল দিয়ে ফেলছি না? একটি দেহের মধ্যে যে একটি "আমি" আছে সেই আমিটার নাম রেখেছেন পিতা-মাতা অথবা অন্য যে কেউ। যাতে সেই বিশেষ নামটি ধরে ডাকলে একটি দেহের একটি আমি বুঝতে পারে যে তাকেই ডাকা হয়েছে। আসলে কি সেই বিশেষ নামটাই আমি? অন্যান্য কোটি কোটি ভিন্ন ভিন্ন দেহেতে যে ভিন্ন ভিন্ন আমি বাস করছে, সেই আমিগুলি কি এক আমিরই প্রকাশ, না ভিন্ন ভিন্ন আমির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ? এক একটি ভিন্ন ভিন্ন আমি নামক আখের মধ্যে কি এক মিষ্টি আমিরই প্রকাশ? ভিন্ন ভিন্ন করল্লার মধ্যে কি এক তেতোরই প্রকাশ? ভিন্ন ভিন্ন সোনার অলঙ্কারের মধ্যে কি এক সোনারই প্রকাশ? ভিন্ন ভিন্ন

প্রদীপের মধ্যে কি এক আলোরই প্রকাশ? ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মাধ্যমে প্রদীপ জ্বালানো যেতে পারে যেমন কেরোসিন, সরিষা, তিসি, ঘি, গ্যাস, বিদ্যুত ইত্যাদির প্রদীপ, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের দ্বারা যে প্রদীপ ভিন্ন ভিন্ন শক্তির একটি সীমিত মাত্রায় আলো ছড়ায়, উহা কি এক আলোরই প্রকাশ?

অসীম একটি মুহূর্তের তরেও থামে না। ভবিষ্যত মুহূর্তে হয় বর্তমান আবার বর্তমান মুহূর্তে হয় অতীত। অনন্ত ছুটে চলার গতির মধ্য দিয়েই নব নব রূপে তথা আবর্তন-বিবর্তনের মাধ্যমে সসীমকে তথা আমাদেরকে প্রতিটি মুহূর্তেরও কোটি কোটি ভগ্নাংশে জানবার, বুঝবার জ্ঞান দিয়ে অবাক করে চলছে। যত অবাক করে দেয় সসীম, ততই অসীম যেন ক্ষুধার্ত সিংহের মত নতুনের শিকার খুঁজে বেড়ায়। এ খোঁজার যেন আদি নেই অন্ত নেই। মানুষ যেমন ক্ষুদ্র বস্তু নিয়ে খেলার আনন্দে মেতে থাকে, অসীমও মনে হয় সসীমকে নিয়ে খেলায় মেতে চলছে। প্রিয় তার প্রেয়সীর মান-অভিমানে পায় জটিল প্রশ্ন তুলে রাখা- খেলা, না অভিলাষ।

নিজেকে কেমন করে চিনতে পারবো? প্রশ্ন করেন সসীম মানুষ। অসীমের উপদেশ– মোহাম্মদের প্রয়োগ-পদ্ধতি অনুসরণ করলে নিজেকে চিনতে পারবে। সসীমের প্রশ্ন মোহাম্মদের প্রয়োগ-পদ্ধতির অনুসরণ ছাড়া কি নিজেকে চেনার কোন পথ নেই? অসীমের উত্তর, মোহাম্মদ বলতে তুমি কি বুঝ? মোহাম্মদ কি একটি নামের সীমায় বাঁধা? মোহাম্মদ অর্থ হল প্রশংসিত। ঈসা, মুসা, ইব্রাহীম নাম না জানা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার অবতার সবাই তৌহিদের মধ্যে লীন হয়ে আছেন। আপন প্রকাশের যে ধারা, সেই ধারাতে আমি আবরণী তথা পরদা গ্রহণ করি। নিজেকে প্রকাশ করতে গিয়ে যেন পর্দাহীন হয়ে না পড়ি। মানুষ মোহাম্মদ তো আমারই আবরণী। যে আবরণীর মাঝে আমারই প্রত্যক্ষ খেলা উহাই প্রশংসিত। আমিই প্রভু আবার আমিই দাস। আমার দাসত্বের যোগ্য আমিই, তাই আমার সেজদা আমিই করি। কেবলমাত্র আমার এক এক রকম প্রকাশ ও বিকাশের এক এক রকম মর্যাদা ফুটে উঠে।

অনেকের কাছে নিজের পরিচয়-জ্ঞানের অনুশীলনটাই একটা হেঁয়ালী ভাব। যার দরুন মূল বিষয়টা বাদ দিয়ে ধর্ম পালনের নাম দিয়ে কতগুলো কষ্টকর আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া করে চলছি। (মূল না থাকলে ইহা হয় মুল্যহীন) কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এর সত্যতা এই বিজ্ঞানের মাধ্যমেই প্রমাণিত হতে পারে বলে আশা করি। কিছুদিন আগেও মানুষের চাঁদে পা রাখাটা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। অদূর ভবিষ্যতে আরো কত রহস্যের পরদা খুলে যেতে পারে যা আমরা ভাবতেও পারি না। পুনর্জন্মের কথাই কি প্রমাণ হবে, না অন্য কিছু অদেখা সত্য? পুনর্জন্মের মাধ্যমেই কি আত্মা পরমাত্মায় লীন হবে? না আত্মা অগ্নি নামক কোন গরম পদার্থের দ্বারা (ঠাণ্ডাও হতে পারে অথবা এমন কিছু যা জানা নেই) শোধন করে বেহেস্ত নামক পরিবেশ (ইনভায়রনমেন্ট) অথবা স্থানে (রিলম) ঢুকিয়ে দেবে? আমি জানি না — সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়, ভাল ও মন্দ, সুন্দর এবং অসুন্দর, স্বপ্ন এবং বাস্তব এই শব্দগুলো অসীমের অবিরাম গতিতে ছুটে চলার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পরিবেশের বিভিন্ন কার্যের বিভিন্ন কারণের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয় কিনা? ভাই-বোন অসীমের একটি বিশেষ পরিবেশের উপর ভিত্তি করে এবং বিশেষ কার্যের কারণেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হত কিনা আমি জানি না। পাঁচ ভাই মিলে একটি মেয়েকে বিবাহ করা অথবা একটি যুবক অনেকগুলো বিবাহ করা অথবা বিবাহ ছাড়াই অবাধ যৌন মিলন কি একটি বিশেষ পরিবেশের উপর ভিত্তি করে একটি কার্যের বিশেষ কারণ কিনা আমি জানি না। কাঁচা মাংস, ফলমূল খাওয়া, পাথরের অস্ত্র ব্যবহার, গুহায় বাস করা, রোগের কাছে অসহায় হওয়া, সূর্যের রূপ দেখে দেব-দেবীর আসনে বসানো ইত্যাদি কি অসীমের একটি পরিবেশে এক একটি কার্যের এক একটি কারণ ছিল কিনা আমি জানি না। পৃথিবী গ্রহটার মাটি

আর পানিকে শত শত খণ্ডে ভাগ করে, দেশ আর সাগর নাম দিয়ে, আইনের নামে সরকার তৈরি করে, একটি দেশের সঙ্গে আর একটি দেশের যুদ্ধ বাধিয়ে মানুষ মানুষকে খুন করে, খুন করার পুরাতন অস্ত্র হতে আধুনিকতম পদ্ধতি শিখে, অস্ত্র বিক্রি করে পুঁজি বাড়ানো, অন্যকে দারিদ্রের জোয়াল কাঁধে তুলে দিয়ে, সভ্য আর অসভ্যের দেয়াল দাঁড় করিয়ে অসীম কি এক একটি কার্যের এক একটি কেবল কারণই দেখিয়ে চলছে কিনা আমি জানি না। পৃথিবীটাই যদি কোনদিন একটি দেশ, একটি সরকার অথবা সরকার ছাড়াই সাম্য বিরাজ করে এবং মানুষের কাছে যদি পৃথিবীটাই তার জন্মভূমি, পৃথিবীর মানুষগুলোই তার ভাই এবং এই পৃথিবীর মানুষগুলোর ভাল করাটাই তার ধর্ম হয়, তবে সেদিন সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, মানুষকে জংলী বানাবার কমিউনিজম ইত্যাদি ইজমগুলো কি ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে স্বপ্নের মত মনে হবে না?

আল্লাহর বর্ণিত রেজেক ও কিতাবের মূলতত্ত্ব

এক কথায় আল্লাহর আপন গুণাবলীকে রেজেক বলা হয়। যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছার ঘরে বাস করে তথা আমিত্বের কাছে বিক্রি হয়ে যায় তথা স্বকীয়তার বৃত্তে ঘূর্ণায়মান, তথা আপন মনের ইচ্ছায় চলে, তথা এক কথায় যারা দুনিয়াতে (পৃথিবীতে নয়) বাস করে, তাদের কাছে আল্লাহর গুণাবলী প্রকাশিত হবে না তথা রেজেকরূপে পাবে না। এই রেজেক পেতে হলে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এই আত্মসমর্পণ প্রকৃতির নিয়মের কাছে নয়। আল্লাহর ইচ্ছার কাছে করতে হবে আত্মসমর্পণ। আপন স্মৃতিই বন্ধন এবং বিস্মৃতিই মুক্তি। আল্লাহর গুণাবলী রেজেকরূপে দান করার জন্যই তিনি প্রকাশিত হয়েছেন। এই প্রকাশের ধারার নামই কেতাব। এই কেতাব আল্লাহর জাত হতে আগমন। সুতরাং কেতাব হতেই সমস্ত সৃষ্টির আগমন। প্রকৃতির নিয়মগুলো কেতাব হতেই বেরিয়ে আসে। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টিটাই কেতাবের মধ্যে আছে এবং থাকবে। কেতাব আল্লাহর নূর হতে আসে এবং নূর আসে ইশক হতে। ইশকের অর্থ হল প্রেম, ভালবাসা, মহব্বত, লাভ। আল্লাহ নিজের প্রেমে নিজেই প্রেমিক। নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের এবং এর বাহিরে যা কিছু আছে উহা আল্লাহর অখণ্ড রূপের একক প্রকাশ তথা আহাদ। তাই তিনি ছাড়া কিছুই নেই এবং থাকতে পারে না। তাই আর কেহ নেই যে আল্লাহ অন্যের সঙ্গে প্রেম করবে। অন্য কেউ থাকলে, তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, পৃথক অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া হচ্ছে। এবং এই আলাদা কিছু আছে ধারণা করাই শেরেক তথা অংশীত্বের দর্শনকে মনের অজান্তে মেনে নেওয়া হচ্ছে। অথচ সৃষ্টিতে কোথাও অংশীত্বের দোষ আরোপিত করা যায় না। *'লা মওজুদা ইল্লাল্লাহ'* –"কোন কিছুই নেই তিনি ছাড়া"। সুতরাং নাস্তিবাদ বলে কিছুই নেই ইসলামে। নাস্তিবাদ থাকে মনের স্বাধীনতার পাশে ছায়ারূপে। এই ছায়াই মায়া এবং ইহা যে সত্যিই মায়া তা ধরা যায় মৃত্যু নামক ঘটনার দ্বারা। মৃত্যু-ঘটনা আবার দুই প্রকার। একটি মরার আগে মরে যাওয়া, অপরটি দেহ-বিনাশের সাধারণ মৃত্যুবরণ। প্রথমটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং দ্বিতীয়টি সার্বজনীন; ব্যক্তিকেন্দ্রিকটা সাধনার সিদ্ধি লাভের প্রশ্নে এবং দ্বিতীয়টি প্রকৃতির নিয়মে আরোপিত হয়। প্রথমটির সাধনার প্রশ্নে পৃথিবীতে যত মহাপুরুষের আগমন এবং যত ধর্ম-উপদেশ। প্রথমটির সাধনার প্রশ্নে ধর্ম উপদেশের বিভিন্ন প্রয়োগ-ব্যবস্থা।

প্রয়োগ ব্যবস্থা এক নয় এবং এক হতেই পারে না। ইহা অনেক এবং অগণিত। বাংলাদেশের পোশাকে আর শীতের দেশের পোশাকে পার্থক্য থাকতেই হবে। উল্টাপাল্টা করলেই দেহের উপর আসবে প্রবল শাস্তি। সুতরাং প্রয়োগ-পদ্ধতির প্রশ্নে অনেক হতে বাধ্য। যারা প্রয়োগ-পদ্ধতিকেও এক মনে করে জোর করে চালু করতে চায়, তাদেরকেই কাঠ মোল্লা, কাঠ পুরোহিত, কাঠ পাদ্রী এভাবে বিভিন্ন নাম দেওয়া যেতে পারে। আসলে এদের যদি এর রহস্যের কিছু জানা থাকতো, তা হলে এই চেঁচামেচির সৃষ্টিতে মানুষকে বিভ্রান্ত হতে হতো না মোটেই। যেহেতু অন্য কোন পৃথক সত্তায় সত্তাবান প্রাণী, অপ্রাণী এবং কোনকিছুই নেই, সেহেতু আল্লাহ কার সঙ্গে করবে প্রেম? অতএব আল্লাহ নিজের প্রেমে নিজেই প্রেমিক। তাই প্রেমের যে আলোড়ন তোলা ঢেউ জেগে উঠে উহা আল্লাহ হতেই আসে। সেই ঢেউয়ের প্রতিক্রিয়ায় (রিঅ্যাকশন) যাহা বিকশিত হয়ে পড়ে সেই বিকাশের নাম কেতাব। কেতাব হতেই প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত সৃষ্টি বেরিয়ে আসে। এই রহস্যময় সৃষ্টির এক একটি নির্দশন এক একটি চিহ্ন এবং এই প্রকাশ্য প্রমাণিত চিহ্নগুলোকে না মানার তথা অস্বীকার করার কোন উপায় থাকে না এবং এই চিহ্নগুলোকেই বলা হয় কেতাবের এক একটি আয়াত। এই আয়াতের সঙ্গে সংযোগ করা যায় দুই ভাবে। নিজের ভেতর আমিকে রেখে এবং নিজের আমিকে সাধনার দ্বারা ত্যাগ করে নির্বাণ হয়ে। নিজের ভেতর আমিকে রেখে এই আয়াতের দর্শনকে সাধারণ দর্শন বলা হয়। এরকম দর্শন কম বেশি সবার হয়ে থাকে, কিন্তু নিজের আমিকে সাধনার দ্বারা ত্যাগ করে যে চরম দর্শন লাভ হয় উহাকে অসাধারণ দর্শন বলা হয়। আয়াতের সঙ্গে এরকম অসাধারণ দর্শন লাভ করলে মানুষ হতচেতন হয়ে পড়ে, তথা বাহিরের সাধারণ চেতনার হয় অবলুপ্তি এবং তখনই নিজের রহস্য দর্শন লাভ হয় এবং তখনই সাধক ঘোষণা করেন যে, তিনি আদিতেই মুমিন ছিলেন *(আনা আউয়ালুল মুমিনিন)।* দুনিয়ার কলুষিত মায়ারূপ আমিত্ব নিজের মধ্যে থাকা অবস্থায় এরূপ রহস্যের দর্শন লাভ হয় না। কারণ, কলুষিত মায়ারূপ আমিত্ব হল এরূপ সত্য দর্শন লাভের পথে সব চাইতে বড় পরদা তথা দেয়াল। আবার বলতে হচ্ছে, আল্লাহ নিজের প্রেমে নিজেই প্রেমিক। কারণ, তিনি ছাড়া যে কিছুই নেই। আল্লাহর প্রেমের যে আলোড়ন তোলা ঢেউ, সেই ঢেউয়ের বিকশিত রূপটির নাম কেতাব। সুতরাং তার সমস্ত সৃষ্টি জগৎ সমূহ এই কেতাব হতেই আগত। সুতরাং যাহা কেতাবে নেই উহা কোথাও নেই, এমন কি কল্পনাতেও নেই। কারণ, এই কল্পনাও কেতাবেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেতাব সৃষ্টির মূলে হল প্রেম যাকে ইশক বলা হয়। ইশক তথা প্রেম অখণ্ড একক এবং অদ্বৈত। তবু বুঝবার খাতিরে প্রেমের আর একটি নাম হল পার্থিব প্রেম। পার্থিক প্রেমের রূপটিও প্রায় একই রকম। মানুষও নিজের প্রেমে নিজেই মত্ত থাকে এবং এই প্রেমের যে ঢেউ জেগে উঠে সেই ঢেউয়ের প্রতিক্রিয়াটাই স্তরে স্তরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠা মানব সভ্যতা। এই সভ্যতা একজনের প্রেমে নয় এবং একজনের প্রেমের প্রতিক্রিয়াও নয়। বহু মানবের বহু অতীত-বর্তমানের একটু একটু করে জমে উঠা বিশাল প্রেম প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন রূপের নাম হল মানব সভ্যতা। আমি নয় আমরা। এক নয় বহু। আমরার মধ্যেই আমি এবং আমার মধ্যেই আমরা। একটি শরীরের মধ্যেও আমি। আবার বহু শরীরের মধ্যেও আমি। বহু শরীরে বহু আমি কিন্তু আসলে এক আমি। বহু মোমবাতির মধ্যে বহু আলো, কিন্তু আসলে এক আলো। বহু বাল্বের মধ্যে বহু বিদ্যুৎ, কিন্তু আসলে এক বিদ্যুৎ। বহু জলের কলসের মধ্যে বহু জল, আসলে এক জল। বহু আখের বহু মিষ্টি রসের মধ্যে এক মিষ্টি রস। বহু স্থানের বহু রকম গাভী, কিন্তু একই সাদা দুধ। বহু সোনার গহনার মধ্যে বহু সোনা, কিন্তু আসলে এক সোনা।

আল্লাহ বলছেন যে, তিনি নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের সমস্ত জীবের রেজেক দাতা। 'নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডল' এই সামান্য শব্দ দুটোর বিশালতা যে কত বড় উহার ধারণা করাটাও বিরাট কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে মোটামুটিভাবে বলতে গেলে এ দুটো শব্দের বিশালতার সামনে আমাদের এই ছোট পৃথিবী নামক গ্রহটার আয়তন কথায় কথায় একটা আপেলের সমান হতে পারে। পৃথিবী নামক গ্রহের সীমানা যেখানে শেষ আকাশের সীমা শুরু হয় সেখান থেকে। এই নিকটের আকাশের তুলনায় তার উপরের আকাশ আরো অনেক বড়। আরশে আজিম এরকম আকাশগুলো হতে আরো বড়। আরশ, কুরসী, আকাশ, পৃথিবী এবং এই আকাশগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সব মিলেই হল সৃষ্টিজগৎ, এবং এই সৃষ্টিজগতের যেখানে শেষ সেখান হতে শুরু হল ফেরেশতার জগত যাকে বলা হয় 'আলমে মালাকুত।'সৃষ্টিজগৎকে একটি আপেলের মত তুলনা করা চলে ফেরেস্তাদের জগতের সামনে। আবার ফেরেস্তাদের জগৎকে একটি আপেলের মত তুলনা করা চলে রূহের জগতের সামনে। রূহের জগতকে বলা হয় 'আলমে জবরুত'।

নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের শাব্দিক অর্থে যে জগৎ আল্লাহ বুঝাতে চেয়েছেন সেটা আমাদের মত পৃথিবী নামক কুয়োর ব্যাঙ কি করে ধারণা করতে পারে? তাই আমার মত কুয়োতে বাস করা ব্যাঙের পক্ষে কি বর্ণনা দেওয়াটাও সাজে? সুতরাং আল্লাহর কথায় স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, আরো অসংখ্য জগৎই কেবল নেই সেই সঙ্গে অসংখ্য জীবও আছে এবং এই অসংখ্য জীবদের রেজেক দাতাও একমাত্র তিনি। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এই পৃথিবী নামক কুয়োতে বাস করা অধম লেখক এই অগণিত জগতের অগণিত জীবেরা দেখতে কেমন, তারা কি আমাদের মতন না অন্যরকম, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কি আমাদের চেয়ে বহুগুণে বেশি না আমাদের চেয়ে অনেক কম, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনদিনও পরিচয় হবে কি না, তাদের ধর্ম এবং আমাদের ধর্ম এক কিনা, আমাদের পৃথিবী নামক কুয়োতে বাস করা জীবগুলোর নানা প্রকার মত ও পথের বিভিন্নতার জটিলতার কি অবসান হয়ে সবাই এক ধর্মে এক আদর্শে লীন হতে পারবো না এবং উহা কি ইমাম মেহদী নামক কোন মহামানবকে দিয়ে করানো হবে কিনা, সেই রহস্যের প্রকাশিত রূপটি কি অন্য গ্রহের রহস্য, এবং হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বুকে কেন জিব্রাইল নামক ফেরেস্তা অপারেশন করলেন এবং এই সিনাচাক যাকে "বুক অপারেশন" বলে এরই কি-বা রহস্য, ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন আসে। কেন এত প্রশ্ন বুকের মধ্যে জমা হয়ে থাকে? এবং এর রহস্য কি কোনদিনও ভেদ করা যাবে না? কথার সত্যকে প্রমাণিত সত্যরূপে জানতে হলে আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহের প্রচলিত এবং অপ্রচলিত সবগুলো ধর্ম গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে এবং আপন ধর্মীয় সাইনবোর্ড ফেলে দিয়ে একদম নিরপেক্ষ মনোবল নিয়ে যাচাই করে দেখতে হবে তন্ন তন্ন করে। মুখের কথার আনুষ্ঠানিক নিরপেক্ষতার নামে নিরপেক্ষ দর্শন এখানে ভণ্ডামী বলে গৃহীত হবে। আন্তরিক এবং ইতিবাচক মনোবৃত্তির নিরপেক্ষ ভাবধারা নিয়ে কষ্টি পাথরে সোনা যাচাই করার মত প্রতিটি বিষয়কে যাচাই করতে হবে। তারপর ভুল হোক আর শুদ্ধ হোক একটা আন্তরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, এবং সেই সিদ্ধান্ত যদি একান্তই ভুল হয় তবু আন্তরিকতার প্রশ্নে একদম প্রশ্নাতীত বলে দূষণীয় মনে করা হবে না। যদিও উহা বর্জনীয় কিন্তু আন্তরিকতার সঙ্গে বর্জনীয়।

সময়ের একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে সবাইকে লিখতে হয় গবেষণামূলক রচনা। সুতরাং সময়ের গণ্ডীতে সেই রচনা স্থান করে নেয় একান্ত বাধ্য হয়ে। বিজ্ঞানী নিউটন একটি নির্দিষ্ট সময়ের উপর দাঁড়িয়ে এবং বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইনের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। আমি অধম লিখকও একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীর বৃত্তে অবস্থান করে ধর্ম দর্শন লিখছি কিন্তু অন্য একটি সময়ে হয়তো

অন্য কোন লেখক দাঁড়িয়ে যা লিখবে তা হবে অনেক উন্নত, অনেক গ্রহণযোগ্য এবং অনেক নতুন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর নতুন রূপে প্রতিষ্ঠিত। কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান যেমন অবাক করা কম্পিউটার রোবট এবং টেষ্টটিউবে মানুষ তৈরি করার অপূর্ব কৌশল আবিষ্কার করেছেন এবং আরো কিছুদিন পর যে আরো নতুন নতুন অভাবনীয় আবিষ্কার করবে, সেটা তো জলের মত পরিষ্কার বুঝা যায়। এই বিজ্ঞানই এমন একদিন আসবে যেদিন কোন ধর্মের মধ্যে কতটুকু সত্যতা ধারণ করে আছে উহা পরিষ্কার প্রমাণ করে দিবে। এবং যেদিন এই বিজ্ঞান এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ করে দিতে পারবে সেদিন সবাই বিনা বাক্যে সেই ধর্মটিকে অবিসংবাদিত সত্য বলে মেনে নেবে এবং সেদিনই একটি মাত্র শাশ্বত ধর্ম বিরাজ করবে সমগ্র পৃথিবীতে।

এই প্রকৃতির বিধানগুলো (লস অফ নেচার) আসে কেতাব হতে। তাই যাহা কেতাবে নেই তাহা কোথাও নেই। যাহা কেতাবে আছে উহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের প্রশ্নটাই অবান্তর। সন্দেহ মনের ছায়া, সুতরাং উহা মায়া। সুতরাং মন যতদিন আছে ছায়াও ততদিন আছে এবং ছায়া যতদিন আছে মায়াও ততদিন আছে। সুতরাং মনটাকে যাকাত দিতে হয়, কোরবাণী করতে হয় তথা বিসর্জন দিতে হয় আল্লাহর মহামনের মধ্যে এবং ইহাই আমিত্বের বিনাশ, স্বকীয়তার বিলুপ্তি। সুতরাং মন কোরবাণী দিলে ছায়া আর থাকছে না এবং ছায়া না থাকলে মায়াও থাকছে না এবং তখনই আল্লাহর গুণাবলীতে সম্পূর্ণ নিমজ্জমান তথা ফানাফিল্লাহ এবং ইহাই হল আল্লাহর অফুরন্ত রেজেকের অধিকারী হওয়া। কারণ, এই রেজেক লাভ হয়ে গেলে সময়সীমা (টাইম এ্যাণ্ড স্পেস) আর থাকছে না তথা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে যায়। তাই আরবী কোরানে তথা বড় সহিফায় আল্লাহর দেওয়া অনেক আদেশ যাহা নবীকে দেওয়া হয়েছে উহাতে আছে 'আপনি কেতাবে দেখে নিন'-এর গভীর রহস্যটা। তাই আমরা নবীকে বলতে শুনি যে, তিনি দেয়ালের ভেতর যাহা দেখেন দেয়ালের বাইরেও তাহাই দেখেন। তিনি সামনে যা দেখেন, পেছনেও তাই দেখেন।

আল্লাহর রেজেক যিনি লাভ করেছেন, কেতাব তার হস্তগত। কেতাব যার হস্তগত কেতাবের মধ্যে যে বিশ্ব প্রকৃতির বিধানগুলো আছে তাও স্বাভাবিক ভাবেই তার হস্তগত, আর প্রকৃতির বিধানগুলো যার হস্তগত তার ফলাফল ভোগ করাটাও স্বাভাবিক ভাবেই হস্তগত। সুতরাং প্রকৃতির বিধানের মধ্যেই একটি মুরগী একটা ডিম দিল। মনে করুন, ডিম দিবার সময়কে ক নাম দিলাম। একুশ দিন পর বাচ্চাতে পরিণত হবার সময়কে খ নাম দিলাম এবং এই বাচ্চাটির এক বছর পূর্ণ হবার পর যখন সম্পূর্ণ মুরগীতে পরিণত হল, অর্থাৎ ইহাও ডিম দেবার মত বয়সের অধিকারী হল, সেই সময়টির নাম দিলাম গ। ক, খ, গ, এই তিনটি আলাদা সময় ও অবস্থা প্রকৃতির বিধানের মধ্যেই আছে। আল্লাহর রেজেক যিনি লাভ করতে পেরেছেন তিনি ডিমটির ক, খ, গ, তিনটি সময় ও তিনটি অবস্থান পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। কারণ, কেতাব তার করায়ত্ত ও আজ্ঞাধীন হয়ে যায়। আল্লাহর প্রকৃত দাসের পূর্ণ অধীন এই কেতাব। কেতাবের নিয়মকে আপন অধীন করে তোলার নামই হল পূর্ণ কামালিয়াৎ অর্জন করা তথা সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করা। এখানেই অন্য সব সৃষ্টি হতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। তাই যার মধ্যে আমিত্ব আছে তার পক্ষে এই কেতাব অধীন হওয়া তো দূরের কথা স্পর্শ করার ক্ষমতাও নেই *(লা ইয়া মাসসাহু ইল্লাল মুতাহারুন)।* যেহেতু আল্লাহর জাত ও সেফাতের বিকাশের নামই কেতাব সেই হেতু কেতাবের বাইরে কিছু নেই। বৃহত্তম নক্ষত্র হতে আরম্ভ করে ক্ষুদ্রতম অনু পর্যন্ত সবই কেতাবে অবস্থান করে। আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছার মিলন হয়ে গেলে অর্থাৎ ফানা হলে আল্লাহ তাকে স্থায়িত্ব দান করেন অর্থাৎ "বাকা"-এর অবস্থান দান করেন। ইহাকে বলা হয় ফানাফিল্লাহ এবং বাকাবিল্লাহ। এবং সাধক এখানেই কেতাব পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে এবং

কেতাব পরিচালনার যিনি কর্তৃত্ব লাভ করেন তিনিই বেহিসাব রেজেকের অধিকারী হন। আল্লাহর প্রেমে প্রেমিক না হলে আপন ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে মিলানো যায় না। তাই যীশুখৃষ্ট পবিত্র বাইবেলে বলেন, "তোমার সবটুকু হৃদয় দিয়ে, তোমার সবটুকু প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার প্রভু আল্লাহকে প্রেম করবে। এটাই মহৎ ও প্রথম আদেশ। আর দ্বিতীয় আদেশটি হল, তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মত প্রেম করবে এবং এই দুইটি মাত্র আদেশের মধ্যেই সমস্ত বিধান ও ভাববাদী কেতাবও ঝুলছে। যীশুখৃষ্ট পবিত্র বাইবেলে বলেন, "যে কেহ নিজের আমিত্বকে ঊর্ধ্বে উঠাতে চায় তাকে নত করা হবে আর যে কেহ নিজের আমিত্বকে নত করে দেয় তাকে উঁচুতে উঠান হবে। ধর্ম নিয়ে যারা ভণ্ডামী করে ধিক তাদের। কারণ, তারা মানুষের সামনে বেহেস্তের দরজা বন্ধ করে দেয়। তারা নিজেরাও প্রবেশ করে না এবং যারা প্রবেশ করতে চায় তাদেরকেও প্রবেশ করতে দেয় না। চোর কখন ঘরে ঢুকে পড়বে ঘরের মালিক তা জানে না। যদি জানতে পারতো তবে জেগে থাকতো এবং ঘরে সিঁধ কাটতে দিত না। জেগে থাক ও ইবাদত কর। আত্মা ইবাদত করতে চায় কিন্তু শরীরের মাংস দুর্বল। যারা খুন করার অস্ত্র হাতে নেয় তারাই খুনের অস্ত্রে খুন হয়।" যীশু পথ দিয়ে যাবার সময় একটি ডুমুর গাছে কেবল পাতাভর্তি দেখতে পেলেন। কোন ফল নেই দেখে যীশু গাছটিকে লক্ষ করে বললেন, আর কখনো তোমাতে ফল না ধরুক, আর সঙ্গে সঙ্গে গাছটি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল এবং উহা দেখে ভক্তবৃন্দ অবাক হয়ে গেলেন। অবাক হবার কথাই। কারণ, শিষ্যদের তখনো কেতাব অধীন হয়নি। আর যীশুর কথা! কেতাব হস্তগত হওয়া তো তাঁর মত নবীর জন্য একদম মামুলী ব্যাপার। তাই যীশু তাঁর ভক্তদের লক্ষ করে বলছেন, 'তোমাদের আল্লাহতে বিশ্বাসে (ঈমানে) এক সরিষা কণা সন্দেহ যদি না থাকে তা হলে ডুমুর গাছ তো মামুলী ব্যাপার, যদি একটি পর্বতকে বল যে সাগরে গিয়ে পড়, তবে সেই আদেশও পালিত হবে এবং যা চাইবে তাই পাইবে।'

যীশুখৃষ্টের এই উপদেশের মাধ্যমে কেতাব এবং বেহিসাব রেজেকের পূর্ণ ইঙ্গিত পাচ্ছি। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) আদেশ-উপদেশকে কয়জন গ্রহণ করতে পেরেছি? মনগড়া ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করে মনগড়া মেকী ভালবাসি, তাই ফলটাও আসে মেকী। কোন নবী বড় আর কোন নবী ছোট এই সব বাজে কথার বিকৃত, নোংরা আর ঠেটামীর গবেষণা করে নিজেকে চেনার অপূর্ব সময় ও সুযোগ হারালাম। অথচ কোরান পাক ধমকের সুরে নবীদের মধ্যে নুফাররেক তথা ছোট বড় করতে মানা করে দিয়েছেন। কারণ, তারা সবাই মিলে আহাদের তথা অখণ্ডতার সৌন্দর্যের উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর।

গুণ অঙ্ক না জানলে ভাগ অঙ্ক করা যায় না। কান টানলে মাথা আসবেই। রেজেকের কথা বলতে গেলে কেতাবের কথা আসবে। কেতাবের কথা আসলে বিজ্ঞানের কথা আসে। বিজ্ঞানের কথা আসলে আল্লাহর দ্বীন ও মানুষের দ্বীনের কথা আসে আর দ্বীন আসলে মসজিদের কথা আসে। একটার সঙ্গে আরেকটা যেন হাতের পাঁচ আঙুল সাজানোর মত। বাদ দিয়ে যেন কিছু বলার উপায় নেই। আল্লাহর আইনের দুটি দিক। একটি প্রকৃতির আইন (লস অফ নেচার) অপরটি মানুষের চরিত্রের নিয়ন্ত্রণ আইন (কোড অফ হিউম্যান কনডাকট)। প্রথমটির নাম কেতাব এবং দ্বিতীয়টির নাম "দ্বীনে এলাহি" তথা দ্বীন ইসলাম। দ্বিতীয়টির অনুসরণ করলে প্রথমটির জ্ঞান লাভ হয় তথা 'কেতাব জ্ঞানলাভ হয়। যে সকল আইন-কানুন আল্লাহ তাঁর নবীদের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন ইহাকে "দ্বীনে এলাহি" বলা হয়। মানবীয় স্বকীয়তার পূর্ণ সমর্পণের ব্যবস্থাই হল দ্বীনে এলাহির মূল বৈশিষ্ট্য ও সূত্র। 'দ্বীনে এলাহি" মানবীয় সকল প্রকার স্বকীয়তার উপর তথা ব্যবস্থাদির উপর তথা মানবীয় সকল ক্ষণস্থায়ী দ্বীনের উপর প্রাধান্য লাভ করুক তথা মানুষের দ্বীনগুলো আল্লাহর দ্বীনের রঙে রাঙিয়ে নেওয়া হোক – এটাই আল্লাহর ইচ্ছা। এই জন্য কোরান বলছে, ***"ইন্না দ্বীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম"*** অর্থাৎ "নিজেকে

সমর্পণের ব্যবস্থামূলক দ্বীনই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন"। মানবরচিত দ্বীনগুলোত যদি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের উপায় ও ব্যবস্থা না থাকে তবে মানুষের দ্বীনগুলোকে তখনই "দুনিয়া" নাম দেওয়া হয়। কারণ দুনিয়া আল্লাহর পছন্দও নয় এবং মনোনীতও নয়।

অনেকেরই প্রশ্ন, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ আছে কি-না? চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। কারণ প্রকৃতির নিয়মগুলো শিক্ষা করাই বিজ্ঞান। আর প্রকৃতির সমস্ত নিয়ম কেতাবেরই বিষয়সমূহ। ধর্ম মানুষকে "কেতাব জ্ঞান" শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষার পূর্ণতা তখনই হয় যখন আল্লাহ তাঁর দাসকে "কেতাব দান" করেন তথা কেতাবের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করা হয় এবং তখনই আল্লাহর দাস বেহিসাব তথা অফুরন্ত রেজেকের অধিকারী হন। সুতরাং ধর্ম শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে যে কেতাব জ্ঞান লাভ হয় উহা সেই ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে যে কেতাব জ্ঞান লাভ হয় উহা ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষালাভ করাটা প্রথমে সীমাবদ্ধ কিন্তু পরে ব্যাপকতার মধ্যে ছড়িয়ে পরে। ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে যে কেতাব জ্ঞান লাভ হয় উহাতে প্রকৃতির যে কোন আইনকে বদলিয়ে নিতে পারবেন, যদিও ইহা একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং ব্যাপকতার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তবে ব্যাপকতার বিশাল অপ্রতিহত ক্ষমতা এখানে যতটুকু থাকে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে এখনো আমরা ততটুকু পাইনি। একই ব্যক্তি এক স্থানে মৃত অবস্থায় দাফন করার আয়োজন হচ্ছে এবং অন্যস্থানে ভক্ত মুরীদদেরকে নিয়ে খানা খাবার আয়োজন চলছে। এটাই ধর্মের মাধ্যমে কেতাব জ্ঞানদান। একই ব্যক্তি পাঁচ স্থানে একই সময়ে পাঁচটি মরা দেহ ফেলে গেছেন। সবাই দাফন করেছে একই ব্যক্তিকে। পরে জানাজানি হবার পর বুঝা গেল যে ইহা পীর-ফকিরের কারামত। আসলে এই কারামতই হল ধর্ম শিক্ষার বিজ্ঞান। সুতরাং এই শিক্ষায় শিক্ষিতের সংখ্যা সাংঘাতিকভাবে নগণ্য তাই সমাজে ইহার গুরুত্ব বহন করা তো দূরে থাক বরং ঠাট্টা-তামাশার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ইহাকে ভদ্রলোকেরা গাঁজাখোরী গল্প বলে হি হি করে হাসতে থাকে। হাসাটাই খুব স্বাভাবিক এবং ইহাতে ভক্তদের মনে দুঃখ পেলেও বলবার মত কিছুই নেই। তাই পীর-ফকির খাজা উসমান হারুনী বলেছেন যে, তিনি মানুষের অসহ্য ঠাট্টা-তামাশার উপর দাঁড়িয়ে প্রভুর প্রেমে নেচে চলেছেন। তাই ভক্তদেরও দৃঢ় মনোবল নিয়ে এই ঠাট্টা-তামাশার উপর দাঁড়িয়ে সাধনা করতে হবে। এই ঠাট্টা-তামাশার ভয়ঙ্করতা দিনে দিনে চারদিক হতে এমনভাবে বেড়ে চলছে যে, অধিকাংশই ঠাট্টার শিকারে পরিণত হয়ে বরবাদ হয়ে যান। 'এমন এক সময় আসবে যখন ঈমান ঠিক রাখাটা হাতে জ্বলন্ত কয়লা রাখার মত অসহ্য হবে'– হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বাণীটি মনে পড়ছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃতির মহানিয়মের কিছু অংশ মানুষের ব্যবহারে আনতে পেরেছে। প্রকৃতির নিয়মকে বিজ্ঞান শিক্ষায় বদলাতে না পারলেও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতির নিয়মকে বদলাতে সক্ষম হয়েছে। যেমন গর্ভে ধারণ করার বাচ্চাটিকে টেস্টটিউবে বানিয়ে দিচ্ছে। একজনের হৃৎপিণ্ড ফেলে দিয়ে আরেকটা লাগিয়ে দিচ্ছে। একুশদিনের মেয়াদী ডিম ফোটানোকে একদিনের কিছু অংশে ফুটিয়ে দিচ্ছে। কৃত্রিম হীরা, মুক্তা, কাপড়, চামড়া বানাচ্ছে – ইত্যাদি।

ধর্ম শিক্ষা করলেই যে সকলে কেতাব জ্ঞান পাবে এটা মোটেই ঠিক নয়। বিজ্ঞান শিক্ষা করলেই যে সকলে বিজ্ঞানী হবে এটা মোটেই ঠিক নয়। বিজ্ঞানের ডিগ্রী নেওয়া ছাত্র বরিশালের স্বরূপকাঠির সবরি আমের মত টুকরি টুকরি অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু বিজ্ঞানী কয়টি পাওয়া যায়? ধর্ম শিক্ষার ব্যাপারেও ঐ একই প্রশ্ন? কারণ, মাদ্রাসায় পাশ করে কেহই নবী হননি।

'কেতাবের জ্ঞান' অর্জন করতে হলে মনটিকে মসজিদ বানাতে হবে।মনের মসজিদে অবস্থান করতে না পারলে কেতাব জ্ঞান লাভ করা যায় না।

'বিজ্ঞানের জ্ঞান' অর্জন করতে হলে মনটিকে প্রজ্ঞার (ইনটিউশন) মসজিদ বানাতে হবে। প্রজ্ঞার মসজিদে ধ্যানস্থ না হলে বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করা যায় না।

উভয়ের জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতির পরিবেশ অভিন্ন, কিন্তু গভীরতায় ভিন্ন। একজন আপন স্বকীয়তায় কোরবানীর তাকোয়ায় রত, অপরজন আপন স্বকীয়তাকে সাময়িক ভাবে ভুলে থেকে সাধনায় রত।

পৃথিবীর নিকটতম উপগ্রহ চাঁদে এই সেদিন পা রাখলেন মানুষ। হযরত মুহম্মদ (দঃ) সমস্ত সৃষ্টি অতিক্রম করে গিয়েছেন মেরাজে। সৃষ্টির বাইরে যেখানে বিজ্ঞান কল্পনা করতে পারে না সেই বস্তুহীন, স্থান কালহীন 'লা মোকামে' হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বিজ্ঞানের সাহায্যেই গিয়েছিলেন। ইহাই আল্লাহর মনোনীত বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান বলে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) পৃথিবীতে থেকেই শুধু আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দু'টুকরো হতে বলেছিলেন এবং সেই আদেশ সঙ্গে সঙ্গে পালিত হয়েছিলো। দুনিয়ার বিজ্ঞান এরূপ শক্তি অর্জনের ধারণা এখনো করেনি, তবে ভবিষ্যতে কি হয় বলা না। কারণ, জ্ঞানরাজ্যে ভেটো বলে কোন কথা নেই।

লোকের মুখে শুনি যে চাঁদের ফাটল দেখে এলড্রিন, আর্মস্ট্রং এবং কলিন্স অবাক হয়ে একসময় মুসলমান হয়ে যান। তারা যে মুসলমান হয়েছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে চাঁদের ফাটল দেখে না অন্য কিছু বুঝে মুসলমান হয়েছেন উহা তারাই জানেন। খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে তারা যে মুসলমান হয়েছেন ইহা বাংলাদেশে কোন এক দৈনিক খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। কোরানে উল্লেখিত 'হেকমত', যার অর্থ বিজ্ঞান, কথাটির তাৎপর্য ও অর্থ না বুঝে প্রায় তফসীরেই গোঁজামিল দেওয়া হয়েছে। এমনিই তো প্রায় তফসীরই গোঁজামিলের এক একটি আজব বস্তা বানিয়ে রেখেছে, তার উপর 'হেকমত' কথাটির অনুবাদে 'বিজ্ঞান' শব্দ ব্যবহার না করে অন্য শব্দ ব্যবহার করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। কারণ, অনুবাদকারীরা মনে করেন যে, হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সময়টি তো বিজ্ঞানের যুগ ছিল না। অবশ্য এজন্যই এরকম মনগড়া অনুবাদ করা হয়েছে। গোঁজামিলের আজব বস্তা কেউ ইচ্ছে করে বানাতে চায় না। প্রত্যেকেই গোঁজামিল দেওয়াটা অন্তর থেকে ঘৃণা করেন, কিন্তু যার যতটুকু বুঝবার শক্তি অর্জন করা হয়েছে ততটুকু আন্তরিকার সঙ্গেই তিনি ব্যবহার করেন এবং যা জ্ঞানে ধরে না উহা নিরুপায় হয়ে অন্য আর একজন যা বুঝেছেন তারটা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তাই অনেক সময় অসহ্য হয়ে অধম লেখক গালাগালি দিয়েছি। আমার চেয়ে যিনি ভাল বুঝতে পেরেছেন তিনি আবার আমাকে গাল দেবেন - ইহা স্বাভাবিক এবং গালমন্দ হজম করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। কারণ, আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি-জগৎ ছুটে চলছে। একস্থানে থেমে নেই। সরল রেখার মত পথ দিয়ে সৃষ্টি-জগৎ ছুটে চলে না। কোরান সরল রেখার গতির সমর্থন দেননি। দর্শনিক স্পিনোজার অনুমানটা তাই ঠিক হয়নি। বৃত্তাকারে সৃষ্টি-জগৎ ঘুর্ণায়মান, তাই সুন্না তাল্লাহে লা তাবদিলার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। মেরাজে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর গমন এবং আল্লাহ পাকের সঙ্গে মিলনের রূপটি বৃত্তকার। দুই ধনুকের ব্যবধানে । একটি ধনুক অর্ধবৃত্ত। দুই ধনুকের দুই অর্ধ বৃত্ত সমান এক বৃত্ত। যদিও বলা হয়েছে আরো নিকটে। এই 'আরো নিকটে' বাক্যটি দিয়ে উভয়ের ব্যবধান একাকার করে দেওয়া হয়েছে। এই একাকার করে দেবার প্রকাশিত স্থানটিকে নূরে মোহাম্মদী বলা হয়। অনেকে আবার ইহাকে নূরে মোহাম্মদী না বলে নূরে ঈসা, নূরে মুসা, নূরে ইব্রাহীম নামও দিয়ে থাকেন। তা যে নামেই ডাকা হোক না কেন সেই প্রকাশিত স্থানটিকে মুসলমানেরা নূরে মোহাম্মদী বলে এবং অপ্রকাশিত স্থানটিকে বলে আল্লাহ। তাই বলতে শোনা যায় যে জাহিরিতে মোহাম্মদ বাতেনিতে

আল্লাহ। বৃত্তকারে সৃষ্টিজগৎ ঘুরছে, কোরানের এই ঘোষণাটির সমর্থন পেয়েছি জার্মান দার্শনিক হেগেলের দর্শনে।

এই অবিরাম ছুটে চলার গতির কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে কোন কিছুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। অবশ্য সিদ্ধান্ত আমরা অসহায়ের মত নিয়ে ফেলি, কিন্তু শত কি হাজার বছর পর উহার আমূল পরিবর্তন দেখতে পাই।

ইসলাম ধর্ম ও ব্যক্তিমালিকানা

\

কোরান এবং হাদীস শরীফের কোথাও ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি পেলাম না। অবশ্য আমি যতটুকু বিদ্যা অর্জন করেছি তারই একটি প্রকাশমাত্র এবং ইহাই গ্রহণ করতে হবে বলে এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আদেশ দিতে চাই না। তবে বেশীর ভাগ শ্রদ্ধেয় আলেম ভাইয়েরা ইসলামে ব্যক্তিমালিকানা আছে বলেই ঘোষণা করেছেন সুতরাং আমার বক্তব্য গ্রহণীয় নাও হতে পারে। যে কোন চিন্তাশীল নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে 'ইসলামে ব্যক্তিমালিকানা নেই' বললে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। আমার এই অধম প্রবন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের এবং শ্রদ্ধেয় আলেম ভাইদের চিন্তা ধারার পরিবর্তন আসবে কিনা জানি না, তবে তারা যদি ব্যক্তিমালিকানার সপক্ষে কোরান হতে একটিমাত্র দলিল পেশ করে আমাকে দিতে পারেন তবে আমি খুবই খুশি এবং কৃতার্থ হব। কারণ, মানুষ মাত্রেই ভুল করে এবং আমিও মানুষ, সুতরাং ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে আমিও নই এবং তাতে আমার ভুল সংশোধন করে নেব।

সমগ্র কোরান-হাদীস আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ব্যক্তিমালিকানার পক্ষে একটি কথাও পেলাম না, বরং তার বিরুদ্ধেই বলা হয়েছে। আমি ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধে যে সমস্ত বাণী পেয়েছি উহারই ক্ষুদ্র একটি অংশ প্রবন্ধকারে লিপিবদ্ধ করলাম।

'আল্লাজি জামাআ মালাও ওয়াদ্দাদা' কোরান শরীফের এই একটিমাত্র আয়াতকেই ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধে অকাট্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দলিলরূপে পেশ করতে চাই। এই আয়াতের হুবহু অনুবাদ হল 'জমা করে সম্পদ এবং গুণে-বেছে রাখে'। এখন সবচাইতে বড় প্রশ্নটি হল, সম্পদ কাকে বলে? সম্পদ বলতে কি বুঝায়? সম্পদ বলতে কি কাগজের টাকা এবং ধাতুর তৈরি পয়সা বুঝায়? অর্থনীতির অতি সাধারণ বিদ্যাটুকুও যারা রপ্ত করেছেন তারাও জানেন যে, কাগজের টাকা ও ধাতুর তৈরি পয়সা কেবলমাত্র সম্পদ আদান-প্রদান করার একটি সহজ উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়। যেহেতু কাগজের টাকা ও ধাতুর তৈরি মুদ্রায় জিনিসপত্রের লেনদেন তথা আদান-প্রদান করতে হয় সহজ, সেহেতু ইহাকে মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তা হলে সম্পদ কাকে বলা হয়? জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর, খাদ্যশস্য, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, কাপড়-চোপর ইত্যাদি যাহা জীবন ধারণ করতে প্রয়োজন হয় তাকেই মোটা কথায় সম্পদ বলে। অচল টাকা এবং অচল পয়সায় সারাটি দিন পৈ পৈ করে ঘুরেও আপনি কি এক টুকরো কাপড় সংগ্রহ করতে পারবেন, অথবা কেউ আপনাকে পেটের ক্ষুধা মেটাবার খাদ্যদ্রব্য দেবে, অথবা যে কোন জিনিস? কেউ আপনাকে দেবে না। কারণ, সম্পদ বিনিময় করার মাধ্যমটি সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। এমনও পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যখন যুদ্ধের ভয়ঙ্কর আঘাতে নাগরিক জীবন সর্ববিষয়ে পর্যুদস্ত। জীবন বাঁচানোর প্রশ্নে সম্পদের অভাব, খাদ্যশস্যের ভীষণ ঘাটতি, তখন কাগজের টাকা এবং ধাতুর মুদ্রার মুল্য অনেকক্ষেত্রে এমন মুল্যহীন

হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, পরনের সাধারণ একটি লুঙ্গি, যার দাম খুব বেশি হলে ত্রিশ টাকার ঊর্ধ্বে নয় উহাই সাড়ে চার শত টাকায় খরিদ করতে হয়েছে। (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বার্মার কোন একটি বাজারে)। এক বেলা পেট ভরে হোটেলে খেতে গিয়ে ছয় শত কুড়ি টাকা দিতে হয়েছে এবং তার দুদিন পরেই এক বস্তা টাকা হোটেলের মহাজনকে তেল মেখে দিয়েও পেট ভরে খাওয়াতে পারবে না বলে হুমকি শুনতে হয়েছে। (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান যখন সিঙ্গাপুর আক্রমণ করে)। ফ্রান্সের প্যারী শহরে তো এর চেয়ে বেশি টাকা দিয়েও মানুষ একমুঠো খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে পারতো না। এখন নিজের বিবেককে প্রশ্ন করে দেখুন তো, কাগজের টাকা এবং ধাতুর তৈরি মুদ্রাই কি সম্পদ না জায়গা-জমি, কাপড়-চোপড়, খাদ্যশস্য ইত্যাদিই সম্পদ? নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যদি আপনি টাকার বস্তা দিয়েও না পান তখন কি আপনি মনে মনে এই ভাববেন না যে, কাগজের টাকা, ধাতুর তৈরি মুদ্রা কখনোই সম্পদ হতে পারে না। তবে আপনি কি এখনো সম্পদ বলতে কাগজের টাকা ও ধাতুর তৈরী পয়সাকে মনে করছেন? না-কখনোই মনে করতে পারেন না। শুধু সম্পদ আদান-প্রদান করার একটি উপায় ছাড়া টাকা ও মুদ্রার কি আর কোন মূল্য আছে? সম্পদ বলতে যে জায়গা-জমি, খাদ্যশস্য, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি ব্যবহার্য জিনিসপত্রকেই বুঝায়নো হয়েছে এতে কি আপনার এখনো কোন সন্দেহ থাকতে পারে? যদি এগুলোকেই আপনি সম্পদ বলে মেনে নেন তবে এগুলো জমা করে রাখা তথা মজুদ করে রাখতে পারছেন না। কারণ, কোরান সম্পদ জমা করে রাখতে নিষেধ করছেন এবং নিষেধ অমান্যকারী হুতামা নামক জ্বলন্ত নরক অগ্নিতে অবশ্যই বাস করবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল কতটুকু সম্পদ জমা করতে কোরান বারণ করেছেন? কোরানে সম্পদের কোন পরিমাণ দেননি বরং বলা হয়েছে যে, যে জমা করে সম্পদ অর্থাৎ জমা করাটাই হুতামা তথা জ্বলন্ত অগ্নি অর্থাৎ যত ক্ষুদ্র সম্পদই হোক না কেন, উহা জমা করতে মানা করছে তথা ব্যক্তির অধিকারে কোন সম্পদই জমা করা বারণ করা হয়েছে হুতামার হুমকি দিয়ে। এখন প্রশ্ন হল, সম্পদ ব্যক্তির অধিকারে যে কোন পরিমাণ রূপেই জমা থাক, যদি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি দেওয়া হয় তবে ব্যক্তিমালিকানায় সম্পদ জমা করা জ্বলন্ত অগ্নি হয় তবে ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি তথা প্রাইভেট প্রোপারটির স্বীকৃতি কোথায়? কোরানের এই আয়াতে আমরা ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি তো দূরে থাকে বরং জ্বলন্ত আগুন রূপেই দেখতে পাই। কোরান কি একবার ব্যক্তি মালিকানার বিরুদ্ধে আবার অন্যত্র ব্যক্তিমালিকানার পক্ষে বলতে পারেন? অবশ্য যুগের চাহিদা অনুযায়ী সম্পদ বণ্টনের নানা রকম ব্যবস্থা থাকবে এবং থাকতে পারে এবং আছে এবং থাকবে। সব যুগেই যে একই রকম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু থাকবে ইহা অসম্ভব এবং ইহা আল্লাহর সৃষ্টির প্রকাশের ধারার মধ্যে নেই। অনেকখানি সম্পদ একজনের আমানতে থাকতে পারে, তাই বলে যার আমানতে আছে উনি যদি নিজেকে সম্পদের মালিক বলে ঘোষণা করে তবে ইহা সম্পূর্ণ কোরান বিরোধী ঘোষণা। মানুষ অনেক কিছুর আমানতদার হতে পারে কিন্তু কোন কিছুরই মালিক হতে পারে না। আমার প্রবন্ধের সার বক্তব্য কিন্তু ইহাই। আমার ভয় হয়, অবশেষে কি বলতে গিয়ে পাঠক কি বুঝে ফেলেন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামের শরীয়তের একটি প্রধান আইন, কিন্তু ইহা ইসলামের কখনোই মূলনীতি নয়। ইসলামের মূলনীতি হল, নিজের আমিত্ব বর্জন করে আল্লাতে ফানা হওয়া তথা নিজেকে চেনা। এখানেই ইসলাম এবং মানুষকে পশু বানাবার কমিউনিজমের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। যেহেতু কমিউনিজমে মানুষের জৈবিক চাহিদার একটি নিরেট প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা এবং আত্মা-টাত্মার ধার ধারার প্রশ্ন তো দূরে থাক, বিশ্বাসই করে না তথা 'আর কোন জ্ঞান নেই' বলে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেই হেতু কমিউনিজম হল মানুষকে পশু বানাবার নুতন মতবাদ।

অবশ্য গুরুদেব কার্লমার্কস পোল্যাণ্ডের এহেন অবস্থা দেখলে কয়বার যে দাঁতে দাঁতে লেগে জ্ঞান হারাতেন!

ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি যেহেতু ইসলামে নেই, সেই হেতু ব্যক্তির জমা করে রাখা পুঁজির প্রশ্নটিও অবান্তর। যেহেতু ইসলামে ব্যক্তির জমা করে রাখা পুঁজির প্রশ্নটি অবান্তর সেই হেতু সুদ বলে কোন কিছু কল্পনা করাটাও ইসলামে নেই। ব্যক্তির হাতে পুঁজি থাকছে না, তাই সুদের প্রশ্নও আসছে না। যেহেতু ইসলামে সুদ হারাম তথা নিষিদ্ধ, সেই হেতু ব্যক্তির কাছে পুঁজি তথা মাল থাকার স্বীকৃতিও হারাম, তথা ব্যক্তি মালিকানায় কিছুই থাকছে না। মানুষকে জানোয়ার বানাবার কমিউনিজম, ব্যক্তি মালিকানার মৌলিক স্বীকৃতি না দিলেও ব্যক্তিকে ভরণ-পোষণের জন্য যা রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত করে দেওয়া হয় তার উপর ব্যক্তির পূর্ণ কর্তৃত্বকে মেনে নেওয়া হয়, কিন্তু ইসলাম সেটুকুরও স্বীকৃতি দেয় না। তথা মেনে নেয় না অর্থাৎ কোন কিছুরই মালিক হওয়া তো দূরের কথা, এমনকি তার দেহ মন তথা সে-ও তার নয়, অর্থাৎ ব্যক্তি নিজেও তার নয় এবং সেই হেতু ব্যক্তি কোন কিছুরই মালিক নয়। মানুষ আল্লাহর গোলাম। কিন্তু এই গোলামরূপে চলার পথে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজের মন বা আইডিয়া। এই জন্য ইসলাম নিজের খেয়াল খুশী মত চলাকেই কুফুরী জিন্দিগী বলেছে এবং এই জিন্দিগীকে ‘নফসে আম্মারা’ খেতাব দিয়েছে। ইসলামের ভেতর নিজের খেয়াল-খুশী মত চলার স্বাধীনতা নেই এবং থাকতে পারে না। কারণ, খেয়াল-খুশী মত চলাকেই ইসলাম ‘দুনিয়াতে’ বাস করছে বলে অভিহিত করেছে এবং এরূপ দুনিয়াতে যে ব্যক্তি বাস করতে চায় তাকে মরদুদ তথা শয়তান বলা হয়েছে। কারণ, শয়তান আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ না করে নিজের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, তথা নিজের প্রবৃত্তির গোলামী করেছিল এবং এই গোলামীকে ইসলাম জঘন্য জীবন বলে অভিহিত করেছে এবং এর পরিণাম জাহান্নাম তথা অনুশোচনার আগুনের শাস্তি। অনুশোচনার আগুন কথাটি অনেকেই ভাল করে বুঝতে পারেন না। কারণ জাহান্নামের আগুন কিন্তু কোন ঘর-বাড়ী পোড়ায় না, জাহান্নামের আগুন কোন কাপড়-চোপড় পোড়ায় না, কোন কাঠ-কয়লা পোড়ায় না, এমনকি ইহা মানুষের দেহটিও জ্বালায় না। তবে জাহান্নামের আগুন কি জ্বালায়? ইহা কেবল একটি জিনিসই জ্বালায়। উহা কি জিনিস? উহা তথা জাহান্নামের আগুন শুধু মানুষের অন্তরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একাকার করে দেয়। জাহান্নামের আগুনের কত বড় শক্তির অদৃশ্য উত্তাপ হলে, কতটুকু অন্তরে দাহ তৈরি হলে মানুষ অসহ্য হয়ে গলায় দড়ি, নানারকম বিষ সেবনে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে ফেলে-ভাবতে গেলেও অবাক হতে হয়; আর অবাক হতে হয় কোরানের বিজ্ঞানময় ভাষার লালিত্য ও গভীর দর্শন দেখে। কোরানের গভীর দর্শন দেখতে পেয়ে ইউরোপের কিছু দলপ্রিয় দার্শনিক হিংসায় যা-তা বলতেও বিবেকে বাধেনি।

আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যে এইরকম স্বাধীনতা কাউকে দেওয়া হয়নি (অবশ্য আমাদের জানা মতে)। সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য আল্লাহর গোলামী করছে কেবল দুটো প্রাণী বাদে। একটি মানুষ অপরটি জ্বিন। এই দুটোকেই ব্যক্তিস্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে, তোমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে আল্লাহর হয়ে যাও তথা দাস বা গোলাম হও। কারণ, সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য আল্লাহর গোলামী করছে এবং যেহেতু সকলেই আল্লাহর গোলামী করছে সেইহেতু সকলেই মুসলমান, কেবলমাত্র মানব এবং জ্বিন নামক দুটো প্রাণীকে গোলামীর বাধ্যকতায় না ফেলে স্বাধীনতা প্রদান কলেছেন এবং সেই সঙ্গে এই স্বাধীনতার কুফুরী হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য কেবলমাত্র এদুটো জাতিকেই ইবাদত তথা গোলামী করার আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যই স্রষ্টার গোলামী করছে তথা ইবাদত করছে তথা তসবিহ পাঠ করছে তথা জিকির করছে তথা সেজদায়

আছে তথা এক কথায় সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য আল্লাহর এক, একক এবং অখণ্ড বিধান তথা দ্বীনে এলাহিতে বাস করছে, সেইহেতু সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য মুসলমান তথা আত্মসমর্পণকারী। ব্যতিক্রম কেবলমাত্র মানব এবং জ্বিন জাতির ক্ষেত্রে, যেহেতু মানব এবং জ্বিন জাতিকে ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে তথা নির্বাচনী ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে সেইহেতু স্রষ্টাকে আবেদন করতে হয়েছে, সাবধান করতে হয়েছে, ভয়ঙ্কর শাস্তির হুকুম দিতে হয়েছে এই বলে যে, তোমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে তথা আমিত্বকে ধ্বংস করে তথা হাস্তি বা খুদিকে মিটিয়ে দিয়ে, তথা মরার আগে মরতে, তথা নিজের স্বল্পস্থায়ী দ্বীনকে বর্জন করে স্রষ্টার একক, অখণ্ড দ্বীনে এলাহিতে আত্মসমর্পণ করতে, তথা ইবাদত করতে। তাই কোরান ঘোষণা করেন যে, তিনি কেবলমাত্র মানব এবং জ্বিনকে ইবাদত করার জন্যই তথা দাসত্ব করার জন্যই তৈরি করেছেন। যেহেতু মানব এবং জ্বিন জাতির অনেকেই আল্লাহর দাসত্ব তথা ইবাদত করতে নারাজ এবং নিজের স্বাধীন প্রবৃত্তির ইচ্ছায় চলতে চায় সেইহেতু কেবলমাত্র এই দুটো জাতিকেই 'ইবাদত করবার জন্যই সৃষ্টি করেছে' বলে কোরানকে ঘোষণা করতে হয়েছে। কেবলমাত্র এই দুটি জাতি ছাড়া আর কাউকে কোরান 'ইবাদত কর' বলে আবেদন করেননি। কারণ, সৃষ্টিরাজ্যে আর কোন প্রাণীকেই নির্বাচনী ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, তথা ব্যক্তিস্বাধীনতা দেওয়া হয়নি এবং সেইহেতু সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য আল্লাহর একক বিধানে তথা আল্লাহর দ্বীনে বাস করছে এবং সেইহেতু তারা সদা সর্বদা ইবাদতে রত আছে এবং সেইহেতু তারা সবাই মুসলমান। কেবল মানব এবং জ্বিনকেই এর ব্যতিক্রম করে তৈরি করা হয়েছে এবং এই ব্যতিক্র,হেতু তারা কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান তথা আত্মসমর্পণকারী হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের নির্বাচনী ক্ষমতা তথা ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের দাসত্বকে হাসি মুখে বরণ না করে। মনে থাকে যেন, এখানে বলা হয়েছে ইসলামের ভিতর ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই। তা হলে প্রশ্ন আসবে, তবে কি ব্যক্তি স্বাধীনতা ইসলামের বাইরে? হ্যাঁ, ব্যক্তি স্বাধীনতার আর এক নাম আমিত্ব। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পনের আগে এই আমিত্ব কিছু না কিছু থাকবেই । এখানে ইসলামের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে যা ইচ্ছে তাই করে যাবেন, এটা ইসলাম স্বীকার করে না। তবে প্রয়োগ পদ্ধতিতে স্বাধীন মতামত এবং দর্শন প্রদান করার পূর্ণ স্বাধীনতা আপনার আছে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিভিন্ন চিন্তাবিদের বিভিন্ন মত ও দর্শনের সৃষ্টি হতে পারে এবং তা হয়েই থাকে। যেমন ইমাম গাজ্জালী এবং ইমাম তাইমিয়ার কথা ধরা যাক। বিবেককে ফাঁকি না দিয়ে বিচার করলে ইমাম গাজ্জালীর দর্শন ইমাম তাইমিয়ার ঠিক বিপরীত। তাই বলে কি চট করে কাফের ফতোয়ার তরবারি বসিয়ে দেব? তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের বিরুদ্ধে অনেক রকম যা-তা ফতোয়া মারতে দেখে ভীষণ দুঃখ পাই। এই অল্পদিন আগে আল্লামা ইকবালকে কয়েকশত আলেম কাফের ফতোয়া দিয়েছিল এবং কবি কাজী নজরুল ইসলামকেও। ইসলামের মধ্যে দল তৈরি করে এক শ্রেণীর আলেম সমাজ যে কত বড় ক্ষতি করে চলছেন এবং এই ফতোয়ার কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি করেই তো আজ আমাদের এহেন রূপখানা দেখে পৃথিবী হি হি করে হাসে। সবাইকে যদি দার্শনিক হতেই হবে বলেন তা হলে বাজারের তরকারী, মাছ-মাংস বিক্রি করবে কারা? তারা না থাকলে আপনি চলবেন কেমন করে? সেটা একবার ভেবে দেখেছেন তো? না, না ভেবেই ফতোয়া মেরে দেবেন? ব্যক্তিস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি করা -ইহা কি মেনে নিতে চাইছেন? টোটাল সিনসিয়ারিটি তথা সম্পূর্ণ সততার মাধ্যমে কোরান হাদীস গবেষণা করতে হবে এবং এতে কার সঙ্গে কতটুকু মিলে বা মিলে গেল উহা বিচার্য নয়। ইসলামের রূপ ও দর্শন যা বুঝতে পেরেছি উহাই প্রকাশ করে গেলাম। আমার দর্শনই একমাত্র সত্যদর্শন এবং এর বাইরে আর কিছু

নেই বলাকে ধৃষ্টতা মনে করি। আমি মনে করি ভুল করা অনেক ভাল, জেনে শুনে ভণ্ডামী করার চেয়ে। দার্শনিক ফ্রেডারিক নিটশে নাস্তিক, কিন্তু ইমানুয়াল কান্ট আস্তিক। চিন্তার রাজ্যে উভয়ের ব্যবধান আকাশ আর পাতাল। কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতা উভয়কে দিয়েছেন সমান গণতান্ত্রিক সুযোগ-যা মানুষকে পশু বানাবার কমিউনিজম দেয় না। তাই চিন্তার রাজ্যের স্বাধীনতার প্রশ্নে 'সব কিছু বুঝে গেছেন মার্কা' কমিউনিষ্টদের সঙ্গে একমত নই।

আদম সন্তানেরা একই জাতি এবং একই সঙ্গে যদি মিলেমিশে চলার তাগিদ থাকে এবং সেই সঙ্গে হিংসা, মারামারি, জুলুম এবং অন্যায় অত্যাচার হতে দূরে থাকার তাগিদ দেওয়া হয়, তবে কি আমরা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখবো না যে, কিসের দরুন এই অনর্থ হিংসা বিদ্বেষ মানব সমাজে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এবং উঠতে চায়। নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে যদি বিচার করা যায়, যদি বিবেককে ফাঁকি না দেওয়া হয় তবে দেখা যায় যে, এই ব্যক্তিমালিকানাটাই এক এক সময় এক এক রূপ নিয়ে মানব সমাজকে অকথ্য নির্যাতন এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে ফেলেছে এবং এই নির্যাতন ও বিশৃঙ্খলার অভিশাপে সমাজ জীবনে নেমে এসেছে দিনের পর দিন এক ভয়ঙ্কর করুণ পরিস্থিতি এবং মানব সমাজের ভারসাম্য ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে এবং এরই দরুন পাপ তার সর্পিল গতি নিয়ে কি বিশ্রী এবং জঘন্যরূপে সমাজের আনাচে-কানাচে ফুটে উঠেছে দিনের পর দিন।

এই ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদ করে আদম সন্তানেরা সকলে মিলে আল্লাহর মালিকানায় বিশ্বাস রেখে যদি চলতে পারে, তবেই সেদিন মানবজাতি পাবে সত্যিকার অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সেদিনই মানব সমাজে বিরাজ করবে প্রকৃত সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব। এর আগে সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের কথা বলাটা নিতান্ত ভণ্ডামী করা ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য দুদিন আগে আর পরে হোক, এসব ভণ্ডামী আস্তে আস্তে সমাজ জীবন হতে মুছে যেতে বাধ্য। কারণ মানুষ এখন বেশ বুঝতে পেরেছে যে, ব্যক্তিমালিকানাটাই যত অপকর্ম এবং বর্বরতার মূল।

ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদ করে আল্লাহর মালিকানায় যদি কোন গোষ্ঠী এগিয়ে আসে তবে তাদের জয় সুনিশ্চিত এবং অর্থনৈতিক দাসত্ব হতে মুক্তিও তারা সম্পূর্ণরূপে পাবে এবং সেই মানব গোষ্ঠীর সকলের মুখেই অর্থনৈতিক মুক্তির হাসি ঝলসিয়ে উঠবে।

এই ব্যক্তিমালিকানার খপ্পরে পড়ে লাখো লাখো গরীবদের ফুটপাতের ধারে রাত কাটাতে হয় জীব-জানোয়ারের মত, অথচ ধনীদের বাড়ীতে যে মোটর গাড়ীর জীবন বলতে কিছুই নেই, সেই গাড়ীটারও থাকার জায়গা হয় দালানের একটি সুরক্ষিত কামড়ায়। এই ব্যক্তিমালিকানার খপ্পরে পড়ে পরে ধনী লোকটি তার ছেলেপুলে নিয়ে নাস্তা খায় এক টুকরা মাখন আর হালুয়া রুটি, আর অপর দিকে বস্তির কাদামাটির ঘরে, বৃষ্টি এলে ঝুপ ঝুপিয়ে জল পড়ে, তারই মধ্যে গরীব বেচারা পয়সার অভাবে চিকিৎসা করতে না পেরে কি করুণ উপবাস আর কি বুক ফাটা শিশুদের কান্না।

যেহেতু 'ব্যক্তিমালিকানা' যতদিন মানব সমাজে প্রচলিত থাকবে ততদিন পুঁজি থাকছেই এবং যতদিন পুঁজি থাকছে ততদিন শোষণ ও জুলুম থাকবেই। যেহেতু পুঁজিবাদের স্বীকৃতি ইসলামে নেই, সেই হেতু ব্যক্তিমালিকানার কোন অস্তিত্বই ইসলামে নেই। আল্লাহর কাছে যত পাপই করা হোক না কেন, তার ক্ষমা লাভ করার আশ্বাস আপনি পেতে পারেন। কিন্তু যে অপরাধের ক্ষমা নেই সেটি হল মানুষের উপর জুলুম ও শোষণ। কারণ, এরকম শোষণ ও জুলুম আল্লাহর উপর নির্ভর ও বিশ্বাস হারাবার পরই করতে পারে এবং এই নির্ভর ও বিশ্বাস হারানোর অর্থই হলো শেরেক। আত্মকেন্দ্রিক অন্যায়কেও ব্যক্তিগত জুলুম বলা হয়েছে, কিন্তু সামাজিক জুলুম ও শোষণকে বলা হয়েছে অমার্জনীয় অপরাধ এবং এরকম অপরাধের ক্ষমা নেই। আল্লাহ যেহেতু মনে করেন যে, এই অপরাধ তাঁর কাছে

করা হয়নি, করা হয়েছে মানুষের উপর, সেই হেতু ক্ষমা করে দেবার প্রশ্ন ও প্রতিশোধ নেবার প্রশ্ন উভয়ই নির্ভর করে তাদেরই উপর, যারা শোষিত এবং অত্যাচারিত হয়েছে।

যেহেতু শোষিত এবং অত্যাচারিত মানবদের উপর ক্ষমা অথবা প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছাশক্তি প্রদান করা হয়েছে, সেই হেতু মানবজাতি যদি শোষক এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা না করে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তবে আল্লাহর আইন মোতাবেকই ইহা করা হবে এবং এই শোষক ও জালেমের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোকেই আল্লাহ 'জালেমকে সাহায্য কর' বলে আহ্বান জানিয়েছেন।

ইসলাম ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করে বলে যারা কোরান হতে উদ্ধৃতি পেশ করেন তাদের উদ্ধৃতিসমূহের মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার কথাই বলা হয়েছে কিনা সেটাই তুলে ধরতে চাই। তুলে ধরতে চাই, কিভাবে সহজ সরলমনা জনতাকে, কিভাবে কোরান হতে আগা মাথা-বাদ দিয়ে দু একটি কথা তুলে ধরে ভুল পথে টেনে নিয়ে চলছে। কোরানের প্রতিটি কথা উহার সমস্ত ভাবধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোরানে সামান্য একটু কথার ব্যাখ্যা লিখতে গেলে প্রথমেই জনতাকে কোরানের বিশেষ বিশেষ শব্দ ও সংজ্ঞার সঙ্গে পরিচিত করানো উচিত এবং কোরানের দু'একটি কথার সত্যিকার আলোচনা করা অল্প কথায় এক প্রকার অসম্ভব।

কোরানের সূরা আনআমের ১৬৫ আয়াতে বলেছেন, 'এবং তিনিই, যিনি তোমাদেরকে উত্তরাধিকারিত্ব দিয়েছেন এবং কতককে অন্য কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য সেই বিষয়ে যা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই তোমার রব শাস্তিদানে ত্বরান্বিত এবং নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু।' কোরানের সূরা বনি ইসরাইলের ২১ আয়াতে বলছেন, 'দেখো কিভাবে আমরা দিয়েছি শ্রেষ্ঠত্ব কাউকে কারো উপর এবং নিশ্চয়ই পরকাল শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার দিক দিয়ে অনেক বেশি।' কোরানের সূরা যুখরুফের ৩২ আয়াতে বলছেন, 'তারা কি রবের রহমত বিতরণ করে? আমরাই দুনিয়ার জীবনে বণ্টন করে দিয়েছি তাদের মধ্যে উপার্জনের উপায় উপকরণ এবং আমরাই তাদের কতক কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছি যাতে করে কতক কতকের উপর কর্তৃত্ব করে, কিন্তু তোমার রবের রহমত তো এর (সম্পদ) থেকে শ্রেষ্ঠ, যা তারা জমা করছে।'

কোরানের এই জাতীয় আয়াতগুলির দ্বারা অসাম্য এবং ব্যক্তিমালিকানার পক্ষে দলিল রূপে দাঁড় করানো হয়। কিন্তু একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাব যে, ইহার দ্বারা অর্থনৈতিক অসাম্য এবং ব্যক্তিমালিকানার স্বপক্ষে দলিলরূপে মোটেই দাঁড় করানো যায় না। আয়াত তিনটির ব্যাখ্যা হল, হে মানব, তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উত্তরাধিকারীরূপে পৃথিবীতে স্থান দান করেছেন এবং মর্যাদায় তোমাদের একজনকে অন্যান্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। এই 'মর্যাদা' কথাটির দ্বারা বুদ্ধি, বিবেচনা, চিন্তাধারা, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করাকেই বুঝানো হয়েছে। ধন-সম্পদের যে শ্রেষ্ঠত্ব, তথা একজন আর একজনের উপর অর্জন করে থাকে, সে কথা মোটেই বলা হয়নি। তার কারণ হল, ধন-সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ কখনোই স্বীকার করেন না এবং ধন-সম্পদ উপার্জন করার শ্রেষ্ঠত্ব কখনোই রবের দান হতে পারে না। এই আয়াতে 'আল্লাহ' শব্দের ব্যবহার করা হয়নি। ব্যবহার করা হয়েছে 'রব' শব্দ। রব কখনোই ধন-সম্পদের ব্যতিক্রমকে মর্যাদার কারণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন না। ধনসম্পদ ছাড়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভের অন্যান্য যে সকল উপায় রয়েছে সেগুলোর কথাই এই আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিশেষ করে নফসের তথা চিত্তবৃত্তির শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদাই এখানে বলা হয়েছে। কারণ এ মর্যাদাই রবের কাছে বিশেষভাবে গ্রহণীয়। মানুষকে তার রবের কাছে যে পরীক্ষা দিতে হবে তা হবে এ দানগুলোর মধ্যেই। অর্থাৎ রবরূপে তিনি মানুষকে যতকিছু দান করে থাকেন এই দানগুলোর ব্যবহারের মধ্যে তাকে পরীক্ষা

দিতে হবে। রবের সঙ্গে সংযোগের জন্য তিনি রবরূপে যে সব গুণাবলী দান করেন, যার দ্বারা রবের সঙ্গে সংযোগ করার অধিক সুযোগ পাওয়া যেতে পারে, সেই সকল সুযোগগুলো রবকে পাবার চেষ্টায় ব্যয় না করে দুনিয়ার আধিক্য পাবার চেষ্টা করলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না। তাই সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই তোমার রব শাস্তিদানে ত্বরান্বিত'। এবং যদি সংযোগ করার অধিকতর সুযোগ এবং অবলম্বনগুলোকে উপযুক্ত ব্যবহার কেউ করে, তবে নিশ্চয়ই তিনি হবেন সেই ব্যক্তির জন্য 'ক্ষমাশীল রহিম'। এখানে 'ক্ষমাশীল রহিম' কথার ব্যাখ্যা একটু প্রয়োজন। আল্লাহ শুধু দ্বীনের মধ্যে রহিমরূপে আছেন। দুনিয়াতে নয়। দুনিয়াতে আল্লাহর রূপ হল 'রহমান'। দ্বীনের মধ্যে রহিমরূপে যে দয়া তিনি ক্ষমার পর দান করেন তা অপার্থিব। কারণ, ক্ষমা অর্থই হল মানবীয় গুণ ও ভাবধারা তথা আমিত্ব বা অহম হতে মুক্তিদান করে সম্পূর্ণ শুদ্ধ করে তোলা।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে ব্যক্তিমালিকানা বা অধিকারের কথার কোন ইঙ্গিত নেই। শুধু মাত্র এতটুকু বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী লোকদের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে মানুষ পৃথিবীর অধিবাসী হয়ে বাস করছে। প্রকৃতিগতভাবে একজনের উপর অন্য জনের যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন, সেই দানগুলির ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে মানুষের পরীক্ষা। অর্থাৎ নফসের তথা চিত্তবৃত্তির এ সকল শ্রেষ্ঠত্বের উপকরণের দ্বারা সে কি দুনিয়া সন্ধান করে, না রবকে সন্ধান করে, এটাই হবে একমাত্র বিচার্য বিষয়। প্রবৃত্তির সুখ-সম্পদ অথবা অন্য ব্যক্তি হতে অধিক অর্থ উপার্জন করার অপর নাম দুনিয়া উপার্জন করা । দুনিয়া উপার্জন 'রব'-এর একান্ত অপ্রিয় বিষয়। কাজেই আর্থিক শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রভুত্ব অন্যের উপর বিস্তার করার সহায়তা রব কখনোই করতে পারে না। যেহেতু দুনিয়া উপার্জন ইসলামে হারাম।

যে মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বের কথা কোরান ঘোষণা করছে উহা বুদ্ধি, বিবেচনা, চিন্তাধারা, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথাই বলা হয়েছে। এসব বিষয়ে মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা এবং গুণগত পার্থক্য থাকবেই। যেমন ধরুন, রহিম নামক একটি মানুষ অধ্যাপক, করিম ইনজিনিয়ার, মতিন ডাক্তার, আবুল শ্রমিক এবং সেলিম কৃষক। কর্মক্ষেত্রে এই পাঁচজনের কাজ মোটেই এক নয়। কাজের বিভিন্নতা এবং গুণগত পার্থক্য এখানে স্পষ্ট ধরা পড়ছে। এই বিভিন্নতা এবং গুণগত পার্থক্য জীবন ধারণের বিভিন্ন সমস্যার উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যতদিন মানব জীবনে বিভিন্ন সমস্যা থাকবে ততদিন কর্মেরও বিভিন্নতা থাকতে বাধ্য। এবং যতদিন কর্মের বিভিন্নতা থাকছে ততদিন মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নও থাকবেই। যে কোন একটি কাজের কথাই ধরে বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে সেই কাজের বিষয়ে একজন প্রচুর অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলন করার ক্ষমতা রাখে, পক্ষান্তরে অপর একজন সদ্য সেই কাজে যোগ দিয়েছে। এই দু'য়ের মাঝে গুণগত পার্থক্য থাকবেই এবং থাকছে। এই দুয়ের মর্যাদা এক হতে পারে না। কারণ, মর্যাদার দিক দিয়ে এখানে একজন শিক্ষক অন্যজন ছাত্র। সেরকমভাবে সমাজ জীবনের বিভিন্ন সমস্যার অভাব পূরণ করতে গিয়ে এই পাঁচজনের পাঁচ রকম কাজ করতে হচ্ছে। এই পাঁচ জনের পাঁচ রকমের কাজের মধ্যে কোন মিল নেই। এক একজন এক এক রকম সামাজিক সমস্যার দায়িত্ব পালনে রত, কিন্তু এই পাঁচজনকে যদি এক সঙ্গে বসিয়ে পাঁচজনের হাতে একটি করে ঝাল মরিচ হাতে দিয়ে খেতে বলেন, তবে পাঁচজনেই ঝাল লাগছে অথবা মুখ পুড়ে যাচ্ছে বলে একই রকম বেদনার কথা আপনাকে জানাবে। এই পাঁচ জনের মধ্যে কেউ মরিচ খেয়ে মিষ্টি লাগছে বলবে না। তার কারণ কি? কারণ হল জৈবিক প্রয়োজনের (বায়লজিক্যাল নিডের) বেলায় সবাই সমান বেদনা এবং আনন্দ অনুভব করে তথা জৈবিক প্রয়োজনের বেলায় সবাই সমান। খিদে পেলে সবাই খেতে চাইবে এবং এখানে বিভিন্ন কার্যে

রত পাঁচজনে একই জিনিসের জন্য সমান অভাব অনুভব করছে। ইসলাম এই বিভিন্ন কর্মে রত পাঁচজনের যেখানে একই রকম অনুভব, সেখানেই রেখেছে সাম্য। অর্থাৎ জৈবিক প্রয়োজনের বেলায় যেহেতু বিভিন্ন কার্যে রত পাঁচজন একই রকম অভাব অনুভব করছে, সেইহেতু ইসলাম জৈবিক প্রয়োজনের বেলায় সবাইকে সাম্যবাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে এবং ইসলাম এটাও ঘোষণা করে দিয়েছে যে, এই জৈবিক প্রয়োজনের বেলায় সবাই যেখানে সমান অনুভব করছে সেখানে অসাম্য থাকতে পারে না এবং এই জৈবিক প্রয়োজনের বেলায় যারা অসাম্য তৈরি করতে চায় তথা বৈষম্য রাখতে চায় তারাই তাগুত পুজা করে, তথা কলুষিত বস্তুবাদের (কোরাপটেড মেটিরিয়ালিজম) গোলামী করছে এবং ইহাই কুফুরী জিন্দিগী এবং এদেরকে ইসলাম কাফের বলে ঘোষণা করেছে। জৈবিক প্রয়োজনের বেলায় বৈষম্য তৈরি করে মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বের কথা কল্পনা করাটাও জঘন্য অপরাধ বলে ইসলাম বার বার উপদেশ দিয়েছে। ভাতের বাসনে পাঁচজন খেতে বসলে একই রকম এবং একই পরিমাণ না খেলেই যে অসাম্য হয়ে গেল তা নয়। বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত এই পাঁচজনের খাটুনী একই রকম হতে পারে না। মাটি যে ব্যক্তি কাটে এবং যে ব্যক্তি বসা কাজ করে, উভয়ের খাটুনি সমান নয় বলেই খেতে বসলে উভয়ের সমানই খেতে হবে এরকম কল্পনার সাম্যও ইসলাম প্রচার করেনি। খাটুনি অনুযায়ী যার যতটুকু অভাব পূরণের প্রয়োজন ততটুকুই শুধু তাকে দিতে হবে এবং ততটুকু তাকে গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু জমা করাটাই জাহান্নামের আগুন, সেইহেতু জমা করে রাখার প্রশ্নই আসতে পারে না। খলিফা আবু বকর, উমর, আলী, মাআজ ইবনে জাবাল, আবুজর গিফারী এই মহামান্য সাহাবারা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনধারণের বেলায় এবং অনেক সময় এমন কঠোর সাম্যনীতি অনুসরণ করছেন, যা যুগে যুগে মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। খলিফা উমর যেভাবে জালুলার যুদ্ধে পাওয়া কাপড় জনসাধারণকে ভাগ করে দিয়েছিলেন তাহা আজকের যুগে কল্পনার সাম্যের মতই মনে হয়। খলিফা আবু বকর মদীনাতে যখন কোন এক যুদ্ধে পাওয়া সম্পদ এলো, তখন তিনি সেই সম্পদকে সমানভাবে ভাগ করে দিলেন। বড়-ছোট, দাস-দাসী, নারী -পুরুষ সবাইকে দিলেন সমান ভাগ। এতে আপত্তি করেছিলেন কেউ এবং বলেছিলেন, ইসলাম যারা আগে গ্রহণ করেছেন তাদের ভাগটা অন্যরকম করা হোক। কিন্তু খলিফা আবু বকর বজ্রকণ্ঠে এর বিরোধিতা করে বললেন, এটা হল জৈবিক প্রয়োজন তথা খাদ্য সংক্রান্ত ব্যাপার। মর্যাদাভিত্তিক ব্যবহার এই ব্যাপারে হয় না। এরকম অবিস্মরণীয় বিস্ময়কর বহু ঘটনার সমাবেশ আমরা দেখতে পাই দেড় হাজার বছর আগে যখন বর্বরতার যুগ তার ডানা মেলে অনেকাংশে বিরাজ করছে। সেই যুগে সেই পরিবেশের ভয়ঙ্করত্বের মধ্যে সহসা এরকম শিক্ষা ও মানবতার বাণী শুনি সাহাবাদের কণ্ঠে ও ব্যক্তিগত জীবনে। এরকম হাজার হাজার মানবতার বাণী আজো পুরনো পুঁথির পাতায় লিখা আছে কিন্তু তার আদর্শ ও শিক্ষা, আজকের মুসলমানদের মধ্যে নেই বলেই তো এত লাঞ্ছনা আর অপমান।

ইসলাম কোন অর্থনৈতিক প্রয়োগ ব্যবস্থা দিয়ে যায়নি। যেহেতু ইসলাম অর্থনৈতিক প্রয়োগ ব্যবস্থা দিয়ে যায়নি সেই হেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যদি ইসলাম অর্থনৈতিক প্রয়োগ ব্যবস্থা দিয়ে যেতো তবে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান বলে দাবী করতে পারতো না। তার কারণ? কারণ হল, আদিম যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং আজকের আধুনিক যান্ত্রিক যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কখনোই এক হতে পারে না। যেহেতু কোরান নিজেই দাবী করছেন যে, তিনি একটি বিশেষ যুগের জন্য নাযেল হননি, সেই হেতু কোন একটি বিশেষযুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও দিয়ে যাননি। যেহেতু কোরান কোন একটি বিশেষ যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপত্র দিয়ে যাননি, সেইহেতু কোরানের বাণী

সর্বকালের জন্য চিরন্তনরূপে বিরাজ করছে এবং সেইহেতু কোরান প্রতিটি বিষয়ের মূলনীতি দিয়ে গেছেন এবং সেইহেতু সর্বকালের জন্য ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান।

ইহুদি শব্দটির একটু ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন মনে করছি। মীর জাফরকে যেমন বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক এবং প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা হয়, ঠিক সেইরকমভাবে ইহুদিকে ধন জমাকারী তথা পুঁজিপতির প্রতীক এবং প্রতিশব্দরূপেই ব্যবহার করা হয় এবং এর ঐতিহাসিক কারণও আছে। কারণ, ইহুদিরাই ধনের প্রতি এত বেশি লোভী হয়ে পড়ে যে, তাদের ধর্মগ্রন্থকে পর্যন্ত তারা বিকৃত করে ছেড়েছে। আমাদের দেশে যেমন কৃপণকে সাহা বলে গাল দেওয়া হয়, সেরকম ইহুদি বলতে এখানে যারা মাল জমা করে তাদের কথাই বুঝানো হয়েছে। মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেই সে মুসলমান হয় না ততক্ষণ, যতক্ষণ তার সার্বিক জীবনটা কোরানে বর্ণিত মুসলমানের মত না হয়। হুজুর পাক (দঃ) এরকম ইহুদিদের থেকেই মুসলমানদেরকে সাবধান থাকার উপদেশ দিয়েছেন। কারণ মুসলমানী মুখোশে এই সমস্ত ইহুদীরা দ্বীন ইসলামের উপর যথেষ্ট কলঙ্ক লেপন করেছে এবং এখনো করে যাচ্ছে।

কোন একটি প্রচারপত্রে দেখতে পেলাম কোরানের সূরা ইয়াসিনের ৭১নং আয়াতটি ব্যক্তিমালিকানার পক্ষে দলিলরূপে ব্যবহার করেছে। উক্ত প্রচারপত্রটি ইসলামে 'ব্যক্তিমালিকানা' স্বীকৃতি আছে বলে রায় দিয়েছে এবং ইহার ফলে কোরানের সত্যিকার ভাবধারা বিকৃত হয়ে পড়ে এবং আরবী ভাষা না জানা সরল প্রাণের লোকেরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে রীতিমত হাবু-ডুবু খাচ্ছে। অথচ এই আয়াতে পশুর উপর মানুষের যে কর্তৃত্ব ও অধিকার দেওয়া হয়েছে কেবলমাত্র সেকথাটার এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহাকে ব্যক্তি মালিকানার নজির রূপে তথা উদাহরণ রূপে কেমন করে যে দেখানো যেতে পারে তাহা বুঝাই মুশকিল। এক মানুষের উপর অন্য মানুষের অথবা একদল মানুষের উপর অন্য দলের কর্তৃত্ব পাবার নির্দেশ এই আয়াতের দ্বারা কেমন করে যে বুঝা যেতে পারে তাহা আবিষ্কার অথবা কল্পনা করাও যায় না। ব্যক্তিমালিকানার স্বার্থবাদী ভূত যারা দেখেন তাদের পক্ষে এইরূপ অদ্ভুত অর্থ আবিষ্কার করা সম্ভব হতে পারে।

যদি কেহ একান্তই এই আয়াতটিকে ব্যক্তিমালিকানার দিকে লাগাতে চান তা হলেও এই মালিকানা ব্যক্তিমালিকানা নয়। ইহা পশুর উপর সমগ্র মানবজাতির মালিকানা বা অধিকার বুঝায়। ব্যক্তিমালিকানার কোন প্রশ্নই আসে না। আল্লাহর বিধান মতে আমরা সবাই এই অধিকার পেয়েছি পশুর উপর। একজনকে বঞ্চিত করে অথবা বাদ দিয়ে অন্যজনের অধিকার বুঝায় না। এই অধিকার সার্বজনীন। কোরানের আয়াত কয়টি নিম্নরূপঃ- (৭১) 'তারা (অর্থাৎ লোকেরা) কি দেখে না যে, আমাদের হস্ত পরিচালনার দ্বারা যত সৃষ্টি আমরা করেছি তার মধ্যে গৃহপালিত পশু একপ্রকার সৃষ্টি, কাজেই তারা (অর্থাৎ লোকেরা) উহার মালিক হয়েছে? (৭২) এবং উহাদিগকে আমরা তাদের অধীন (বশীভূত) করেছি। কাজেই উহাদের মধ্যে কতকগুলিতে তারা চড়ে এবং উহাদের কোনটি ভক্ষণ করে। (৭৩) এবং উহাদের মধ্যে তাদের জন্য অনেক উপকার ও পানীয় (দুগ্ধ) আছে, তথাপি তারা কি কৃতজ্ঞ হবে না?'

মানুষকে পশুর উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার আল্লাহ দান করেছেন। তাই মানুষ পশুর উপর কর্তৃত্ব করতে পারে। ইহাদের উপর আরোহণ করে, মাংস খায় ইত্যাদি। যদি মানুষকে পশুর উপর মালিকানা অর্থাৎ অধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব দান না করতেন তাহলে পার্থিব জীবনে মানুষ পশুকে আপন ব্যবহারে আনতে পারতো না এবং পশু মানুষের বাধ্য থাকতো না। সে তার অধিকতর শারীরিক শক্তি দ্বারা এবং বুদ্ধি বেশি দেওয়া হলে উহা দ্বারা হয়তো মানুষের উপরই কর্তৃত্ব করতে চাইতো। পার্থিব

জীবনের এরূপ শক্তিদানের নমুনা হতে মানুষের বুঝা উচিত যে, আল্লাহকে একমাত্র ইলা রূপে (অর্থাৎ কর্তা, নেতা, অধিকারী রূপে) গ্রহণ করতে পারলে অর্থাৎ দ্বীনের মধ্যে, আল্লাহ মানুষকে সারা সৃষ্টির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব দান করবেন। পার্থিব জীবনে পশুর উপর কর্তৃত্ব দান উহারই একটি নমুনা মাত্র।

এই আয়াত তিনটি পরবর্তী আয়াতসমূহে কোরান যে ভাবধারা অঙ্কন করেছে তা নিম্নরূপঃ - পার্থিবজীবনে মানুষ আল্লাকে ছেড়ে অন্যান্য ইলার সাহায্য সন্ধান করে এবং অন্যসব ইলার সাহায্য লাভে তৃপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু পরিণামে দেখা যাবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাকে সাহায্য করতে পারে না, অথচ দুনিয়ার জীবনে অনেক ইলার সাহায্য নিয়েই সে তার জীবনযাপন করে থাকে। তাই মানুষকে সাবধান করবার জন্য আল্লাহ বলছেন যে, এ বিষয়ে কোরান কোনরূপ কবির কল্পানাপ্রসূত এক প্রকার সাবধান বাণী নয়। কাজেই যারা জাগ্রত ও জীবন্ত তারাই কেবল উপদেশ লাভ করে সাবধান হবে পরকাল ও দ্বীন সম্বন্ধে। আল্লাহ পাকই যে মানুষের জন্য একমাত্র সাহায্যকারী এবং সৃষ্টির উপর কর্তৃত্বদানকারী, তারই একটি নমুনা দুনিয়ার জিন্দেগীতেই তিনি দেখিয়েছেন গৃহপালিত পশুর উপর কর্তৃত্বদানের কথা উল্লেখ করে। কাজেই ব্যক্তিমালিকানার কোনরূপ প্রসঙ্গই ইহা নয়।

কোরানের অনেক আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আমরা কাহাকেও বেহিসাব তথা অফুরন্ত রেজেক দেই এবং কাহাকেও আমরা তার রেজেক নির্দিষ্ট করে দেই।' আল্লাহর রেজেকের অর্থ যে কেবলমাত্র পার্থিব ধন-সম্পদকে বুঝানো হয়েছে তা মনে হয় না। বেহিসাব তথা অফুরন্ত রেজেক দান করেন ইহা কোরানেরই ঘোষণা। যদি ধরে নিলাম আল্লাহর রেজেক বলতে একমাত্র পার্থিব সম্পদকেই বুঝানো হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তার বেহিসাব রেজেক দেবার অপ্রতিহত ক্ষমতা হতে মানুষকে জানোয়ার বানাবার কমিউনিজমের দেশে বঞ্চিত হয়ে পড়েন। ধরে নিলাম সারা পৃথিবীতে যদি কখনো সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সাম্য ধর্মসহ অথবা ধর্মনিরপেক্ষ অথবা যে কোন রকমেই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, উহাতে আল্লাহ তার বেহিসাব রেজেক দেবার ক্ষমতা হতে কি বঞ্চিত হয়ে পড়েন না?

'বেহিসাব রেজেক' অর্থে যদি দুনিয়ার সম্পদকেই বুঝানো হয়ে থাকে তা হলে এমন কোন ব্যক্তি আছেন যার ধনের ব্যবহার বিধির উপর আল্লাহ 'হিসাব' তথা কৈফিয়ৎ করবেন না? আল্লাহ প্রত্যেকের ধনের ব্যবহার বিধির উপর পাই পাই করে হিসাব নেবেন বলে অনেকবার আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যেখানে আল্লাহর বেহিসাব ধন-সম্পদ দেবার কথা বলা হয়েছে সেখানে আবার হিসাব চাইবার প্রশ্ন উঠলে কি আত্মবিরোধী ভাবধারার সমাবেশ হয়েছে বলে মনে হয় না? যদি দুনিয়ার একমাত্র ধন-সম্পদকেই 'আল্লাহর রেজেক' বলে ধরে নেই?

যদি ধরে নেই যে, একমাত্র দুনিয়ার ধন-সম্পদই আল্লাহর রেজেক, তা হলে প্রশ্ন আসবে, আল্লাহ এই ধন-সম্পদ কাহাকে বেহিসাব (?) দিলেন অথবা দিচ্ছেন অথবা দেওয়া হয়েছে? যদি ধরে নেই, পৃথিবীর বড় বড় ধনীদের দেওয়া হয়েছে তা হলে 'যে জমা করে ধন-সম্পদ এবং গুণে বেছে রাখে' তার জন্য ওয়াইল নামক নরকের আগুনে জ্বলতে হবে বলার মাঝে কি আত্মবিরোধী ভাবের সমাবেশ হয় না? অথবা 'সূঁচের ছেদা দিয়ে উট ঢুকে যেতে যতটুকু অসম্ভব বলে মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি অসম্ভব হবে একজন ধনবান ব্যক্তির বেহেস্তে ঢুকা' বলার মাঝে কি এখনো আপনি স্পষ্ট আত্মবিরোধী ভাবের সমাবেশ পাচ্ছেন না, যদি আল্লাহর রেজেক বলতে একমাত্র দুনিয়ার ধন-সম্পদকেই বুঝানো হয়ে থাকে?

দুনিয়ার ধনী লোক যত সম্পদশালীই হোক না কেন তার সম্পদ কখনো বেহিসাব হতে পারে না। তাছাড়া বেহিসাব রেজেক বলতে যদি দুনিয়ার ধন-সম্পদই হয় তবে এমন একটি ব্যক্তি কি দুনিয়াতে আপনি দেখাতে পারবেন যার ধন-সম্পদের হিসাব নেই? বরং নিশ্চয়ই তার ধনের হিসাব নিকাশ

আছে এবং তা পরিমিত ও স্থান আর কালের সীমায় আবদ্ধ। সুতরাং উহা বেহিসাব তথা অফুরন্ত মোটেই নয়। কোন ব্যক্তিবিশেষের কথা তো আসতেই পারে না বরং সারা পৃথিবীতে কতটুকু চাউল, গম ইত্যাদি হচ্ছে তারও হিসাবখানা আজকের বিজ্ঞানের যুগে আমরা প্রায়ই খবরের কাগজে দেখতে পাই। পৃথিবীতে কতটুকু চাউল, গম ইত্যাদি খাদ্যশস্য জায়গা-জমি, কাপড়-চোপড় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তথা এককথায় যাকে সম্পদ বলা হয়, সেই সম্পদগুলোর হিসাব দিতে গিয়ে যদি বিজ্ঞানীরা বলতো যে, এসমস্ত ধন-সম্পদ বেহিসাব তথা এর কোনই হিসাব দেওয়া সম্ভবপর নয়, তবে বেহিসাব কথাটি একমাত্র দুনিয়ার ধনসম্পদকে 'আল্লাহর রেজেক' বলে একদিক দিয়ে মাত করা যেত। কিন্তু পরক্ষণেই সেই একই বিজ্ঞানীদের মুখে বেহিসাব কথাটি শুনতে পাই তখনই, যখন এক সৌর জগত হতে অপর জগতের দূরত্বের প্রশ্ন আসে। দূরতম নক্ষত্রের দূরত্ব কতটুকু বলে যখন আমরা বিজ্ঞানীদেরকে প্রশ্ন করি তখন বিজ্ঞানীরা একবাক্যে সকলেই বলেন যে, নক্ষত্রের দূরত্ব হল বেহিসাব তথা যার হিসাব দেওয়া সম্ভবপর নয়।

আল্লাহর রেজেকের অর্থ যদি দুনিয়ার ধন-সম্পদই হবে তা হলে আল্লাহ তার প্রিয়জনকে নিশ্চয় প্রচুর দান করবেন এই রেজেক, কিন্তু ইহা মোটেই সত্য নয়। বরং আল্লাহ তার প্রিয়জনকে এসব সম্পদ হতে দুনিয়ার জীবনে প্রায়ই একপ্রকার বঞ্চিত করে রাখতে ভালবাসেন। এজন্যই আল্লাহ কোরানের সুরা যুখরূফের ৩৩ হতে ৩৫ আয়াতে এরূপ ভাব প্রকাশ করছেন, 'যদি সমস্ত মানুষের গতি একই দিকে হবার সম্ভাবনা না থাকতো তা হলে আমরা কাফেরদেরকে ধন-সম্পদ, সোনা-রূপা এত প্রচুর পরিমাণে দিতাম যে, যার দ্বারা তাদের ঘুমাবার খাটিয়া, দালানের সিঁড়ি, দরজা, জানালা, ইট-পাটকেল ও কাঠ ইত্যাদির পরিবর্তে সোনা-রূপা ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা তৈরি করে দিতাম।' আল্লাহ এটাই আমাদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, বিশ্বাসীকেও দুনিয়ার সম্পদ কিছু দেবার সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা করেছেন যেন সকল মানুষ অধৈর্য হয়ে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদের দিকে না যায়।

তবে আল্লাহর রেজেক বলতে কি বুঝানো হয়েছে? অথবা আল্লাহর রেজেক কাকে বলে? এক কথায় আল্লাহর গুণাবলীকে রেজেক বলা হয়।

ইসলামে যাকাত বিষয়ের আলোচনা

এবার আমরা কোরান-হাদীসের উল্লেখিত যাকাত বিষয়টির উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করবো। সাধারণ মুসলমান নামে যারা সমাজের বুকে পরিচিত তাদের কথা তো বাদই দিলাম। কিন্তু যারা ইসলামকে নিয়ে রীতিমত গবেষণা করেন তারাও যাকাত বলতে যে আড়াই টাকা মোটেই নয় এবং আড়াই টাকাকে কোরান হাদীসের কোথাও যাকাত বলেননি সেটাও বড়ই দুঃখজনকভাবে আমাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত হয়ে রইল। যেন মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া মুক্তোর আর সন্ধানই কেউ ক্ষ্যাপার পরশমণি খোঁজার মত খুঁজেও পেল না। যারা ধনী-গরীব আল্লাহ বানায় বলে আল্লাহর উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিরপরাধী সেজে তথাকথিত সভ্যতার অনুশীলন আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে তারাই দায়ী? এরকম তথাকথিত সভ্যতার বাতাস সেবন করে যারা এক বোঝা ডিগ্রীর নরমুণ্ড গলায় পরে শিক্ষিত ও গবেষক বলে সমাজে পরিচিত, তাদের কাছে

আসল বিষয়টি উদ্ধার করতে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে অরণ্যে রোদনের সামিল। বরং আসল বিষয়টাকে তারা এমনভাবে কবর-চাপা দিয়ে ফেলেছে যে, আসলটা মাথা উঁচু করে যদি কখনও উঁকি-ঝুকি মারতে চায় তখনই ভূত দেখে মারপিটের মত 'নকল নকল' বলে চেঁচিয়ে সমাজকে আরো বিভ্রান্তির অতল তলে তলিয়ে দেয়।

শতকরা আড়াই টাকাকে কোরান-হাদীস কোথাও যাকাত না বলে 'সাদকা' বলেছেন। যেখানেই সম্পদের উপর করদানের প্রশ্ন, সেখানেই কোরান-হাদীসে 'সাদকা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অনুবাদকারীদের মধ্যে এই শব্দ-পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। কোরান শরীফ ঘোষণা করছেন যে, হযরত লুত, হযরত ইব্রাহীম এবং প্রত্যেক নবীই যাকাত দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল, হযরত লুতের জন্ম আজ থেকে বহু বছর আগে। অন্যান্য নবীরা তো আরো বহু পুরাতন। ইতিহাসই বলছে মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে পণ্যবিনিময় প্রথা তথা বারটার সিসটেম তথা একসচেইঞ্জ অব কমোডিটি ছিল এবং এই প্রচলন বেশ কিছুদিন মানব সমাজের বুকে পরিচিত ছিল। কিন্তু পণ্য বিনিময় প্রথার আগের ইতিহাসে আমরা দেখি আদিম সাম্যবাদ। এই আদিম সাম্যবাদ কয়েক হাজার বছর আগেই ছিল। এখন বিরাট প্রশ্নটি হল, যখন পয়সারও প্রচলন ছিল না এবং পণ্য বিনিময় প্রথাও ছিল না তখন কোরানে বর্ণিত নবীরা কোন যাকাত দিয়েছেন, যদি জাকাতের অর্থ একান্তই মাল ও শতকরা আড়াইভাগ অথবা টাকা বলে প্রচার করা হল? এতে কি আত্মবিরোধী কথার সমাবেশ হয় না? তবে কি শ্রদ্ধেয় আলেম ভাইয়েরা সোনার পাথরের বাটি এখানে খুঁজে পাচ্ছেন না? তবে যে সমস্ত তেলেসমাতি গবেষকরা 'ডকটরেট' মুণ্ড গলায় ঝুলাবার লোভে সিক্ত, তারা হাতীটাকে নদীতে টেনে হেঁচরিয়ে ফেলে দিয়ে, নদীর রচনায় গবু দার্শনিকদের মত ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে পাণ্ডিত্যের বমি উদগীরণ করে। এই বমির গন্ধে সমাজের সহজ, সরল, কাঁচা গলা মোমের মত মানুষগুলোকে এমনিভাবে আক্রান্ত করে ফেলে যে, এরা আর সহজে কোন প্রতিষেধক ঔষধ পায় না। আর যদি একান্ত ঔষধ মেলেই, তবে সেই ঔষধে প্রাণ বাঁচলেও, মরলে জাহান্নামে যেতে হবে বলে তেলেসমাতি গবেষকেরা ভয় দেখিয়ে ফেলেছেন। মরে যাও তাতে কোন দোষ নেই, কিন্তু এই জাতীয় ঔষধ খেয়ে বাঁচাও মহাপাপ বলে আশা দিয়েছেন তেলেসমাতি গবেষকবৃন্দ।

তারপরের প্রশ্নটি হল, প্রত্যেক নবীই যদি যাকাত দিয়ে থাকেন এবং যাকাতের অর্থ যদি মাল ও আড়াই টাকা হয়, তবে প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) কাকে যাকাত দিলেন? বিবেককে আর ফাঁকি না দিয়ে এই প্রশ্নটির উত্তর দিবেন কি? কোরান বলছেন, *'আল্লাজিনাহুম লিয্ যাকাতে ফায়েলুন'* অর্থাৎ 'তারা (বিশ্বাসীরা) সদা-সর্বদা যাকাতের জন্য কর্মতৎপর থাকে।' যদি যাকাত বলতে টাকার অথবা মালের ট্যাক্স বুঝায় তা হলে যে যাকাত দিচ্ছে তার আর সবসময় যাকাত নামক ট্যাক্স দেবার মধ্যে ডুবে থাকার প্রশ্নই আসে না। তাহলে সে অথবা তার পক্ষ হয়ে কেউ বাৎসরিক আয়ের হিসাবটা কিছু সময়ের মধ্যে করেই চুকিয়ে দেওয়া যায় এবং বছরের বাকি সময়টা নানা বিষয়ের উপর সহজেই মনোযোগ দিতে পারবে। সদা-সর্বদা যাকাতের জন্য কর্মতৎপরতায় নিমজ্জিত থাকার প্রশ্নই তা হলে এখানে উঠতে পারছে না। বিশ্বাসী হবার যে সংখ্যা কোরান দিয়েছেন তার মধ্যে এটিও একটি প্রধান শর্ত যে, বিশ্বাসী যাকাত দেবার জন্য সবসময় নিজেকে নিমজ্জিত রাখে। যদি যাকাত বলতে ট্যাক্স বুঝায় তা হলে ধরে নিলাম, একটি গরীব মানুষের সেই গুণটির সম্পূর্ণ অভাব আছে এবং যেহেতু যাকাত প্রদান করাটা বিশ্বাসী বলে গণ্য হবার জন্য একটি অন্যতম প্রধান সংখ্যা সেইহেতু সে বিশ্বাসী হবার সংখ্যা হতে কি বঞ্চিত হয়ে পড়ছে না? যদি যাকাত বলতে 'গরীবের জন্য খাজনা' বলে ধরে নেই তা হলে কোরানে একই কথাকে বার বার বলার মাঝে কি অবৈজ্ঞানিকতার অথবা গড়মিলের

পরিচয় মেলে না? 'সালাত' তথা নামাজ সকলের জন্য অবশ্য পালনীয়, অথচ 'যাকাত'- কে বলা হয় শুধু মাত্র কিছু সংখ্যক লোকের জন্য। তাই নয় কি? তাহলে কেমন করে এই দুটো শব্দ বিজ্ঞানসম্মতভাবে সকলের জন্য বার বার আদেশ এবং সতর্ক থাকার জন্য একই সঙ্গে বসানো হল, যদি একটি আদেশ শুধু কতকের জন্য হয়ে থাকে এবং অন্যটি সকলের তরে? এরকম অবৈজ্ঞানিক শব্দচয়ন কোরানের কোথাও নেই। আর যদি একান্তই 'গরীবের জন্য খাজনা'-কে কোরানের যাকাত বলে ধরে নেই তাহলে সমগ্র কোরানের ভাবধারা ও দর্শনের মাঝে আত্মবিরোধী ভাবের সমাবেশ দেখা যায়, কিন্তু কোরানের কোথাও আত্মবিরোধী একটি উক্তিও নেই। বুঝবার ভুলের জন্যই আত্মবিরোধের জন্ম হয়। আত্মবিরোধ মনের মধ্যে অবস্থান করে, আক্ষরিক কোরানের পাতায় নয়। মনের এই আত্মবিরোধের ফলেই আমরা এক ইসলামকে তেহাত্তরটি ভাগ করে ফেলেছি। সবচাইতে দুঃখ লাগে মনে তখনই, যখন দেখতে পাই এমন একজন অনুবাদকারী পেলাম না যিনি অকপটে অনুবাদ গ্রন্থে অন্ততঃ একটিবারও যদি লিখতো যে, ইহার অর্থ বুঝিতে পারলাম না। কি জঘন্য হামবড়া ঠেঁটা মনোবৃত্তি। বস্তু-বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার আমাদের কুসংস্কার, অজ্ঞতার অন্ধকার, অনুমানে ঢিল ছোঁড়া, ঠেঁটামী আর ভণ্ডামীর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত হেনে এক সার্বজনীন চিরন্তন জ্ঞানরাজ্যে নিয়ে চলছে জোর করে, অথচ বুঝতেই পারছি না বস্তুবিজ্ঞানের শক্তি কত প্রবল, কত অজেয় এবং এই বস্তু-বিজ্ঞানই একদিন থলির লুকানো বিড়ালটি বের করে ছাড়বে এবং পৃথিবীর মানুষগুলোকে সবকিছু পরিষ্কার বুঝিয়ে দেবে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা।

তাহলে যাকাতের কোরানী অর্থ কি? খুব সংক্ষেপে উত্তরটি হল, মানুষ আল্লাহ হতে যা কিছু লাভ করে যথা ধন-সম্পদ, বিদ্যা-বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি চিত্তবৃত্তির সর্বপ্রকার গুণাবলী সকলই আল্লাহর দান। আল্লাহর এই সমস্ত দান ও অনুগ্রহগুলোকে তাঁরই নিকট উৎসর্গ করার নাম হল যাকাত। তাই মানুষের যা কিছু আছে তা আল্লাহর সেবায় নিয়োগ করা ফরজ তথা অবশ্য কর্তব্য। তাঁরই দেওয়া চিন্তা-ভাবনা ও ধন-সম্পদ তাঁরই সেবায় তাঁরই নির্দেশমত উৎসর্গ করার নামই হল যাকাত। মানবীয় আমিত্ব ও আপন ভাবধারা আল্লাহর নিকট বিলিয়ে দিতে হয়। আমিত্বকে নিজের মাঝে রাখলে তাঁর সঙ্গে সংযোগ হয় না। তাই আমিত্বের উৎসর্গ তাঁর সঙ্গে সংযোগের জন্য একান্তই প্রয়োজন। এজন্য লক্ষ্য করবেন, যাকাত কথাটি কোরান শরীফে প্রায়ই সালাতের সঙ্গে মিলিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন ঃ ***'অয়াকিমুস সালাতা ওয়াতুয যাকাত'*** অর্থাৎ 'কায়েম কর (পড়তে বলা হয়নি তথা একরা সালাত বলেনি) সালাত এবং দাও যাকাত।' সালাত শব্দের যত রকমেরই অর্থ করা হোক না কেন, আসলে সালাতের অর্থ হল আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ-প্রচেষ্টা। আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ করতে গেলেই মানবীয় আমিত্বের বিসর্জন প্রয়োজন হয়। এজন্য প্রায়ই সালাত এবং যাকাত একত্র করে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্র এই সাদকা খাজনারূপে আদায় করতো এবং এই খাজনার নাম ছিল যাকাত। এই সাদকাকে যাকাতরূপেই সকলে মনে করে আসছে। আর এই একই কারণে কোরান শরীফের যাকাত অর্থ ভুল করে সাদকার ভাবধারাতে গ্রহণ করার অভ্যাস চলতি হয়ে গেছে। যার ফলে কোরানের অর্থের মিল পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে।

অতি সাধারণ একটি নমুনা তুলে ধরছি। 'বিলেত' নামে রাজধানীর বুকে মনে করুন একটি বড় বাজার আছে। 'বিলেত' নামে যে একটি দেশ আছে এটা যার জানা নেই সে হয়তো 'বিলেত বলতে কি বুঝ?' বলে প্রশ্ন করলেই বাজারটির কথা মনে করিয়ে দেবে এবং এটা তার জন্য নিতান্ত স্বাভাবিক। সেরকম খাজনাটির নাম দেওয়া হয়েছিল যাকাত, আর এই যাকাত নাম দেবার ফলে আমরা এখন

সাদকাকেই কোরানের বর্ণিত যাকাত বলে ভুল করে আসছি। তাই পাঠকের কাছে অনুরোধ রইলো, তারা যেন লক্ষ্য করেন যে, বাৎসরিক আয়ের আড়াই ভাগ আদায় করার নিয়ম-কানুন যেখানে লিখা আছে সেখানে সাদকা শব্দটি বসানো হয়েছে এবং দুই কি একবার 'মাল' শব্দটি বসানো হয়েছে। কিন্তু যাকাত শব্দটি বসানো হয়নি।

এবার আমরা আলোচনা করবো 'ফরায়েজী আইন' বিষয়ে কোরান কি বলছেন। আলোচনার আগে বলে রাখা ভাল যে, এই 'ফরায়েজী আইন' বিষয়টি এমনভাবে ঘোলাটে ও জটিল করে ফেলেছেন শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ যে তার তুলনা নেই। ব্যক্তির সঞ্চিত ধন-সম্পদ কিভাবে ব্যক্তিটি মারা গেলে বণ্টন করে দিতে হবে তার বিধি-ব্যবস্থাকে বলা হয় ফরায়েজী আইন। পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, প্রার্থী-অপ্রার্থী কিভাবে সেই মৃত ব্যক্তির সম্পদ পাবে সেটাই বলা হয়েছে। প্রার্থী ও অপ্রার্থী বলতে এখানে মৃত ব্যক্তির অনাত্মীয়দের কথাই বলা হয়েছে, তথা যারা এককথায় গরীব এবং অভাবী তাদেরও সেই সম্পদের উপর হক আছে এবং এই হককে কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। আর অস্বীকার করা যায় না বলেই শ্রদ্ধেয় আলেমেরা মহাফাঁপড়ে পড়লেন। যদিও এই বণ্টনব্যবস্থা কেন এবং কতদিনের জন্য দেওয়া হল সেই মূল সূত্রের সঙ্গে একেবারেই সমাজকে পরিচালিত না করেই এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাদ দিয়েই তারা বিরাট ফাঁপড়ে পড়ে যান। তারা দেখতে পেল যে, যদি গরীব এবং অভাবীদের হককে সেই সম্পদের উপর স্বীকার করে নেওয়া হয় তা হ'লে তারাই মৃতব্যক্তির ধন-সম্পদের কিছু অংশের অধিকারী হয়ে যায়। তাই সবকিছু ভেবে-চিন্তে দেখার পর শ্রদ্ধেয় আলেমরা এক চমৎকার ফন্দি আবিষ্কার করলেন। সেই ফন্দিটি হল, মৃত ব্যক্তির ধন হতে কিছু খাদ্যদ্রব্য গরীব আর অভাবীদেরকে দিয়ে দিতে হবে। তা হলেই গরীব আর অভাবীদের যা হক তথা পাবার ছিল তা সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেওয়া হল। চমৎকার শ্রদ্ধেয় আলেম ভাইদের ফতোয়া।

এরকম খাসা খাসা ফতোয়া দিয়ে দিয়েই তো নায়েবে নবী দাবী করার দল শ্রদ্ধেয় আলেমেরা ইসলামের এক দেহে তিন কুড়ি তের তালির লেবাস পরিয়ে দিয়েছেন। আর ইসলামের গায়ে এত তালির জামার বাহার দেখে সার্কাস খেলার মাঠের লোক হাসানো জোকার মনে করে। এই শ্রদ্ধেয় আলেমেরা ইসলামকে হেফাজত করতে গিয়ে শিয়াল পণ্ডিতের নমস্য সাধুতার পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন, তাই জনতা ইসলামের নাম শুনলেই এই সমস্ত শ্রদ্ধেয় আলেমদের ছায়া মারাতেও ভয় করে।

যেহেতু মৃতব্যক্তির সঞ্চিত ধন-সম্পদ বণ্টন করার ব্যবস্থা ইসলাম দিয়েছেন সেই হেতু ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি আছে বলেই স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে এবং এই স্বীকৃতিকে নিরপেক্ষ মনে বিবেককে ফাঁকি না দিয়ে বিচার করলে মেনে নিতেই হবে যে, ব্যক্তিমালিকানা ইসলামে আছে।

যেহেতু ইসলাম বলেছে, তুমি যা খাও ও পরিধান কর ইহা তোমার দাস-দাসীদেরকেও দিতে হবে, সেই হেতু দাসপ্রথার স্বীকৃতি আছে বলেই স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে এবং এই স্বীকৃতিকে নিরপেক্ষ মনে বিবেককে ফাঁকি না দিয়ে বিচার করলে মেনে নিতেই হবে যে, দাসপ্রথা ইসলামে আছে।

যেহেতু 'দাসপ্রথা ইসলামে নেই' বলে প্রতিবাদ করে সঙ্গে সঙ্গে বলবেন যে, এখানে দাস-দাসীর উপর যে ব্যবহারিক আদেশ রয়েছে সে আদেশ সর্বকালের জন্য আদেশ নয়। যতদিন দাসপ্রথার বিলুপ্তি না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই আদেশ সাময়িকভাবে কার্যকরী বলে ধরা হবে এবং যেহেতু কোরানের স্থানে স্থানে এবং বহু সংখ্যক হাদীসে দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেবার আদেশ রয়েছে সেই হেতু দাসপ্রথা থাকে কোথায়? এবং যেহেতু দাসপ্রথা যেদিন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং কোরান

হাদীসের আদেশ অনুযায়ী দাসপ্রথা উচ্ছেদ করতেই হবে এবং যেদিন আর দাসপ্রথা সমাজে থাকবে না সেই হেতু দাস-দাসীদের উপর মানবিক আচরণের আদেশগুলো যাহা কোরান-হাদীসে দেওয়া হয়েছে উহা থাকে কোথায়? যেহেতু 'যে ধন-সম্পদ জমা করে' তার জন্যই হুতামা তথা জ্বলন্ত আগুনে চিরদিন অবশ্যই জ্বলতে হবে বলে কোরান ঘোষণা করছেন এবং ধন-সম্পদ জমা করাটাই যেখানে মারাত্মক শাস্তি পাবার কথা কোরান-হাদীসে অসংখ্যবার বলা হয়েছে সেই হেতু মৃত ব্যক্তির সঞ্চিত ধন-সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থাটি যাহা কোরানে দেওয়া হয়েছে উহা থাকে কোথায়? এবং যেহেতু দাসপ্রথা চালু থাকা অবস্থায় দাসদের উপর কি কি রকম আচরণ করা হবে উহা বলে দেওয়া হয়েছে, সেই হেতু ধন-সম্পদ যতদিন ব্যক্তির হাতে জমা থাকার প্রথা চালু থাকবে ততদিন সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পর অবশ্যই বণ্টন ব্যবস্থাটিও থাকতে হবে এবং সেই হেতু ততদিন ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতিও থাকছে। যেহেতু যেদিন থেকে দাসপ্রথা আর থাকছে না, সেদিন থেকে দাসদের উপর কি কি রকম ব্যবহার করতে হবে সেই প্রশ্নটিও আর থাকছে না। যেহেতু যেদিন থেকে ধন-সম্পদ জমা করার নিয়ম আর থাকছে না, সেদিন থেকে ধন-সম্পদ ব্যক্তির মৃত্যুর পর যে বণ্টন করার পদ্ধতি উহাও আর থাকছে না। এবং সেই হেতু ইসলামের অর্থনৈতিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যেখানে টানা হয়েছে, সেখানে ব্যক্তিমালিকানা মোটেই থাকছে না, এবং সেখানে থাকছে অর্থনৈতিক সাম্য।

ইসলাম প্রদত্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি সর্বতোভাবে মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত বিশ্বের বুকে স্থাপন করার কোন দর্শন না দিয়ে যেতো তবে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কখনোই সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা যেতে পারে না। গায়ের জোরে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা যেতে পারে না। গায়ের জোরে বিশ্বের জনতার কাছে গুরু হওয়া যায় না। একথাটি যারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন তারা কখনোই ইসলামের অর্থনৈতিক পদ্ধতিকে উপেক্ষা করতে পারেন না।

ইসলামে কোন সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন তো উঠতেই পারে না, বরং এর সম্পূর্ণ বিরোধিতাই করছে। কোরান এবং হাদীস শরীফ হতে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও যদি আপনি একটি মাত্র প্রমাণও দাঁড় করাতে পারেন যে, রহিমের ছেলে করিমকে ইসলাম মুসলমান বলেছে এবং রামের ছেলে শ্যামকে ইসলাম হিন্দু বলেছে, টমের ছেলে হ্যারিকে ইসলাম খৃষ্টান বলেছে, ইহুদির ছেলেকে ইসলাম ইহুদি বলেছে, তাহলে আমি মেনে নেব যে, নিশ্চয়ই ইসলামে সাম্প্রদায়িকতা আছে এবং তা যত ক্ষুদ্র আকারেই থাক না কেন। কিন্তু অবাক হবেন, ইসলাম এরূপ অশোভন উক্তি কোথাও করেনি। ইসলাম মুসলমান হবার সংখ্যা দিয়েছে এবং এই সংখ্যার বাইরে যারা তাদেরকে মুসলমান বলা হয়নি। অথচ মিথ্যার পাহাড় দিয়ে এবং বানায়োট ব্যাখ্যার জগাখিচুড়ী পরিবেশন করে যুগে যুগে সবার ইসলামকে কিছু লোকের ব্যক্তিগত ইসলামে পরিণত করে রেখেছে। যারা ইসলামের সত্য সুন্দর রূপটি ধরতে পেরেছেন তারা এসব সংকীর্ণতা দেখে এ পথ ছেড়ে সুফিদের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন এবং অনেকে রাজশক্তির প্রবল বাধা আসতে পারে বলে বাধ্য হয়েছেন। এদের সঙ্গে ঝগড়া করে এবং কলম না চালিয়ে আত্ম দর্শনের সাধনার রাজ্য সুফিবাদের মধ্যে চলে গেছেন। 'কুকুরদের জন্য হাড় রেখে দিলাম' বলে সুফিবাদের উপর অমর গ্রন্থ '*মসনভী শরীফ*' রচনা করে জালালউদ্দীন রুমী সুফিবাদকে জ্ঞানীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সত্যরূপে রেখে গেলেন। এত মিথ্যার পাহাড়, ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর মত কেবল সেই হাদীস তৈরি করার সময় হতে চলে আসছে যে, সামান্য সত্য লিখনীর দ্বারা এত বড়

মিথ্যের সমুদ্রের কাছে না দাঁড়িয়ে সুফিবাদকেই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হিসাবে বহু সত্যাশ্রয়ী মনীষী গ্রহণ করে নিয়েছেন।

ইসলামের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, সাম্য-ভ্রাতৃত্বের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করার পথে দ্রুত তালে এগিয়ে গেলেও চরম আঘাত খেল হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) কাছে। অনেকেই হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-কে বর্ণচোরা মুনাফেক বলে অভিহিত করেন। যে বায়তুল মালের উপর জনসাধারণের সমান অধিকারকে মেনে নেওয়া হতো সেই পবিত্র বায়তুল মালের আমানতকে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করতেও বিন্দুমাত্র লজ্জা অনুভব করেননি। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অতিমাত্রায় জনতার কাছে গুরুত্ব প্রদানের জন্য নিয়োজিত করলেন বেতনভুক্ত কিছুসংখ্যক আলেমদেরকে, যারা ইহাকে নৈতিকতা-বিরোধী কাজ বলে ঘৃণা প্রদর্শন করলেন এবং বহু ক্ষেত্রে বিপ্লব শুরু করার প্রস্তুতি নিতেছিলেন তাদেরকে নির্মমভাবে দমন করা হল। আর নিযুক্ত করা হল বেতনভুখ গুপ্তচর। এদের মাধ্যমে রাজ্যের আনাচে কানাচে কোথাও যদি বিপ্লব দানা বাঁধার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেত তবে সেই সমস্ত সন্দেহসূচক বিপ্লবীদেরকে নির্মমভাবে করা হতো হত্যা। প্রয়োজন হলে ভোজের দাওয়াত দিয়ে ঘরের ভেতর এনে মেরে ফেলা হত। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের ফেলে রাখা বাস্তব আদর্শের বুকে বসিয়ে দিলেন ডেগার। কিন্তু আফসোস! কত যুগ পেরিয়ে গেল, কিন্তু সেই আদর্শ আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলো না।

ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠার তরে যখন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর নয়নের মণি ইমাম হুসায়েন এগিয়ে এসেছিলেন তখন হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) সেই পেশাদারী তিন শত তথাকথিত আলেমরাই ‘কাফের এবং বাঘী’ ফতোয়া দিতেও বিবেকে বাধেনি। তাই তো হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বিশ্বের মানবকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, ‘এমন দিন আসবে যখন আলেমদের স্বভাব জমিনের উপর সবচাইতে নিকৃষ্ট হবে।’

‘মসজিদ ঘরে ধনী-গরীব সমান আর খাবার সানকিতে একজন পোলাও-কোরমা আর একজন দু’মুঠো বাসি ভাত’ এটাই কি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সেই সাম্যগান, যে সাম্যগানে অবগাহন করে খলিফা উমর ফারুক নিজে যতটুকু উটের পিঠে বসে জেরুজালেম গিয়েছিলেন ততটুকু তার চাকরকেও বসিয়ে নিয়েছেন? এটাই কি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সেই সাম্যগান, যে গানের সুরে মাতোয়ারা হয়ে হযরত আবু বকর বন্ধুর দেওয়া মধু মিশ্রিত পানি পান করার পর গলায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, ‘কি জবাব দেব যদি আবু বকরকে প্রশ্ন করা হয় লক্ষ লক্ষ জনতা কি সেদিন সে বেলায় তৃপ্তির সাথে পানি পান করতে পেরেছিল? সে খবর কি তুমি নিয়েছিলে? তবে কোন অধিকারে পানির সঙ্গে মধু মিশিয়ে পান করেছো?’ এটাই কি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সেই সাম্যগান, যে গানে মুগ্ধ হয়ে মাওলা আলী বলেছিলেন, ‘যেদিন প্রতিটি মানুষ এরকম প্রাসাদে থাকার ব্যবস্থা করতে পারবো সেদিনই এই প্রাসাদে থাকার প্রশ্ন বিবেচনা করা হবে’?

যে ধন-সম্পদের দাম একটি মাছির একটি ডানার সমানও নয় বলে আল্লাহ আমাদেরকে বার বার জানিয়ে দিলেন, যে ধন-সম্পদের দাম একটি মরা-পচা-দুর্গন্ধযুক্ত ছাগলের বাচ্চার চেয়েও মূল্যহীন বলে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আমাদেরকে বহুবার বহু রকমে উপদেশের পর উপদেশ দিয়ে গেলেন আর সেই ধন-সম্পদ নিজের অধিকারে রেখে কি করে যে আমরা আল্লাহ এবং নবীর আদর্শে বিশ্বাসী বলে জাহির করি সেটা ভাবতেও মন লজ্জা ও ঘৃণায় ভরে উঠে।

'বিশ্বের এমন কোন প্রাণী নেই যার প্রয়োজনীয় সম্পদ আল্লাহ সৃষ্টি করেননি', এত বড় নিশ্চয়তার বাণী কোরান আমাদেরকে দেওয়া সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি অভিযোগ করে যে, তেরশত পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ যে না খেয়ে মারা গেল, তারা যদি কেয়ামতের দিনে আল্লাহকে প্রশ্ন করে যে, এই অর্ধকোটি না খেয়ে মরা মানুষের প্রয়োজনীয় সম্পদ তখন কোথায় রেখেছিলে? যদি এরকম প্রশ্ন করা হয় তবে কি তার জবাব আল্লাহ দিতে পারবেন না? আল্লাহ তার উত্তরে বলবেন, যারা তোমাদের এত লোকের খাদ্যসামগ্রী তোমাদের চোখের সামনে গুদামজাত করে রাখলো তাদের বিরুদ্ধে কি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়নি? তোমাদের খাদ্যসম্পদ তোমাদের চোখের সামনে যারা গুদামজাত করে রাখে তাদের বিরুদ্ধে কিছু করার চেতনা কি তোমাদের মনে দোলা দেয়নি? যারা অন্যায়, শোষণ, জুলুমের বিরুদ্ধে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে তাদের জন্য সত্যিই দুঃখ হয়। তোমাদের সম্পদ যদি শোষকেরা শোষণ করে, তোমাদের চোখের সামনে অবৈধভাবে যদি গুদামজাত করে, তার জন্য কি আল্লাহ দায়ী, না তোমরা? ***'ইন্না আবয়াবাল জান্নাত তাহতা জেলালে সাইয়ুফে'*** অর্থাৎ 'বেহেস্তের দরজা নিশ্চয়ই তরবারির ছায়ার নিচে' বলে কি শোষণ জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বলা হয় নি? ***'উনসুর আখাকা জালেমান'*** অর্থাৎ 'সাহায্য কর জালেমকে' বলে কি তোমাদেরকে আবেদন জানানো হয়নি? ***'উনসুর আখাকা জালেমান ওয়াল মজলুমা'*** অর্থাৎ 'সাহায্য কর জালেমকে এবং মজলুমকে'। হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর পবিত্র মুখনিসৃত এই বাণী সাহাবাদের মুহূর্তের তরে অবাক করে দিয়েছে। তাই অবাক চোখে একজন সাহাবা প্রশ্নই করে বসলেন, 'হুজুর, যারা মজলুম, যারা অত্যাচারিত, নিষ্পেষিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, পদদলিত তাদেরকে সাহায্য করা যায়, তাদেরকেই সাহায্য করার প্রশ্ন উঠে, কিন্তু যারা অত্যাচারী, জালেম, মানুষের বুকের রক্ত মশার মত আরামে বসে পান করে, মিথ্যার আশ্রয়ে ভানুমতির ভেল্কিবাজি দেখায়, হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার ডুগডুগি বাজায়, গদির পুরনো পঁচা চামড়ার উগ্র গন্ধে যারা গদির চারপাশে চামড়া চাটা কুকুরের মত ঘুর ঘুর করে বেড়ায়, তাদেরকে সাহায্য করার কথা বললে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই অবাক হবে এবং প্রশ্ন করবেই। তাদেরকে সাহায্য করতে হবে বলে যখন আদেশ হল তখন সবাই অবাক হয়েছিলেন। অবাক হয়েছিলেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর সাহাবারা। তাই প্রশ্ন উঠেছিল, প্রশ্ন করতে হয়েছিল, ***'কাইফা আনসুরু জালেমা?'*** অর্থাৎ 'কেমন করে জালেমদেরকে সাহায্য করবো?' হযরত মোহাম্মদ (দঃ) বললেন, ***'কুফ ফুহু আনিজ জুলমে'*** অর্থাৎ 'অত্যাচার করা হতে বিরত রাখ।'

জালেমকে কেমন করে জুলুম হতে বিরত করা যাবে? রুখে দাঁড়াও অত্যাচারী জালেমদের বিরুদ্ধে, যেন জালেম আর কোনদিন জুলুম করতে না পারে এবং এই রুখে দাঁড়ানোটাই কি অত্যাচারী জালেমদেরকে সাহায্য তথা মদদ করা নয়?

হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর এই আদেশ-বাণীকে যদি আমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি, যদি নিরপেক্ষ মন দিয়ে তথা বিবেকের দ্বারা বিচার করে দেখি, তবে নিশ্চয়ই আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হব যে, জালেমদেরকে দুনিয়ার ইতিহাসে কোনদিন আবেদন-অনুরোধ তথা যুক্তির মাধ্যমে বুঝিয়ে সর্বপ্রকার জুলুম পরিত্যাগ করাতে পারেনি এবং আবেদন-অনুরোধের মাধ্যমে হয় না বরং আরো উগ্র আরো ভয়াল মূর্তি নিয়ে জালেম চরম আঘাত হানার ষড়যন্ত্রে দিশেহারা হয়ে পড়ে। তারই জ্বলন্ত নমুনা, তারই জলজ্যান্ত ঘটনাসমূহ স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সময়ও আমরা দেখতে পেয়েছি। দেখতে পেয়েছি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর আবেদন-অনুরোধের প্রতিক্রিয়া এমন ভীষণ আকার ধারণ করলো জালেমদের মনে যার দরুন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে পর্যন্ত জেহাদ করতে

হল। জেহাদ করতে হল সংঘবদ্ধ হয়ে জালেমের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রামের লৌহশপথ নিয়ে। জালেমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর পবিত্র রক্ত কণিকাও পবিত্র দেহ মোবারক হতে ঝরে উষ্ণ বালিকে লাল রঙে পরিণত করেছে ওহোদের যুদ্ধ ময়দানে।

দেড় হাজার বছর আগে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর কাছে এসেও যারা মুনাফেকী করেছে – যারা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর এন্তেকালের পরও ভণ্ড নবী সেজে, পোশাকী নবী সেজে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভুল পথে টেনে এনে জাহান্নামের লাকড়ি বানিয়েছে, তারা চিরতরে মানব সমাজ হতে মুছে যায়নি। তারা বেঁচে নেই কিন্তু তাদের প্রেতাত্মা ভর করে আছে আমাদের সমাজে। এই সমস্ত ভণ্ডদের ডাকে আজো কত সহজ-সরল-প্রাণের মানুষ ধোঁকা খাচ্ছে এবং ভুল পথে পা বাড়িয়ে দিচ্ছে তার সাবধান বাণী কালের ইতিহাস হয়তো দিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে।

হযরত আবু বকর, হযরত উমর ফারুক, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আবুজর গিফারীর চোখের সামনে মুসায়লামা লেবাসধারী ও ভণ্ডনবী সেজে যখন একলক্ষ মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল তখন জানি না মহান সাহাবারা কি মুহূর্তের তরে মুখের পবিত্র ভাষা ভুলে গিয়েছিল কিনা? জানিনা – হয়তো অবাক বিস্ময়ে বোবার মত কিছুক্ষণ কি অনাগত কালের মুসলমানেরা এমনিভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাবে বলে ভেবেছিলেন কিনা?

জিজ্ঞাসার বিভিন্ন বিশ্লেষণের মরুভূমিতে ঊর্মির নৃত্যছন্দের ছায়া আবরণ দিতে অক্ষম। জীবনপ্রদীপ অসহ্য অভ্যন্তরীণ জ্বালায় বিবেক প্রশ্নের ধারালো বাণের আঘাতে উপলব্ধি করে মৃত্যুগ্রহণের অনিচ্ছার ছবি। ইচ্ছার তীব্রতা আত্মহত্যার দড়ি অবলোকনে ভীত হলেও ফাঁসির আসামীর মত জমটুপী মাথায় এগিয়ে যেতে হয়। বেদনার মূর্তি তৈরি করে দুঃখ।

আত্মপরিচয় অপরিচিত রাজপথের পথিকের মত হেঁটে চলে। কেউ প্রশ্ন করতে চাওয়া তো দূরে থাক, একটা মমতার চাহনিও পায় না তখন। ভিক্ষুকের চাওয়ার মত মিনতির ম্লান আহ্বান। নিজেকে আপন হাতে ডুবিয়ে দেয় অথৈ জলে। আশার অদৃশ্য আকাঙ্ক্ষায় যান্ত্রিক সভ্যতার মেকী আভিজাত্যের অথৈ জলে যে তাকে জেনে-শুনে ডুবে যেতে হবে সেটা অভিজ্ঞতার আঁকা-বাঁকা পথে হোঁচট খেতে-খেতে বুঝতে পারে মর্মে-মর্মে। আর তখন? কেউ রূপ নেয় বিদ্রোহের। জানে পরাজয় তার অবধারিত, তবু বিদ্রোহটাই তার প্রতিবাদ। কেউ রূপ নেয় ডাকত-হাইজ্যাকার-চোর-ছ্যাঁচড়ে আর প্রতারণার সুন্দর সুন্দর বাণিজ্যে। এই বাণিজ্যের মধ্যে আছে আর এক বাণিজ্য। একটা মার খায় এই সমাজে আর একটা সুখের প্রাসাদ গড়ে তোলে। যান্ত্রিক সভ্যতার আধুনিক পৃথিবী পাহারা দেবার প্রহরীকে দিয়ে শান্তির বাণী শোনায়। অথচ পাহারাদারকে যদি পরীক্ষার হলে নিয়ে যাওয়া হয় তবে তুমি দেখতে পাবে রাজপথের দু'ধারের সারিবদ্ধ প্রাসাদের চমক আর ঠমক গড়েছে তারাই। আইন আইনের গলা টিপে মারতে দেখেছি, দেখতে হবে এবং কতদিন দেখতে হবে জানি না। কারণ, সবচেয়ে বড় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে শেষ কথা তার নাম 'জানি না'।

জেনে-শুনে উষ্ণতার ভয়কে আলিঙ্গন করে অনেকেই জ্বলন্ত আগুনের সামনে দাঁড়াতে পারে, তবু বর্ণচোরাদের বানানো ভণ্ডামীর নরম তুলতুলে বিছানাটাকে করে ঘৃণা। কারণ, ঐ বর্ণচোরদের নরম বিছানায় যদি একবার ঘুমিয়ে পরে তখন ওরা লাশ মনে করে আর তখনই ওরা জিভ বের করে শিয়ালের ঝক ঝক চোখে খুবলিয়ে খাবার বোবা বাসনায়।

আমাদের ধর্মীয় দর্শনে কোরানের কতিপয় সূরার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

(ক) সূরা লাহাব

১. তাব্বাত্ ইয়াদা আবি লাহাবিউঁ ওয়া তাব্বা
২. মা আগনা আন্হু মালুহু ওয়ামা কাসাবা
৩. সাইয়াস্লা নারান্ জাতা লাহাবিউ অম্রাতুহু
৪. হাম্মা লাতাল্ হাতাবে
৫. ফি জিদিহা হাবলুম মিম্ মাসাদ্

অনুবাদ

১. আবু লাহাবের হাত দু'টো ধ্বংস হোক এবং উহা ধ্বংসই।
২. তার ধন ও তার উপার্জন তার কোন উপকারেই আসে না।
৩. শীঘ্রই সে লেলিহান আগুনে জ্বলবে।
৪. আর জ্বলবে তার স্ত্রী জ্বালানি কাঠ বহনকারিনী।
৫. খেজুর পাতার দড়ি তার গলায় জড়িয়ে পড়বে।

ব্যাখ্যা

এই সূরাতে হুজুর পাককে সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছে। ঠিক তেমনি আবু লাহাবকে দেখানো হয়েছে অন্যায়-অবিচার এবং সত্যকে বাধাদানকারীর প্রতীকরূপে। সে সর্বদাই পার্থিব ও আধ্যাত্মিক (মেটিরিয়াল এণ্ড ইসপিরিচুয়াল) সত্যের বিকাশের প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড়িয়ে থাকে। আবু লাহাব জাতীয় মানুষ বাস করে জাহান্নামে (ফিউচার টেনস তথা ভবিষ্যত কাল ব্যবহার করা হয়নি তথা জাহান্নামে যাবে বলা হয়নি)। তার স্বভাব ও কার্যকলাপগুলো নিজেরাই জাহান্নামে বাস করার খোরাক তথা ইন্ধন। আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পাবে যে, তার আমলগুলোর দ্বারাই তথা কার্যকলাপের দ্বারা সে জাহান্নামে তথা দুনিয়াতেই ছিল এবং দ্বীনে প্রবেশ করে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ হয়ে গেল। কাজেই দেখা যায়, জালেম লোক জাহান্নামেই বাস করে। শুধু দৃষ্টি হতে পরদা সরে না যাবার কারণে আমরা উহা বুঝে উঠতে পারি না। এটুকুই যা প্রভেদ। এই কারণেই এই সূরার প্রথম আয়াতেই বলা হয়েছে, 'ওয়াতাব্বা' অর্থাৎ 'এবং উহা ধ্বংসই'।

সত্য ও অসত্য এই দুই বিপরীত ভাবের মধ্য হতে অসত্যের বিরুদ্ধে জেহাদের শিক্ষা দিচ্ছেন কোরান। যেন আমরা অসত্য, অন্যায় হতে সাবধান থাকি এবং ভুলেও উহার প্রশ্রয় না দেই। যারা আবু লাহাবের মত জালেম তারা ধ্বংস হোক তথা ধ্বংস করে দেবার মনোবল নিয়ে এগিয়ে চলার আদর্শকে আমাদের মনের উপর জাগ্রত প্রহরীর মত স্থিতিমান রাখার মহান চেতনায় সজাগ প্রহরী হবার শিক্ষা দিচ্ছেন কোরান। তারপর বলা হয়েছে যে, আবু লাহাব জাতীয় এক শ্রেণীর জালেমেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থাতেই আছে। যদিও আমরা তাহা দুনিয়ার কলুষ মাখানো দৃষ্টির জন্য বুঝে উঠতে পারি

না। মজলুম জনতার জীবনপথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, জুলুমের বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার যে বিরাট ও মহান শিক্ষা রয়েছে এই সূরার প্রথম আয়াতটি তারই একটি জ্বলন্ত নজির।

সমাজ জীবনে জালেমদেরকে অভিশাপ দেবার অর্থই হল তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মনোভাব নিয়ে চলার নির্দেশ। ভুলেও যেন মুহূর্তের জন্য জালেমদেরকে প্রশ্রয় দিয়ে না ফেলি। এই জন্যই এরূপ অভিশাপ দেবার নির্দেশ রাখা হয়েছে। এখানে আবু লাহাব বলতে ব্যক্তি আবু লাহাবকে বুঝানো হয়নি, বরং শ্রেণী আবু লাহাবকেই বুঝানো হয়েছে, যে আবু লাহাবের উদয় যুগে যুগে মানব সমাজের প্রত্যেক অংশে বিভিন্ন রূপে ও গন্ধে বিরাজ করে। তার এই অকল্যাণের মূর্তি আমরা দেখতে পাই সবরকম বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক কর্মক্ষেত্রে।

আবু লাহাব এবং শ্রেণী আবু লাহাবদের ধ্বংস কামনা শুধু যে আমরা মানুষেরাই করবো তা নয়, বরং কোরান নিজেই এই ধ্বংস কামনা করে। অর্থাৎ, ইহা কোরানেরই বিধান তথা বিশ্ব প্রকৃতির বিধান যে, এই আবু লাহাব শ্রেণীর লোকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েই চলছে, কিন্তু তা আমরা অন্ধ দুনিয়ার দৃষ্টির কারণে বুঝতে পারি না। আবু লাহাব শ্রেণীর যারা, তাদের সকল প্রকার কর্ম প্রচেষ্টা এবং উপার্জন ব্যর্থ। কারণ শীঘ্রই অর্থাৎ দুনিয়া সরে গেলেই তারা অনুশোচনার লেলিহান অগ্নিশিখায় প্রবেশ করবে।

তারপর আসলো তার স্ত্রী-প্রসঙ্গ। যারা ভালবাসবে আবু লাহাব শ্রেণীর লোকদেরকে এবং তাদের সহযোগিতা করবে, তারাও এই একই শ্রেণীভুক্ত। যে কার্যাবলী ও আমল তারা করে সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে, ঐগুলোই তাদের দোজখের ইন্ধন। দুনিয়ায় অবস্থানকালে এই ইন্ধনসমূহের জ্বালা দৃষ্টিগোচর না হলেও অতি শীঘ্রই দ্বীনে প্রবেশ করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের ঘাড়ে সেই অগ্নির বোঝাই বহন করছে। আর তাহা এমনভাবে তাদের গলদেশে দড়ির মত জড়িয়ে পড়বে যে, উহা তারা ত্যাগ করতে পারবে না।

আবু লাহাব ও তার স্ত্রী সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক হুজুর পাকের (দঃ) বিরুদ্ধে যেরূপ অন্যায় আচরণ করতো উহার মূলে ছিল হিংসা এবং কর্তৃত্বের মোহ। সকল যুগেই দেখা যায় যে এক শ্রেণীর লোক নিজেদের হীনস্বার্থ এবং ক্ষমতার কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য সমাজসেবী কল্যাণকামী লোকদের বিরুদ্ধে হিংসামূলক আচরণ করে থাকে। যদিও তারা বেশ জানে যে, যাদের বিরুদ্ধাচারণ তারা করছে তারা প্রকৃতই মহান জনদরদী।

'আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হওয়া'-এর অর্থ অন্যায় শক্তির ধ্বংস কামনা করা তথা অন্যায় শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা। অন্যায়কারী অনুতপ্ত হয়ে সংশোধিত হলে তার ধ্বংসের কোন দরকার হয় না। সে আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত লাভ করে তার তৌবার তথা অনুতাপ ও সত্যপথে প্রত্যাবর্তন করার কারণে। এই জন্য 'আবু লাহাব ধ্বংস হোক', এ কথা না বলে 'আবু লাহাবের হাত দুটো ধ্বংস হোক' একথা বলা হয়েছে। কারণ হাত দুটো শক্তির প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয়। যদিও আবু লাহাবের হাত দুটো ধ্বংস হবার সাথে সাথেই সেও ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তার স্ত্রী, যে তার হাতকে অন্যায় করার ইন্ধন যোগাতো, সেও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। কারণ, পাপ কখনো ধারণারূপে বিরাজ করে না। পাপ আরোপিত হয় অখণ্ড একক সত্তার বিবর্তিত খণ্ডসত্তা একমাত্র মানব ও জ্বিন নামক জাতির অন্তরে। তাই পাপের ডিপো আবু লাহাব ও তার স্ত্রী ধ্বংস হয়েছে এবং ধ্বংস করে দিতে বলা হয়েছে।

মন্তব্য

'ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হাত দুটো এবং উহা ধ্বংসই' কোরান পাকের এই বাণীতে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে আবু লাহাব তো আর ইহজগতে নেই, দেড় হাজার বছর আগেই তার মৃত্যু হয়েছে, তবে তাকে আর ধ্বংস হয়ে যাক আবু লাহাবের হাত দুটো বলার মাঝে কি সার্থকতা থাকতে পারে? কিন্তু এর উত্তর, ব্যক্তি আবু লাহাব নয়। আবু লাহাবদের শ্রেণীগতভাবে ধ্বংস হবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যক্তি মীরজাফরকে যেমন বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীকরূপে আমরা ব্যবহার করি এবং তার ধ্বংস কামনা করি, সেরকম আবু লাহাবকে জালেম অত্যাচারীর প্রতীকরূপে ব্যবহার করে আবু লাহাবদের শ্রেণীচরিত্রকে ধ্বংস হয়ে যাবার কামনা করতে বলা হয়েছে। মহাপুরুষরা যেমন এক একটি যুগে আগমন করে মানবতার আদর্শ ব্যাপকভাবে প্রচার করে যান এবং মানবতা প্রতিষ্ঠার তরে নিজের স্বল্প জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে যান, সেরকম আবু লাহাবেরাও যুগে যুগে আগমন করবে এবং মানবতার বিরুদ্ধে মতবাদ তথা জুলুম অত্যাচারের বন্যা বয়ে দিয়ে যাবে। তাই এই আবু লাহাব শ্রেণীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেন আমরা তথা মজলুম জনতা সদা-সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন করতে পারি তথা তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারি তারই সংকল্প গ্রহণ করতে বলেছেন পাক কোরান তথা অত্যাচার, অবিচারের বিষবৃক্ষ যারা মানব সমাজে বুনে দেয় ও দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে মানব সমাজের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের আবেদন ও আদেশ দিয়েছেন পাক কোরান। আবু লাহাবদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মাঝে আপাতদৃষ্টিতে নির্মম বলে মনে হলেও ইহা মোটেই নির্মমতা নয়, যদিও আবু লাহাবদের চোখে এবং যারা তাদের অত্যাচার করার লাকড়ি যোগাড় করে তথা আবু লাহাবদের সাহায্য ও সহযোগিতা করে তাদের দৃষ্টিতে ইহা নির্মম বর্বরতা এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপ বলেই মনে হবে এবং মজলুম জনতাকে ভুল পথে পরিচালনা করার জন্য স্ত্রী উজ্জারা, তথা আবু লাহাবদের পা-চাটার দল, উঠে পড়ে লাগবে।

ব্যক্তি আবু লাহাবকে অত্যাচার করতে সহায়তা করেছিল তারই স্ত্রী উজ্জা তাই স্ত্রী উজ্জাকেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে হয়েছে তথা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে এবং শ্রেণী আবু লাহাবদের যারা ব্যক্তি আবু লাহাবের স্ত্রী উজ্জার মত অত্যাচার করার তরে সাহায্য ও সহযোগিতা করছে তাদেরকেও সমুচিত শিক্ষা দেবার উপদেশ দিচ্ছে পাক কোরান। শ্রেণী আবু লাহাবদের অত্যাচারের হস্তকে যারা সুদৃঢ় করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চালায় তারা প্রত্যক্ষ আবু লাহাব না হলেও পরোক্ষভাবে একই শ্রেণীর এবং এই একই শ্রেণীভুক্ত বলেই ব্যক্তি আবু লাহাবের সঙ্গে স্ত্রী উজ্জাকেও ধ্বংস হয়ে যেতে হয়েছে। স্ত্রী যেমন স্বামীর কর্মপ্রেরণায় উৎসাহ এবং সহায়তা করে সেরকম শ্রেণী আবু লাহাবকেও যারা অত্যাচার করার লাকড়ি যোগাড় করে তথা সহায়তা করে তারা তো স্ত্রীর মতই, যদিও আধুনিক ভাষায় এই শ্রেণীর স্ত্রীদেরকে দালাল, বাটপার, পা চাটা কুকুর বলে থাকে এবং গ্রাম্য ভাষায় এদেরকে বলা হয় বেদের পোষা খাঁচার ডাহুক।

অবশ্য আজকের এই আধুনিক যুগে স্ত্রী উজ্জার মত যারা শ্রেণী আবু লাহাবদের দালালি করে গোটা সমাজ জীবনকে একটা বিরাট ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে চেনাও মজলুম জনতার পক্ষে ভীষণ কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্ত দালাল ডাহুকেরা যে কত রকম পোশাক বদলাতে পারে এবং কত রকমে যে মজলুম জনতার দৃঢ় ঐক্যের মাঝে শত শত ফাটল তৈরি করে যার দরুন মজলুমের সংগ্রাম ও বিপ্লব সফলতা অর্জন করে বহুদিনের অধ্যবসায় ও কঠোর সাধনার পর। ডাহুক-ধরা বেদে জানে যে, ঝোপ-জঙ্গলের স্বাধীন ডাহুকেরা বেদের মুখ দেখে ধরা দেবে না। কারণ,

ডাহুক-ধরা বেদে এদের শ্রেণীভুক্ত ডাহুক নয়। সে অন্য জীব তথা মানুষ। তাই বেদের মুখ দেখলে ঝোপের ডাহুকদল পালিয়ে যায়। বেদে তখন মনে মনে ফন্দি আঁটে আর এই ফন্দির ফলস্বরূপ বেদে একটি ডাহুককে খাঁচায় পুরে আপন জনের মত খাদ্য দিয়ে লালন-পালন করে। যখন খাঁচার ডাহুক বেদের পোষ মেনে নেয় এবং বেদের শেখানো আকার-ইঙ্গিত রপ্ত করে ফেলে তখনই বেদের বুকে আশার সঞ্চার হয়। খাঁচায় আবদ্ধ পোষা ডাহুকটিকে নিয়ে বেদে তখন ডাহুককুলের আড্ডাখানায় তথা ঝোপ-জঙ্গলের এক কোণে রেখে দেয় এবং চার ধারে পেতে রাখে মরণ ফাঁদ, যাকে ফালা বলা হয়। পোষা ডাহুক মনিবের শেখানো আকার-ইঙ্গিতগুলো আপনমনে ঠোঁটের কোণে সুর করে ভাজতে থাকে। বেদে বহু দূরে চুপ করে লুকিয়ে থাকে। ঝোপের ডাহুকেরা সহসা চমকে উঠে, চমকে উঠে তাদেরই দলের তাদেরই শ্রেণীভুক্ত আর একটি ডাহুকের করুণ কান্নায়। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সুখের সংসার পেতেছে ডাহুককুল ঝোপের ভেতর। তাই তারা সংসারের মায়া বোঝে, বোঝে অপরের বেদনা। নিজেদের সুখে তারা নিজেরাই গর্বিত, নিজেরাই আনন্দিত, সংসারের সকলে মিলেই তারা আনন্দের গান গেয়ে একে অপরকে সুখের কথা জানায়, কিন্তু সহসা কে এমনিভাবে একাকী কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে? কি তার ব্যথা? প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ডাহুককুলের কিছুসংখ্যক ডাহুক এগিয়ে আসে পোষা ডাহুকটির কাছে। পোষা ডাহুকটি তাদের দেখে কান্নায় যেন ভেঙ্গে পড়ে। বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। ঝোপের ডাহুক অতি কাছে এসে যখন পোষা ডাহুকটিকে মুক্ত করে দিতে চায় তখন সে বুঝতে পারে যে, মরণ ফাঁদের চুটার ভেতর সেও চিরদিনের তরে আটকে গেছে। পাখার ঝাপটা-ঝাপটিতেও আর নিজেকে মরণ ফাঁদ হতে মুক্ত করতে পারে না। আর এমনি মুহূর্তে সম্পূর্ণ অন্য একটি জীবকে তথা বেদেকে দেখতে পায়, যে তাদের পাগুলো দড়ি দিয়ে বেঁধে হাতের মুঠোয় পুরে নিয়ে যাচ্ছে, আর সঙ্গে খাঁচার পোষা ডাহুকটিও। কত বড় প্রতারণা – কত বড় জঘন্য বাটপারী – কি বিশ্রী বিশ্বাসঘাতকতা। একই জাতের, একই শ্রেণীর, একই পালকে মোড়া দেহ অথচ কত ব্যবধান।

সাবধান করে দিচ্ছে পাক কোরান মজলুম জনতাকে। সাবধান করে দিচ্ছে স্ত্রী উজ্জার মত শ্রেণী আবু লাহাবদের, যারা বেদের পোষা ডাহুকের মত মায়াকান্না কেঁদে মজলুম জনতাকে মরণ ফাঁদে ফেলতে চাইছে। যারা বেদের পোষা ডাহুকের মত মানব সমাজের মাঝে বিচরণ করে সাম্য-মৈত্রীর ভিৎ গড়ার সংগ্রাম আর মহৎ চেতনাকে বিকৃত করছে তাদেরকেই পাক কোরান অন্যত্র মুনাফেক বলেছেন। ঐ পোষা ডাহুকের মত একই পোষাকে সজ্জিত, একই পালকে মোড়া দেহ, গরীব সর্বাহারার মত মলিন বসনে আবৃত, গরীব সর্বহারার বেদনায় সে-ও কাঁদে, সে-ও প্রতিকার চায়, মুক্তি চায় কিন্তু আবু লাহাব শ্রেণীকে উচ্ছেদ করে নয়, সমুচিত শিক্ষা দিয়ে নয়, বিপ্লবী চেতনায় জেহাদী মনোবল নিয়ে নয়। ধনী-গরীবকে একই বিছানায় কলেরা রুগীর সঙ্গে সুস্থ ব্যক্তিটিকে শান্তিতে নিশিযাপন করার পণ্ডিতী দর্শনে, যুক্তি আর সূক্ষ্ম বচন ঠাটের বাগবিভূতির তেলেসমাতি চিন্তাধারার জগা খিচুড়ি পাকিয়ে, ব্যক্তিমালিকানার (ব্যক্তি আমানতের কথা বলে নয়) ডুগডুগি হাতে নিয়ে বাঁদর নাচানোর মত শোষকদের শোষণ করার স্বাধীনতার উপর কবর রচনা করে নয়, ব্যক্তির মালিকানা উচ্ছেদ করে আল্লাহর মালিকানার স্বীকৃতি দিয়ে সকলে মিলে, রাষ্ট্রীয় আমানতের মাধ্যমে নয়।

ব্যক্তি আবু লাহাব, আবু জাহেল, ইয়াজিদ আর মারোয়ান ইহজগতে নেই। দেড় হাজার বছর আগে কালের কয়টি দিবসের নাটক মঞ্চের বিশ্রী অভিনয় মানুষের দৃষ্টি হতে মুছে গেছে, কিন্তু স্মৃতির পাতায় যুগে যুগে স্বাক্ষর হয়ে থাকবে কলঙ্কের আবর্জনায়। কিন্তু ব্যক্তি আবু লাহাবদের প্রেতাত্মা

মানুষের দেহধারণ করে যুগে যুগে ভর করে থাকবে। তাই পাক কোরান আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, সাবধান করে দিচ্ছে, সমুচিৎ শিক্ষা দিতে উৎসাহ দিচ্ছে এই ছোট্ট আবু লাহাব সূরাটিতে।

ব্যক্তি মীরজাফর, মোহাম্মদী বেগ, ইয়ার লতিফ, উমি চাঁদ আর এই মর্ত্যে বিশ্বাসঘাতকতার অভিনয় করতে আসবে না কিন্তু মর্ত্যের নাটক চলার গতির মাঝে তারা বিশ্বাসঘাতকতার অভিনয় কিভাবে করতে হয় তা অনাগত কালের নতুন মীরজাফর, মোহাম্মদী বেগ, ইয়ার লতিফ, উমি চাঁদদের শিক্ষাগ্রহণ করার ব্যবস্থা করে রেখেছে। তাই আজকের দিনে যারা মজলুম জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার বিরুদ্ধে মীরজাফরী করে বেড়াচ্ছে তাদেরকে হেদায়েত করতে বলছেন পাক কোরান।

আমরা শিক্ষা দিতে না পারলেও আল্লাহ এই পৃথিবীতেই এদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে যান, অথচ অনেকেই সেসব খবর রাখি না। বেঈমান মীরজাফর কুষ্ঠ রোগে হাতের মাংস খসে পড়া গন্ধ বেরিয়েছিল এবং পেশাব করার সময় ঠাটা পড়ে মারা যান। মোহাম্মদী বেগ বদ্ধ পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াত এমন কি পায়খানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতো এবং অবশেষে একটি কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। ইয়ার লতিফ, জগৎ শেঠ, উমি চাঁদকে ঘুমন্ত অবস্থায় কে বা কারা নদীতে নিক্ষেপ করার পর লাশ ভেসে উঠে এবং পানির অধিবাসীদের পেটে দেহ সৎকার হয়। লর্ড ক্লাইভের আত্মহত্যার কথাটা কিন্তু অনেকেই জানেন। কিন্তু ওয়ারেন হেসটিংস-এর করুণ এবং ভয়াবহ মৃত্যুর খবরটা অনেকেই মনে রাখার প্রয়োজন মনে করেননি। জালেমদের এরকম বহু নজীর আল্লাহ পাক দুনিয়াতেই দেখিয়ে দিয়ে যান কোন না কোন উছিলাতে, নির্মম বোবা ধীরগতি অথবা দ্রুতগতির শাস্তি দিয়ে এবং অনেক নজীর বোধ হয় আমাদেরও দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

(খ) সূরা হুমাজা

১. ওয়াইলুললি কুললি হুমাজাতিল লুমাজাতিন
২. আললাজি জামাআ মালাও ওয়া আদ্দদাহ
৩. ইয়াহ সাবু আন্না মালাহু আখলাদাহু
৪. কাল্লা লাইউমবাজান্না ফিল হুতামাতে
৫. হুয়া আদরাকা মাল হুতামা
৬. নারুল লাহি মুকাদাতু
৭. আল্লাতিতাত তালেউ আল্লাল আফিদাহ
৮. ইন্নাহা আলাইহিম মুসাদাতুন
৯. ফি আমাদিম মুমাদ দাদাহ।

অনুবাদ

হুমাজা — যারা দুর্নাম এবং অন্যায় করে বেড়ায়।

১. যারা অপরের দুর্নাম এবং অপকর্ম করে তাদের সবার জন্য দুঃখ।
২. যারা ধন জমা করে এবং তাহা গুণে বেছে রাখে।
৩. তারা মনে করে তার পুঁজি তাকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবে।

৪. (না) তা নয়, নিশ্চয়ই তাকে হুতামায় ফেলে দেওয়া হবে।
৫. কি দিয়ে তোমাকে বুঝানো যায় যে হুতামা কি?
৬. (হুতামা হল) আল্লাহরই প্রজ্বলিত আগুন।
৭. যাহা উদিত হয় অন্তরের উপর।
৮. নিশ্চয়ই ইহা তাদের উপর স্তূপীকৃত অবস্থায় আছে।
৯. থামের মধ্যে পরিবেষ্টিত।

ব্যাখ্যা

যারা ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে তা গুণে-বেছে তাদের মনোমত সাজিয়ে রাখে এই ভেবে যে, তাদের মাল তাদের সুখ-সম্পদকে চিরস্থায়ী করে তুলবে, তাদের জন্য আফসোস। এই ধন-সম্পদের জন্যই তারা অন্যের দুর্নাম এবং অপকর্ম করে বেড়ায়। কিন্তু ধন-সম্পদ তাদেরকে স্থায়িত্ব দিতে পারবে না বরং উহা তাদের হুতামায় নিক্ষেপ করবে। পুঁজিমোহ নিজেই হুতামা। হুতামা আল্লাহর রোষের জ্বলন্ত আগুন। এই আগুন মানব মনের সর্বপ্রকার কোমলতা, প্রেম-প্রীতি এবং সাম্য ইত্যাদি সদগুণগুলি পুড়িয়ে ফেলে। যার ফলে সমাজের উপর নেমে আসে বৈষম্যের দুঃখ এবং শ্রেণীভেদের তীব্র বেদনা। মানব সমাজে চরমরূপে দেখা দেয় অসাম্য এবং এই অসাম্যের পরিণামরূপে প্রেম-প্রীতির বন্ধন হয় শিথিল। বস্তুমোহ তাদের অন্তরে পশুর মত হয় উদিত। নিশ্চয়ই এই বস্তুমোহ বিশ্রী রূপধারণ করে তাদের মনের উপর বোঝাই হয়ে থাকে। তাদের এই জঘন্য মনোভাবকে তারা খুঁটি দ্বারা ঘেড়াও করে সংরক্ষিত করে রাখে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর রোষের আগুনকেই নিজেদের উপর বড় বোঝা করে সংরক্ষণ করে রাখে। এই সূরার সারমর্ম হিসাবে একটি কথা অতি সুন্দর ও সচ্ছ হয়ে ফুটে উঠে। উহা হল, পুঁজিবাদ ও হীনস্বার্থবাদ সমাজে সর্বপ্রকার অকল্যাণের মূল। 'যারা ধন জমা করে রাখে এবং তা গুণে বেছে রাখে' এই সূরার দ্বিতীয় আয়াতটি অতি সুন্দর এবং স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে প্রাইভেট প্রোপারটি তথা ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধে। প্রাইভেট প্রোপারটি তথা ব্যক্তিমালিকানাটাই মানব চরিত্র এবং সাম্যবাদকে বিকৃত এবং বিশ্রী করে তোলে। তাই কোরানের এই সূরাটি প্রাইভেট প্রোপারটি তথা ব্যক্তিমালিকানাটাই প্রজ্বলিত অগ্নির সর্বপ্রধান ইন্ধনরূপে বর্ণনা করেছে।

মন্তব্য

এই সূরাটি বস্তুবাদকে কেন্দ্র করে যে পাশবিক হীন স্বার্থবাদের গন্ধে গড়া পুঁজিবাদ, সেই পুঁজিবাদের উপর একটি চরম আঘাতরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এরকম বস্তুমোহ মানব অন্তরের গুণরাজিকে ধ্বংস করে তথায় প্রতিষ্ঠিত করে একপ্রকার কঠোর পুঁজিবাদ ও হীন স্বার্থবাদ। এবং এই পুঁজিবাদের সমর্থনে তারা সর্বপ্রকার অপবাদ এবং কলাকৌশলের ভণ্ডামির সাহায্যে অন্যায়ের রাস্তাকে আরো বড় করে তোলে। এবং এরই ফলে শ্রেণী বৈষম্যের উগ্রতা জনসমাজের বুকে মহাপ্রীতির স্পর্শে গড়া সাম্যবাদে অনেক ফাটল তৈরি করে। 'অয়াইলুল' শব্দটির অর্থ ধ্বংস। আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা সত্যিই ধ্বংসের পথে হেঁটে চলেছে, যদিও তারা মনে করে এই পুঁজিবাদের হীন স্বার্থবাদকে শক্ত বেড়া ও খুঁটি দ্বারা নিরাপদ করে রেখেছে। খুঁটি ও বেড়া মানুষের থাকার ঘরকে যেমন রোদ-বৃষ্টি এবং ঝড় হতে নিরাপদ রাখে সেরকম তুলনার সাহায্যে আল্লাহ তাদের পুঁজিবাদের হীন স্বার্থ সংরক্ষণের

বিশ্রী মনোভাবের তুলনা দিয়েছে। বঞ্চিত গণসমাজ যদি সাম্যবাদের ন্যায়দণ্ড দ্বারা চুরমার করতে না-ও পারে তবুও কিন্তু মৃত্যুঘটনা তাদের মেকী নিরাপত্তার প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে।

নিজের স্বার্থটা নিজের কাছে এত প্রবল এবং এত বড় বিশ্রীরূপ যে এর সামনে সর্বপ্রকার আদর্শবাদ খেই হারিয়ে ফেলে। যুক্তিহীন স্বার্থবাদের গতিপথে চোরা খাদ তৈরি করে। যুক্তিবাদের ঢাক-ঢোল যত রকমেই পেটানো হোক না কেন উহা আসলে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মানুষের মানবিক দাবীকে ফাঁকি দেবার সূক্ষ্ম অন্ধবাদ। স্বার্থটাই হল অন্ধ। অন্ধ আলো (আল হক তথা একমাত্র সত্য তথা দি ট্রুথ) দেখতে পায় না। আলোর স্নিগ্ধরূপ তাকে মহীয়ান করে তুলবে কেমন করে? পবিত্র কোরান এই রকম অন্ধবাদকেই আমিত্ব বলে ঘোষণা করেছে। আমিত্বের আঁধারে বাস করাটাই আবার পবিত্র কোরান পাপ বলেছে। সুতরাং হীনস্বার্থবাদই অন্ধবাদ। তাই ইহা পাপকে তাড়াবার চেষ্টায় সেই পাপই তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং সেটা তার নিজের স্বার্থে, না হয় পারিবারিক স্বার্থে, না হয় দলীয় স্বার্থে, না হয় খণ্ড একটি ভূমিতে বাস করা কতগুলো মানুষের স্বার্থে। এই স্বার্থটা কখনো সার্বিক মঙ্গলের পথ দেখাতে এবং আদর্শ দিতে পারে না। তাই এই হীন স্বার্থটাই অন্ধবাদের পুজারী। সুতরাং অখণ্ড ভালোর জন্য পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তার মৌখিক, অর্থাৎ মুখে মুখে এবং ইহা গৌণ এবং হীন স্বার্থটা তার আন্তরিক অর্থাৎ ভেতরে ভেতরে এবং ইহা মুখ্য। হীনস্বার্থটি যে সম্পূর্ণরূপে অন্ধবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অখণ্ড ভালকে বর্জন করে পাপকেই বহুদূর দিয়ে নিজের মধ্যেই ঘুরানো হচ্ছে এবং ইহা তখনই পরিষ্কাররূপে মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে যখন পাপের বিস্তৃত চক্রটি মানুষের কাছে ধরা পড়ে যায়। কালির কলমে আর চামড়ার মুখের চাতুর্যপূর্ণ ভাষা দিয়ে যুক্তির সেতু রচনা করে, কিন্তু বালির ভাগ এত বেশি মেশানো হয় যে, যার ফলে সার্বিক মঙ্গলের পা-খানা পড়তেই মেকী যুক্তির সেতু তার অস্তিত্ব হারাতে থাকে। সূক্ষ্ম হতে অতি সূক্ষ্মরূপে হীনস্বার্থটা যখন বিরাজমান তখন স্থুল দৃষ্টির কাছে ধরা পড়ে না। তাই বহু মানুষের সূক্ষ্ম হীনস্বার্থের প্রভাব থাকলেও উহা নিঃস্বার্থবাদ, সুতরাং আপাত যুক্তিসংগত। সাদা চোখে পানির মধ্যে ভেসে বেড়ানো রোগ-জীবাণু ধরা পড়ে না, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিলে চোখ দুটো বোকা বনে যায়। মনের ভেতর হীনস্বার্থটা ভেসে বেড়াচ্ছে কিনা ইহার প্রমাণ দিতে হলে বিশ্বের মানব নামক অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। মহাপুরুষ রসূলাল্লাহ (দঃ)-এর দেওয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রটির নাম হল এই, 'কেহই মুসলমান হতে পারে না, যে পর্যন্ত সে যা পছন্দ করে নিজের জন্য তা সে পছন্দ করে অপরের জন্য' এবং এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি দিয়ে নিজের হীনস্বার্থটা নিজের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে হবে।

আমি নামায পড়ছি, রোজা রেখে চলছি, পশু কুরবানী দিচ্ছি কিন্তু সবচাইতে বড় প্রশ্ন হল, আমি কি মুসলমান হতে পেরেছি? তেহামা পর্বতের মত নেকীর পর্বত বানালেও 'পুঁজি' সংগ্রহের লালসা থাকলে আমাকে দোজখে যেতে হবে – এইটা ইসলামের স্পষ্ট ঘোষণা। কোন এক সাহাবী রসুলাল্লাহ (দঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, এরকম ধনলোভী ব্যক্তি কি নামায পড়ে না? রসুলাল্লাহ (দঃ) সাহাবীকে তথা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যাতে সে বিষয়ে সাবধান হতে পারি – 'শুধু নামায কেন, নফল নামাযও আদায় করেছে, রাত জেগে তাহজ্জুত নামাযও পড়েছে এবং রোজাও রেখেছে, তবু তাকে এই পুঁজি সংগ্রহের লালসাই নরকে ফেলে দেবার মূল কারণ হয়ে দাঁড়াবে।' গাছের গোড়া কাটা, কিন্তু সে দিকে নজর না দিয়ে গাছের মাথায় পানি ঢেলে চলছি। কিন্তু এ প্রশ্নটি কি মনের মাঝে ভেসে উঠে না, গাছটি কি বাঁচবে? ফরজ হল অবশ্য কর্তব্য, যা না করলে শাস্তি দেবে, কিন্তু ফরজের চেয়েও

ঈমানের ভিত্তি কি বড় নয়? ঈমানের ভিত্তির দিকে নজর না দিয়ে নামায, রোজা এবং পশু কুরবানীর মত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির একটি পয়সাও দাম থাকে না। যে রকমভাবে গাছের গোড়া কাটা থাকলে গাছের মাথায় পানি ঢালা, আলো এবং বাতাস পাবার দিকে লক্ষ রাখার মত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর একটি পয়সাও দাম থাকে না। কারণ, গোড়া-কাটা গাছের মাথায় যত পানি ঢালাই হোক না কেন উহা বাঁচতে পারে না। এবং এরকম অবস্থায় পানি ঢালার কোন মৌলিক অর্থই থাকতে পারে না। সোনা খাঁটি কি মেকী নিলেন তার প্রমাণ কি কষ্টি পাথরে যাচাই করে নেওয়া হয় না? দামী হীরে বলে যাচাই না করে মেকী কাঁচের ঝলসানো মোনাফেকী রূপটি মরে যাবার পর যদি ধরা পড়ে তবে অনুশোচনায় গুমড়ানো কান্নার সিক্ত জল কি সম্পূর্ণ বিফলে যাবে না?

একজন বিলাসিতার ঢেউয়ের মাঝে দোল খায় আর একজন বাঁচা-মরার করুণ প্রশ্ন নিয়ে একমুঠো ভাতের জন্য মানুষের দোরে দোরে পাগলের মত ঘুরে ফিরছে। বিংশ শতাব্দীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে মানবতার যে জঘন্য অপমান করা হচ্ছে তার বিশ্রী দৃষ্টান্তগুলো মানবপ্রেমিকদেরকে দিশেহারা করে তোলে। ধনতন্ত্রের দেশে মানুষের দ্বারে মানুষ তার বেঁচে থাকার ফরিয়াদ জানায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি মানুষকে মাথা গোঁজার ঠাঁইস্বরূপ একটি কুটির দেওয়া হয় না, অথচ আর একটি তারই মত রক্ত-মাংসের দেহে গড়া মানুষ তার প্রাণহীন যন্ত্রদানব ট্যাকসীখানাকে ইটের তৈরি দামী ঘরে রেখে দেবার কত সুন্দর ব্যবস্থাই না করে রাখে। আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব আশরাফুল মাখলুকাতের রাত কাটাবার স্থান পুঁজিমোহে আচ্ছন্ন ব্যক্তিটি আকার-ইঙ্গিতে রাজপথের ফুটপাত দেখিয়ে দেয়। প্রশ্ন করলে বলে 'আল্লাহ আমাকে ধন-মান আর ইজ্জত দিয়েছে আর তোমাকে কিছুই দেয়নি।' ধনতন্ত্রের দেশে ধনের মর্যাদা মানুষের জীবন হতে অনেক বেশি মূল্যবান। কোটি কোটি মানুষের বাঁচা মরার করুণ প্রশ্নটির দাম ধনতন্ত্রের পুঁজিপতিদের কাছে একটি কানাকড়িও নয়। প্রাসাদের কক্ষে প্রাণহীন জড় মোটর গাড়ী ঘুমাবার স্থান পায়, কিন্তু অবহেলিত মানুষ পথের ধারে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে হাড়-কাঁপা শীতে ভোর কখন হবে ভাবছে। এই কি ইসলামের নামে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা? উঠের পিঠে চাকরকে বসিয়ে হযরত উমর (রাঃ) রশি ধরে গরম বালুর উপর হেঁটে জেরুজালেম গিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর তথাকথিত ধনতন্ত্রে গড়া মেকী সভ্যতা হযরত উমর (রাঃ)-এর সাম্যবাদকে অচল বলে উপহাস করছে। হযরত উমরের (রাঃ) আদর্শ আজকের পৃথিবীতে বাস করা মেকী মুসলমানেরা বেদাত, না-জায়েজ, শেরেক এবং কুফুরী ফতোয়া দিয়ে হজরত উমরের (রাঃ) চোখের জল আর বোবা চাহনিকে কি উপহাস করছে না? তাই আমাদের ভাল করে মনে রাখতে হবে যে, অবহেলিত মানুষের দাবী প্রতিষ্ঠা ততদিন পুঁজিপতিরা করে না বা করতে চায় না, যতদিন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমে না আসবে — জেহাদ ঘোষণা না করবে। যতদিন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে একমাত্র নীতি হিসাবে গ্রহণ করে এগিয়ে না আসে। হাজার বছরের ইতিহাস বাস্তব সাক্ষী দিচ্ছে, সংগ্রামই বন্যতাকে দূর করে — বিষের সাহায্যেই বিষের ক্রিয়াকে ধ্বংস করে এবং এই সংগ্রামকে বর্বরতা না বলে রসূলুল্লাহ (দঃ) 'সাহায্য কর অত্যাচারীকে' বলে বিশ্বের অবহেলিত জনতাকে আহ্বান জানিয়েছেন।

ইমাম হুসায়েন কারবালার রণপ্রান্তে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে উম্মতে মোহাম্মদীকে শিক্ষা দিয়ে গেলেন, 'খবরদার, অত্যাচার-অসাম্যের বিরুদ্ধে মাথা নত করে থেকো না। শির দিও মুসলমান, তবু অসাম্যের শাসনকে মাথা পেতে মেনে নেবার জন্য মোনাফেকী জীবন ধারণ করো না। যে পর্যন্ত তোমরা অত্যাচার-অসাম্যের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে না পড়বে সে পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের উপর

হতে অত্যাচার আর অসাম্যের বিষ দূর করবেন না।' বদমাইশ ইয়াজিদের সেনাপতি সাদ ইবনে আস কারবালার রণপ্রান্তে ইমাম হুসায়েনকে ইয়াজিদের বশ্যতা স্বীকার করে নেবার অনুরোধ জানাবার পর ইমাম হুসায়েন সেনাপতিকে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'হুসায়েনকে সারা পৃথিবীর অধিশ্বর করে দিলেও হুসায়েনের দেহের উপর মাথা থাকা পর্যন্ত অত্যাচার অসাম্যের বিরুদ্ধে কখনই মাথা নত করে থাকবে না।'

কলুষিত পুঁজিপতিরা হল ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থাৎ কোরান হাদিসের মাপকাঠিতে অপরাধী, অর্থাৎ পবিত্র কোরান ঘোষণা করছে, তারা জাহান্নামে আছে এবং জাহান্নামে থাকবে। ইসলাম বজ্রকঠিন বাণীতে বিশ্ববাসীকে সাবধান করে দিচ্ছে, "সূঁচের ছেদা দিয়ে বিরাট একটা উট ঢুকে যাওয়াটা আমাদের বিশ্বাসকে যতখানি অবাক করে দেয় এবং বিবেক অসম্ভব বলে বিদ্রোহ করে তার চেয়েও অনেক বেশি অসম্ভব হবে একজন পুঁজিপতির বেহেস্তে প্রবেশ করা।' পুঁজিপতিদের বিভিন্ন ভাষার শৈলিতে পবিত্র কোরান-হাদিস প্রবল ঘৃণা প্রদর্শন করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বলেছে। তবু অতি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, মুসলিম ভূখণ্ডগুলো হতে এবং আরো বেশি বেদনা লাগে, তথাকথিত কতগুলো দল ইসলামের মুখোশ লাগিয়ে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়েছে যারা ইসলামের ভেতর প্রাইভেট প্রোপারটি তথা ব্যক্তিমালিকানা এবং পবিত্র যাকাতের অর্থ শতকরা আড়াই টাকার খসবু পায়। এদেশের বুকে এরকম তথাকথিত সংঘ অনেক গজিয়ে উঠেছে। সার্কাসের মাঠে চুনকালি মুখে মেখে লোক হাসাবার তরে যেরকম জোকার তার অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে জোকারী করে বেড়ায়, সেরকমভাবে পৃথিবীর জনতার মঞ্চে এই ভণ্ড দলগুলি লাফালাফি করে জনতাকে খুব হাসাচ্ছে। এই হাসাবারও কিন্তু প্রয়োজন আছে এবং এই প্রয়োজনকে ততখানি অস্বীকার করা যায় না যতখানি সার্কাসের মাঠে একটি জোকারের প্রয়োজন।

ইসলাম ধর্মের গতিধারার উপর যুগে যুগে এজিদ আর মারোয়ানের মত ধর্মের মুখোশ লাগিয়ে নেতাদের অশুভ আগমন এবং ইসলাম ধর্মকে কৌশলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার পরিচয় আমরা ইতিহাসের বাস্তব পৃষ্ঠায় পাই। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক-এর খিলাফত পাবার পর আবু সুফিয়ান ইসলাম ধর্মকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার হীনপ্রচেষ্টায় মওলা আলীকে খেলাফতের প্রকৃত দাবীদার বলে খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার উস্কানী দেওয়া হয় এবং মওলা আলীকে সৈন্য ও রসদ দিয়ে পুরামাত্রায় সাহায্য করার আশ্বাসও আবু সুফিয়ান দিয়েছিল কিন্তু মওলা আলীর প্রচণ্ড ধমক খেয়ে আবু সুফিয়ান নীরব রইলো। মওলা আলী আবু সুফিয়ানকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি এতকাল হুজুর পাকের (দঃ) ঘোর শত্রুতা করেও তৃপ্ত হওনি? আবার সেই হীনপ্রচেষ্টা আমার মাধ্যম দিয়ে করাতে চাও?' বাটপার এজিদের মত কায়েমী স্বার্থবাদীরা সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে পবিত্র ইসলাম ধর্মের মুখোশ লাগিয়ে। জনসাধারণ ভাল করেই জানে, যদি এই সকল ইসলামের মুখোশধারী দলগুলো কোনদিন ক্ষমতায় আসতে পারে তবে সেদিন হুজুর পাকের (দঃ) প্রচারিত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বাটপার এজিদের ইসলামই প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সমস্ত ধূর্ত দলগুলোর প্রচারণায় আজ মুসলিম সমাজের সরল মুসলমানগুলোর কাছে ইসলামের লেবাসধারী অনেক বাটপার পেয়ে আসছে সম্মান, কিন্তু ইনশাল্লাহ এমন দিন হয়তো আসবে, যেদিন জনসাধারণ বুঝে নিতে পারবে যে সাহাবী হবার সংজ্ঞাটি কত শক্ত আর কঠিন।

কলুষিত (কোরাপটেড) পুঁজিপতিরা মানবজাতির বিস্তৃত বুকটাতে বুলেট-বেয়নেটের আঘাতে তাজা রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়ে, অবহেলার কাদা ছুঁড়ে, ভাষাহীন দুর্দশা আর দীনতার বোবা বেদনার

যন্ত্রণা দিয়ে ধর্মের টুপী পরে মানবজাতির কাছে মানবতার তন্ত্র-মন্ত্র যপে চলছে। এই সমস্ত কলুষিত পুঁজিপতিদের ধর্মের টুপি পরা ভদ্ররূপটি তখনই মানবজাতির কাছে নগ্ন হয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ে যখন তাদের শোষণের স্বার্থবাদের উপর আঘাত পড়তে চায়। তাদের এই নিখুঁত কপটতা এবং জঘন্য বর্বরতার জন্য ইসলাম আন্তরিক ঘৃণা করে। ***'ইন্না আবওয়াবাল জান্নাতে তাহতা জেলালিস সয়ুফে'*** অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই বেহেস্তের দরজা তরবারির ছায়ার নিচে।' তাই ইসলাম মানবজাতিকে সাবধান করে দিয়েছে, কলুষিত পুঁজিপতিরা মানুষ খুন করার বিকটাকৃতির আদিম দানব। মানুষের মাথার খুলি দিয়ে বিলাসিতার পান-পেয়ালা তৈরি ছাড়া কলুষিত পুঁজিপতিরা বিকৃত ভোগের তৃপ্তি পায় না। মানবজাতির ইতিহাসে হীনস্বার্থবাদের পাশবিক পরিচয় কলুষিত পুঁজিপতিরা যেভাবে দিয়ে যায়, তার তুলনা হিংস্র জানোয়ারের সাথে দিতেও ইসলাম ঘৃণা করে। বেঁচে থাকার সম্মানিত অধিকার নিয়ে যে সাম্যবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে ইসলাম বার বার আহ্বান জানিয়েছে, ইসলামের এই সত্যটুকু অস্বীকার করে কলুষিত পুঁজিপতিরা মানবজাতিকে মরে যাবার পর বেহেস্তে হুর-গেলমান নিয়ে আরামে থাকার নিশ্চিত আশ্বাসের বাণী শোনায়, অথচ নিজেদের হীনস্বার্থবাদের দর্শনটাকে দুনিয়ার বুকে কৌশলে বজায় রেখে চলেছে এবং আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। মরে যাবার পর বেহেস্ত পাবার উগ্র মোহে জনসাধারণ নিজেদেরকে আচ্ছন্ন করে জীবনের অতি সাধারণভাবে বাঁচার অধিকার ধাপে ধাপে নিচের দিকে নেমে যায় এবং ঠিক সেই হারে বাটপারেরা মরে যাবার পর বেহেস্তের সুখ-ভোগ না চেয়ে মর্ত্যে ভোগস্বর্গ বানায়। এইভাবে সম্পদ আর শক্তির একক অধিকার তখন বাটপারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। জনসাধারণ আকাশে বেহেস্ত তৈরি করতে নেশা-খাওয়া মাতালের মত ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু নেশা কেটে গেলে নর্দমার কাছে নিজের দেহটা পড়ে আছে দেখে যখন ভীষণ লজ্জা অনুভব করে সেরকম লজ্জা নিয়ে জনগণের মনে ধূমায়িত বিদ্রোহ জেগে উঠে এবং এই বিদ্রোহটি প্রথম অবস্থায় নিজের মনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং পরে মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনতার ছিটেফোঁটা বিদ্রোহ দেখা দিলেও কলকজ্জার আসল বোতামটা বাটপারদের হাতে থাকাতে তেমন আশাপ্রদ ফল ফলে না। কেননা, এই বাটপারদের বন্যশক্তির লৌহহস্তে নিষ্পেষিত করার জিঘাংসা চরিতার্থ করার দরুণ মুক্তির স্বল্পস্থায়ী স্বপ্নগুলো মিলিয়ে যেতে চায় এবং এরই ফলে পাপ হতে পরিত্রাণ পাবার মনোবলের মাঝে ভাঙ্গন আর ফাটলের অপূরণীয় ফাঁক সৃষ্টি হয়। ইসলাম এই শরিয়ত তথা সামাজিক তথা প্রাথমিক সংগ্রামকে পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বলে ঘোষণা করেছে। বাটপারেরা হল সমাজ জীবনের বিষপাপ। অখণ্ড ভালতে (কনকৃট গুড) পাপের অনস্তিত্ব আঁধার দূর করে বিরাজ করতে হলে সমাজ জীবনের বিষপাপকে প্রাথমিক সংগ্রামের দ্বারা অখণ্ড ভালকে পাবার যে পথ সেই পথে সবে হেঁটে চলেছে বলে ইসলাম ঘোষণা করছে।

ইসলাম স্পষ্ট ভাষায় বলে দিচ্ছে, তুমি কি সেই ব্যক্তিটিকে দেখেছ যে ইসলামকে প্রথমেই অস্বীকার করে? সে তো সেই ব্যক্তিটি যে ইসলামের দেওয়া সাম্যবাদকে অস্বীকার করে। সুতরাং ইসলামের প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গির দর্শনে যারা ইসলামকে মানবসমাজে তুলে ধরতে চেয়েছেন অর্থাৎ মানবসমাজের অসহ্য বৈষম্য আর বাটপারদের চেহারাখানা জনসমাজের কাছে তুলে ধরতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে এবং ইসলামের সাম্যবাদ মানব সমাজে প্রতিষ্ঠা করার বাসনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তাদেরকে আমরা অখণ্ড ভালর পথে সবে হেঁটে যাচ্ছে বলে মেনে নেব। এরাই হল পাপের বিরুদ্ধে ইসলামের দৃষ্টিতে প্রাথমিক সংগ্রামী এবং মুক্তি-সাম্য-ভ্রাতৃত্বের পূজারী হবার যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেই সংজ্ঞায় প্রাথমিক দলভুক্ত মুসলমান।

হোমিওপ্যাথ ঔষধের আবিষ্কারক হ্যানিম্যান যদি মুসলমান না হয় তবে তার দেওয়া ঔষধে রোগ সারে না বলে ফেলে দেওয়াটি কি নিতান্ত বোকামীর পরিচয় দেয় না? মাইক বিধর্মী আবিষ্কার করেছে বলে কি মাইকে আজান দেওয়া, কোরান তফসীর এবং ওয়াজ করা ইত্যাদি হারাম বলে মাইক ব্যবহার করবেন না? যদিও এরকম ফতোয়া দেওয়া হত। পেনিসিলিন ঔষধের আবিষ্কারক আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং খৃষ্টান বলে কি তার পেনিসিলিন ব্যবহার করার মাঝে নিষেধ আছে? বিশ্বাস একান্ত ব্যক্তিগত, কিন্তু আবিষ্কার সার্বজনীন এবং গ্রহণযোগ্য। ধর্মের নামে ভণ্ডদের জন্য দুঃখ হয়, কারণ তারা তো নিজেদের চোখে ঠুলি পরে কলুর বলদের মত দৌড়াচ্ছে এবং মানবসমাজকে সেই একই ঠুলি জোর করে পরিয়ে দিচ্ছে। তাই মানুষের হুঁসজ্ঞান মানুষকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে, মানুষের সামাজিক নিত্যকার অসহনীয় পরিবেশ এবং যে কোন সময় ফেটে পরতে পারে বোমার মত সামাজিক বিপ্লব এবং সে বৈপ্লবিক পরিণাম কলুষিত পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্তভাবে মুক্তির সরলপথ দেখায়, অর্থাৎ ইসলামের দেওয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার যাত্রা শুরু হয়।

কাজ করার সাধনা ছাড়া অখণ্ড ভালতে বাস করছি বা করতে চলেছি বলার অধিকারকে ইসলাম ভণ্ডামী করা হচ্ছে বলে জানিয়ে দিচ্ছে এবং অধিকার না পেয়ে কাজ করে যাওয়াটাকে ইসলাম নিছক গাধার-বোঝা-বইছে বলে উপহাস করছে। সত্য, ন্যায় ও নৈতিকতার পথটাই হল পুলসেরাতের বর্ণিত ধারালো এবং সূক্ষ্মপথ। এই পথের চারপাশ ঘিরে আছে অনস্তিত্ব পাপের আঁধার। তাই যে কোন দুর্বল মুহূর্তে পাপের আঁধার বাসা বাঁধতে পারে। ওহোদের যুদ্ধের মাধ্যমে পার্থিব সম্পদটি যে কোন এক দুর্বল মুহূর্তে সত্য, ন্যায় ও নৈতিকতার আদর্শকে ভুলিয়ে দিয়ে পাপের গ্রাসে পরিণত হতে পারে তার জলন্ত ইঙ্গিত রসুলাল্লাহ (দঃ) বিশ্বমানব সমাজকে দিয়েছেন। আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করি — এই ওহোদের যুদ্ধ আমাদেরকে মূল্যবান শিক্ষা দিচ্ছে যে, সত্য, ন্যায় ও নৈতিকতার আদর্শকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে এবং সর্বনাশের প্রসারিত আঘাত অখণ্ড ভালর পবিত্র দেহে গিয়ে লাগার বিপদ আছে।

'যারা ধন জমা রাখে এবং তা গুণে-বেছে রাখে' কোরানের এই কয়টি কথা একটু চিন্তা করলেই অতি সুন্দর এবং স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রাইভেট প্রপারটি তথা ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধেই বলা হয়েছে। ব্যক্তিমালিকানাটাই মানব চরিত্র এবং ইসলামী সাম্যবাদকে বিকৃত এবং বিশ্রী করে তোলে এবং এরই ফলে সামাজিক আচার এবং বৈষম্য দেখা দেয়। তাই কোরান প্রাইভেট প্রোপারটিইকে প্রজ্বলিত অগ্নির সর্বপ্রধান ইন্ধনরূপে বর্ণনা করেছে।

প্রাইভেট প্রপারটি বলতে কিছু না কিছু ধন-সম্পদের উপর কর্তৃত্ব করা বুঝায় এবং সম্পত্তির কর্তৃত্ব মানুষের আমিত্ব এবং পৃথিবীর উপর স্বার্থ রক্ষার ইবলিসী ইঙ্গিত বহন করে। তাই এখানে ব্যক্তির অধিকারকে তথা নিজের অধিকারে ধন জমা রেখে দাতা সেজে ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করার ছওয়াব হাসেল করতে বলা হয়নি অর্থাৎ প্রাইভেট প্রোপারটি স্বীকৃতি দেওয়া তো দূরে থাক বরং ইহা আমিত্ব এবং দুনিয়ার মোহে জড়িয়ে পড়ার একটি প্রধান শত্রু বলে ইহাকেই (প্রাইভেট প্রোপারটিকে) হুতামাহ অর্থাৎ জাহান্নামের প্রজ্বলিত অগ্নি বলা হয়েছে।

'ধন জমা করে' বাক্যটির অর্থ কি? আপনি নিজেই একটু তলিয়ে দেখুন তো। আপনি কি ধন বলতে ধাতুনির্মিত মুদ্রা ও কাগজের টাকাকে মনে করছেন? আপনি তা কখনোই মনে করতে পারেন না যদি অন্ততঃ অর্থনীতি সম্বন্ধে আপনার কিছুটা ধারণা থেকে থাকে। কারণ, আপনি জানেন, ধাতুতে

বানানো মুদ্রা এবং কাগজের টাকা হল ধন বিনিময় করার একটি সহজ মাধ্যম। সুতরাং ধন জমা করে রাখা এবং তার হিসাব রাখাটার অর্থ হল নিজের অধিকারে কম-বেশি সম্পদ রেখে দেওয়া এবং সেই সম্পদ যাতে নিজের হাতছাড়া না হয় তার জন্য সবসময় সেদিকেই মনোনিবেশ করা এবং ইহাকেই অন্য ভাষায় বলা হয় প্রাইভেট প্রোপারটি তথা ব্যক্তি মালিকানা। যেহেতু এই প্রাইভেট প্রোপারটিকেই যখন কোরান 'প্রজ্বলিত অগ্নি' বলে সাবধান করে দিচ্ছে সেই হেতু প্রাইভেট প্রোপারটির গন্ধ ইসলামের কোথায় আছে? কোরান শরীফের ভিতর এমন কোন বাণী নেই যার ভেতর প্রাইভেট প্রোপারটির সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় বরং বহু বাণী ইহাকে প্রজ্বলিত অগ্নি, জাহান্নাম, কঠিন শাস্তির ইন্ধনরূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। জানি না নাস্তিক কমিউনিস্টরা সর্বহারাকে যদি পরিধানের কাপড় এবং পায়ের জুতো সরকারীভাবে ব্যবহার করতে গিয়ে যদি বলে, 'এই কাপড় এবং জুতোর ব্যবহারের মধ্যে অন্তত তোমাকে সর্বময় অধিকার দেওয়া হল' তাহলেও ইহা আমাকে অকপটে স্বীকার করতে হবে যে, ইসলাম সেই কাপড় এবং জুতাটুকুর উপরেও কাউকে সর্বময় অধিকার দেয়নি। সর্বহারা তো বাদ, যে কেহ যদি সেই কাপড় এবং জুতার অপব্যবহার করে তবে তারও কৈফিয়ত দিতে হবে – ইহাই ইসলামের বিধান। কারণ, সর্বময় ক্ষমতার অধিকার এবং আসমান ও জমিনের একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ। কোরান ঘোষণা করছে, 'তুমি কি জান না, আসমান এবং জমিনের মালিকানা আল্লাহরই।' (সূরা মায়েদা ৪০ আয়াত)।

পুনরায় কোরান এই কথা ঘোষণা করছে যাতে আমরা নিজেদেরকে মালিকের আসনে না বসাই; কারণ আমরা মালিকানার কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে মানব সমাজের বুকে অসাম্য, জুলুম আর শোষণের বিভীষিকা। কোরান বলছে 'আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে, যা কিছু ইহাদের উভয়ের মধ্যে আছে এবং যা কিছু মাটির নিচে আছে, সবই তাঁরই (আল্লাহরই)।' (সূরা তোয়াহা ৬ আয়াত)। তাই বড় হোক কিংবা যত ক্ষুদ্রই হোক, কোন জিনিসেরই মালিক মানুষ হতে পারে না। মানুষ হতে পারে শুধু মানবজাতির সর্বপ্রকার মঙ্গলসাধনের আমানতদার। পানির পিপাসায় নিজের জীবন হয়তো চলে যেতে পারে – তবু সেই পানি হাতে নিয়ে যে ব্যক্তি ভাবতে পারে যে তার মত পিপাসার্ত অনেকেই যুদ্ধময়দানে পড়ে আছে, তাদের পিপাসা হয়তো আমার চেয়েও বেশি, তাই আগে তাদেরকে পানি পান করতে দাও। এমনিভাবে সকলের তৃষ্ণার্ত ঠোঁটের কাছে পানি পেয়েও যারা অপরের তৃষ্ণার কথা মনে করে পানি পান করেন নি এবং পরিশেষে সবাইকে এন্তেকাল করতে হয়েছে। এরকম নজীরবিহীন ভ্রাতৃত্ব আর সিমেনটেড ইউনিটি যাদের চরিত্রের আমলে সালেহা তথা 'অপরের সুখ-দুঃখ নিজের মত মনে করে বরণ করে নেওয়া' ছিল তাদেরকে যত সমালোচনাই করা হোক না কেন তবু বিশ্বের মানবকে মুহূর্তের তরে অবাক করে দেয়। আর যারা মুসলমান তাদের চোখ দুটো মুহূর্তে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। প্রাইভেট প্রোপারটির জঘন্য অপবাদ কোরান হাদীসের উপর চাপিয়ে দিয়ে বিকৃত ব্যাখ্যা করে যারা ইসলামের সৌন্দর্যের মুখে কালি লেপে দিয়ে হীন স্বার্থসিদ্ধি করে, যারা আল্লাহ যা নাজেল করেন তার বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে আসল সত্যটিকে মানুষের চোখে ফাঁকি দেবার জন্য ঢেকে রাখে, তাদেরকে কোরান সোজা শান্তিভঙ্গকারী, জালেম এবং সবশেষে কাফের বলে ঘোষণা করছে। কোরান ঘোষণা করছে, "আর সেই সব লোক হতে দূরে থাক যারা আল্লাহর নামকে বিকৃত করে দিচ্ছে, শীঘ্রই তারা তাদের কর্মের প্রতিফল পাবে।' (সূরা আরাফ ১৮০ আয়াত)। কোরান পুনরায় বলছে, 'তবে কে আছে তার চেয়ে অধিক অত্যাচারী যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে নেয়?' (সূরা কাহাফ)।

কোরান বলছে, ‘আল্লাহ যা নাযিল করেছেন যারা সেই অনুসারে বিচার করে না, তারাই শান্তি ভঙ্গকারী।’ (সূরা মায়েদা ৪৭ আয়াতে)। একই কথা আবার কোরান বলছে, ‘আল্লাহ যা নাযিল করেছেন যারা সেই অনুসারে বিচার করে না তারাই কাফের।’ (সূরা মায়েদা ৪৪ আয়াত)। আবার কোরান ঘোষণা করে, ‘আল্লাহ যা নাযিল করেছেন যারা সেই অনুসারে বিচার করে না, তারাই জালেম।’ (সূরা মায়েদা ৪৫ আয়াত)।

সমাজের যত অকল্যাণ এবং সমাজের বুকের উপর দাঁড়িয়ে ধূর্তশিরোমণি সেজে যত ভানুমতির ভেল্কিবাজি দেখানো হয় তাতে ইসলামের চিন্তাধারার সৌন্দর্য দিনের পর দিন বহাল তবিয়তে না থেকে বরং রাজযক্ষ্মা রুগীর মত ধীরে ধীরে মাটির গর্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভাবলে অবাক হই, কতবড় ভেল্কিবাজের দল এরা! কোরান হাদিসের দর্শনকে পর্যন্ত উল্টো করে দেয়। ‘এই ধূর্তশিরোমণি এবং লম্পট বাটপারদের বলে প্রেমের দ্বারা, পরকালের ভয় দেখিয়ে, নরকের যন্ত্রণার কথা শুনিয়ে সমাজ হতে অন্যায় দূর করতে কোরান-হাদীস বলেছে।’ এত বড় ডাহা মিথ্যা কথাটা পর্যন্ত বাজারে বেশ চালু হয়ে গেছে এই সমস্ত ভণ্ডদের গুয়েবেলসের ধারায় মিথ্যা প্রচারণায়। অথচ কোরান-হাদীস এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাবার জন্য উপদেশ আর উৎসাহ দিচ্ছে। আমরা কি বিশ্বের মানবজাতিকে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলবো না, ইসলাম ধর্মের উপর এই সমস্ত ডাহা মিথ্যা এবং বিকৃত ভাবধারা কোরানের কোথাও নেই?

প্রাইভেট প্রোপারটির তথা ব্যক্তিমালিকানার সপক্ষে সূরা ইয়াসিনের ৭১, ৭২ এবং ৭৩ এই তিনটি আয়াতকে দলিলরূপে অনেকেই ব্যবহার করে থাকেন। অথচ এই আয়াতে পশুর উপর মানুষকে যে কর্তৃত্ব ও অধিকার দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র সেই কথারই উল্লেখ রয়েছে। ইহাকে ব্যক্তিমালিকানার নজির রূপে কেমন করে যে দেখান যেতে পারে তাহা বুঝাই মুশকিল। এক মানুষের উপর অন্য মানুষের অথবা একদল মানুষের উপর অন্যদলের কর্তৃত্বপ্রাপ্তির নির্দেশ উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা কেমন করে যে বুঝা যেতে পারে তাহা আবিষ্কার করা যায় না। ইসলামী সাম্যবাদের বিরুদ্ধাচারণের উদ্দেশ্যে, ব্যক্তিমালিকানার স্বার্থবাদী ভূত যাদের মাথায় চড়ে বসে আছে তাদের পক্ষে এরূপ অদ্ভূত অর্থ আবিষ্কার করা সম্ভব হতে পারে। যদি কেউ একান্তই এই আয়াত শরীফকে মালিকানার দিকে লাগাতে চান তাহা হলেও এই মালিকানা ব্যক্তিমালিকানা নয়। ইহা গৃহপালিত পশুর উপর মনুষ্য জাতির মালিকানা বা অধিকার। ব্যক্তিমালিকানার কোন প্রশ্নই আসে না। মানুষ আল্লাহর বিধান মতে সবাই এই অধিকার পেয়েছে পশুর উপর। একজনকে বঞ্চিত করে অথবা বাদ দিয়ে অন্যজনের অধিকার বুঝায় না। এই অধিকার সার্বজনীন। আর একটি বিষয় প্রথমেই জেনে রাখতে হবে যে, সম্পদ জমাকারীর ইসলামী সংজ্ঞাটি কি, অর্থাৎ সম্পদ জমা করে রাখে বলে কার উপর ইসলাম অভিসম্পাত বর্ষণ এবং কাফের-মোনাফেক বলে অভিহিত করছে? ইসলাম ধর্ম তাকেই সম্পদ জমা করছে বলে অভিহিত করছে যার জীবন ধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদেও কিছু সম্পদ জমা থেকে যায়। তাই হুজুর পাক (দঃ) এরকম সম্পদ জমাকারী সম্বন্ধে বলেছেন, ‘সম্পদ জমা করে যে লোক সে আল্লাহর দূরবর্তী, বেহেস্তের দূরবর্তী, মানব সমাজের দূরবর্তী এবং দোজখের নিকটবর্তী’ (তিরমিজি)। হুজুর পাক (দঃ) আরো বলেন, ‘বাটপার, সম্পদ জমাকারী এবং নিষ্ঠুর ব্যক্তি বেহেশতে যাবে না’ (তিরমিজি)। হুজুর পাক (দঃ) পুনরায় বলেন, ‘আমার মনে হল যে আমার কাছে একটুকরো সোনা আছে। ইহা (এই সোনা) আমাকে ধরে রাখুক আমি ইহা মোটেই পছন্দ করি না। তাই ইহা বণ্টন করে দেবার আদেশ দিয়েছি’ (বোখারী)। হুজুর পাক (দঃ) বলেন, ‘মওজুদদার অভিশপ্ত’

(এবনে মাজা)। হুজুর পাক (দঃ) বলেন, 'যে খাদ্যশস্য চল্লিশ দিন মওজুদ রাখে আর তা পরে বিলিয়ে দেয় (গরীবকে) তা তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না' (রাজীন)। হুজুর পাক (দঃ) বলেন, 'যারা মুসলমানগণের ক্ষতি করে তাদের খাদ্যশস্য মওজুদ করে রাখে আল্লাহ তাদেরকে কঠিন রোগ ও দরিদ্রতা দিয়ে কষ্ট দেবেন' (এবনে মাজা)।

হুজুর পাক (দঃ) বার বার আমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছেন এই জন্য যে, আমরা যেন ইসলামী সাম্যের আদর্শ হতে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে অসাম্য, বৈষম্য, শোষণ নিজের অধিকারে সম্পদ জমা করে রাখার জঘন্য কর্মে লিপ্ত না হই।

হুজুর পাক (দঃ) একদিন ঘটনাচক্রে হযরত বেলালের নিকট গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তার সামনে এক ঝুড়ি খেজুর। তিনি তখনই বেলালকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে বেলাল এগুলো কি?' বেলাল উত্তর দিলেন, 'আগামী কালের জন্য আমি ইহা জমা করে রেখেছি।' তিনি বললেন – 'বিচারের দিন দোজখের আগুনের বাষ্প কি দেখতে ভয় কর না?' (বাইহাকী)।

মাত্র এক ঝুড়ি খেজুর জমা করে রাখাটাকে হুজুর পাক (দঃ) দোজখের আগুনের বাষ্প বলে হযরত বেলালকে সাবধান করে দিলেন, আর আমরা এখন কোথায় কোন পতনের বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছি একবার নিরপেক্ষ মনে বিচার করে দেখুন তো! অন্যের কথা বাদই দিলাম, ব্যক্তি আমিটাকেই একবার বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করালে কি রায় আশা করতে পারি? আমার নিজের পাপ দিয়েই তো অন্যের পাপ মেপে যাই, তার পরিণতির শোচনীয় অবস্থাটার কি ব্যাখ্যা দিতে হবে? জলজ্যান্ত সত্যের উলঙ্গ প্রকাশের ধারাকেও আপন অন্ধস্বার্থের খাতিরে বাঁকা পথে জোর করে টেনে নিয়ে যাই, আর যদি একান্তই না নিতে পারি তা হলে চিরন্তন একখানা অপবাদের গালি দিয়ে যাই – 'এই হাদীসগুলো না একদম বানানো হাদীস তথা জয়িফ হাদীস।' কিন্তু আমরা জেনেও না জানার ভান করতে বাধ্য হই ঐ স্বার্থের ঝুড়িটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। কিন্তু এটা যে অবিসংবাদিত সত্য কথা – 'সত্যের থাকে না কোন পোশাক। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সত্য চিরদিন থাকে উলঙ্গ।' চমক দিয়ে উঠে রক্তপানের চরিত্র তরবারির দেহে। পিপাসার্ত পেটুকের মত ঢক ঢক করে পান করতে চায় তরবারি। চমক দিয়ে উঠে চৈতালী প্রখর সূর্যের মত উলঙ্গ ছবি সত্যের চরিত্রে। পিপাসার্ত পেটুকের মত ঢক ঢক করে গিলে ফেলতে চায় মিথ্যার ঘুট ঘুট অন্ধকার দিয়ে বিছানো শয্যা। কারণ, সত্য সাংঘাতিকভাবে ঘৃণা করে আসছে মিথ্যাকে যেমন গ্রেহাউণ্ড কুকুরগুলো ঘৃণা করে মানুষখেকো চিতা বাঘগুলোকে।

কত প্রকারেই না আমাদেরকে সম্পদ যাতে কোন ক্রমেই জমা না করি তার আদেশ-উপদেশ হুজুর (দঃ) দিয়ে গেছেন। মাত্র এক ঝুড়ি খেজুর একটি দিনের জন্য রাখার বাসনা হওয়াতে হুজুর পাকের (দঃ) প্রেমিক সাহাবা হযরত বেলালকে পর্যন্ত সাবধান বাণী শুনতে হল। যে হযরত বেলাল একদিন আবু উসামার নিষ্ঠুর প্রহারের তলেও হযরত মুহাম্মদ (দঃ) নামটি উচ্চারণ করতে এক মুহূর্তের তরেও ভুলে যান নি। কত সহস্রবার যে হুজুর পাক (দঃ) সম্পদ জমা করা তথা ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধে, বৈষম্যের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, সর্বপ্রকার জুলুমের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে, সংগ্রাম চালাতে আবেদন-নিবেদন করে গেছেন তার হিসেব নেই। অথচ আমরা গাছের মূল কেটে ফেলে মাথায় পানি ঢেলে গাছ বাঁচানোর কতই না কথার তুবড়ি আর বস্তাপচা বুলি ঝাড়ছি তার ইয়ত্তা নেই। হুজুর পাক (দঃ) বলেন, 'সম্পদ জমা করে রাখা দোজখের একটি গাছ। যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করে রাখে, সে দোজখের একটি ডাল ধরে আছে। ডালটিও তাকে ছাড়বে না যে পর্যন্ত সে

(ডালটি) তাকে দোজখে দাখিল না করে।' (বায়হাকী)। একদিন হুজুর পাক (দঃ) কাবা শরীফের ছায়ায় বসে ছিলেন, তখন হুজুর পাক বললেন– 'কাবার প্রভুর শপথ! তারা ক্ষতিগ্রস্ত। আবুজর গিফারী বললেন, 'আমার পিতা ও মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। তারা কে?' হুজুর পাক বললেন–'যারা ধন-সম্পদ অধিক করে, কেবল ঐ লোকজন ছাড়া যার সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডান হাতে, বাম হাতে বলে এই ভাবে, এই ভাবে, এই ভাবে খরচ করে। তাদের সংখ্যা অল্প।' *(বোখারী এবং মোসলেম শরীফ)।*

হুজুর পাক (দঃ) যেভাবে খরচ করার নমুনা দেখালেন সেভাবে যদি ধরে নিলাম কেউ তার সঞ্চিত সম্পদ বিলিয়ে দেয় তবে তার কাছে যে কি থাকবে তা বুঝতে কারো কষ্ট হবে না। অর্থাৎ সম্পদ যাতে অতি সামান্য পরিমাণও কেউ জমা না রাখতে পারে সে কথাই ঘুরে-ফিরে বিভিন্ন রকমে বলেছেন। সম্পদ জমা করার বিরুদ্ধে (প্রাইভেট প্রপারটির তো প্রশ্নই উঠতে পারে না) হুজুর পাক (দঃ) কত রকমেই না আমাদের আদেশ দিচ্ছেন। হুজুর পাক (দঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সোনা মওজুদ করে তার উপর অভিসম্পাত এবং যে ব্যক্তি রূপা মওজুদ করে তার উপর অভিসম্পাত' (তিরমিজি)। আমাদের অন্ততঃ এটুকু নিশ্চয়ই জানার কথা যে, হুজুর পাক (দঃ) একমাত্র কাফের এবং মোনাফেকদেরকেই অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন। এখন একটু তলিয়ে দেখুন তো সোনা আর রূপার মৌজুদদারদের কি অভিসম্পাত বর্ষণ করা হয়নি? হুজুর পাকের (দঃ) বর্ণিত হাদীসগুলো ভাষা এবং ভাবের দিক দিয়ে এত সুন্দর এত গভীর যে তার একটি নমুনাস্বরূপ নিচে দেওয়া হল। হুজুর পাক (দঃ) বলেন, 'দোজখে ঢুকানো হবে না সেই ব্যক্তিকে যার ভেতর এক তিল পরিমাণ ঈমান আছে এবং বেহেস্তে ঢুকানো হবে না সেই ব্যক্তিকে যার ভেতর এক তিল পরিমাণ অহংকার আছে।'

মাত্র একটি 'এবং' শব্দ যোগ করে দিয়ে কি সুন্দর ভাবের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। আশা করি পাঠক মাত্রেই এই হাসীদটুকুর গভীর রহস্য অনুধাবন করতে পারবেন। শুধু মাত্র কাফের এবং মোনাফেকদেরকেই অভিসম্পাত বর্ষণ করা হয়েছে, তাহলে সোনা-রূপার মওজুদদারদেরকে কি বলতে চান? এই সব মওজুদদারদেরকেই লক্ষ্য করে কোরান বজ্রকঠিন কণ্ঠে ঘোষণা করেছে, যাতে পৃথিবীর বুকে শোষণ এবং বৈষম্যের গ্লানি মানব জীবনে প্রবেশ করে মানব সমাজকে এক নিদারুণ সমস্যায় না ফেলে।

কোরান বলছে, 'আর যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করেছে এবং পরকালের কোন ধার ধারে না এবং ভাল কাজকে মিথ্যা জানে, তার জন্য দুঃখের পথকে আমি নিশ্চয়ই সহজ করব যাতে সে শীঘ্র দোজখে পৌঁছিতে পারে এবং যখন সে দোজখে পড়বে তখন তার ধন-দৌলত (যা সে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করেছে) কোন কাজেই আসবে না। ' (সূরা লাইল ৮ হতে ১১ আয়াত)।

কোরান বলছে, 'না, না, মানুষ সত্যিই সীমালঙ্ঘন করে এই জন্য যে, সে নিজেকে ধনবান মনে করে, কাহারো ধার ধারতে চায় না এবং পরোয়া করে না।' (সূরা আলাক ৬ আয়াত হতে ৭ আয়াত)। কোরান বলছে, 'লোক হতে তুমি অহঙ্কার করে মুখ ঘুরিয়ে নিও না কিংবা দুনিয়াতে অহঙ্কার করে চলো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ অহঙ্কারী লোককে ভালবাসেন না।' (সূরা লোকমান ১৮ আয়াত)। কোরান বলছে, 'অতএব অসহায়দের উপর তুমি কখনো জুলুম করিও না এবং যে (বেঁচে থাকার জন্য অধিকার আদায়ের আশায় চায় তাকে ধমকিয়ে দিও না ও তার প্রতি খারাপ ব্যবহার করিও না।' (সূরা দোহা ৯ আয়াত)।

কোরান বলছে, 'কিন্তু সেদিন অত্যাচারীদের ওজর-আপত্তি তাদের কোন উপকারেই আসবে না এবং তাদের অনুতাপও (তওবা) কবুল করা হবে না।' (সূরা রুম ৫৭ আয়াত)। কোরান বলছে, 'এই জালেমেরা স্পষ্টই পথভ্রষ্ট (কাফের) হয়ে রয়েছে।' (সূরা লোকমান ১১ আয়াত)।

কোরান বলছে, 'এবং তাদের সহিত যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না জুলুম দূর হয়।' (সূরা বাকারার ১৯৩ আয়াতের কিছু অংশ)।

জালেমদের ক্ষমা করে দিলেও এবং জালেমদের জুলুম হতে সাময়িক রেহাই পেলেও সর্বকালের জন্য উহা কিন্তু মোটেই নিরাপদ নয়। শক্তি প্রয়োগের কাছে জালেম কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ থাকলেও ভেতরে ভেতরে জুলুম করার নিখুঁত পদ্ধতি বের করার জন্য তারা ফন্দি করতে থাকে। এজন্য কোরান পাক আমাদেরকে সব সময় জালেমদের উপর কড়া নজর রাখতে বলেছে। ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস পড়লেই একথাগুলোর মূল্য এবং গুরুত্ব বুঝা যায়।

জালেমের অত্যাচারে মজলুম জনতার যে রক্ত শোষণ করা হয়েছে, মজলুম জনতার উপরে যে অত্যাচারের রোলার নির্মমভাবে চালিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাদেরকে সেরকমই শাস্তি দিতে হবে, যেরকম তারা মজলুম জনতার উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে, এবং সেই শাস্তি দেবার মাঝেই আছে মজলুমের জীবন ফিরে পাবার, এবং জালেমদেরকে শাস্তি দেবার মাঝেই আছে হত্যা ও রক্তপাত হতে নিজেদেরকে রক্ষা করা, যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে জালেমকে শাস্তি প্রদান করাটা আমাদের চোখে এক প্রকার নির্মম বলেই ঠেকছে, কিন্তু কোরান জালেমকে শাস্তিদান করার মাধ্যমে যে নির্মমতা ফুটে উঠে উহাকে নির্মম বলে আখ্যা না দিয়ে বলছে, এই শাস্তিদানের মাঝেই আছে মজলুমের জীবন ফিরে পাবার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তাই কোরান বলছে, 'হে জ্ঞানের অধিকারীগণ, তোমাদের জন্য খুনের পরিবর্তে খুনের (মধ্যে) রয়েছে জীবন, যেন তোমরা (হত্যা ও রক্তপাত) হতে নিজেদের রক্ষা করতে পার।' (সূরা বাকারা ১৭৯ আয়াত)।

ইসলাম বলছে যারা জালেম, যারা অত্যাচারী তারাই পথভ্রষ্ট, তারা কাফের আর মোনাফেক। তাদেরকে আল্লাহ পথ দেখান না। তারা মানুষকে এতিম বানিয়ে, এতিমের রক্ত শোষণ করে সুখে থাকার জন্য তৈরি করে বড় বড় প্রাসাদ। কিন্তু শোষণের দ্বারা গড়ে তোলা যে প্রাসাদ তার প্রতিটি ইট জালেমের হৃদয়ে স্থায়ী শান্তির স্বপ্নকে আঘাত করে ভীষণভাবে। তারই দরুন জালেমের মন সবসময় অস্থির আর সন্দিগ্ধ থাকে। শান্তির রূপে গড়া প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষের দেয়াল জালেমকে 'শোষণ করছে এতিমের রক্ত' বাক্যটি বোবা ভাষায় প্রতিধ্বনিত করে, আর তারই দরুণ জালেম প্রতিটি ক্ষণে অনুভব করে অদৃশ্য অথচ তীব্র পাঁজর ফাটা আঘাত। কোরান কত সুন্দর করেই না জালেমের মর্মবেদনার ছবি ফুটিয়ে তুলছে, 'আর আল্লাহ কখনোই জালেমদেরকে পথ দেখান না। যে (শোষণের দ্বারা গড়া বিলাসী) প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছে তারই দরুন তাদের মন সবসময় সন্দেহে ভরা থাকবে যে পর্যন্ত না তাদের হৃদয় টুকরো টুকরো করে কাটা হয়।' (সূরা তৌবা ১১০ আয়াত)।

কেন ঐ জালেম বেঈমানদের ভীরু বুক দুরু দুরু করে কেঁপে উঠে? যাদেরকে অত্যাচার করে, শোষণ করে, অকথ্য নির্যাতন করে, অর্থনৈতিক ভেল্কিবাজি দেখিয়ে, সম্পদের কেন্দ্রীভূত করার মিঠা অস্ত্রের আঘাত দিয়ে মানবতা বিহীন নেংটি পরিয়ে দিয়ে সরল জনতাকে এতিমের শ্রেণীতে ভিড় করাচ্ছে তারা কি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে যাবে? তারা কি ভাগ্যের লিখন এই ছিল বলে সান্ত্বনা খুঁজবে?

অত্যাচার, জুলুম, শোষণ আর নির্যাতন যদি বোবার মত শুধু নীরবে দাঁড়িয়ে সয়ে যাও, যদি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর না হও, যদি গোপন করে রাখো অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার আল্লাহর দেওয়া স্পষ্ট প্রমাণগুলোকে, যদি লুকিয়ে রাখ আল্লাহর পথে চলার যে নির্দেশ যাহা কেতাবের ধারা সমূহে 'আমরা'-রূপে তোমাদের কাছে খোলাসা করে দিচ্ছে আবর্তন-বিবর্তনের মাধ্যমে, তবে তোমাদের ধ্বংস হয়ে যাবার অভিশাপ আল্লাহ কর্তৃক নিশ্চয়ই বর্ষিত হবে এবং তাতে নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে আনবে।

নীরব দর্শকের মত যাতে আল্লাহর নির্দশনগুলো তোমরা গোপন করে না রাখ তারই জন্য কোরান তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছে, 'যারা গোপন করে রাখে স্পষ্ট প্রমাণগুলো এবং আল্লাহর পথে চলার নির্দেশগুলো যাহা আমি পাঠিয়েছি তোমাদের জন্য আর যাহা (একবারে) খোলাসা করে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি আমাদের কেতাবে তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ এবং যাদের অভিশাপ দেবার ক্ষমতা আছে।' (সূরা বাকারা ১৫৯ আয়াত)।

পৃথিবীর বুকে সাম্য, শান্তি, শৃঙ্খলা যাতে বজায় থাকে, আর যত প্রকার অপকর্ম, অন্যায় এবং ক্ষতি যারা তাদের শয়তানি বুদ্ধির জোরে করে বেড়ায় এবং পৃথিবীর বুকে অশান্তির বন্যা নামিয়ে দেয়, আল্লাহ যত বড় কঠিন শাস্তি দিতে আমাদেরকে আদেশ করছেন তা শুনলে সত্যই অবাক হতে হয়। একতিল পরিমাণ মায়া-মমতার প্রশ্ন উঠাই অবান্তর করে রাখা হয়েছে আল্লাহর প্রতিটি আদেশের মাঝে যারা পৃথিবীতে অন্যায়-অত্যাচার করে বেড়ায়। এই জালেমের দলকে সমুচিত শিক্ষা দেবার আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ। এদের অপকর্ম যাতে ভূ-পৃষ্ঠে রোগজীবাণুর মত সংক্রামক না হয় তার দরুন জালেমদেরকে পৃথিবীর বুক হতে চিরতরে মুছে দিতে আদেশ করছেন। জালেমের প্রতি উদারতা আল্লাহ কোথাও দেখাননি। কারণ, উদারতার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। উদারতা প্রদর্শন করার অর্থ হল জালেমকে সাহায্য করা এবং জালেমের সাহস বাড়িয়ে দেবার ভূমিকা গ্রহণ করা। আমরা যেন মুখেই শুধু আল্লাহর এবং রসুলের আদেশ পালন করে না যাই বরং উহা কার্যক্ষেত্র প্রয়োগ করতে হবে এবং তৌহিদের মূল শিক্ষাই হল মুখ এবং কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। নিজে মধুপান করার অভ্যাস ত্যাগ করে অপরকে মধুপান ত্যাগ কর, বলার আদর্শই ইসলাম এবং ইহার ব্যতিক্রমকেই উদারতাবাদ বলা হয়। মুখে জেহাদের বুলি কপচানো কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উদারতাবাদ প্রয়োগ করা, অন্যকে জেহাদ করতে বলা, কিন্তু নিজের বেলায় প্রয়োগ করা হয় উদারতাবাদ এবং ইহাকেও কি এক প্রকার মোনাফেকীর লক্ষণ বলা যায় না? পশুর মত এক বোঝা খাবার উদরে তুলে আবার মুচকি হাসি তুলে রসুলের বাণীকে টেনে এনে মিষ্টি খাবার মোহটাকে সুন্নত বললে ঐ মোনাফেকদের মুখেই সুন্দর শোনায়, কিন্তু শোষণ আর জুলুমের বিরুদ্ধে হাজার হাজার বার আল্লাহ এবং রসুলের আদেশটা কেউ শুনিয়ে দিলেই উদারতাবাদের ললিত ভাষার শৈলী শোনায়। 'তিন দিনের বেশি খাদ্য ঘরে মওজুদ না করার' যে হুজুর পাকের আবেদন, সেই আবেদন 'যারা ভূড়িভোজের পর মিষ্টি খেয়ে হুজুর পাকের সুন্নত পালন করছে' বলে বেড়ায় তাদেরকে এই খাদ্য মওজুদ না করে রাখার বয়ান শুনালে তারা যেন সহসা আকাশ হতে পড়ে যান। অবাক হয়ে এরকম প্রশ্নও হয়তো করে বসতে পারে 'এরকম হাদীস তো শুনিনি', অর্থাৎ তা হলে তো কাজ সেরেছে। শুনলে অবাক হবেন– হুজুর পাকের বর্ণিত এই হাদীসটিকে দুর্বল, মিথ্যা, বানানো, মনসুখ বর্ণনাকারীদের মধ্যে অনেকেই 'নির্ভরযোগ্য নয়', ইত্যাদি বিশেষণগুলো আগেই লেপে দিয়েছে তারাই যারা মিষ্টি মুখের গর্তে টপ টপ করে ফেলে হুজুর পাকের সুন্নত পালন করতে ব্যস্ত এবং বিশেষজ্ঞ।

আল্লাহ ঘোষণা করছেন জালেমের জুলুমকে পৃথিবী হতে মুছে দিতে। ‘শক্তির পুরোপুরি প্রয়োগ করে যারা পৃথিবীর বুকে জুলুম, অনিষ্ট আর ক্ষতি করছে তারা আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং এটাই তাদের একমাত্র শাস্তি যে, তাদেরকে অবশ্যই খুন করা হবে অথবা শূলে চড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে অথবা উল্টো দিক করে তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হবে এবং এটাতো তাদের জন্য পৃথিবীতে ভীষণ অপমান এবং পরকালের জন্যও তাদেরকে ভয়ঙ্কর শাস্তি দেওয়া হবে।” (সূরা মায়িদার ৩৩ আয়াতের ভাবার্থ)।

(গ) সূরা তাকাসূর

১. আল্ হাকুমুত্ তাকাসূর
২. হাত্তা জুরতুমুল মাকাবের
৩. কাল্লা সাওফা তালামুনা
৪. সুম্মা কাল্লা সাওফা তালামুন
৫. কাল্লা লাও তালামুনা এ্লমাল ইয়াকীন
৬. লাতারা উন্নাল্ জাহিমা
৭. সুম্মা লাতারা উন্নাহা আইনাল ইয়াকীন
৮. সুম্মা লা তুস আলুন্না ইয়াওমাইজিন আনিন্ নাইম।

অনুবাদ

১. (বিষয় সম্পদের প্রয়োজনের) বেশি কামনাই তোমাদেরকে বিনাশ করে।
২. যে পর্যন্ত না তোমরা কবরে যাও।
৩. তা নয়, শীঘ্রই তোমরা বুঝতে পারবে।
৪. পুনরায় (বলছি) তা নয়, শীঘ্রই তোমরা বুঝতে পারবে।
৫. তাও নয়, (হায়) যদি তোমরা জ্ঞানের দ্বারা বুঝতে পারতে।
৬. নিশ্চয়ই তোমরা দোজখ দেখবে।
৭. তারপর নিশ্চয়ই তোমরা উহা প্রত্যক্ষভাবে দেখবে।
৮. তারপর নিশ্চয়ই তখন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে নিয়ামত সম্বন্ধে।

ব্যাখ্যা ঃ

দুনিয়ার ধন-সম্পদের উপর ভোগ-বিলাসের ফলাও করার জন্য আল্লাহ মানুষকে দুনিয়াতে পাঠাননি। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল দুনিয়ার পরীক্ষাগার হতে মুক্তি লাভ করে আল্লাহর দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করে তাঁর সন্তোষ লাভ করা। বিষয়বস্তুর কামনা অন্তরে অধিক থাকলে আল্লাহর দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এই কারণেই এই সূরায় আল্লাহ বস্তুমোহ হতে মুক্ত থাকার জন্য সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। নিতান্ত প্রয়োজেনের অধিক উপার্জন করার চেষ্টা করাই অপরাধ।

কারণ তাতে আমাদের মানসিক শক্তির অপব্যবহার হয়। অথচ আমরা পরস্পর প্রতিযোগিতামূলকভাবে সঞ্চয় প্রবৃত্তি জাগ্রত করে রাখি। কারণ, বস্তুর চাকচিক্য এবং ধন-সম্পদের মোহ কবরে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি না। ব্যক্তিগতভাবে সঞ্চয়-প্রবৃত্তির উপর এই সূরাটি বিরাট একটি ধমক। এই সঞ্চয়-প্রবৃত্তির অর্থই হল অন্য লোক হতে নিজের জন্য অধিক রাখার ব্যবস্থা করা। এ অপরাধের শাস্তিস্বরূপ দোজখে ফেলে দেওয়া একেবারেই অবধারিত। তাই সর্বশেষ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রত্যেকটি নেয়ামতের ব্যবহার সম্বন্ধে মানুষকে প্রশ্ন করা হবে। অন্য লোক হতে অধিক ভোগ করার প্রবৃত্তিই একটি বড় অপরাধ। যাহা সমাজ জীবনে অনেক অনর্থ ঘটিয়ে থাকে। এই অনর্থ বহু রকমে দেখা দেয়। ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সম্মানী-অসম্মানী ইত্যাদি নানারূপ শ্রেণীবিভাগ সামাজিক কলঙ্কের মূল কারণ হল অন্য হতে অধিক সঞ্চয় করার প্রবৃত্তি। কারণ, এই সঞ্চয়ের দ্বারা সে কাহারো উপর প্রভুত্ব করে থাকে, কাহারো উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে, আবার কাহারো উপর অপমান ও ঘৃণা নিক্ষেপ করে। এই সব সামাজিক কলঙ্ক হতে রক্ষার জন্য মানুষের সঞ্চয় প্রবৃত্তির উপর আল্লাহ দোজখের ভয় দেখিয়ে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। বস্তুমোহের মূল্য আল্লাহর দ্বীনের সৃষ্টিতে একেবারেই তুচ্ছ; অথচ ইহাকেই আমরা বড় করে দেখে থাকি। দৃষ্টির এই ভুলের জন্য আমাদের চক্ষুকে দেখানো হবে ভয়ঙ্কর দোজখ। অর্থাৎ চক্ষুকে প্রবৃত্তিসমূহের প্রতীকরূপে ধরে ইহাই বুঝানো হয়েছে যে, প্রবৃত্তিসমূহ দুনিয়ামুখী হওয়ার কারণে শাস্তি লাভ করবে।

ইসলামী সমাজে ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন শ্রেণীবিভেদ করা জঘন্য অপরাধ। উহার দ্বারা মানুষকে জাহান্নামে ঠেলে দেয়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হবে মানুষকে এই অপরাধ হতে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে উদ্ধার করা। তা হলে শ্রেণীবিভেদ সৃষ্টি হওয়ার কোনই আশঙ্কা থাকে না। পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক সঞ্চয় প্রবৃত্তি ও উহার ভোগের প্রবৃত্তি সকল প্রকার সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও কলঙ্ক সৃষ্টির মূল উৎস। ইসলামী সমাজে মানুষের প্রবৃত্তিগুলোর পরিচালনা আল্লাহর দ্বীন ইসলামে প্রবেশ লাভ করার চেষ্টাতে নিয়োজিত রাখাই অধিক হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সূরার প্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে, অন্য লোক হতে অধিক সঞ্চয় করার কামনা মানুষের ধ্বংস হয়ে যাবার প্রধান কারণ। আল্ হাকুম অর্থ হল, ধ্বংস করে তোমাদেরকে তাকাসূর অর্থাৎ অপর লোক হতে অধিক বিষয়বস্তু লাভ করার কামনা।

মন্তব্য

বিষয়-সম্পদের প্রতি অধিক কামনা উহার সীমা ছেড়ে সীমাহীনরূপে পরিণত হয়। প্রয়োজন মত আছে, কিন্তু তাতে কামনার তৃপ্তি নেই। 'আরো চাই – আরো পাই' এই কামনার বিশ্রী রূপ মানুষকে কবরে যাবার পূর্ব পর্যন্ত অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরে এবং মৃত্যুই এই ভয়ঙ্কর বিশ্রী সীমাহীন কামনার পথে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। মৃত্যুর আঘাত না পাওয়া পর্যন্ত 'আরো চাই'-এর সীমাহীন কামনার পথকে আটকিয়ে রাখতে পারে না এবং কোন কিছুই বাঁধা দেবার ক্ষমতা রাখে না। আধিক্যের কামনা জলের নিচের দিকে গড়িয়ে যাবার ধর্মের মত গড়াতেই থাকে। এই গড়ানোর ধর্মকে আঘাত করে কঠিন পাথরের তৈরি বাঁধের মত মৃত্যু নামক বাঁধ। মৃত্যুবাঁধের কাছে সীমাহীন কামনা বুঝে নেয় যে, তার গড়িয়ে চলার শেষ পরিণতি মৃত্যুর ভয়ঙ্কর আঘাতের কাছে। মৃত্যুর আঘাতে অধিক কামনাকে

আত্মসমর্পন করাতে বাধ্য করে, কিন্তু এই আত্মসমর্পনের ভেতর প্রেম নেই। আছে দহনজ্বালা। যে জ্বালার দহন তাকে চিরকাল বাধ্য করে সইতে এবং এই তীব্র জ্বালাই হল দোজখ।

আধ্যাত্ম দৃষ্টিতে 'আরো চাই'-এর সীমাহীন বন্য লালসার শেষ হয় মৃত্যুর কাছে– কোরানের এই কঠিন সত্যটি সমাজ জীবনেও একইভাবে প্রযোজ্য। 'আরো চাই'-এর ভয়ঙ্কর কামনা ছোট থেকে কি ভাবে বড় হয়ে আরো বড় হতে হতে সামনের দিকে এগিয়ে চলে এবং 'আরো চাই'-এর পুঁজি রূপটি যখন চরমরূপ সাম্রাজ্যবাদের রূপ গ্রহণ করে বলগাহীন হয়ে যায় তখন 'আরো চাই'-এর মৃত্যু ঘণ্টা বেজে উঠবে।

আমরা সমাজ জীবনের পথে 'আরো চাই'-এর গতি-প্রকৃতি এবং মৃত্যু নিয়েই সামান্য আলোচনা করবো। 'আরো চাই'-এর গতি অনন্ত, কামনা সমাজ জীবনের পথে চলার সময় যে কত রূপ নেয় এবং কত রূপ বদলাতে হয় তা ভাবতে সত্যিই বিস্ময় লাগে। 'আরো চাই'-এর একটি অঙ্গে যে এতরূপ থাকতে পারে এবং বদলাতে পারে তা সমাজের শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত, নিষ্পেষিতরা মনে-প্রাণে বুঝতে পেরেছে এবং যেদিন থেকে শোষিতরা 'আরো চাই'-এর মত রূপ এক অঙ্গে থাকা মোটেই শোভা পায় না বলে বুঝতে পারল সেদিনই তার এত রূপ দেখানোর অঙ্গটির সামাজিক মৃত্যু চাইলো। 'আরো চাই' নামক অঙ্গটি মৃত্যুর সাথে নিরুপায় হয়ে করে শেষ সংগ্রাম। কিন্তু হেরে যায় এবং আত্মসমর্পন করতে হয় একান্ত বাধ্য হয়ে। শোষিতদের 'মৃত্যু'-অস্ত্রের বার বার আঘাত খেয়ে 'আরো চাই' মৃত্যু অস্ত্রের নিচে যন্ত্রণায় ঢলে পড়ে।

সীমাহীন কামনার শেষ রূপটি হল সাম্রাজ্যবাদ। এখানে এসেই সীমাহীন কামনা মৃত্যুর আঘাত খায় শোষিতদের ঐক্য-সংগ্রাম নামক অস্ত্রে। সাম্রাজ্যবাদ কথাটি উচ্চারণ করলেই আমরা একটি দেশ অপর আর একটি দেশকে দখল করাই বুঝি, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ জাতি যেমন আমাদের ভারতবর্ষকে দখলে রেখেছিল। কিন্তু আধুনিককালের সাম্রাজ্যবাদ পেছন দিক হতে শোষণ করে। ছল-চাতুরির টাল-বাহানা এবং গোপনে একটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অন্য একটি দেশ কব্জা করে এবং কোটি কোটি মানুষের রক্ত শোষণ করে বন্যসর্প ভাইপারের মত। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে তখন নেমে আসে দারুণ লাঞ্ছনার গ্লানি। ভাত হয় তো কাপড় হয় না– কাপড় হয় তো ভাত হয় না। অসুখ-বিসুখে পয়সার অভাবে নিজের ছেলে-পুলে নিজের চোখের সামনে কাতরিয়ে মরে। পিতা-মাতার আশায় ভরা বুকখানা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।। বুক-ভাঙ্গা সমবেত দলকেই এক কথায় বলা হয় শোষিতদের দল। এদের সমবেত সংগ্রামকেই বলে শোষিতদের সংগ্রাম। আর শোষিতদের সংগ্রাম যেদিন বিজয়লাভ করবে সেদিন তৈরী হবে ইসলামী সাম্যবাদ। আর ইসলামী সাম্যবাদ শিক্ষা দেয় প্রতিটি মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার। আর সেই ইসলামী সাম্যবাদই মহামিলনের আল্পনা আঁকবে। যে মহামিলনের আল্পনা আঁকার দর্শন সর্বপ্রথম সিরাজুম মুনিরা রসুলুল্লাহ (দঃ) পৃথিবীকে উপহার দিয়ে যান।

ধন জমা করে যারা তাদেরকে আল্লাহ শুধু জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুনে চিরকাল থাকতে হবে, প্রবল ঘৃণা-বৃষ্টি নিক্ষেপ করা, অভিশাপ তথা লানৎ দেওয়া, বয়কট করা ইত্যাদি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেই কর্তব্য শেষ হল বলে মনে করেননি। কারণ সর্বজ্ঞ আল্লাহ জানেন যে, পরকালভিত্তিক ভয় দেখানোকে ধন জমাকারীরা কোন পরোয়াই করবে না। ধন জমাকারীরা আল্লাহর সাবধান বাণী শুনে বলে বেড়াবে, 'মরার পর জাহান্নামে যাব কিনা তার নিশ্চয়তা কে বলতে পারে? আর যদি যেতেই হয় তখন সীমা-ছাড়া দয়াল আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলে তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমা করে দেবেন।'

তাই আল্লাহতালা প্রথমে ধন জমাকারীদেরকে শোষণনীতি পরিত্যাগ করে 'সাম্যের আদর্শে সকলের চলতে হবে' বলে আহ্বান জানাতে বলেছেন। যদি ধন জমাকারীরা সাম্যের আদর্শকে তাদের শোষণনীতি ছেড়ে দিয়ে গ্রহণ করে তবে সংগ্রাম করার কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি বেঁকে বসে এবং সাম্যের আদর্শকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তবে জেহাদের মনোবল নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে হবে এবং আদ জাতির মত নির্মমভাবে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। ***'ইন্না আবওয়াবাল্ জান্নাতা তাহ্তা জেলালিস সয়ুফে'*** অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই তরবারীর ছায়ার নিচেই বেহেস্তের দরজা।' ধন জমাকারীদেরকে আল্লাহ এবং রসূল (দঃ) মোনাফেক বলেছেন। মোনাফেক কিন্তু কাফেরদের চেয়েও ভয়ঙ্কর এবং বিশ্রী। তাই তার শাস্তির মাত্রাটাই খুব বেশি। ইহকালে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শাস্তি এবং পরকালে অগ্নিবাস। কোরান প্রকাশ্যে ঘোষণা করছে, 'সম্মান একমাত্র আল্লাহর এবং তাঁর রসুল এবং মোমিনদের।' এর বাইরে কারো সম্মান ইসলাম স্বীকার করে না। এখন প্রশ্ন হল, মুমিন কে? মুমিনের সংজ্ঞা কি? মুমিনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কোরান কতগুলো শর্ত দিয়েছে এবং এই শর্তগুলোর মধ্যে ইহাও একটি মুমিন হবার শর্ত–'তুমি তোমার জন্য যতটুকু বাঁচার প্রয়োজন অনুভব কর ততটুকু প্রয়োজন অপরের বেলাতেও অবশ্যই করতে হবে।'

কিছু সংখ্যক লোক যদি ইসলামের এই আদেশ অমান্য করে শোষণনীতি গ্রহণ করে সমাজ জীবনকে এক অসহায় অবস্থাতে পরিণত করে তবে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা সমাজের সকলের জন্য হয়ে দাঁড়ায় অবশ্যকর্তব্য এবং এই অবশ্যকর্তব্য যদি সমাজ পালন না করে তবে তাদেরকেও মোনাফেকের সাহায্যকারীরূপে গণ্য করা হবে। তাই ইসলাম ধর্ম ঘোষণা করে – জনসাধারণের দ্বারা সরকার গঠন করতে হবে। জনসাধারণই নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্রীয় (?) ক্ষমতা। ইসলাম সরকার এবং রাষ্ট্র বলে ভৌগোলিক কোন সীমা দেয়নি এবং ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি নেই। ইসলাম মালিকানা স্বীকার করে শুধু একমাত্র আল্লাহর। জনসাধারণ যদি 'ব্যক্তিমালিকানা' উচ্ছেদ করে সমগ্রের মঙ্গলের জন্য সমগ্রের আমানত স্বীকার করে নেয় উহাকে বলা হবে সমগ্রের মঙ্গলের জন্য সমগ্র কর্তৃক রাষ্ট্রীয় আমানত ব্যবস্থা। কারণ, ইসলাম 'ব্যক্তিমালিকানা' না বলে 'ব্যক্তি-আমানত' বলেছে। খলিফা উমর ফারুককে যখন মালিক বলে সম্মান করেছিলেন তখন খলিফা মালিক না বলে খাদেম বলতে বলেছেন। সুতরাং জনসাধারণ যখন দেখতে পাবে যে, ব্যক্তি-আমানত 'ব্যক্তি-মালিক' এবং 'ব্যক্তি শোষণ' রূপে পরিণত হবে এবং সমাজ জীবনের ভারসাম্য মোটেই টিকে থাকবে না, তখন ব্যক্তি-আমানত উচ্ছেদ করে দিয়ে সমগ্রের মঙ্গলের জন্য সমগ্র কর্তৃক 'সমগ্রের আমানতরূপ ব্যবস্থা' গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের নামে যারা ভণ্ডামী করে শোষণ ব্যবস্থাটাকে জিইয়ে রাখতে চায় তারা বলে বেড়ায়– 'ইসলামী সাম্যবাদ ব্যক্তিমালিকানা উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রীয় মালিকানাতে পরিণত করবে।' কিন্তু মানুষকে জানোয়ার বানানোর বিদ্যা কমিউনিজম রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে স্বীকার করে কারণ তারা ইসলাম ধর্ম তো দূরে থাক পৃথিবীর কোন ধর্মই মানে না। তাদের মত ঠেটা আর ঘাড়মাগড়া কমই পাবেন। কারণ ইনারা সব বিষয় ইঁচড়ে পাকা ফরফরিদাসের মত বুঝে গেছেন। এমন ইঁচড়ে পাকা পণ্ডিত একমাত্র কমিউনিস্টদের মধ্যেই পাবেন গণক ঠাকুরের মত। ইনাদের কোন নেতা কি খলিফা উমর ফারুকের মত চাকরকে উটের উপর উঠিয়ে নিজে রশি ধরে টেনে নিয়ে যাবার সাম্য কল্পনা করত পারবে? বাস্তবের কথা তো বাদই দিলাম। ইনাদের যে কোন নেতার বই পড়ে দেখলে দেখতে পাবেন যেন সাক্ষাৎ গণক ঠাকুরখানা। ইনাদের জানোয়ার বানানোর ইজমখানার মৃত্যুঘণ্টা বাজতে আর বেশি বাকি নেই এবং কম-বেশি বাজনার শব্দ যে শুনতে পাই তা এদের নেতাদের চরিত্র

দেখলেই বুঝা যায়। এই 'মহান' আবার কিছু দিন যেতে না যেতেই 'শয়তান' দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত বিশেষণের সমাবেশ একই নেতার মধ্যে আমরা হর-হামেশা পেয়ে আসছি এবং এই উল্টা-পাল্টা রূপখানা দেখে পৃথিবী রুমাল চেপে হি হি করে হাসতে শুরু করেছে এবং দাঁত বের করে হাসার সময় একদিন অবশ্যই আসবে– ইহা একটি ঐতিহাসিক ফরমান হবে একদিন।

বেশি দুঃখ হয় তাদের জন্য যারা ইসলামের উপর সুগভীর নিরপেক্ষ মন নিয়ে পড়াশুনা না করে ভণ্ডদের উক্তিসমূহ নীরবে সহ্য করে যায় আর না হয় তাদের সাহায্যকারীরূপে পরিণত হয়। তারা কি ভুলে গেছেন যে, মাসালার পরিবর্তন অনিবার্য কিন্তু মুলনীতি অপরিবর্তনশীল। ইসলামের ব্যবহারিক দিক দিয়ে সর্বস্থানেই মূলনীতি হল সাম্যবাদ। যেমন নামাজ পড়তে গেলে সকলেই এক সারিতে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে হবে।

মাসালার পরিবর্তন কেমন করে হয় তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন ধরুন দাসপ্রথা। দাস বহু রকম হতে পারে। যুগের পরিবর্তন অনুযায়ী দাসপ্রথা বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। এখানে দাসপ্রথা বলতে আমরা বুঝে নেব যারা বাজার হতে দাম দিয়ে কেনা এবং যুদ্ধবন্দী গোলাম। দাসপ্রথা যাতে সমাজ জীবন হতে চিরতরে উচ্ছেদ লাভ করে তার জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল কোরান এবং হাদীসে বহু রকমে বহুবার বলেন। কিন্তু সেই অসভ্য যুগে রাতারাতি দাসপ্রথা উচ্ছেদ করা সম্ভব নয় বলে হুজুর পাক (দঃ) দাসদের প্রতি মনিবের ব্যবহার কি রকম হতে পারে তার আদর্শ প্রচার করলেন। হুজুর পাকের (দঃ) বহু উক্তির মধ্যে একটি হল 'তুমি যা খাবে দাস-দাসীদের তাই দিতে হবে এবং তুমি যা পরবে দাস-দাসীকে তাই পরতে দিতে হবে। কারণ, সে তোমার ভাই এবং ইহা অমান্য করাই হল সেই জাহিলিয়াৎ যুগের বর্বরতাকে পুনরায় গ্রহণ করা এবং যদি দাসকে মুক্ত করে দাও তবে উহাই হবে সবচাইতে উত্তম ব্যবস্থা।' এখন প্রশ্ন হল দাস-প্রথা যদি চিরতরে উচ্ছেদ হয়ে যায় তখন দাসদের প্রতি মনিবের কি প্রকার ব্যবহার করবে উহার মাসালা থাকে কোথায়?

তাই ইসলামের মূলনীতি হল এক জিনিস, যাহা পরিবর্তনীয় নয় এবং মাসালা হল অন্য জিনিস, যাহা পরিবর্তনীয়। হুজুর পাকের (দঃ) সময়ে মদিনাতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশ্যই উহা ছিল সেই যুগের সেই পরিবেশে উপযোগী একপ্রকার ব্যবস্থা। এই প্রয়োগ ব্যবস্থাটি পরিবর্তনশীল, কিন্তু বণ্টন বিষয়ে সাম্য ও ন্যায়নীতির মূল কথা কখনোই পরিবর্তন করা চলবে না।

অনেকে ধারণা করেন এবং করেছেন, হুজুর পাকের (দঃ) সময়ে মদিনাতে যে অর্থনীতি চালু ছিল তার পরিবর্তন করা চলবে না। ইহা মারাত্মক ভুল।

যারা এই ভুলের নেশা কেটে উঠতে পারেননি তাদেরকে সমালোচনা নির্মম হলেও বলতে বাধ্য হব যে ইসলামের উপর একটানা নিরপেক্ষ সুগভীর গবেষণা তারা না করে গোঁড়ামির চার দেয়ালে আবদ্ধ হয়ে থাকেন।

পরস্পর সুবিচার ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করার বিষয়ে ইসলামের জোর তাগিদ রয়েছে—এই নীতি সম্পদ-বণ্টনের ব্যাপারেও প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োগ-পদ্ধতি যেরকমই হোক না কেন তাতে কিছুই আসে যায় না।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার প্রয়োগ-পদ্ধতি অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে কিন্তু সাম্যবাদের মূলনীতি অক্ষুণ্ন রাখতেই হবে। ধরুন যেমন 'যাকাত' নামক কর। ইহা হুজুর পাক (দঃ) চালু করেছিলেন দরিদ্রকে সাহায্য ইত্যাদি কয়টি নির্দিষ্ট কাজের জন্য। যদি বণ্টন সাম্যনীতিরূপে গ্রহণ করা হয় তা হলে 'যাকাত' নামক করটিকে না রেখেও চলে, কিন্তু

যাকাতের যে মূলনীতি আমিত্ব সরিয়ে দিয়ে পূত-পবিত্র হতে হবে উহা অবশ্যই পরিবর্তন করা চলবে না। মূলনীতি ফেলে দিয়ে শুধু পূর্ববর্তীদের প্রয়োগ-ব্যবস্থা অন্ধের মত অনুসরণ করলে মারাত্মক ভুল হবে। উহা ইসলামের অনুসরণ না হয়ে অনেকক্ষেত্রে বিরুদ্ধাচরণ রূপে কাজ করবে। দ্বীন ইসলামের মূলনীতির পরিচয়ের অভাবে এবং পরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থার উপর উহা প্রবর্তন করার সুগভীর জ্ঞানের অভাবে আধুনিক যুগে দ্বীন ইসলামকে একদল লোকে অপ্রযোজ্য মনে করছেন। তাদের মতে নাকি দ্বীন ইসলাম একবারেই ব্যক্তিগত বিষয়। তাই দ্বীন ইসলাম 'মধ্যযুগীয়' অপবাদে তাদের নিকট একপ্রকার কলুষিত হয়ে রয়েছে।

(ঘ) সূরা মাউন

১. আরাইতাল্ লাজি ইউকাজ জিবু বিদ্দ্বীন
২. ফাজালিকাল্ লাজি ইয়াদুউল ইয়াতিম
৩. ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আলা তোয়ামিল্ মিসকিন
৪. ফা ওয়াইলুল্লিল্ মুসাল্লিন
৫. আল্লাজিনা হুম আন্ সালাতিহিম সাহুন
৬. আল্লাজিনা হুম ইউরাউন
৭. ওয়াইয়াম নাউনাল্ মাউন।

অনুবাদ

১. তুমি কি দেখেছ তাদেরকে, যারা দ্বীনের উপর মিথ্যা আরোপ করে?
২. তা হলে (দেখে নাও) এতিমকে যারা তাড়িয়ে দেয় ওরাই তারা।
৩. এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উৎসাহ দেয় না।
৪. তাহলে আক্ষেপ মুসল্লীদের জন্য।
৫. যারা তাদের সালাতের প্রতি উদাসীন।
৬. তারা করে লোক দেখানো সালাত।
৭. এবং তারা মাউন দিতে মানা করে।

ব্যাখ্যা

এখানে রসুলাল্লাহ (দঃ)-কে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষকে একমাত্র দ্বীন ইসলামের উপর যারা মিথ্যা আরোপ করে তাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ওরাই দ্বীন ইসলামকে মানে না যারা এতিমকে তাড়িয়ে দেয় এবং মিসকিনকে খাবার দেবার বিষয়ে উৎসাহ দেয় না।

এতিম কথাটি অসহায় ও দুর্বলের প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয়েছে এবং মিসকিন কথাটি নিঃসম্বল ও দরিদ্রের বোবা প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। যারা গরীবকে গরীবই রাখতে চায় এবং তাদের খাওয়া-পরার সামাজিক বন্দোবস্ত করতে রাজি থাকে না এবং অসহায় অবস্থায় পেয়ে তাদেরকে তাদের মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত রাখে, তারাই দ্বীন ইসলামকে সোজাসুজি একেবারেই

অস্বীকারকারী। এর মূল কারণ সত্যিকার দ্বীনদার লোক দুনিয়াকে করে উপেক্ষা। তাই দুনিয়া সংক্রান্ত স্বার্থ তাকে মোটেই করে না প্রলুব্ধ। এই কারণে দুনিয়া সংক্রান্ত ন্যায়নীতি ও সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই হয় তার স্বভাব। এই সাময়িক জীবনের স্বার্থ তাকে মোটেই বিচলিত করতে পারে না। যেহেতু তার মূল লক্ষ্য আল্লাহর দ্বীনের প্রতি। এই কারণেই 'সুতরাং' শব্দ লাগিয়ে নকল মুসল্লীর সত্যিকার চেহারা এবং মনোভাবকে তুলে ধরা হয়েছে। নকল মুসল্লী আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ বিষয়ে অমনোযোগী। কারণ, তার মনোযোগ পড়ে রয়েছে দুনিয়ার দিকে। তাই দুনিয়ার সাময়িক হীনস্বার্থ উদ্ধারের দিকে তার মনোযোগ থাকে বেশি। এই কারণেই 'মাউন' দিতে সে করে মানা।

মাউন অর্থ সংসার-জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। যেমন দা, কুড়াল, খন্তা, হাঁড়ি, পাতিল ইত্যাদি। এই শব্দটি মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের বস্তুর প্রতীক-রূপে লাগানো হয়েছে। আমরা প্রতিদিন প্রত্যেকেই পরস্পর পরস্পরের উপর ছোট-খাট অনেক বিষয়েই নির্ভরশীল। তাই সমাজ জীবনে পরস্পর সহযোগিতা ও সাহায্যের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন জীবন সুষ্ঠুভাবে চালাতে হয়। এই সহযোগিতা করতে যারা উদারতা প্রকাশ করে না তারা সংঙ্কীর্ণমনা। এরা বহু প্রকারে সমাজের বুকে অনর্থ ও শ্রেণীভেদের দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে। পার্থিব লাভ-লোকসানের প্রতি ব্যক্তিগত স্বার্থজড়িত দৃষ্টি দেখলেই বুঝা যায় যে মুসল্লী সাহেবের দৃষ্টি দুনিয়ার দিকে না দ্বীনের দিকে? এই কথা কয়টি এই সূরার মধ্যে মুসল্লীর পরিচয়স্বরূপ ব্যক্ত করা হয়েছে।

এখানে আর একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গরীবকে খাবার দেবার ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে উৎসাহ দানের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। নিজে খাদ্যদান করুক তবেই সে মুসল্লী হতে পারবে একথা উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ ইসলামী সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা না করে নিজে ধনবান হয়ে বহু ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান করে দানের গৌরব অর্জন করা যেতে পারে কিন্তু তাতে থাকবে আমিত্ব এবং দুনিয়াভিত্তিক স্বার্থ। প্রাইভেট প্রোপারটি তথা ব্যক্তিমালিকানাটাই কিছু না কিছু ধন তথা সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব করা বুঝায় এবং সম্পত্তির কর্তৃত্ব মানুষের আমিত্ব এবং দুনিয়ার উপর স্বার্থ রক্ষার ইবলিসি ইঙ্গিত বহন করে। তাই এখানে নিজের অধিকারে ধন রেখে ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান করতে বলা হয়নি। অর্থাৎ প্রাইভেট প্রোপারটির স্বীকৃতি দেওয়া তো দূরে থাক বরং ইহাকে আমিত্ব এবং দুনিয়ার মোহে জড়িয়ে পড়ার একটি প্রধান শত্রুরূপে উল্লিখিত হয়েছে। তাই বলা হয়েছে পরস্পর পরস্পরকে উৎসাহিত করতে, যাতে সবাই এই সাম্যের নীতিবাদকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করে অর্থাৎ সামাজিকভাবে সবাই মিলে এমন একটি বন্দোবস্ত করা যাতে দরিদ্র ও অসহায়েরা সমাজ জীবন হতে মুছে গিয়ে সাম্যের আদর্শে জীবন পরিচালনা করতে পারে। কাজেই আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, এই সূরাটি সাম্য প্রতিষ্ঠার বিশেষ একটি রূপ বহন করছে।

দুনিয়াদার ও দ্বীনদারের স্বভাব সম্পূর্ণ পৃথক। দুনিয়াদার স্বভাবতই পার্থিব স্বার্থের প্রতি অধিক জাগ্রত। তাই সে হল লোভী ও স্বার্থান্বেষী। অপর পক্ষে দ্বীনদার দুনিয়াকে করে ঘৃণা ও নজর রাখে দ্বীনের হেফাজতের দিকে তাই পার্থিব বণ্টন বিষয়ে সে হয় উদার ও সুবিচারক। এই কারণেই সত্যিকারের মুসুল্লি হল সাম্যবাদী। কারণ, সে দুনিয়াকে করে ঘৃণা। কাজেই দুনিয়ার এই ঘৃণ্য ধন-সম্পদ সবাই কেন সমভাবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের মধ্যে থেকে ভোগ করবে না?

মন্তব্য

যারা এতিমকে তাড়িয়ে দেয়, অর্থাৎ বঞ্চিত-শোষিত-অবহেলিত হয়ে সমাজ জীবনে কোন রকমে জীবনটা বাঁচিয়ে রাখার জন্য যারা সংগ্রাম করছে তাদের সাম্য এবং নৈকট্যের দাবীকে উপেক্ষা যারা করে, তারা ইসলামের সীমানাতেই দাঁড়াতে পারেনি। অর্থাৎ প্রথমেই তাদেরকে ইসলামের ধারে-কাছেও নেই বলে আমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে। আমার মনে হয়, এতিম শব্দটির গভীরতা অনেকেরই জানা নেই। এতিম বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে তার সামান্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে করছি। পিতা-মাতা না থাকলেই এতিম হয় না। আবার পিতা-মাতা থাকা সত্ত্বেও এতিম হয়। যেমন, আদমজী মারা গেলে তার ছেলেকে এতিম বলা চলে না। আবার যে ব্যক্তি তার ছেলে-পুলে নিয়ে প্রতিদিনের খাবারটুকু যোগাতে পারে না, প্রায়ই উপবাস করে দিন কাটাতে হয়, তাদেরকেও এতিম বলা হয়। এখন সহজেই বুঝা যায়, এতিম শব্দটির অর্থ হল বঞ্চিত, শোষিত, অবহেলিত ইত্যাদির মূর্ত প্রতীক। এরা শোষণের বেদীতে দাঁড়িয়ে মৃত্যু-তরবারির অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছে। সব মানুষের বাঁচা-মরার দাবী হল সমান এবং এই সমান কথাটিকে যারা মানে না আল্লাহ তাদেরকে ইসলামের অতি সাধারণ সারিতেও স্থান দিতে ঘৃণা তো দূরে থাক সম্পূর্ণরূপে ইসলামের ধারে কাছেও নেই বলে বজ্রকঠিন গলায় ঘোষণা করেছে। এখন বুকে হাত রেখে নিজের বিবেককে প্রশ্ন করুন — মুসলমান হবার সংজ্ঞাটি কেমন। এখন প্রশ্ন হল, তা হলে মুসলমান কে? এবং অমুসলমানই বা কে? যে সকল ধনলোভী রক্তশোষকেরা ইসলাম ধর্মের নামাবলী দেহের উপর জড়িয়ে মুসলমান সমাজে নকল মুসলমান সাজে তারাই মানব সমাজের কাছে মসজিদ ঘরের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে মুচকি শয়তানি হাসি হেসে বলে বেড়ায় — 'আইয়ে আইয়ে ভাইসব মসজিদ মে আমীর গরীব কা কই ফারাক নাহি হায়, সব একদম সমান!' কিন্তু সহজ-সরল মনের মুসলমানেরা এতদিন তাদের ধাপ্পাবাজির রহস্য বুঝতে পারেনি। তাই সঙ্গে সঙ্গে ধনলোভীদেরকে খেঁকিয়ে প্রতিবাদ করে– 'সাচ কাহা, মসজিদ মে আমীর -গরীব কা ফারাক নাহি হায় মাগার সানকি মে বহুত ফারাক।'

লোক-দেখানো ইবাদতকারীরা আর চোখে কলুর বলদের ঠুলি পরাতে পারছে না। গরীবরা তাই বলছে, মসজিদ ঘরে ধনী-গরীব সমান বলার বাণী প্রচার করেন, কিন্তু খাবার বেলায় সমান দাবী করলেই নাস্তিক বলেন কেন? শোষকের শোষণ, অত্যাচারীর অত্যাচার পুঁজিপতি মাথায় টুপি লাগিয়ে গরীবের দাবীকে কুফুরী দাবী বলে আর কতকাল মানব -সমাজের বুকে ভণ্ডামী করে বেড়াবেন? আপনাদের নামাজ-রোজাকে তো পবিত্র কোরান 'ভণ্ডামী করছো' বলে বার বার জানিয়ে দিয়েছে। তবু আপনাদের ভণ্ডামী গরীবদেরকে এতকাল ফাঁকি দিয়ে রেখেছে, কিন্তু মনে রাখবেন, ভণ্ডামী করাটা কম-বেশি সময়ে একদিন না একদিন ধরা পড়ে যায়। গরীবেরা এখন বুঝতে পারে, আপনারা ইসলামের দোহাই দিয়ে শোষণের শাসন চালাতে চান। আপনারা হুজুর পাকের (দঃ) ইসলাম চান না। আপনারা চান এজিদের ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে। আপনারা কবে ইসলামের নাম বিক্রি করে ভণ্ডামী করার মুখোশ ফেলে দিয়ে প্রকৃত মুসলমান হবেন? ইসলামের সাম্যবাদ যুগে যুগে আপনাদের মত দলের হাতে যদি আঘাত না খেত, যদি এজিদের মত বাটপারদের কুচক্রের তলে ইসলামের আদর্শ ঘুরপাক না খেত তবে কুফরী মতবাদ, পশু-বানানো কমিউনিজমের কল্পনাও কেহ কোনদিন অনুভব করতো না। আজ সারা পৃথিবীর নাগরিকেরা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে ইসলাম যে প্রকৃতই শান্তির ধর্ম উহা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করতো। কৃষক, মজুর আর মধ্যবিত্তরা শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথাটি কল্পনায় বানানো মানুষ মনে করতো। খলিফা উমর ফারুকের উটের

রশি ধরে ভৃত্যকে উটের পিঠে বসিয়ে যাবার আদর্শ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ফোটা ফুলের মত শোভা বিস্তার করতো। 'মানুষ মানুষের ভাই' ইসলামের দীপ্তিমান মন্ত্রের দীক্ষায় মানুষের জীবনধারার প্রণালীর শিক্ষা আপনাদের হাতে পড়ে মাদ্রাসার ছোট ছোট ছাত্ররা হায়েজ-নেফাস আর ঢিলাকুলুপের মাসলা-মাসায়েল শিক্ষা করে। মহানবীর অশ্রুভরা নয়নে মানবতার আদর্শ মাদ্রাসার দ্বারপ্রান্তে হুমড়ি খেয়ে বোবার মত কাঁদে। কিন্তু মাদ্রাসার হাজার হাজার প্রিয় ছাত্ররা একদিন আপনাদের আসল চেহারাখানা চিনতে পারবে। আর বেশি বাকি নেই যেদিন এই মাদ্রাসার ছাত্র ভাইয়েরা, শ্রদ্ধেয় মুহাদ্দেস-মুফাসসেররা বলে উঠবেন, আল্লাহ পাক ও রসুলাল্লাহর (দঃ) দেওয়া সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর রচিত পুস্তকগুলো পড়ে অবাক হয়ে নিজেকে শুধু এতটুকুই প্রশ্ন করলাম- কোরান এবং হাদীস কি বলছে আর আপনারা কি লিখছেন! কোরান হাদীসের দেওয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামান্যতম মিলও খুঁজে পাওয়া তো দূরে থাক, সম্পূর্ণরূপে চিরস্থায়ীরূপে দাঁড় করানো হয়েছে এক ভয়ঙ্কর মানবতার-অপমান করার হিংস্র পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কথায় বলে, ফলের চেয়ে বিচি বড়। আপনারা ইসলামের নামে যে অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা দান করেছেন উহা পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর লিখিত কয়েকটি উক্তি অতি সংক্ষেপে তুলে ধরলাম। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে প্রদত্ত ভাষণে শ্রদ্ধেয় মওলানা মওদুদী সাহেব পুঁজিবাদের উপর দৃঢ় সমর্থন দিয়ে ইসলামের দোহাই দিয়ে বলে ফেললেন, 'এক ব্যক্তি যেমন কাপড়, আসবাবপত্র ও ঘরবাড়ী রাখার অধিকারী, তেমনি তার যন্ত্রপাতি ও কল-কারখানার মালিক হয়ে যাওয়াটাও তেমন অপরাধ নয়।' তিনি শুধু মালিকানা মেনেই চুপ করে রইলেন না বরং কথার মায়াজাল বিস্তার করতে করতে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। '*অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান*' নামক বই-এর ৫১ পৃষ্ঠায় তিনি বললেন, 'কাজেই কেহ লক্ষ-কোটি টাকার সম্পদ উপার্জন ও সঞ্চয় করলেও তা সমাজের অর্থনৈতিক জীবনকে বিপর্যস্ত করতে পারে না।' পুঁজিপতি, সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের হীনস্বার্থকে মানব সমাজে চিরস্থায়ীরূপে জিইয়ে রাখার উদ্দেশ্যে এবং কোটি কোটি মানুষকে এক অসহায় করুণ অবস্থার মাঝে ফেলে দিয়ে শ্রদ্ধেয় মওলানা মওদুদী সাহেব ইসলামের নামে '*ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ*' পুস্তকের ১৭৭-৭৮ পৃষ্ঠায় প্রচার করলেন, 'ইহার কোন সীমাও নির্দিষ্ট নাই, এক বর্গগজ হতে কয়েক হাজার একর পর্যন্ত যতখানি জমিই হউক না কেন, আইনসম্মত উপায়ে ও নিয়মে কাহারো মালিকানাভুক্ত হলে সে অবশ্যই তার বিধিসম্মত মালিক হবে, তা তার বৈধ মালিকানা সম্পত্তিরূপে গণ্য হবে।' ইহাই শেষ কথা নয়—যাতে সামন্তবাদীরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে, হাতে চাবুক নিয়ে গরীবদের দ্বারা জমি চষিয়ে ভোগ করতে পারে তার উপরও ইসলামের নাম দিয়ে ফতোয়া দিয়ে ফেললেন, 'নিজের জমি যে নিজেই চাষাবাদ করতে হবে এই মালিকানার বৈধতার জন্য তারও কোন শর্ত নেই।' (*ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ*' পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ১৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা)।

উলামারা প্রশ্ন করেন, উহা কাদের এবং কি প্রকার 'আইনসম্মত' উপায় রাখার ফতোয়া দিলেন? উহা কি আপনার বানানো ইসলামের আইন না আল্লাহ এবং রসুলাল্লাহ (দঃ)-এর দেওয়া আইন?' চাউল সেদ্ধ হল কিনা তার জন্য হাঁড়ির সমস্ত চাউল একটি একটি করে টিপে দেখতে হয় না। আপনাদের মতবাদখানা যে কি, কয়টি উক্তিতেই যথেষ্ট মনে করি।

আমরা সার্বজনীন ভোটাধিকার চেয়ে গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী সাজি। ভোট দেবার বেলায় সকলের সমান অধিকার মানি, কিন্তু সানকির (খাদ্যের) বেলায় একজনের পোলাও-কোরমা আর একজন দুবেলা সেদ্ধ ভাতটাও পেট পুরে খেতে পারবে না। সানকিতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী সাজার জামাটায় বুঝি আমাদের ছারপোকা কামড়ায়? ভোটের বেলায় যদি সবাই মিলে সমান অধিকার পাই, সানকির বেলাতেও যাতে সবাই সমভাবে খেতে-পরতে পারে। আমাদের এহেন অবহেলা এবং উদাসীনতার দরুন আমরাই নিজেদের হাতে সুন্দর সুন্দর খাল কেটে মানুষকে পশু বানাবার কুফুরী মতবাদ কমিউনিজমকে ডেকে আনছি। তাছাড়া মুরগীর 'বটি হারাম আর সুরুয়া হালাল' ফতোয়ার ধোঁকা দেবার দিন মনে হয় চলে গেছে।

পৃথিবীর মানবজাতিকে ইসলাম তার সত্য ও সৌন্দর্য বুঝে নিতে এবং গ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছে সার্বজনীনভাবে। কিন্তু ইসলামের এই অখণ্ড সত্য ও সৌন্দর্যকে সীমানার মেকী বেড়া দিয়ে গণ্ডীর ভেতর আটকিয়ে রাখতে চেষ্টা চালিয়েছে এবং চালাচ্ছে কিছু সংখ্যক আরবী-জানা পণ্ডিতেরা। অতি সাধারণ কতগুলো আঙ্গিক বিকাশকেই ইসলামের সত্য ও সৌন্দর্যের মাপকাঠি বলে ধরে নেন এবং মানুষের আকৃতির মাঝে আঙ্গিক বিকাশের চিহ্ন ফুটে না উঠলে পথভ্রষ্ট অথবা ইসলামে নেই বলে ফতোয়া দিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। এই আরবী-জানা পণ্ডিতেরা কেবল 'ফেকাহ' শাস্ত্র অর্থাৎ ধর্মীয় বিধি-ব্যবস্থা বিষয়ক বিদ্যার অনুশীলন করে সারাটি জীবন বিনষ্ট করে দেন। 'ফেকাহ্' শাস্ত্রের বিধান মত চললেই পরকালে মুক্তি মিলবে – এটাই তাদের ধারণা। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তা নয়। কতগুলো মাসালা মুখস্থ করে রাখা আর মানবজীবনের সার্থকতা কোথায়, স্রষ্টার নৈকট্য লাভের যে পথদিশারী সেই বিষয়ে জ্ঞান সন্ধান করা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। বিশ্ববিখ্যাত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এই দুটো বিষয় যে মাটেই এক নয় এবং এর গোলক-ধাঁধায় আমরা যাতে না পড়ি সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও দলিল প্রমাণের সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন। 'কেবল সেই ব্যক্তিই ইসলামের আসল বিষয় তথা মূল জ্ঞান কিছুই বুঝতে বা জানতে পারে না যে ব্যক্তি কেবল ফেকাহ শাস্ত্রের মাসালা-মাসায়েল নিয়ে পড়ে থাকে। এরূপ ভুল ধারণায় নিজেরা তো তা গড়াতে থাকে এবং সহজ সরল মানুষগুলো গড়াবার ব্যবস্থা তৈরী করে রাখে, যার ফলে সাধারণ মানুষগুলো এই মাসালা-মাসায়েলকেই ইসলামের মূলনীতি জেনে ইহারই মধ্যে সারাটি জীবন কাটিয়ে দেয় *(কিমিয়ায়ে সাআদাত)।*' ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এই কথাই দুঃখ করে লিখে গেছেন। রসুলাল্লাহ (দঃ) বলেছেন, ***'ইন্নাললাহা লা ইয়ানজুরু ইলা সুয়ারেকুম অলা ইলা আমালেকুম অলা কিন্ ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া নিয়াতিকুম।'*** অর্থাৎ 'বাস্তবিক আল্লাহ তোমাদের চেহারার এবং আমলগুলোর প্রতি দেখেন না, কিন্তু তোমাদের অন্তর এবং উদ্দেশ্যের দিকে দেখেন।'

খলিফা উমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন, 'আমি হারামে পতিত হবার ভয়ে সত্তর প্রকার হালাল জিনিস বর্জন করেছি।' নিজেকে এত সাবধানে রেখেও খলিফা উমর ফারুক (রা) কাফের মেয়েলোকের পাত্রে পানি নিয়ে অজু করেছেন। আর আরবী ভাষা জানা পণ্ডিতেরা 'বঞ্চিত মানবকে বঞ্চনার বিশ্রী অপচেষ্টা ঘুচিয়ে ইসলামী সাম্যের আদর্শে মহিয়ান করে তোল মানুষের সমাজ' এই আদর্শ গ্রহণ এবং প্রচার করার পরিবর্তে মিছেমিছি অজু -গোসলের বেলায় পবিত্রতা লাভে বাড়াবাড়ি করে অনর্থক সময়ের অপচয় করে থাকে। এদেরকে ইসলামের মূল বিষয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝাতে গেলে বুঝ নেওয়া তো দূরের কথা, কেউটের মত ফণা তুলে ছোবল মারতে আসে। এদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা ধোপার ধোওয়া কাপড় পরিধান করাটাকে মনে করে বড় পাপের কাজ করা হল।

অথচ রসুলাল্লাহ (দঃ)-কে কাফেরেরা যে কাপড় উপহারস্বরূপ দিতেন তিনি বিনাদ্বিধায় সেই কাপড় পরিধান করতেন। সাহাবায়ে কেরাম ধর্মযুদ্ধে কাফেরদের থেকে যে কাপড় 'গনিমতের মাল' হিসাবে পেতেন বিনা দ্বিধায় তা পরিধান করতেন। এমনকি ধুয়ে নেবার প্রয়োজনও মনে করতেন না। কাফেরদের যে তলোয়ার পাওয়া যেত সাহাবারা না ধুয়েই তা কোমরে বেঁধে নামাজ পড়তেন। কেউ 'অপবিত্র' মনে করে তা নেননি। যারা কেবল গরীবদের দাবীকে আড়াল রেখে উদরপূর্ণ করে পশুর মত, অন্যের প্রতি দৃষ্টি না রেখে ভক্ষণ করে, যারা রসনা, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গগুলোর ন্যায়-অন্যায়ের বিচার বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন না করে কেবল অজু-গোসলের বেলায় অঙ্গশুদ্ধির মাসালা-মাসায়েল নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, তাদের জন্য সত্যিই দুঃখ হয়। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেছেন, 'এই সমস্ত আলেমদের নিয়ে শয়তান বিদ্রুপ ও উপহাস করে থাকে *(কিমিয়ায়ে সাআদাত)*' তাই তো গরীবদের মুখে প্রশ্ন জেগে আছে, ইসলাম-বাদ্যযন্ত্রে কি মধুর সুর বাজে আর যন্ত্রের রীডে হাত দিয়ে ওস্তাদ সেজে আরবী জানা পণ্ডিতেরা কি গান গাইছেন। সুরের মধুর আহ্বানে গরীবের বুকে সাড়া দিতে চায়, কিন্তু সুরের বিশেষজ্ঞ ওস্তাদ আরবী-জানা পণ্ডিতেরা কণ্ঠ মেলাতে গেলেই বাঁধে যত গণ্ডগোল। গরীবেরা গান গাইতে চাইলে আরবী-জানা পণ্ডিত খেকুনি দিয়ে মুখটাকে বিশ্রী করে বলে দেন, তালের মাত্রা জানিস বেটা।

আবার অনেক আরবী জানা পণ্ডিত আছেন যারা নামাজে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতেহা অথবা কোরানের অপর কোন অংশ পড়বার সময় অক্ষরগুলোর শুদ্ধ উচ্চারণ নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে। নামাজের মধ্যে মনটাকে সবসময় সেদিকেই রাখে যেন অক্ষরগুলো সুন্দর ও সঠিকভাবে উহাদের উৎপত্তিস্থল হতে উচ্চারণ করা যায়, কিন্তু নামাজের আসল বিষয়ের দিকে মনোযোগ দেবার অবসর পান না। যে বাক্য উচ্চারণ করে তার ভাবের মধ্যে না ডুবে মাখরাজ অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল হতে সঠিকভাবে উচ্চারিত হল কিনা তাই নিয়ে শুরু করে দেন টানা-হেঁচড়া। তিনি কেমন করে তার অর্থের মাঝে ডুব দেবেন? যিনি নামাজে এভাবে অক্ষরের ভেদ বিচার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তার নমুনা দেখে কি আল্লাহ তাকে পাগল বলে মনে করবেন না?

আবার এমন অনেক আলেম আছেন যারা একদিনে এক খতম কোরান পাঠ করেন। তার জন্য তাদেরকে কোরান শরীফ খুব তাড়াতাড়ি পড়তে হয়। জিহ্বা রেলগাড়ীর মত দ্রুতগতিতে চলবে, কিন্তু কি যে পড়ছেন তার দিকে কোন খেয়ালই নেই। উদ্দেশ্য হল, মানুষের কাছে বলে বেড়ানো যে আমি অনেকবার কোরান খতম করেছি। এরা ভেবে নেন না যে, কোরানের প্রতিটি আয়াত এক একটি আলাদা লিপিকা। উহার একটিতে আদেশ, অপরটিতে নিষেধ, কোনটিতে নেয়ামত ও পুরষ্কার পাবার প্রতিশ্রুতি, কোনটিতে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন, কোনটিতে দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

পৃথিবীর বিশাল সবুজ বুকটাতে গরীবেরা খুঁজে পেতে চায়, সেইযন্ত্রের সুরে সুর মিলিয়ে কে গান গায়? বেসুরা, বেতাল গানের বিশ্রী শব্দে গরীবেরা আহত পাখীর মত ছটফট করতে থাকে আর খুঁজে পেতে চায়, কোথায় সুর আর কণ্ঠের মিলনে মধুর সেই গেয়ে উঠা হুজুর পাকের (দঃ) গান– 'মানুষ মানুষের ভাই।'

হুজুর পাক (দঃ) বলেছেন, 'মানবের তরে এমন একটি সময় আসবে তখন প্রকৃত ইসলাম থাকবে না। কেবল থাকবে উহার খোলস বা রুসম। কোরান থাকবে না, কেবল থাকবে এর নাম। স্থানে স্থানে মসজিদ ঘর পাকা হবে, কিন্তু এর মধ্যে হেদায়েতের গন্ধও থাকবে না। এবং ঐ জামানার আরবী ভাষার পণ্ডিতগণ চরিত্রহীন হবে। তারা ঝগড়া করবে, বিবাদ ও মতানৈক্যভাব প্রকাশ করে

জনসাধারণকে সত্যপথ হতে বহু দূরে ফেলে দেবে। আকাশের নিচে তাদের মত চরিত্রহীন আর কেউ হবে না।' *(মেশকাত শরীফ)।*

জনৈক ইসলাম গবেষক বলেন, ***'নিমে তবীব খাতরে জান, নিমে মোল্লা খাতরায় ঈমান'*** অর্থাৎ হাতুড়ে ডাক্তার প্রাণনাশক, কাঠ মোল্লা ঈমান নষ্টকারী।'

খলিফা উমর ফারুক (রাঃ) ইসলামী সাম্যবাদের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত সত্যরূপে সেই যুগে, সেই পরিবেশে, সেই অসভ্যতার জের সবেমাত্র কেটে-উঠা সমাজের বুকে গোলাম আর মনিব উভয়কে একই মানের এবং একই পরিমাণ বেতন দেবার ব্যবস্থা করে অপূর্ব দৃষ্টান্ত অনাগত কালের পৃথিবীর নাগরিকদের জন্য রেখে গেলেন। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নাগরিকেরা যেন ইসলামের এই সুন্দরতম আদর্শ মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারে তারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সেই যুগে কতখানি কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই বুঝা যায়। সেই যুগে গোলাম ছিল আরবদের কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং ঘৃণিত শ্রেণী। হুজুর পাকের (দঃ) গোলাম হযরত যায়েদের (রাঃ) পুত্র হযরত উসামার (রাঃ) বেতন অন্যান্য মনিবদের সমপরিমাণ হওয়াতে খলিফা উমর ফারুকের (রাঃ) পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) পর্যন্ত প্রতিবাদ করেছিলেন। সেই যুগের কথা বাদ দিয়ে আমাদের সভ্য যুগে কেউ যদি প্রস্তাব করে যে, দারোয়ান পিওন এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী একই পরিমাণ বেতন পাবে তবে আমাদের জনদরদী নেতাগণ হাউমাউ করে চিৎকার মেরে প্রতিবাদ করবে এবং আজকের যুগে প্রতিবাদ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইসলামের চরম আদর্শ প্রতিষ্ঠার কল্পনা ছিল উহাই, সামান্য দুনিয়ার মূল্যহীন বস্তুপ্রাপ্তির অসাম্য তৈরি না করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। একই খাদ্য, একই পোশাক পরিধান করাতে সম্মানের উঁচু-নিচুর পার্থক্য হয় না। পার্থক্য হয় এবং হবে ঈমানের গভীরতা এবং তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে। ছোট-বড় এই অসাম্যর প্রবাহকে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) অসভ্য যুগের ঘৃণ্য আচরণ বলে বার বার ঘোষণা করেছেন এবং আরব জনসাধারণ যাতে এই হিংসাত্মক অহংকার হতে রেহাই পায় তার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন এবং এই পরিশ্রম যে সেই যুগে বেশ কিছুটা কিছুদিনের জন্য সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তাঁর নজির তার নির্বাচিত প্রধান সেনাপতিদের চরিত্রে ফুটে উঠেছে অপূর্বরূপে। ইরাক বিজয়ের সময় প্রধান সেনাপতি আবু ইবায়দা যখন সাকাতিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন তখন সেই সাকাতিয়ার দুইজন বিখ্যাত সরদার ফারুক এবং ফেরাওয়ান্দ মুসলমানের বশ্যতা মেনে নিলেন। একদিন এই দুই সরদার দামী খাদ্য তৈরি করে আবু উবায়দাকে খেতে বললে আবু উবায়দা প্রশ্ন করলেন, 'সমস্ত সৈনিকদের জন্য কি এই খাদ্য আনা হয়েছে, না শুধু আমার জন্য?' সরদার ফারুক উত্তর দিলেন, 'এই সামান্য সময়ের মধ্যে সকল সৈনিকদের জন্য ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।' আবু উবায়দা সরদারের সেই তৈরি করা খাদ্য ফিরিয়ে নিতে বললেন এবং উপদেশ দিলেন যে, 'মুসলমানদের মধ্যে একের উপর অন্য ব্যক্তির কোনই প্রাধান্য নেই।'

ফাহাল বিজয়ের সময় রুমীয় সেনাপতি স্কলার-এর নিকট যখন দূতরূপে হযরত মা' আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে পাঠান হয় তখন একটি রুমীয় সৈন্য এসে বিলাসবহুল কক্ষে যাবার জন্য অনুরোধ করে এবং বলে আপনার ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখছি, আপনি ভেতরে যান। হযরত মা' আয (রাঃ) বললেন, 'গরীবের রক্ত শোষণ করে যে গালিচা বানানো হয়েছে মুসলমান তাতে বসে না। সুতরাং আমি তাতে বসতে পারি না।' তিনি মাটিতেই বসে পড়লেন। বললেন, 'আপনাকে উপযুক্ত সম্মান দিতে চাইলাম, কিন্তু নিজের সম্মান নিজে নষ্ট করলেন।' হযরত মা' আয (রাঃ) বললেন, 'তোমরা যেটাকে সম্মান মনে করছ আমার তাতে কোনই প্রয়োজন নেই। মাটিতে বসাই যদি গোলামের রীতি হয় তবে আমার চেয়ে আল্লাহর বড় গোলাম কে আছে?' জনৈক সৈনিক প্রশ্ন করে, 'বলুন তো

মুসলমান বাহিনীতে আপনার মত উচ্চ আদর্শের মানুষ আরো আছে কি?' হযরত মা' আয (রাঃ) বললেন, 'আমার তো মনে হয়, মুসলমান বাহিনীতে আমার চেয়ে আর নিকৃষ্টতম ব্যক্তি কেউ নেই।'

গরীবের শোষকদের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে শান্তিপূর্ণভাবে সাম্য-মৈত্রীর প্রীতি প্রতিষ্ঠা করার আশা এবং প্রচার ঠিক সেই রকমই আত্মবিরোধী আশা এবং প্রচার, যে রকম একটি অবধারিত মৃত্যুপথযাত্রী বসন্ত রোগীর সঙ্গে সুস্থ-সবল মানুষটাকে একই বিছানায় রাত কাটানোর আশা এবং প্রচার করা। অথবা শিয়াল আর মুরগীকে এক ঘরে শান্তিতে বসবাস করতে দেওয়া। কারণ শিয়াল আর মুরগী খাবে না বলে কথা দিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাস এবং ইসলাম এই মারাত্মক ভুলের স্রোতে যাতে শোষিতরা ঘুরপাক না খায় তার জন্য বহুবার আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছে, মনে রেখ বাতেল তথা অসত্য এবং হক তথা সত্য একই বিছানায় থাকতে পারে না। হয় সত্য না হয় মিথ্যা থাকবে। অসত্যের সঙ্গে সত্যের কোন আপোষ হয় না। যারা আপোষের কথা বলে শোষিতদের আশা দেয় তারা মোনাফেক। তারা ভণ্ড এবং এই ভণ্ডামীর ভেতর পুরো অসত্যই লিক লিক করছে। তাই সত্য নামক অস্ত্র দ্বারা যখন মিথ্যাকে আঘাত করা হয় তখন মিথ্যার মাথার খুলি চুরমার হয়ে যায় এবং সত্য তার আপন সুন্দরতম রূপটিকে নিয়ে উদ্ভাসিত হয়। সত্যের অস্ত্র ব্যবহার না করা পর্যন্ত মিথ্যা কখনোই তার আসন হতে সরতে চায় না। যারা সত্যের অস্ত্র ব্যবহার না করে মিথ্যাকে সরাতে চায় তারা পৃথিবীর ইতিহাস এবং পবিত্র কোরান পড়লেও গবেষণার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পড়েন না। সত্যের অস্ত্র ব্যবহার না করে আল্লাহর সাহায্য পাবার আশা অসম্ভব। কারণ, আল্লাহ সে বিষয়ে আমাদেরকে আগেই সাবধান করে রেখেছেন — তোমাদের ভাগ্যকে যদি তোমরা পরিবর্তন করার চেষ্টায় রত না থাক তবে আল্লাহও তোমাদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করবেন না। তাই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি যে, সত্যের তরবারি শোষিতরা কাঁধে নিয়ে এক মহান ঐক্যের মাধ্যমে মিথ্যার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করতে হবে। আঘাত হানতে হবে মিথ্যার বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কররূপে। ***'ইন্না আবওয়াবাল জান্নাতে তাহতা জেলালিস সয়ুফে'*** 'নিশ্চয়ই তরবারীর ছায়ার নিচেই বেহেস্তের দরজা' হুজুর পাকের (দঃ) এই মহাবাণীই শোষিতদের একমাত্র আদর্শ। মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হলে শোষিতদের গলায় 'গাজী' নামক মালা শোভা পাবে। মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মৃত্যু হলে শোষিতদের গলায় 'শহীদ' নামক মালা শোভা পাবে। মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সত্য হাতিয়ার তুলে নিয়ে সুনিশ্চিত বিজয় বলে আল্লাহ পাক কালামে বহুবার ঘোষণা করেছেন। পৃথিবীতে সত্যের হাতিয়ার তুলে নিয়েছ যারা, তারা এক হও এবং আঘাত হান মিথ্যার বিরুদ্ধে। মনে রেখ অসত্যের মৃত্যু অবধারিত, তবে সত্য বলতে কি বুঝায় এবং সত্যের আসল পরিচয় কি তা জানতে হবে, নইলে সত্য-মিথ্যার গোলক-ধাঁধাঁয় পড়ার থাকবে সম্ভাবনা। সত্য এবং মিথ্যার প্রভেদ করতে হলে সত্যকে ভাল করে প্রথমেই জেনে নিতে হবে।

এই কথায় যেন কুফুরী মতবাদে বিশ্বাসী কমিউনিস্টরা মনে না করে যে তাদের মতবাদে সাম্য আছে। পৃথিবীতে সাম্যবাদের প্রবক্তা একমাত্র মহানবী হুজুর পাক (দঃ)। মানুষকে পশু বানাবার বিদ্যা কমিউনিজমে কি রকম সাম্য বিরাজ করে তা নিজের চোখে দেখে আসলে হাজার বার তওবা পড়তে হবে, নতুবা বমি আসার উপক্রম হবে। পৃথিবীর কোন ধর্মকেই এরা মানে না বরং এরা পশুর মত খাওয়া-দাওয়া করে পশুর ডাক দেয় — ধর্মগুলো হল আফিম। তার মানে হল উনারাই পৃথিবীতে একমাত্র মহাপণ্ডিতের দল। যদি কোনদিন ইসলামের দেওয়া সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং মহানবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত সত্যরূপে বিরাজ করে সেদিন এদের "ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাচি'র মত

অবস্থা হবে। সত্যি কথা বলতে কি – এক বেলা না খেয়ে থাকতে সবাই আমরা হাসিমুখে রাজি আছি, কিন্তু মরে গেলেও পশু বানাবার বিদ্যাকে করি হৃদয় দিয়ে ঘৃণা। কারণ, পেট ভরে খাও আর কাজ কর এবং আর কিছু নেই-এর দর্শনের সঙ্গে পশুদের জীবনের সঙ্গে সুন্দর মানায় কিন্তু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের জন্য নয়। এই প্রশ্নে যদি সামন্তবাদ, পুঁজিবাদের সঙ্গে থাকতে হয়, থাকবো, কারণ কম খেলেও পশুর মত বাঁচতে চাই না। শ্রদ্ধেয় মাওলানা মত্তদুদী সাহেবের দেওয়া ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শনকে মানতেও রাজি আছি, তবু 'কোন ধর্মই মানি না'র মতবাদ জীবন চলে গেলেও বরণ করে নেব না, যদিও মাওলানা মওদুদী সাহেবের মতবাদের সঙ্গে আমরা একমত নই।

(ঙ) সূরা বালাদ

১। লা উকসিমু বিহাজাল বালাদ
২। ওয়া আনতা হিলমুল বিহাজাল বালাদ
৩। ওয়া ওয়ালিদিউ ওয়ামা ওয়ালাদ
৪। লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি কাবাদ
৫। আইয়াহ সাবু আল লাই ইয়াকদিরা আলাইহি আহাদ
৬। ইয়াকুলু আহলাকতু মাল্‌লুবাদা
৭। আইয়াহসাব আললাম ইয়ারাহু আহাদ
৮। আলাম নাজ আললাহু আইনাইন
৯। ওয়ালিসানাউ ওয়াশাফাতাইন
১০। ওয়া হাদাইনাহুন নাজদাইন
১১। ফালাকতাহামাল আকাবা
১২। ওয়ামা আদরাকা মাল আকাবাহ
১৩। ফাককুরাকাবাহ
১৪। আও ইতআমুন ফি ইয়াওমিন জিমাসগাবাহ
১৫। আও ইয়াতিমান জামাকরাবাহ
১৬। আও মিসকিনান জা মাতরাবাহ
১৭। সুমমা কানা মিনাল্লাজিনা আমানু ওয়াতাওয়াসাউ বেসোয়াবরি
ওয়াতাওয়াসাউ বিল মারহামা
১৮। উলাইকা আসহাবুল মাইমানাহ
১৯। ওয়াল্লাজিনা কাফারু বেআ ইয়া তিনা হুম আসহাবুল মাশআমাহ
২০। আলাইহিম নারুম মুসাদাহ।

অনুবাদ

১। আমি এই শহরের শপথ করছি।
২। এবং আপনি এই শহরের স্বাধীন নাগরিক।
৩। এবং পিতা-মাতা ও সন্তানের কসম।
৪। নিশ্চয়ই মানুষকে আমরা তৈরি করেছি কষ্টের মধ্যে।
৫। সে কি মনে করে তার উপর (অখণ্ড) আহাদ শক্তি বিরাজিত নয়?
৬। সে বলে আমি অনেক মাল (বৃথা) নষ্ট করেছি।
৭। সে কি এই মনে করে যে (অখণ্ড) আহাদ (দৃষ্টি) তাকে দেখছে না?
৮। আমরা দেইনি কি তাকে দুটো চোখ?
৯। এবং একটি জিহ্বা ও দুটো ঠোঁট?
১০। এবং আমরা তাকে দেখাইনি কি দুটো পথ?
১১। কিন্তু সে চলে না দুর্গম (গিরি) পথে।
১২। কি দিয়ে বুঝিয়ে দেব দুর্গম পথটি কি?
১৩। (উহা) ঘাড় অর্থাৎ কণ্ঠ মুক্ত করা।
১৪। অথবা অভাবের সময়ে খাদ্য দেওয়া।
১৫। নৈকট্যের দাবীদার এতিমকে।
১৬। অথবা ধুলিমলিন মিসকিনকে (নিঃস্বকে, সর্বহারাকে)।
১৭। তবে সে হয় বিশ্বাসীর মধ্যে গণ্য এবং ধর্ম বিষয়ে উপদেশদাতার মধ্যে গণ্য এবং রহমত সম্বন্ধে উপদেশ দাতার মধ্যে গণ্য।
১৮। এরাই হল ডান হাতের অধিবাসী।
১৯। এবং যারা মিথ্যা জানে আমাদের (এই) পরিচয়ের উপর তারাই হল বাম হাতের অধিবাসী।
২০। তাদের উপরই ভুরি ভুরি আগুন যা দিয়ে তারা বেষ্টিত।

ব্যাখ্যা

নগর ও উহার স্বাধীন নাগরিকতার শপথ করার উদ্দেশ্য হল, নাগরিকতার শপথের দ্বারা বুঝায় সামাজিক সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের দায়িত্ব পালন করা। তারপর পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির শপথের উদ্দেশ্য হল পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা। এই উভয় প্রকার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে হলে সমাজব্যবস্থা ও সংসার জীবন ব্যবস্থার মধ্যে এমন একটি সার্বজনীন কল্যাণমূলক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার-ব্যবস্থা করতে হবে যেন সমাজ ও পারিবারিক সর্বপ্রকার কলুষ, অন্যায় ও অসাম্য সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়। সামাজিক ও পারিবারিক পবিত্রতার মধ্যে জীবন যাপনের সুবন্দোবস্ত করতে না পারলে মানুষের অধ্যাত্ম-জীবনের বিপুল সম্ভাবনা ব্যাহত হয়। রবের সঙ্গে সম্বন্ধ, পারত্রিক জীবন এবং অধ্যাত্মবাদ, মানুষের জীবনের চরম সার্থকতা এবং মানুষের লাভ-

লোকসানের সব কিছুই যদিও সেখানেই হয়ে থাকে, তথাপি উহা জনগণকে দান করার সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়ে উঠে না, যদি প্রথমতঃ আমরা সমাজ-জীবন ও পারিবারিক জীবনকে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়ের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি।

'স্বাধীন নাগরিক' কথাটি উল্লেখ করার কারণ হল পরাধীন নাগরিক সমাজ ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার রাখে না। তাই স্বাধীন নাগরিকের উপরে আল্লাহ এই কর্তব্য আরোপ করেছেন যে, যেন সে সমাজ হতে পরাধীনতা, অন্যায়, অসাম্য ইত্যাদি সর্বপ্রকার অত্যাচার দূর করে।

উল্লিখিত সামাজিক জেহাদ করতে গেলে মানুষকে বহু দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে হয়। ইহাই স্বাভাবিক। তাই বলা হচ্ছে, আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি দুঃখের মধ্যে অর্থাৎ মানুষকে স্থাপন করা হয়েছে জীবনযুদ্ধের মধ্যে। এই জীবনযুদ্ধের প্রথম অংশ পার্থিব ও পরবর্তী অংশ পারত্রিক বা আধ্যাত্মিক। স্রষ্টা অখণ্ড আহাদ তথা স্বয়ম্ভুরূপে প্রত্যেক মানুষের উপর বিরাজিত। মানুষের শক্তি অখণ্ড শক্তির পরিচালনাধীনে খণ্ড মানবশক্তি চালিত হচ্ছে। সুতরাং তার জয়-পরাজয়ে ঘাবড়াবার বা চিন্তিত হবার কিছুই নেই। কারণ, তিনিই স্বয়ং তার কল্যাণকর উদ্দেশ্য মানবের দ্বারা পূর্ণ করিয়ে চলেছেন। আহাদের উপর নির্ভরতা রাখলে আপাতঃ জয় বা পরাজয় উভয়ই কল্যাণকর। কারণ, কল্যাণময়তার উদ্দেশে মানবের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার পথে জেহাদ ছাড়া ঈমান ও মুক্তিলাভের কোন আশাই ইসলামে নেই। ইহাই এই সূরার বজ্রকঠিন ঘোষণা। যারা বামপন্থী অর্থাৎ আপাত সহজ ও প্রলোভনপূর্ণ মোহময় জীবনে অন্যকে বঞ্চনা দিয়ে, শোষকরূপে আকৃষ্ট থাকবে তারাই ধর্মদ্রোহী, তারাই অবিশ্বাসী এবং তারাই সমাজ ও আল্লাহর শত্রু। ইহারাই জাহান্নামে আছে এবং অনন্ত পরকালেও জাহান্নামেই থাকবে।

মন্তব্য

ধর্ম বলতে যদি সামন্ত ঠাঁট বজায় রাখা হয়, ধর্ম বলতে যদি নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অত্যাচার-অবিচার চলতে থাকা বুঝায়, ধর্ম বলতে যদি ধনীদের হাতে পুঁজি ও জমির কেন্দ্রীভবন হওয়াকেই বুঝায় আর তার সঙ্গে গরীবদেরকে "দারিদ্র চিরদিন থাকবেই' বলে বুঝানো হয় এবং মৃত্যুর পর চিরশান্তিতে থাকবে বলে গ্যারান্টি দেওয়া হয় তবে ধর্ম শব্দটায় যে একটা নির্লজ্জ প্রকাশ্য ভন্ডামী করা হচ্ছে তাহা সকলেই কম-বেশি সময়ে একদিন না একদিন বুঝতে পারবে এবং মানব সমাজ হতে ধর্মটি নাকি-কান্নায় চির-বিদায় নেবে।

ধর্মের চরিত্র যদি চোরকে চুরি এবং মহাজনকে সাবধান থাকার মত হয় অর্থাৎ ধনীর শোষণও চলবে এবং গরীবেরাও চিরদিন ধনীদের শোষণের মোক্ষম যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হবে এবং দাসপ্রথাও থাকবে এবং দাসকে মুক্তিও দিতে হবে কিন্তু চিরতরে পৃথিবী হতে দাসপ্রথাকে মুছে ফেলতে পারবে না। কারণ, তা হলে উহা আর ধর্ম থাকে না। অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, লুণ্ঠন ইত্যাদির চির অবসান চাইতে গেলেই গরীবদের নাস্তিক্যবাদের অপবাদ দেয় শোষকশ্রেণী। গরীবের দল ধর্মের পোশাকে শোষকদের ভন্ডামীতে অতিষ্ট হয়ে এমন খাসা জবাবখানাই দিয়ে বসে যা শুনলে শোষকদের পিলা চমকিয়ে দেয়। গরীবেরা বলতে চায়- শোষকদের খোদা হল গরীবের সবচাইতে বড় শত্রু। মহান আল্লাহ পাকের নামের দোহাই দিয়ে শোষণ করার উপায়গুলোর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে সূরা বালাদ। শোষকেরা ধর্মের মুখোশ লাগিয়ে ভণ্ডামী করছে। সমাজ জীবনে ভেদাভেদের পাপ আর

হিংসার কাদা ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাই এই শোষকেরা ধর্মের যত লেবাস ধারণই করুক না কেন আসলে এরাই যে ধর্ম মানে না তথা প্রকৃত নাস্তিক সে কথা পরিষ্কার বুঝা যায়।

সমাজ কল্যাণের হাত দিয়ে তার মনোমতো ফল না পেলে মানুষ সাধারণত হতাশ হয়ে বলে, 'আমি অনেক মাল বৃথা নষ্ট করেছি,' কিন্তু সত্যিকারভাবে বিচার করতে গেলে বলা যায় মানুষের কোন চেষ্টাই বৃথা যায় না। যদি মানুষ একথা মনে রাখে যে অখণ্ড আহাদ-দৃষ্টি সর্বদাই তার উপর বিরাজ করছে, তার উদ্দেশ্য কল্যাণকর হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই উহা বৃথা যায় নাই। কারণ, যিনি দেখার তিনি সবই দেখছেন। আপাতঃ পরাজয় ও ক্ষতি মোটেই পরাজয় অথবা ক্ষতি নয়। আল্লাহর দয়ার দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই উহা কল্যাণপ্রসূ। অপরপক্ষে যদি কোনরূপ নিজস্ব উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ব্যয় করে থাকে তা-ও অখণ্ড, একক এবং আদি দৃষ্টির অগোচর রয়নি।

তারপর বলা হচ্ছে যে, মানুষকে ন্যায়-অন্যায় দুটি প্রধান পথের হেদায়েত বা নির্দেশ দান করা হয়েছে। অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে মানুষের বিচারশক্তি দান করা হয়েছে এবং ন্যায়ের পথ রাখা হয়েছে এবং ন্যায়ের পথকে রাখা হয়েছে দুর্গম করে। কারণ, সমাজ সাধারণত অন্যায় ও অবিচারের পক্ষপাতী। তাই কোরান বলছে, মানুষের নফসের মধ্যে দেওয়া হয়েছে বহু প্রকার চিত্তবৃত্তি তথা ফ্যাকালটিস অ্যাণ্ড সেনসেস, যা দিয়ে সে ন্যায় ও অন্যায় পথের বিচার করতে পারে। তারই দু' একটি মাত্র নমুনা স্বরূপ দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা চোখ, জিহ্বা ও ঠোঁট। কিন্তু মানুষ নফসের মধ্যে দেওয়া এই দানগুলোকে দুর্গম পথের পথচারী করতে রাজি থাকে না। কারণ, সত্যের পথ সর্বদাই কঠোর সংগ্রামের পথ।

তারপর কোরান সত্যপথ তথা দুর্গম পথের সংজ্ঞা বা পরিচয় দিচ্ছে। সত্য পথ হল পরাধীনতার বোঝা মানুষের কাঁধ হতে নামিয়ে দেওয়ার জেহাদ করা। অর্থাৎ মানুষকে শাসন ও শোষণের সর্বপ্রকার অধীনতা হতে মুক্তি দানের সংগ্রাম করা এবং গরীবদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা।

এই সমস্ত সামাজিক কর্তব্য পালন করলে পর মানুষ বিশ্বাসী তথা ঈমানদার হবার পর্যায়ে আসতে পারে এবং তখনই কেবল সে ধৈর্য ও দয়া সম্বন্ধে উপদেশ দাতারূপে গণ্য হতে পারে। নতুবা বিনা জেহাদে শুধু মুখে মুখে উপদেশ দেওয়ার কোন মূল্যই স্বীকার করা হয়নি। উল্লেখিত সামাজিক কর্তব্যগুলো পালন না করলে ধর্মরাজ্যে ঈমানদাররূপে প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই সমস্ত ধর্মে প্রবেশের শর্তাবলী যারা স্বীকার না করবে অর্থাৎ ত্যাগ ও তিতিক্ষা-সাপেক্ষ এই সমস্ত শর্তাবলী যারা জীবনে পালন করার সংগ্রাম গ্রহণ না করবে তারাই বামপন্থী, আল্লাহর বিরুদ্ধপন্থী, জাহান্নামী। আল্লাহর পথ কণ্টকাকীর্ণ এবং দুর্গম। এই কথাই অতি স্পষ্ট করে ঘোষণা করছে সূরা বালাদ। এদের উপর যে ভূরি ভূরি আগুনের শিখা তথা জাহান্নাম সে কথাও বলছে সূরা বালাদ। ধর্মের নামে মাথায় টুপি লাগিয়ে বস্তাপচা পুরনো কোরান পাকের তফসীরে ব্যাকরণের ডিগবাজি আর বাক্যের অনুবাদের ভেল্কিবাজিতে, শব্দের উল্টা-পাল্টা অর্থ বানিয়ে মন-গড়া মতবাদ দাঁড় করিয়ে, মিলাদ আর মসজিদ ঘরে ঢুকার পথে মিসকিনদের হাত-পাতা, কচি শিশুদের না খাওয়া কান্নার ফরিয়াদকে উপেক্ষা করে, মিসকিনদের হাড়-উঠা না খাওয়া ভুখা বুকের উপর দিয়ে শাহী নাগড়া আর শেরওয়ানী লাগিয়ে মসজিদ ঘরে নামাজ পড়তে যাওয়া কি ধর্ম পালন? এতিম, মিসকিন তথা এক কথায় গরীবদের বিবেক কেঁদে উঠে ফরিয়াদ করে নিজেদের মাঝে বীজরূপী লুকায়িত চিরমহান রবের কাছে তথা প্রতিপালকের কাছে তথা আল্লাহর কাছে। চিরমহান আল্লাহ গরীবদের বিবেককে বলে যান, ওরে বোকার দল, এখনো বুঝিস না যে এরাই শোষক, এরাই ধূর্তশিরোমণি, এরাই তোমাদের ভানুমতির

ভেল্কিবাজি দেখাচ্ছে। এরা শুধু রিয়া তথা লোক দেখানো ইবাদতই করে না, এরা আমার অস্তিত্বের উপর তোদের চিরবিশ্বাসের প্রাচীরকে ভাঙ্গার জন্য ছল-চাতুরীর ডিগবাজি খাওয়া ব্যাকরণের ডিনামাইট ব্যবহার করছে এবং তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে একদম সহজ সরল ভাষায় বলা হয়েছে সূরা বালাদে আর সূরা মাউনে। শোষকদের পয়সা খাওয়া দালাল শ্রেণীর বস্তাপচা বড় বড় কোরান পাকের তফসীর পড়ে তোদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। তালগোল পাকিয়ে বস্তাপচা বড় বড় তফসীরের পচা ডোবায় হাবুডুবু খেতে হয় তোদের। রাজদণ্ডের ধারালো তরবারির নিচে বসে কোরানের অনেক বস্তাপচা তফসীর আরবী, ফার্সি এবং উর্দু ভাষায় রচিত হয়েছে বিরাট বিরাট আয়তনে। এগুলোতে পাণ্ডিত্যের নামে সার্বজনীনতার বিরুদ্ধে গণ্ডির বমি উদগীরণ করা হয়েছে যা পড়লে তোদের মন-প্রাণ বিষিয়ে উঠবে। কিন্তু আসল কোরানের অনুবাদ কি তোরা নতুন করে করতে পারিস না? কোরান পাকের তফসীর যে সব দালালেরা করে গেছে তারা আল্লাহর জ্ঞানের লেজ-কাটা বান্দা। এদের চরিত্র হল ধরি মাছ না ছুঁই পানির মত। কত বড় দালাল আর ভণ্ড হলে ব্যাকরণের ডিগবাজি মেরে কোরান পাকের তফসীরে আমার চিরমহান রূপটাকে তোদের কাছে শোষকের বিশ্রীরূপে শোষণের চুনকালি মেখে জোকার বানাতে চায় এবং এই জোকাররূপ দেখে অনেকেই কোরান পড়া এবং গবেষণা বাদ দিতে বাধ্য হয়েছে। ওরা বলে, গরীরদের প্রতিবাদ আর সংগ্রামের মধ্যে কোন নৈতিক মুল্যবোধ নেই। আর নৈতিক মূল্যবোধ নেই বলেই গরীবের প্রতিবাদ আর সংগ্রাম বলে ওদের মতে অন্যায় প্রতিবাদ আর সংগ্রাম। তথা দুর্নীতি পরায়ণ। শোষকেরা এতিম, মিসকিনদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে ইচ্ছুক, কোরানের এই ভাবধারা তারা একেবারেই অস্বীকার করতে চায় না। কারণ, তাতে তাদের আসল চেহারাখানা অতি সহজেই ধরা পড়ে যাবে। তাই তাদের আসল কথা হল, সমাজের বুকে একশ্রেণীর মানুষ অপরের দয়ার উপর চিরদিন নির্ভর করে থাকবে এবং অপরশ্রেণী তাদেরকে দান-খয়রাত করে দাতা নামে সমাজে পরিচিত হবে। তারা বলে, যে ব্যক্তি এতিমকে মুখের মিষ্টি কথা দিয়ে এবং মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করবে তারা অনেক সোয়াব পাবে এবং কিছু খাদ্য দান করলে সে হবে খুব বড় দাতা। আর যে ব্যক্তি এতিমের মাথায় হাত বুলাবে না, মিষ্টি কথা বলবে না, কিছু খাদ্য দেবে না তারা দাতা নয়। মরে যাবার পর তাদেরকে আল্লাহ শাস্তি দেবেন (অবশ্য কান্নাকাটি করলে হয়তো মান মান ... ...।) তাদেরকে যদি বলা হয়, এতিম-মিসকিনকে চিরদিন এতিম-মিসকিন না রেখে পৃথিবীর বুকে কোরান-হাদীস মোতাবেক এমন একটি সমাজব্যবস্থা কায়েম করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক যার মাধ্যমে পূর্ণ ইসলামী সাম্য বিরাজ করবে, তা হলে তারা খেঁকি কুকুরের মত খেঁকিয়ে জবাব দেবে – ইহা আল্লাহর কোরান-হাদীস বিরোধী সমাজব্যবস্থা কায়েম করা হবে এবং যেহেতু ইহা কোরান-হাদীস বিরোধী সেই হেতু ইহা নৈতিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে এবং যাহা নৈতিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে উহাই অন্যায় এবং সেই হেতু ইহা দুর্নীতি পরায়ণ। প্রশ্ন আসে – উহা কাদের নৈতিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে? নৈতিক মূল্যবোধ বলতে কি এতিম-মিসকিন তথা গরীবের সঙ্গে মেলা-মেশার এবং সম্পর্ক স্থাপনের বিরুদ্ধাচরণকেই নৈতিক মূল্যবোধ খর্ব হবার ভয় করেন? তাদের যুক্তি – সমাজ-প্রেম এবং আল্লাহর পথে চলার যে প্রেম ব্যাখ্যা দেয় উহা কি সত্যিই তাই, না মিথ্যা, সমাজ ধ্বংস এবং আল্লাহর বলা পথে চলার উল্টা দিকেই এগিয়ে নিতে চায়?

আমরা বলতে চাই – আল্লাহর কোরান কি আপনাদের কথাই বলছে, না অন্য কোন কথা বলছে, যেখানে অর্থনৈতিক দাসত্ব হতে মুক্তি, সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের কথাই বলা হয়েছে?

তারা ধর্মের নামে যে অধর্ম করে বেড়ায় তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলেই আমাদেরকে ইসলামের শত্রু বলে নিন্দা করে। হ্যাঁ — আমরা আপনাদের বানানো এজিদের ইসলামের শত্রু ঠিকই। কিন্তু কোরান-হাদীসের শত্রু আপনাদেরকে বলতে চাই। আমরা নই। আমরা ততটুকু আপনাদের বিরোধিতা করি যতটুকু আপনারা এতিম, মিসকিনকে ধোঁকা দিয়ে ঠকাবার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করছেন। আপনারা যে ইসলামের নাম বিক্রি করে আপনাদের স্বার্থটা বজায় রাখতে চান, উহা প্রায় শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হয়। অনেক মুসলমান ভাইয়েরা আপনাদের আসল রূপখানার পরিচয় এবং ইসলাম কি চায় উহা মানবসমাজের কাছে তুলে ধরতে চেষ্টা করছে।

ইসলাম দাসপ্রথা, সামন্তবাদ ও শোষকদের সমস্ত ভাবধারার ঘোর বিরোধী এবং এগুলোকে শেরেক করার ইলা বা কর্তারূপে ব্যবহৃত হয় বলে ইহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন চেয়েছে জেহাদের মাধ্যমে এবং ইসলাম ইহাও ঘোষণা করছে যে, দাসপ্রথা, সামন্তবাদ ও শোষণবাদের সঙ্গে চির দিনের আপোষ মীমাংসার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ, তারা ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত আছে। আর এদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করাকে ইসলাম একটানা রোজা রাখা ও নামাজ পড়ার চেয়ে বেশি পুণ্যের কাজ বলে অভিহিত করেছে। কারণ, ইসলাম শোষকদের জানাযা পড়া, তাদের রোগশয্যায় সেবা করা হারাম তথা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে। যদিও মানবতার দোহাই দেওয়া হয়, কিন্তু ইসলাম কঠোরভাবে এই মানবতাটুকুও প্রদর্শন করতে বারণ করে দিয়েছে। *(কিমিয়ায়ে সাআদাত, তৃতীয় খণ্ড)।* ইসলাম দাসপ্রথা, সামন্তবাদ এবং শোষণবাদের যে নোংরামি উহার চির অবসান চেয়েই ইসলাম তার কাজ শেষ হয়ে গেল বলেনি। ইসলাম যে সত্যই সত্যধর্ম উহাই বিশ্বমানব সমাজকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে। ইসলাম বলছে — আল্লাহতে অন্ধবিশ্বাসের কি মূল্য, যদি তুমি আল্লাহকে দেখেই না নিলে? সবই যদি দেখে নিয়ে যুক্তিসংগত বিশ্বাস কর, তবে আল্লাহকে না দেখে যুক্তিসংগত বিশ্বাস থাকে কি? মোটেই না। তাই চির-অন্ধ বিশ্বাস ফেলে দিয়ে যুক্তিসংগত বিশ্বাস কর তথা আল্লাহকে দেখে নাও এবং এই দেখে নেবার যে প্রয়োগ-পদ্ধতির ধারাসমূহ অর্থাৎ কি কি ফরমুলার প্রয়োগ-মাধ্যমে দেখতে পাব উহাই ইসলামের আদি এবং একমাত্র রূপ এবং এইরূপ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা ইসলামকে অন্যরকম ধর্মরূপে আখ্যায়িত করে তারাই ইসলামের আদি এবং খাঁটি রূপটিকে 'সুফিবাদ' নাম দিয়ে একঘরে করে রেখেছে।

যারা একবার ঈমান এনেছে তাদের আবার ঈমান আনতে বলার মাঝে কেমন যেন বেখাপ্পা শুনায়। অথচ কোরান পাক এভাবেই ঈমানদারদেরকে ঈমান আনতে বলেছেন। অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ বাচনভঙ্গি কোরান পাকের। তা হলে কি ঈমানকে দুভাগে কেউ যদি ভাগ করতে চায় তবে অন্যায় হবে? মাটি বলতে আমরা যেমন মাটিই বুঝি, কিন্তু একশত তিনটি উপাদান একত্র করলেই হয় মাটি। একের ভেতর এক শত তিনটি উপাদান আছে বলতে চাইলে কি অন্যায় হবে? নামে মাটি এক, কিন্তু একশত তিনটি উপাদানের সমন্বয়েই মাটির রূপ। যদি কেউ বলতে চায়, একটি মৌখিক ঈমান এবং অপরটি দর্শনীয় ঈমান। মৌখিক ঈমান হাল্কা। দৃশ্য থেকে সহসা অদৃশ্য হতে পারে মৌখিক ঈমান কিন্তু যে ঈমান দর্শনীয় উহা প্রত্যক্ষ এবং উহার অধিকারীদেরকেই বলা হয় কোরানের ভাষায় মুমিন। আমানুদেরকে যদিও অনুবাদে মুমিন লিখা হয়, কিন্তু ইহা মোটেই সঠিক বলে মনে হয় না। যদি আমানুদেরকে মুমিন বলে ধরে নেই তা হলে কোরান যেখানে সোজাসুজি মুমিন বলে ঘোষণা করেছে সেই মুমিনের সঙ্গে আমানুদের ভাবধারার আকাশ-পাতাল ব্যবধান হয়ে পড়ে। কোরানের অর্থ ও ভাবধারার মধ্যে মিল রক্ষা করা তা হলে সম্ভব হয় না। তবে জোর করে মিলিয়ে দেওয়া অবশ্য অন্য

কথা। আমানুদেরকে বলা যায় প্রকৃত ঈমানের মহড়ায় লিপ্ত আছে তথা যারা সত্য-দর্শনের সাধনায় রত আছে তাদেরকেই এক কথায় আমানুর দল বলা যায়। সুতরাং আমানুর দল আর মুমিনের দল কোরানের ভাবধারায় কখনই এক নয়। যেমন মুসলমান বলতে দলে যোগদান বুঝায় এবং আমানু এবং মুমিনের মধ্যে যেরকম প্রভেদ, ঠিক মুসলমান এবং আমানুর মধ্যেও সেরকম প্রভেদ। তিনটি ভিন্ন ভাবধারাকে একত্রে লাবড়া পাকিয়ে ফেলার দরুন কোরান পাকের ভাবধারার মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষ্য করি। আসল বৈপরীত্য আমাদের মনের মধ্যে বিরাজ করে — কোরান পাকে নয়। যেমন প্রতিটি খাদ্যদ্রব্য খাঁটিই থাকে কিন্তু ভেজাল শব্দটি থাকে আমাদের মন-মানসিকতায়। মনের ভেতর লুকানো ভেজাল শব্দটি যখন খাঁটি খাদ্যদ্রব্যের উপর আরোপিত হয় তখনই লেগে যায় যত গণ্ডগোল। এই মনের ভেতর লুকানো ভেজালটি কি কেবল খাদ্যদ্রব্যের বেলাতেই না এই পৃথিবীতে বাস করা মানবসমাজের সুন্দর জীবনধারার উপরও কি মনের লুকানো ভেজালের প্রভাব পড়ছে না? এই লুকানো ভেজালের প্রভাবে সহজ-সরল জীবনধারার মাঝে কত রং-বেরং-এর আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নিচু কত রূপ আর অরূপের খেলা চলছে তা কি সবাই কম বেশি বুঝতে পারে না? সুতরাং মুসলমান, আমানু এবং মুমিনের বিশদ আলোচনা এই সূরা বালাদে দিতে চাই না। কারণ, এই আলোচনা কোরান হাদীসসহ দিতে গেলে হবে অনেক বড় তাই এখানেই ক্ষান্ত দিতে বাধ্য হলাম।

কোরানভিত্তিক দুর্নীতির স্বরূপ

দুর্নীতির অনেক রকম রূপ আছে। এই দুর্নীতির ফলে বিশ্রী এবং ভয়াবহ কতগুলো শাখা মানবসমাজের জীবনব্যবস্থার ভিতর রোগজীবাণুর মত প্রবেশ করে সংক্রামক হয়ে ওঠে আর মানব জীবনকে অনেকটা বাধ্য করে পাপের পথে হেঁটে যেতে। দুর্নীতির মত দাসত্বের সংক্রামক জন্মস্থল কোথা হতে এবং কি প্রকারে মানবসমাজে ঢুকে পড়ে? রোগের উৎস কোথায় এবং রোগ কেমন করে হল এটাই যদি ডাক্তারের ভাববার বিষয় হয়ে থাকে তবে দুর্নীতি ও দাসত্বের সংক্রামক জন্মের উৎস কোথায় এবং কেমন করে হল সেটাও আমাদের ভাবতে হবে এবং তার একটা স্থায়ী সমাধানও করতে হবে। যেখানে শৃঙ্খলিত দাসেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কঠোর পরিশ্রম করে যায় অথচ সেই দাসদের পরিশ্রমের ফলটুকু নাকে তৈল দিয়ে প্রভুরা আরামসে ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং নামমাত্র বেঁচে থাকার নামমাত্র পরিশ্রমের ফল দেওয়া হয় সেখানেই জন্ম হয় দুর্নীতি এবং দাসত্বের এবং কালে কাল জমা হয় ধুমায়িত বিদ্রোহ এবং এই বিদ্রোহই একদিন রূপ নিতে চায় অধিকার আদায়ের সংগ্রামে।

কোরান পাক যেখানে দুর্নীতি এবং দাসত্বকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে বার বার ডাকছে — কোরান পাক যেখানে দুর্নীতি এবং দাসত্বের সমাজ জীবনকে অসভ্য বর্বর জীবন ব্যবস্থা বলে উহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বলছে সেখানে দুর্নীতি এবং দাসত্বের জন্মস্থলকে সমর্থন করে, না মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সাম্য গড়ে উঠতে পারে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করলে উহাই সমর্থন করে? প্রয়োগ পদ্ধতি এক

এক দেশে এক এক রকম হোক না কেন, কিন্তু প্রধান এবং প্রথম প্রশ্নটি হল যে সেসব প্রয়োগ ব্যবস্থায় ইসলামী সাম্যের মূলনীতিকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং ইসলামী সাম্যের মূলনীতি হতে ছুটে গেলে উহা আর গ্রহণীয় হবে না। কারণ, কোরান-হাদীস যদি শুধুমাত্র একটি যুগের জন্য হয়ে থাকে–কোরান-হাদীসের উক্তি যদি সর্বযুগের জন্য একটি সার্বজনীন মূলনীতি বহন না করে তবে উহাকে সর্বকালের মূলনীতির বাহক বলা মোটেই চলে না। কারণ, তাতে আল্লাহ পাক হয়ে পড়েন কোন একটি বিশেষ যুগের জন্য গণ্ডিতে আবদ্ধ। যদিও সৃষ্টি এবং স্রষ্টার রহস্য সম্বন্ধে এখানে আলোচনা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক– আধ্যাত্মবাদের দৃষ্টিতে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি নেই। সব এক, একক এবং অখণ্ড আহাদ এবং তাঁরই বিকাশ, তারই আবর্তন-বিবর্তনের বিচিত্র রহস্যপূর্ণ খেলা। মানুষের দৃষ্টিতে দুই দেখে ততক্ষণ, যতক্ষণ শয়তান তার মাঝে থাকে। শয়তান যে-মানুষ দূর করে দিতে পেরেছে সেই মানুষকে বলা হয় আদম। এই আদম আমাদের মত মানুষ নন, যদিও দেখতে তিনি আমাদের মতই। আদম দুই তথা বহু দেখে না। আদম একের মধ্যে বাস করে। আদম একের দর্শন লাভ করে এবং দুই বা বহু নেয় চিরবিদায় এবং তিনি তখন স্রষ্টার রহস্য এবং স্রষ্টা হন তাঁর রহস্য। কোরান পাকের ভাষায় ইনারাই মুমিন। আমানুরা মুমিন নয় বরং মুমিন হবার চেষ্টায় রত, আর মুসলমান হল দলভুক্ত। আধ্যাত্মবাদের আলোচনায় ইহার আলোচনা করার আশা করি।

শোষিত গরীবেরা কালে কালে শোষিত হয়ে প্রতিকার চাইবার তরে অসহ্য হয়ে হাতে তুলে নিয়েছে প্রতিবাদের মশাল। যে প্রতিবাদের মশাল বর্বর শোষকদের মাথার খুলিকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তোলে। যে প্রতিবাদের মশাল দুর্নীতি আর দাসত্বের গ্লানি মুছে ফেলতে চায়। যে প্রতিবাদের মশালের তলে কোটি কোটি ভুখা এতিম, মিসকিনদের তৃপ্তির ছায়া দিতে চায়। যে প্রতিবাদের মশাল মহামিলনের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে ছুটে চলে। যে প্রতিবাদের মশালের অপর নাম, ইসলামী ভাষায় – ***'ইন্না আবওয়াবাল জান্নাত তাহতা জেলালিস সয়ুফে'*** অর্থাৎ 'অবশ্যই তরবারির ছায়ার নিচেই বেহেস্তের দরজা।'

শোষক আর বাটপারদের হিংস্র থাবা সমাজ জীবনে এমনিভাবে ঢুকে পড়েছে যে, পবিত্র কোরান-হাদীসের ভাবার্থকে এমনভাবে বিকৃত করেছে যার ফলে যে কোন প্রকার পাঠকের পক্ষে কোরান-হাদীস হতে সত্য উদ্ধার করাটা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সত্যের উপর তথা কোরান-হাদীসের উপর ছাইচাপা দিয়েছে তাদের মাথার বিকৃত চিন্তাধারার বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে, যার ফলে এত আত্মবিরোধী ভাবধারার সমাবেশ হয়েছে যে, যে কোন চিন্তাশীল পাঠক একবার পড়লেই আর পড়তে মন চায় না। এদের বিকৃত চিন্তাধারার অপব্যাখ্যার দরুন এক আল্লাহ, এক নবী এবং এক কোরানের সমর্থকেরা তেহাত্তরটি ফেরকা বা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেছে। আবার প্রত্যেক শ্রেণী একে অপরের উপর কাফের মোনাফেক ফতোয়া পর্যন্ত ইতিমধ্যেই দিয়ে ফেলেছে। ইসলাম ধর্মকে যদি একটি পরিধানের কাপড় বলে ধরে নেই তবে সেই কাপড়টি কিন্তু আস্ত নেই। তেহাত্তরটি তালি মারা হয়েছে। এই কাপড় গায়ে দিতে গেলেই অনেকে সার্কাসের লোক হাসানো জোকার মনে করে। এই সমস্ত বিকৃত ব্যাখ্যার দরুন ইসলাম ধর্মটিকে সার্কাসের জোকার যেরকম শত তালির কাপড় পরে লোক হাসায় সেরকম তেহাত্তর তালির জামা পরিয়ে দিয়ে নাজেহাল করে ছাড়ছে।

অর্থনৈতিক দাসত্ব হতে মানবকে মুক্ত করে দিতে পারলে বার আনি পাপ আপনা হতেই সরে যাবে। শোষকদের একদিক দিয়ে মানুষের রক্তশোষণ অপর দিক দিয়ে দাতা সাজার ভণ্ডামী করার

সমাজব্যবস্থায় যে আদর্শবাদ মোটেই বাঁচতে পারে না সেটাই ইসলাম বিশ্বমানবকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করেছে।

ইসলাম ঘোষণা করছে, *'আগুন, পানি, খাদ্যদ্রব্য এবং পোশাক পরিচ্ছদের উপর রয়েছে জনগণের প্রত্যেকের সমান অধিকার' (হাদীস)।*

'শোষক এবং শোষণ' শব্দটির ব্যবহার যুগের পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক প্রতিচ্ছিবির উপর প্রতিফলিত করেই ব্যবহার করা হয়েছে এবং হচ্ছে। 'শোষক এবং শোষণ' এক একটি যুগে এক একটি নতুন রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়। হাজার বছর আগের মদ ও মদের বোতল আজকের যুগ হতে অনেকটা অন্যপ্রকার ছিল। হাজার বছর আগের নারীর দেহ সাজানোর বিলাস-ব্যসন আজকের যুগে অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। সে যুগে মদ যেমন নেশা ধরাতে পারতো – নারীর দেহ সাজানো যৌবন যেমন কামভাবের উগ্রতা ছড়াতো সেরকম আজো চলছে। মৌলিক কোন পরিবর্তন যুগের ব্যবধান এনে দিতে পারে না। পারে শুধু ব্যবহার করার পদ্ধতির ভেতর পরিবর্তন এনে দিতে। আর একটু না হয় এগিয়েই বলি – প্রাচীনকালে নারী পুরুষের মিলন ছিল অবাধ এবং এই অবাধ নারী-পুরুষের মেলামেশার মাঝে যে পাপ নামক কিছু একটা আছে তারা হয়তো ভেবে দেখেনি। যেদিন থেকে ব্যবহারের পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু মৌলিক এমন কিছু কি পরিবর্তন হয়েছে? নিজের ঘরে রূপসী স্ত্রী থাকতেও কি আজকের কথিত সভ্যতা অন্যের ব্যবহৃত স্ত্রীর রূপ দেখে 'ফুসলিয়ে কি করে আনতে হয়' তার বই-পুস্তক বাজারে মেলে না? তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কোন জিনিসের মৌলিক পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন হয় শুধু প্রয়োগ পদ্ধতির। হাজার বছর আগে যান্ত্রিক যুগের মিল-ফ্যাক্টরীর মাধ্যমে শোষক আর শোষণ না চললেও সে যুগের সেই পরিবেশে প্রতিফলিত অর্থনৈতিক শোষক আর শোষণ নিশ্চয়ই ছিল। শুধু কেউটে সাপের মত তার ছলম বা খোলস বদলায় মাত্র। হাজার বছর আগে শোষক আর শোষণটাকে মানবসমাজ হতে উপড়িয়ে ফেলে সাম্যবাদের নজীরবিহীন শিক্ষাটা সর্বপ্রথম আমরা ইসলাম ধর্মের মাধ্যমেই পাই। ইসলামই সর্বপ্রথম গোলাম আর মনিবকে ভাই-ভাই বলাতে শিখালো। ইসলামই সর্বপ্রথম মনিব যা খাবে, পরবে, থাকবে গোলামও ঠিক তাই পাবে বলে পৃথিবীকে সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের বাণী শুনালো এবং ইসলাম শোষকদের মনরক্ষা করে চলার বিরুদ্ধে চাটুকারিতা বর্জন করে ঘোষণা করলো – তুমি কি দেখেছ সেই মানুষটিকে যে ইসলামের ধারে-কাছেও নেই? যদি সেরকম মানুষটিকে দেখে নিতে চাও তবে তাকেই দেখে নাও, যে মানুষের মাঝে সাম্য আর ভাতৃত্ব গড়ে তুলতে চাইলেই নানা প্রকার ওজর-আপত্তি তোলে। এই ওজর-আপত্তি তুলে যারা সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে টুকরো করে ফেলতে চায় তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর বলে কোরান এবং হাদীসের উক্তিসমূহ প্রচারিত হয়েছে। কোরান পাক নিজেই তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলছে, সর্বযুগের তরে তার বাণী চিরন্তন। সুতরাং কোরান কখনো কোন একটি নির্দিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মডেল অথবা ব্লু প্রিন্ট হতেই পারে না। কোরান পাক আমাদেরকে যে মূলনীতি দিয়েছে তার পরিবর্তন করা চলবে না। শুধু ব্যবহারের পদ্ধতির পরিবর্তন হবে এবং হতে বাধ্য। কারণ সে যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কখনই এক হতে পারে না। রঞ্জনের এক্সরে মেশিনে বুকের হাড়গুলোর ফটো উঠে না বলে ফেলে দেওয়াটা যেমন বোকামী, না অন্ধ বিদ্বেষের দাসত্ব করা হচ্ছে বলবো, সেরকম ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের মাধ্যমে ইসলামী সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় না বলে ফেলে দেওয়াটা কি অন্ধ বিদ্বেষের দাসত্ব করারই নামান্তর নয়? ইসলাম শোষণের নামে কথিত ধর্মের ব্যবসাটাকে সমাজ হতে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে এবং প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে মানুষের

সাম্য-মুক্তি আর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের দর্শন। অবশ্য কিছু সংখ্যক শোষক আর বাটপারদের গাত্রদাহ আর হিংসার তীব্র অগ্নিবাণ ইসলামের উপর নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। কারণ, গরীব আর ছোট লোক বানিয়ে কোটি কোটি মানুষের ঘাড়ের উপর কাঁঠাল রেখে যে কোষ খাবার বিশ্রী হিংস্র মোহটা ধরা পরে যাবে তারই ভয়ে। সাহাবা আবুজর গিফারীর মত গরীবের বন্ধুকে রাবজার উষ্ণ মরুপ্রান্তরে নির্বাসন দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। সাহাবারা জানতেন রসুলাল্লাহ (দঃ) আবুজর গিফারীকে কতটুকু প্রাণঢালা স্নেহ-প্রীতি উপহার দিয়ে গেছেন। 'আসমান জমিনের উপর সত্যবাদী আবুজর গিফারী', রসুলাল্লাহর (দঃ) বাণীটি চাঁদির চাকতির মোহে বাটপারদের বিবেকটাকে মোহাচ্ছন্ন করেছিল কোন এক বিশ্রী আদিম বন্য তৃপ্তিকে চরিতার্থ করতে। মসজিদে নববীতে দাড়িয়ে সাহাবাদের সামনে আবুজর যখন নির্ভয়ে সত্য কথাটি বলে ফেললেন, 'রসুলাল্লাহ (দঃ) আমাকে বলেছেন, বনু উমাইয়ার বংশের দ্বারা ইসলাম ধর্মকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হবে', তখন আবুজর মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে চিৎকার করে উঠলেন। মাওলা আলী আবুজর গিফারীর হাদীসটির সমর্থন দিতে গিয়ে তাঁকেও পরিণামে লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে। মাওলা আলীকে তাঁর খিলাফত হারাতে হল তাদেরই হাতে যারা আরবের এক প্রান্তে নারী-পুরুষের ভুখা থাকার হাহাকার আর অন্য প্রান্তে চোখ ঝলসানো রাজপ্রাসাদ বানিয়ে ভোগ-বিলাসের নেশায় মত্ত ছিল।

আবুজর গিফারীকে এক স্থান হতে অন্যস্থানে অনবরত নির্বাসন আর বয়কট করা হল যাতে গরীবেরা আবুজরের আদর্শ প্রচারের তলে সমবেত না হয়। সবচাইতে বিস্ময় লাগে এবং বিবেক অবাক হয়ে যায় যে, ইতিহাস তার ঘটনাটিকে আবার পুনরাবৃত্তি করে দেখালো মাওলা আলীর জীবনে। গরীবের বন্ধু হতে গিয়ে কি অস্থিরতার যাতনাই না সহ্য করতে হয়েছে। মাওলা আলীর অপরাধ? অপরাধ আর কিছুই নয়, গরীবের চোখ দুটো ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন যাতে গরীবদের পাঁজরের নিচে সঞ্চিত রক্ত আর জোঁকের মত শুষে খেতে না পারে এবং ইসলামের আসল রূপটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

ইসলাম ঘোষণা করছে, ***'লা মওজুদা ইল্লাল্লাহ'*** 'নেই কোন মওজুদ আলাহ ছাড়া' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কিছুই নেই। অর্থাৎ যা কিছু আসমান জমিনে অস্তিত্বশীল উহাই আল্লাহ। সুতরাং আসমান জমিনে যা কিছু অস্তিত্বের রূপ নিয়ে ছুটে চলছে আবর্তন-বিবর্তনের মাধ্যমে নব নব বিকাশ ও রূপে রূপান্তরে, উহাই আল্লাহ। কোরান শরীফে আসমান এবং জমিন বলতে আল্লাহর সৃষ্টি যতকিছু আছে সবই বুঝানো হয়েছে। মূল দৃষ্টির বিচারে সৃষ্টি শব্দটির কোন অর্থ নেই। কারণ, যাহা আমরা সৃষ্টিরূপে দেখছি উহা স্রষ্টা হতে আলাদা নয়। স্রষ্টাই রূপে রূপান্তরে আবর্তিত ও বিবর্তিত হচ্ছে। স্রষ্টা এবং সৃষ্টি আসলে এক এবং অদ্বিতীয় এবং ইহাকে মোটেই ভাগ করা যায় না। তবু আমাদের বুঝবার সুবিধার জন্যই ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন বিজ্ঞানীরা ভাল করেই জানেন যে, সূর্য কোনদিন পূর্ব দিক হতে উঠেও না এবং পশ্চিম দিকে ডুবেও না। তবুও বিজ্ঞানীরা সূর্য উঠে এবং ডুবে বলে লিখে থাকেন।

রাতের ঘন অন্ধকার যখন ফলন্ত গাছপালাকে ঢেকে দেয় তখন আমাদের চোখের দৃষ্টি আর গাছের ফলগুলোকে দেখতে পায় না এবং যখন আলোর আঘাত খেয়ে অন্ধকার পালিয়ে যায় তখন আবার আমাদের চোখে গাছের ফলগুলো ধরা পরে। সেরকম ভাবে আমাদের মনের উপর দুনিয়া নামক যে অন্ধকার বিরাজ করছে উহা দূর করে ফেলতে পারলেই আমরা দেখতে পাব যে একই নূর সর্বত্র বিরাজ করছে এবং এই একের দর্শনকেই বলে আল্লাহ দর্শন। (সূরা ফালাকের ভাবধারা ও মূল দর্শন ইহাই এবং এর ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হবে)। সমগ্র কোরান এবং হাদীস শরীফের শুধুমাত্র একটি

আদেশ এবং একটিমাত্র উদ্দেশ্য। সেই একমাত্র আদেশ হল, তোমার মন হতে অন্ধকার তথা দুনিয়া সরিয়ে ফেল এবং আল্লাহ কি এবং কে, তাঁর পরিচয় জেনে নাও। 'দুনিয়া নামক এই অন্ধকার দূর করে ফেল' ইহাকেই ইসলাম বলছে, 'মরার আগে মরে যাও।' মৃত্যু আবার দুই প্রকার। 'দুনিয়া মন হতে সরিয়ে ফেল'-কে মৃত্যু বলা হয়। সুতরাং এই মৃত্যু জীবিত থেকেই বরণ করতে হবে অর্থাৎ এই মৃত্যু হলেই আল্লাহর দর্শন হয় তথা একের দর্শন মেলে। জীবিত থেকে যে দুনিয়া নামক আঁধার সরিয়ে দিতে পারলো না তার সেই আঁধার তার কাছেই থেকে যাবে। এবং এই আঁধার নিয়ে থাকাটাকেই জাহান্নামে আছে বলা হয় এবং ইহাই বিরহ বা এক হতে বিচ্ছেদ বেদনা তথা একাকীত্বের তীব্র দহন আর বোবা জ্বালা। এই বিচ্ছেদ-বেদনার অপর নামই হল জাহান্নাম। জৈবিক মৃত্যুর পর তখন সে সুন্দর বুঝতে পারবে যে, সে জাহান্নামেই এতদিন ছিল এবং সে তাহা বুঝতে পারেনি। মৃত্যু-ঘটনার পর মানুষ প্রত্যক্ষভাবে বুঝে যে, জাহান্নামের বিচ্ছেদই তার সাথী হয়েছিল এবং এখনো উহাই আছে। মৃত্যু বলতে কিন্তু অনস্তিত্ব বুঝায় না। মৃত্যু একটি ঘটনা মাত্র এবং এর বেশি কিছু নয়। এই মৃত্যু নামক ঘটনাটির দ্বারা মানুষকে একটি অবস্থা হতে সম্পূর্ণ পৃথক আর একটি অবস্থাতে এনে দেয়। এই ঘটনা, অর্থাৎ দুনিয়া-সরানো, জৈবিক মৃত্যুর আগেই যদি কেউ ঘটাতে পারে তবে তার আর মৃত্যু নেই।

'আল্লাহ ছাড়া কিছুই নেই' কথাটি মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারে না যতক্ষণ মানুষের মনের উপর দুনিয়ার অন্ধকার বিরাজ করে। আল্লাহই যে সর্বময় বিভিন্ন রূপ ও বৈচিত্র নিয়ে নতুন নতুন রূপ নিয়ে বিকশিত হচ্ছেন এবং তাঁর এই রূপ যে তাঁরই রূপান্তরিত বৈচিত্রপূর্ণ বিকাশ ইহা ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বুঝতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার মনের উপর দুনিয়ার অন্ধকার বিরাজ করবে। আল্লাহর এই বহুরূপে প্রকাশিত ও বিকশিত ধারাসমূহকেই বলা হয় কেতাব অথবা কোরান। আল্লাহ যে নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন রূপান্তর ও বিবর্তনের (ট্রানসফরমেশন) দ্বারা সেই প্রকাশ ভঙ্গিকেই বলা হয় কেতাব অথবা কোরান। সুতরাং যত ঘটনাই ঘটছে এবং ঘটবে ইহা কেতাবের ধারা অনুসারে প্রকাশের পথে এগিয়ে যেতে থাকে। অপ্রকাশিত এবং প্রকাশিত এই দুটোর সমষ্টি হল আল্লাহ। 'যাহা কেতাবে সুনির্ধারিত করা হয়নি, সৃষ্টির মধ্যে তাহা কখনো প্রকাশিত হয়নি এবং হবে না।' (কোরান)। সুতরাং আমরা এখন বলতে পারি যে, প্রকাশের (সৃষ্টির) মধ্যে এমন কোন বিষয়-বস্তু নেই, ছিল না, অথবা থাকবে না যার অস্তিত্ব কেতাবে মৌজুদ না আছে। 'কোরানে সব কিছুই আছে' এই প্রচলিত কথাটির প্রকৃত রহস্য এখানেই। এই রহস্য না বুঝতে পারলে ইহা মূর্খ লোকের কথা ছাড়া আর কিছুই নয় বলে অনেকের ধারণা করাটা অন্যায় হবে না। যখন আমরা কোরানী পরিভাষায় কোরান ও কেতাবের আসল বা প্রকৃত সংজ্ঞাটি বুঝতে পারবো তখন আর মূর্খজনের উক্তি বলে বিদ্রূপ করা হবে না। কেতাব কোন ভাষায় নেই। কেতাবের পরিচয় এবং কেতাবের পাঠসমূহ কোরানরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা রসুলুল্লাহ (দঃ) হতে যে কোরান পেয়েছি উহা আরবী কোরান। আল্লাহ কে — আল্লাহ বলতে কি বুঝায় এবং আল্লাহ ছাড়া যে কিছুই নেই এবং আল্লাহর দর্শন মেলে কি করে উহারই পরিচয় পাবার জন্য রসুলুল্লাহর (দঃ) মাধ্যমে আমরা আরবী কোরান পেয়েছি। এই আরবী কোরানকে তফসীর করতে হবে। কাগজের পাতায় আলেম সেজে তফসীর করে আলমারীতে রেখে দেওয়া বই আকারে তফসীর নয়। আরবী কোরানকে নিজের জীবনের উপর তফসীর করে তুলতে হবে এবং এই তফসীরই রসুলুল্লাহ (দঃ) করতে বলেছেন এবং ইহাই হল প্রকৃত তফসীর। মুখে মুখে ব্যাখ্যা করে আরবী ভাষা জানা পণ্ডিতদের মত তেহাত্তর ফেরকা বানানোকে তফসীর বলা হয়নি।

এরকম কাগজী তফসীর মাদ্রাসায় অনেক পাবেন। কিন্তু শুনলে অবাক হবেন — লক্ষ নবীদের মধ্যে একজন নবীও মাদ্রাসায় পাশ করে নবী হননি।

ত্যাগ, সাধনা ও মানবের উপর হতে শোষণ করার হিংস্র মোহ বর্জন করে ইসলামী সাম্যবাদের যে প্রেম সেই প্রেমের অনুশীলন দ্বারা কোরানকে নিজের জীবনে ব্যাখ্যা ও মূর্ত করে তোলাই হল প্রকৃত ব্যাখ্যা বা তফসীর। কোরান ও হাদীসের কোন কথাই একেবারে খেলো পর্যায়ে ফেলে রাখা হয়নি। অথচ আমরা নিজেদের সুবিধামত আমাদের মনোমত করে গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি, যার ফলে আমাদের প্রতিফলিত ভাবের ভুল ছাপ কোরান-হাদীসের উপর আরোপিত করে নিয়েছি। শুধু এই কারণেই কোরান-হাদীসের কথার মাঝে এত গড়মিল করা মতামতের পরিচয় আমরা দেখতে পাচ্ছি।

'পবিত্র হওয়া ছাড়া কোরান কেহই স্পর্শ করতে পারবে না', আরবী কোরানের এই উক্তিটির মাঝে এক বিরাট এবং গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। যে কোরান পবিত্র হওয়া ছাড়া স্পর্শ করাই যায় না ইহা আরবী কোরান নয়। উহা হল নূরী কোরান। 'পবিত্র হওয়া ছাড়া স্পর্শ করা অসম্ভব'। পানির সাহায্যে হাত-মুখ ধৌত করে যে অজু সম্পাদন করা হয় ইহা সেই অজু নয়। ইহা আমিত্ব ধ্বংস করে অজু সম্পাদন করতে পারলে স্পর্শ করা যায় নূরী কোরান এবং ইহাই হল প্রকৃত কোরান। কেতাব হল আল্লাহর প্রকাশিত অংশের পরিচয়। কোরানের যে তফসীর উহা কেতাবেরই তফসীর। এই তফসীর ভাষায় করা যায় না বা ভাষায় হয় না এবং ভাষার সাহায্যে যত রকমেই বুঝানো হোক না কেন উহার প্রকৃত অর্থ বুঝা যায় না। ভাষার মাধ্যমে যদি কেতাব তথা কোরানের তফসীর বুঝিয়ে দেওয়া যেত তবে শোষক, বেঈমান আর অত্যাচারী এ জগতে একটিও থাকতো না। আমিত্বের অন্ধকার দূর করার প্রবল প্রচেষ্টার দৃঢ় সংকল্প যার নেই, অর্থাৎ অনিচ্ছুক অন্তরে ইহার তফসীর প্রবেশ করতেই পারে না। যাহা প্রবেশ করতে পারে ইহা হল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক কতগুলো মাসালা-মাসায়েল জাতীয় বিদ্যা। 'কেতাব নাজেল হওয়া' 'কেতাব দান করা' অর্থ হল কোন মানুষের দুনিয়া নামক আমিত্বের অন্ধকার দূর করে দেওয়া অর্থাৎ আল্লাহর দর্শন লাভ করা, তথা 'আল্লাহ ছাড়া কিছুই নেই' উপলব্ধি করা, তথা পবিত্র হওয়া, তথা কোরানকে স্পর্শ করার ক্ষমতা লাভ করা, তথা 'যেদিকে তাকাও সবই আল্লাহর চেহারা' উপলব্ধি করা, তথা মরার আগে মরে যাওয়া, তথা নিজেকে চিনতে পারলে আল্লাহকে চিনতে পারা, তথা তাগুত ভেঙ্গে আয়াতরূপে দর্শন লাভ করা, তথা দুনিয়া হতে ছুটে গিয়ে মসজিদে (মাটি, ইট, পাথরের নয়) আশ্রয় নেওয়া, তথা আমরারূপী (আমি রূপী নয়) আল্লাহর দ্বারা কানে চড় মেরে কাহাফে ঢুকিয়ে দেওয়া, তথা দুনিয়া (পৃথিবী নয়) ত্যাগ করে দ্বীনে প্রবেশ করা, তথা আমাদের রচিত অগণিত দ্বীনগুলো হতে ছুটে গিয়ে আল্লাহর দেওয়া একমাত্র দ্বীনে প্রবেশ করা, যে একমাত্র দ্বীন হযরত আদম (আঃ) হতে জারি করা হয়েছে *(সুননাতাল্লাহে লা তাবদিলা* অর্থাৎ আল্লাহর আইন কখনোই বদল হয় না), তথা কিয়ামতের (ব্যক্তির মৃত্যু) পুলসেরাতের ধারালো পুল পার হওয়া, তথা নিজের দ্বীন ত্যাগ করে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করা, তথা অজু সম্পাদন করা, তথা নফসে মোৎমায়েন্না হয়ে যাওয়া, তথা নিজের সঙ্গে যে শয়তানটি (জ্বিন) আছে উহাকে মুসলমান বানিয়ে ফেলা, তথা সেজদায় (মাথা নত করা নয়) যাওয়া, তথা "আমি আদিতেই মুমিন ছিলাম" *(আনা আউয়ালুল মুমিনিন)-এর* দর্শন লাভ করা, তথা কেতাব নিজের হস্তগত হওয়া, তথা 'আমারই শান-আমরই জালুয়া প্রকাশ হচ্ছে, বলা, তথা মনসুর হাল্লাজের *আনাল হক* তথা আমিই আল্লাহ বলা, তথা আমিই পীর আমিই মুরীদ বলা, তথা আমানুর দল হতে মুমিনের দলে প্রবেশ লাভ করা, তথা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ইফতার করার আহ্বানের রহস্য উপলব্ধি করা, তথা সেজদায় গেলেই হতচেতন

হয়ে যাওয়া, তথা বীজরূপী রূহকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করা, তথা যাকে খুশী দান করির রহমত লাভ করা, তথা ক্ষমার পর রহিম (রহমান নয়) রূপে দর্শন লাভ করা, তথা যুক্তি-তর্ক এবং আইনের রূপগুলোকে ইশকের নূরে হারিয়ে ফেলা।

আমাদের জানামতে একমাত্র মানবজাতি এবং জ্বিন জাতিকেই মন দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। মনের বা চেতনার অধিকারী একমাত্র মানব এবং জ্বিন জাতি। এর বাইরে আল্লাহ আর কাউকে মন বা চেতনা দেননি। এই মন বা চেতনাটার কোন স্থায়িত্ব নেই। কিন্তু অস্থায়ী হলেও এই মন বা চেতনা কিন্তু ক্রিয়াশক্তি বর্জিত নয়। আল্লাহ এই মন বা চেতনাকে সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন অর্থাৎ মৃত্যু-ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই মনের এই ইচ্ছাশক্তিটি লুপ্ত হয়ে যাবে। মনের এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটিকেই ইবলিস তথা দুনিয়া এবং আরো বহু নামে আরবী কোরানে উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং মন বা চেতনাটাই প্রধান এবং আসল নয়। মন হল অপ্রধান এবং নকল। এই মনটাকেই বলে আমি এবং এই আমি যে পর্যন্ত আমার মধ্যে আছে সে পর্যন্ত 'একক অখণ্ড আমি' থাকে না অথবা থাকতে পারে না অর্থাৎ 'একক অখণ্ড আমির একক অখণ্ড অদ্বৈত চেতনাই' হল মুখ্য, মৌলিক এবং একমাত্র আদি এবং ইহাকেই বলে আল্লাহ। এবং এই আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি অথবা আমি নামক যে মন বা চেতনা উহা অখণ্ড একক চেতনা (বা যে কোন নামই বলা হোক না কেন) হতে পরবর্তীকালে উদ্ভব হয়েছে অর্থাৎ একক এবং আদি চেতনাই উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমি-নামক মন বা চেতনাকেই সৃষ্টি করেছে। সুতরাং অখণ্ড আদি চেতনাই আত্মনির্ভর এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ আর আমি-নামক মন বা চেতনা কখনোই আত্মনির্ভর হতে পারে না সুতরাং স্বয়ং সম্পূর্ণ হবার প্রশ্নই আসতে পারে না।

মন বা চেতনাকেই বলা হয় আমিত্ব, খুদি, হাস্তি, অহম, ইগো, খান্নাস, দুনিয়া, তাগুত ইত্যাদি। তাই ইসলাম বলে, 'তুমি জীবিত থাকতে জীবন দাও তবেই জীবিত থাকবে।' অর্থাৎ আমি-নামক চেতনাটাকে সরিয়ে দিলে একক, অখণ্ড এবং আদি আমি নামক চেতনাটাই থাকে এবং এই চেতনারই অস্তিত্ব আছে এবং এই চেতনা ছাড়া আর কিছু নেই।

কোরান তার দর্শনকে সহজ-সরল করে সাধারণের পাতে দেবার জন্য যেমন রূপকতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে তেমনি চিন্তাশীল ব্যক্তিও রূপকতার মাঝে 'তুমি চিন্তা কর' কম বলা হয়নি। অখণ্ড-একক-আদি চেতনার বিকাশ এবং বিবর্তনের কারণগুলো অখণ্ড চেতনার মাঝেই নিহিত আছে। সুতরাং এই অখণ্ড আদি চেতনার বাইরে আবার অলৌকিক শক্তি কি করে আবর্তন, পরিবর্তন এবং সৃষ্টি ও ধ্বংসের কারণ হতে পারে? এরকম চিন্তা করাটাই তো উদ্ভট এবং গাঁজাখুরি গল্প বৈ আর কি হতে পারে?

কত মহাপুরুষ, কত জ্ঞানী-গুণী, কত কবি-সাহিত্যিক, কত সাধু-সজ্জন, কত বিচিত্র ভাষার শৈলীর ঠমকে, কত ইনিয়ে-বিনিয়ে, কত কাতর যাঞ্চার বিনম্র আহ্বানে, কত পুরাতন একটি অতি পরিচিত উপদেশ দিয়ে চলছেন কিন্তু তাতে তবু আমরা অবাক হইনি যদিও অবাক হবারই কথা ছিল। কিন্তু নিরক্ষর মহানবীর কণ্ঠধ্বনিতে সবকিছুর স্রষ্টা, যাকে আমরা কত রকমের নামে ডাকি সেই আল্লাহপাক, খোদা, গড, ঈশ্বর, ব্রহ্মা, জিহোবা প্রচার করছেন একটি অমৃত উপদেশ কিন্তু তবু আমরা ঐ উপদেশের বাড়িতে যেতে হিমশিম খাই। কারণ, বিরাট একটি পুল বা ব্রিজের উপর পা রেখে যেতে হয়। সেই ব্রিজটির রূপকের ঠমক মাখা ভাষায় দুর্গম গিরিপথের হোঁচট খাওয়া রূপ। এ হোঁচট-খাওয়া রূপের আলিঙ্গনে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানালেন আমিনা মায়ের ছেলে মুহাম্মদ নামের আমাদের মত (?) মানুষটি। সেই মানুষটির (?) কণ্ঠে স্রষ্টা জানিয়ে দিলেন, 'ফাককু রাকাবাহ'

অর্থাৎ 'ঘাড় ও কণ্ঠ মুক্ত করা'। এর মর্ম বুঝানো হয় দাস মুক্ত করা। কিসের আবেষ্টনীতে বাঁধা পড়লে দাস বলা হয়? কিসের অভাব থাকলে দাস নাম দেওয়া হয়? অর্থের বিনিময়ে মানুষ কেনা-বেচার নাম কি কেবল দাসপ্রথা? এই আধুনিক যুগে যে কোটি কোটি মানুষ বস্তির নোংরা পরিবেশে ছেলে-পুলে নিয়ে একবেলা খেয়ে কোনরকমে বেঁচে আছে তারা কি বিংশ শতাব্দীর আধুনিক দাস নয়? তারা কি তাদের বিবেক বেচে দেয় না কিছু পয়সার বিনিময়ে? তাদের বিবেকের গলায় দড়ি বেঁধে কি বিংশ শতাব্দীর পথে পথে ঘুরছে না? যে কোন মুহূর্তে পেটের জ্বালার উপশমের টোপের মোহে বিবেকের গলায় দড়ি দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে না? পয়সায় কেনা-বেচা হচ্ছে বিবেক। যেদিকেই তাকান না কেন, প্রশাসনের প্রতিটি শাখায় দেখতে পাবেন কত রকমে, কত স্টাইলে, কত রঙ্গে অহরহ বিবেকের চলছে বেচাকেনা। তবে কি আজো সেই পুরনো দাসত্বের অভিশাপ হয়নি মোচন? পুরনো মদ কি এভাবেই যুগে যুগে নতুন নতুন বোতলে ঢেলে পরিবেশন করা হবে? কতদিন চলবে এরকম নিয়মের ঘোমটায় পৈশাচিক ক্রিয়া? এ দাসত্ব কবে মুছে যাবে চিরতরে? না কোনদিনও মুছবে না? তবে কি পুনর্জন্মের কর্মফল ভোগ করার নামই দাসত্বের জীবন? কোরান পাকের সূরা বাকারার আঠাশ নম্বর আয়াতটি কি পুনর্জন্মেরই কথা বলছে, না অন্যকিছু? এই আয়াতের নিরপেক্ষ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা কি দেওয়া হয়েছে? না মনগড়া নিজেদের পছন্দ মত অনুবাদ ও ব্যাখার বমি উদগীরণ করা হয়েছে? নিজ নিজ দলের সাইনবোর্ড ফেলে দিয়ে নিরপেক্ষ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা কি কোরান পাকের কোনদিনও হবে না? দেড় হাজার বছর আগে আরবদেশের লোকেরা যেমন দলে দলে বিভক্ত ছিল এবং দলীয় দর্শনের মান মর্যাদাকেই দিতো সবার উপরে স্থান এবং তাদের এই দলে দলে বিভক্তিকে আক্ষেপের ভাষায় অনুশোচনীয় দীর্ঘশ্বাস ফেলি আজো আমরা। কিন্তু আমরাও কি এক ইসলাম, এক কোরান আর এক নবী থাকতেও অনেক দলে ভাগ হয়ে যাইনি এবং প্রাচীন আরবদের মত দলের দর্শনকে উঁচু করে দাঁড় করাতে চাই না? হোক না সেই দর্শন স্থূলতায় ভরা অথবা খোঁড়া তবু কি চালাই না আপ্রাণ চেষ্টা? তাহলে সেদিনের দলপ্রিয় আরবদের কেন এত অভিযোগ তুলছি তাদের দলপ্রিয়তাকে কেন্দ্র করে? যদি পুনর্জন্ম না থাকে তা হলে এর সমাধানের পথে কি চিরদিন কিছুলোক এগিয়ে আসবে এবং কালের চাকায় তা আবার অদৃশ্য হয়ে যাবার অভিনয়ের বিলাপ চলবে চিরদিন? আমার মত কত পাগল লেখক কলমে কেঁদেছেন এ বিষয়ের প্রতিবাদে, কিন্তু পৃথিবীর সমাজে এই পাগলদের (?) কপালে কি পুরস্কার বয়ে এনেছে? মৃত্যুদণ্ড, ফাঁসি, জেল, লিখনি বাজেয়াপ্ত, মাথা খারাপ ইত্যাদি নামের মেডেল পুরস্কার নিয়ে পরপারে চলে গেছেন তারা। হাজারবার, লক্ষবার, কোটিবার চিৎকার করে বলছেন *কোরান*, *বাইবেল*, *তাওরাত*, *জাব্বুর*, *বেদ*, *গীতা*, *ত্রিপিটক*, *জেন্দাবেস্তা*—ধন-সম্পদের মোহ আর মায়া মরণে আনে এর ইতি বা অবসান। তবু কেন এত বড় জলজ্যান্ত সত্য চোখের সামনে দেখেও দেখ না? তবে কি এটাই পুলসিরাত? এটাই কি সেই পথ যার ধার তরবারি হতে অনেক বেশি ধারালো এবং চুলের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম? হায়রে মানুষ—আমরা জন্মেছি এটা সত্য এবং অবশ্যই মারা যাবো তথা চলে যাবো এটা সত্য আর এর মাঝখানের ছুটাছুটির মূল্য কতটুকু তার হিসাব করুন তো! তবে কোন মোহে, কোন লোভে, কোন স্বার্থে আল্লাহ পাকের পবিত্র বাণীর বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যাবার সাহস পাই? তবে কি সেই শয়তান আমার মধ্যেই মিশে আছে? সেই শয়তানের নামই কি আমাদের কলুষিত প্রবৃত্তির অনন্ত চাওয়া? এই অনন্ত চাওয়ার নামই কি জাহান্নাম? যত চাওয়ার পাওয়া না পেলেই কি আবার নতুন চাওয়া হাজির হয় না? এই চাওয়ার কি শেষ নেই? আরো আছে কি? আরো দেবে কি? জাহান্নামও এরকম ভাষায় চাইছে না কোরান পাকে? তবে জাহান্নাম কি? এর প্রকৃত

রহস্যই বা কি? তবে কি আমরা অনেকেই জাহান্নামে আছি না? বাস করছি না? বর্তমান কালকেই কি বুঝানো হচ্ছে? না যাব বুঝানো হচ্ছে তথা ভবিষ্যতকে বুঝানো হচ্ছে? এই অনন্ত চাওয়ার যদি শেষ না থাকে তবে ইহাই কি হাবিয়া? চাওয়ায় যদি তলা না থাকে তবে হাবিয়ার কি তলা আছে? জাহান্নামের মুকুট হাবিয়ার কোন তলা নেই তবে কি অনন্ত চাওয়ার হাবিয়াতে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি না? জেনে-শুনেও আমরা প্রবৃত্তির চাওয়া পথকেই সঠিক বলে প্রায় সবাই এগিয়ে চলি এবং তার পরিণতি কত ভয়াবহ, কত করুণ তা এতিম, মিসকিন তথা সর্বহারাদের চাহনি দেখলেই আমাদের ভুল বুঝতে পারি।

কি এক অদৃশ্য রহস্যের অন্ধকারে নিজেকে নিজেই উল্টা-সিধা চিন্তার বাঁধনে বেঁধে চলেছি। বুঝতেও পারছি না যে, আমি তো নিজেই নিজের একটি জ্বলন্ত আত্মবিরোধের মূর্তি, দাঁড়িয়ে আছি এই মানবসমাজে। অথচ কি অপূর্ব রূপকথার ভাষায় ঘৃণা করছি আত্মবিরোধকে। নাক সিঁটকাচ্ছি উল্টা-পাল্টা চিন্তাধারার দর্শন অবলোকন করে। কি বিচিত্র উল্টা-পাল্টা মতবাদ ঢেকে রাখছি নিজের মধ্যে যাদুর চাদর দিয়ে। নিজের ভেতর নিজেকে তদন্ত কমিশনের প্রধান বিচারক বানিয়ে রিপোর্ট দিতে যদি কেউ আহ্বান জানায় তবে একদম নির্ভুল রিপোর্ট পেশ করতে বিবেক থমকে যায় না, বিবেক প্রতিবাদের প্রশ্নে ভাষার জিহ্বা পালন করে বোবার ভূমিকা। আমার মন, আমার বিবেকের সত্তা, আমার এদিক-সেদিকে ঘোরান ক্যামেরার মত অনেক ছবি তোলার চোখ দুটো, আমার কম্পিউটারের হিসাব মেলানো মগজের ভেতর খুঁজে বেড়াই কোথায় মীরজাফরের দল, কোথায় ভণ্ডের দল, কিন্তু একবারও কি নিজেকে নিজে দেখতে চেষ্টা করছি? একবারও কি নিজেকে নিজে চিৎকার করে ঘোষণা করতে পেরেছি যে, মীরজাফর, ভণ্ড আর বেঈমান যে আমি নিজেই হয়ে আছি অনেক আগে, কিন্তু একটা সামাজিক চাহনির লজ্জায় তা ঢেকে রাখতে বাধ্য হয়েছি। কারণ, যুক্তি হিসাবে অপরাধ স্বীকার করেও একটি খোঁড়া যুক্তি তবু দাঁড় করিয়ে ছাড়ি আর সেই যুক্তিটির শেষ ভাষা হল, 'মানুষ লাঠির ভয়ে আত্মহত্যা করে না, আত্মহত্যা করে লজ্জার ভয়ে।'

এসো পৃথিবীর মানুষেরা – তোমরা যে যেমন পোশাকের সাজেই থাক না কেন, যে যেমন চিন্তার ধর্মেই ডুবে থাক না কেন – যত ধর্মের যত বাঁধনেই আমরা আমাদেরকে বেঁধে রাখি না কেন – একবার একটি মাত্র শেষ অনুরোধ জানাতে চাই – আমাদের সবার বিশাল এই বুকের গর্তে বিবেকের ডাগর চোখে একবার মেখে নেই কোরান সাগরের অবগুণ্ঠিত পা হতে মাথা পর্যন্ত উলঙ্গ সত্যের নীল ছবি!

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসুলাল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'আমার জীবন যার হাতে সেই আল্লাহর কসম করে বলছি, কেহই মুসলমান হতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে যা পছন্দ করে নিজের জন্য তা সে পছন্দ করে অপরের জন্য।' (*বোখারী* এবং *মোসলেম শরীফ*)।

হুজুর পাক (দঃ)-এর এই হাদীসটির তথ্য এত গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানময় এবং এই হাদীসটির প্রতিটি কথায় কথায় মুক্তোর মত ঝক ঝক করছে মানবধর্মের অদ্বিতীয় সেবার উজ্জ্বল সাম্যবাদ। শুধু কি তাই? সাদামাটা ভাষার ঝাঁপিতে লুকিয়ে আছে সার্বজনীন একমুঠো উগ্র দ্যুতিচ্ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার তীক্ষ্ণ হুমকি। এই তীক্ষ্ণ হুমকি মানবজাতির প্রতিটি মানুষের হৃদয়কে ভাবিয়ে তোলে। 'কেহই মুসলমান হতে পারে না' অর্থাৎ মুসলমানরূপ ভূমির সীমানার কাছেও থাকার স্বীকৃতি নেই। কার জন্য এত বড় হুমকি? কে সে যে মুসলমানরূপ ভূমির সীমানাতেও স্থান পেল না? সেই মানুষটিকে এই হুমকি দিয়ে সাবধান করে দিচ্ছে, যে নিজের সুখ-দুঃখকে তারই মত আর একটি মানুষ ভাইকে

সমান বলে মেনে নিতে পারলো না বা অস্বীকার করে বসলো। সেই মানুষটি যে অপর মানুষটিকে আদর করে ডাক দিয়ে বলে দিল না যে, আসো মানুষ ভাই, – আমরা এমন সমাজ, এমন ভুবন গড়ে তুলি যেখানে তোমাতে আর আমাতে, আমাদের মাঝে কোন প্রভেদ বা ভেদাভেদ থাকবে না। এই দুনিয়ার পার্থিব ভোগ বিলাসের তো কোন মূল্য নেই। তবে এই মূল্যহীন সম্পদ নিয়ে কেন আমরা বিভেদের প্রাচীর রচনা করবো? আমরা সেই ভুবন রচনা করবো যেখানে তোমার গরু আর আমার চাষের জমি থাকবে না। তোমার গরু আর আমার চাষের জমি থাকলেই আসে বিভেদ। হবে ঝগড়া। দানা বাঁধে অশান্তি। শান্তি পালাতে শুরু করে। দিনের পর দিন মহারুদ্রের মত গড়ে উঠে তোমাতে আর আমাতে প্রবল হিংসা। মানবতা খুন করার উগ্র জিঘাংসা জাগবে উভয়ের মনে। কেন হয়? তোমার গরু আমার চাষের জমির ধান খেলে আমি দেব খোঁয়াড়ে। এই তো ঝগড়ার প্রথম পদক্ষেপ। শান্তির রূপ বদলাতে থাকে অশান্তির। এই ঝগড়ার বীজ কোনদিন যেন মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে তার উপায় তুমি আর আমি অর্থাৎ আমরা মানুষ তাই উদ্ভাবন করবো। আবিষ্কার করবো সেই সহজ-সরল পথ যে পথে আমরা অগ্রসর হ'লে থাকে না কোন অশান্তি।

যদি আমার ফসল বোনা জমিতে আমারই গরু নষ্ট করে ফেলে তবে কি আমার গরুটাকে খোঁয়াড়ে নিয়ে দেব? দেব না। কারণ, ফসল বোনা ক্ষেত ও গরু দুটোই যে আমার। এখানে যে, 'তুমি'-র কোন সমস্যা নেই। তাহলে দেখতে পাচ্ছি তুমি থাকলেই যত অশান্তি আর গণ্ডগোল। যত অত্যাচার, অবিচার আর মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ এই 'তুমি'-টাকে থাকার স্বীকৃতি দিলে। পৃথিবীতে বাস করা মানব সমাজকে 'তুমি' বা 'তোমার' আপদ হতে মুক্তি দেবার কি কোন ঔষধ আজও আবিষ্কার হয়নি? আবিষ্কার অনেক আগেই হয়েছে। কিন্তু স্বার্থের হীনস্তূপের তলায় পড়ে আছে সেই ঔষধ। হীনস্তূপ হতে আমাদেরকে বের করে নিয়ে আসতে হবে। সেই ঔষধ হল ইসলাম। 'আমার'-'আমাদের' এবং 'তোমার'-'তোমাদের' নেই ইসলামে। এই ভাগ করা প্রণালী ইসলামের প্রধানতম শত্রু। অখণ্ড সত্যের অখণ্ড প্রকাশ চায় ইসলাম। 'তোমার'-'তোমাদের' কে ছিন্ন করে উপড়িয়ে ফেলে দেবার জন্য সমগ্র কোরান ও হাদীস শরীফের প্রতিটি সোনালী অক্ষর কখনো শান্তভাবে কখনো উগ্রভাবে আবার কখনো হুমকি দিয়ে সতর্ক করে দিয়েছে। এই 'তোমার'-কে মুছে ফেলার জন্য কোরান-হাদীস, নবী-রসুল যুগে যুগে মানুষকে সাবধান করে দিয়েছে। শুধু এই একটি মাত্র আদেশ ছাড়া সমগ্র ইসলামে আর দ্বিতীয় কোন আদেশের এক বিন্দু স্থানও পায়নি। 'তুমি'-কে আসন দিতে গেলেই খোঁয়াড়ের সৃষ্টি হয়। খোঁয়াড় কি? এটাই তো যত গণ্ডগোল, হিংসা আর ভেদাভেদের আখড়া। এই খোঁয়াড়রূপী হিংসার আখড়াটা প্রথমেই চিরতরে লুপ্ত করে দেওয়া যায়, যদি সবকিছু আমার অথবা আমাদের রূপ গ্রহণ করে। আমাদের জমি, আমাদের গরু, তাই আমাদেরই বেঁচে থাকার শস্য এবং দুধ। আমরা সবাই মিলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকার এবং সকলের সুখ-দুঃখে সমানভাবে শরিক হতে পারবো। ঈমানের নিম্নতম বিধানকে আমরা আমাদের ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো। অক্ষর পরিচয়হীনেরা কি করে বই পড়তে পারবে? নিম্নতম ঈমানের ভূমির সীমানার কাছে না থেকে ঈমানের কেন্দ্রভূমিতে অবস্থানের আস্ফালন কি নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং হাস্যাস্পদ নয়? তা হলে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তুমি এবং তোমরা বাস্তবে স্থান পেলেই 'কেহই মুসলমান হতে পারে না' সংজ্ঞার মাঝে নির্ঘাত আটকা পড়ে যাব। ঈমান আনা অসম্ভব, অবাস্তব হয়ে দাঁড়াবে সকলের পক্ষে। তখন আমরা পারবো না হুজুর পাকের (দঃ) সাবধানবাণী 'যে পর্যন্ত না সে যা পছন্দ করে নিজের জন্য তা সে পছন্দ করে অপরের জন্য' রক্ষা করতে বা মেনে চলতে। কারণ, যেখানে আমাদের এবং তোমাদের থাকবে

সেখানে অন্য তুমি বা তোমরা ভাইদের জন্য আমার মত পছন্দ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। কারণ একই সঙ্গে চাঁদ-সূর্য হয় না। একই সঙ্গে চাঁদ, না হয় সূর্য হবে। দুটো এক সঙ্গে কি করে হয়? এই দুটো অসম্ভব বলেই হুজুর পাক (দঃ) বিশ্বের মানব জাতিকে কি সুন্দর এবং বৈজ্ঞানিক শৈলীতে আহ্বান জানিয়েছেন। এই আহ্বানকে অবহেলা করতে যারা চাইবে তাদেরকে হুজুর পাক (দঃ) আল্লাহর শপথ দিয়ে বলেছেন যে, তারা কখনই ঈমানদার হয় না বা হবে না অর্থাৎ ঈমানরূপ ভুমির অতি সাধারণ সীমানার ধারেও এদের স্থান নেই। অর্থাৎ ঈমানদার হবার প্রথম এবং সহজ সংজ্ঞা হতে এরা সম্পূর্ণরূপে বহির্ভূত। তারপরের ইসলাম? সেখানে শুধু প্রতি পদে পদে নিজের নিজটিকে অর্থাৎ আমিত্ব হারাবার কঠোর সাধনায় লিপ্ত থাকতে হবে। যেখানে আমিত্ব হারাবার প্রশ্ন তো দূরে থাক সামান্য পার্থিব সম্পদের পুটুলিটা অন্য সবাইকে ভাঁওতা দিয়ে, ভেল্কি দানছত্র খুলে আত্মসাৎ করার প্রবল প্রচেষ্টা চলছে সেখানে ঈমান ভূমির প্রথম সীমানার কাছেও কি থাকা যায় বলে এখনো ধারণা হচ্ছে? আল্লাহ নিজে যেখানে বলছেন যে, একটি মাছির একটি ডানার সমান বলেও যদি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের দাম তাঁর কাছে হতো তবে তিনি পথভ্রষ্টদের একটি ঘটি পানিও পান করতে দিতেন না। হায়রে তথাকথিত নামধারী মুসলমান! আল্লাহর অনুগত বান্দা বলে দাবী করেও তাঁরই উচ্চারণ করা সম্পদের কি মূল্য জেনে-শুনেও সেই সম্পদকে 'আমার-আমার' হীনবন্ধনে আবদ্ধ রাখার জন্য কত প্রকার চেষ্টাই না দিনরাত করছি। সেই মূল্যহীন সম্পদ আজ তথাকথিত নামধারী মুসলমানদের কাছে মহামূল্যবান। তাই এই নামধারী মুসলমানেরা ভয় করে না, 'কেহই মুসলমান হতে পারে না' এই সাবধান বাণীতে। এরা মনে করে মসজিদ নামক ঘরে পাঁচবার নামায পড়তে পারলেই সবকিছু হয়ে গেল। পাঁচবার নামায পড়া ছাড়া আর অন্যকিছু সালাতই নয় অর্থাৎ হুজুর পাকের (দঃ) দেওয়া সবচাইতে সুন্দর এবং শ্রেষ্ঠ পাঁচবার সালাতকে কায়েম করার যে আনুষ্ঠানিক নিয়ম পদ্ধতিকে 'একমাত্র সালাতের' পূর্ণ নির্দেশ বলে মেনে নেওয়া হয়, অর্থাৎ এই আনুষ্ঠানিক নিয়ম-পদ্ধতি ছাড়া আর কোন কিছুকেই সালাত বলা যাবে না। তবে হুজুর পাক (দঃ)-এর জন্মের পূর্বে অন্যান্য নবী রসুল যে সালাত পালন করতেন এবং অপরকে করতে নির্দেশ দান করতেন উহা কি প্রকার সালাত কায়েম করা ছিল? আল্লাহ কোরান শরীফে সূরা লোকমানে লোকমান হেকিম তাঁর পুত্রকে কোন এবং কি প্রকার সালাত পালন করার উপদেশ দান করছেন? হুজুর পাক (দঃ) সালাত পড়তে বলেছেন, না কায়েম করতে বলেছেন? আল্লাহ কি অনেকবার বলেছেন যে, অয়াকিমুসসালাত না একড়া সালাত? একড়া শব্দের অর্থ পড় (রিড)। পড় বললে আমরা যে নামাড় পড়ি। তাহলে বিচার দিবসে বলতে পারবো যে, আল্লাহ নামাজ পড়তে বলেছেন তাই আমরা নামাজ পড়েছি, কিন্তু আল্লাহ তখন বলবেন, কোথায়? আমি তো নামাজ পড়তে বলিনি, নামাজ কায়েম করতে বলেছি। নামাজ যার কায়েম হয়ে গেছে মেরাজও তার হয়ে গেছে অর্থাৎ সৃষ্টরাজ্য পেরিয়ে সে লা মোকামে যাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। আসসালাতু মেরাজুল মুমিনিনের অর্থ হ'ল প্রত্যেক মুমিনের জন্য সালাতই তো মেরাজ অর্থাৎ সালাতই মেরাজের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং যারা সালাত তথা নামাজ পড়ছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা উচিত যে, আপনারা যে এতিদন ধরে নামাজ পড়ছেন, কিন্তু মেরাজ হয়েছে কি? অর্থাৎ সৃষ্ট রহস্যের দ্বার খুলেছে কি? সালাতের আসল এবং একমাত্র অর্থ হল সংযোগ প্রচেষ্টা তথা মিলনলাভের সাধনা। কার সঙ্গে এই সংযোগ করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে? আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ প্রচেষ্টাকে স্থায়ী করাকেই কায়েম করা বলা হয়েছে। থাক—ইহা আমাদের এখানে আলোচনার বিষয়বস্তু নয়।

ইসলামী সাম্যভিত্তিক মানুষে মানুষে ভালবাসা

তাহলে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের প্রতিবেশীকে নিজের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার বলে মেনে না নিলে সর্বপ্রথম হুজুর পাকের (দঃ) বাণী 'মুসলমান হতেই পারে না' সংখ্যার মাঝে আটকা পড়ে গেলাম। এখন আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে, ইহা একটা মুসলমান হবার সতর্ক বাণী অর্থাৎ হুমকি।

এই আদেশ যাতে কোন ক্রমেই অবহেলা করতে না পারি তারই জন্য ইসলাম যত বড় হুমকি দিয়েছে সত্যিই তা আমাদের ভাবিয়ে তোলার একটি বিশেষ বিষয়। এই হুমকির রূপক বর্ণনা করতে গেলে বলতে হয়, একটি গাছের শিকড় কেটে ফেলে উপর হতে পানি ঢেলে বাঁচানোর ইচ্ছা যেমন হাস্যকর তেমনই অবাস্তব। প্রতিবাদ করবো, কেন পানি ঢালছো? এই গাছ তো আর বাঁচবে না। এর ভিত্তি যে নেই। ভিত্তিই যদি ধ্বংস করে দিলে তবে পানি ঢেলে কি উপকার হবে? আমরা যদি ইসলামকে একটি গাছ মনে করে নেই তবে তার মূল্য বা ভিত্তি কোনটি? আমরা জানি এবং অতি সহজেই বলে থাকি, ঈমান যার নেই তার শত প্রকার ইবাদতের কোন মূল্য নেই। এর কারণ? মূল বা ভিত্তি ছাড়া গাছের জন্য বেঁচে থাকা যেমন অসম্ভব এবং অবাস্তব সেরকম ঈমান ছাড়া মুসলমান হওয়া এবং অন্য সবরকম ইবাদত করা ঐ গাছের ভিত্তি কেটে আগায় পানি ঢালার মতই অবাস্তব। কোন কর্তব্য পালন করতে না পারলে আমাদের ভিত্তির উপর চরম হুমকি দেওয়া হয়েছে? অপর মুসলমান ভাইদের সুখ-দুঃখ ঠিক নিজের সুখ-দুঃখের মত বরণ করে নিতে হবে। তাই ইসলাম আমাদের চরম হুমকি দিচ্ছে। যদি সমান বলে অপর মুসলমান ভাইদের গ্রহণ করে না নিতে পারি তবে আমরা অবিশ্বাসী। আমরা জানি অবিশ্বাসীদের আরবী ভাষায় কাফের বলে। তবে কি আমরা কাফেরের পর্যায়ে নেমে এলাম? তবে আমাদের এত ইবাদতের কি কোন মূল্যই নেই? অন্য সবরকম ইবাদত করতে না পারলে শাস্তি দেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আন্তরিক ক্ষমা চাইলে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দেবেন বলে তাঁর অসীম করুণার কথা বহুবার বলেছেন। কিন্তু মানুষকে মানুষের মানদণ্ডে স্থান দিতে না পারলে যে আমাদের ভিত্তির উপর চরম হুমকি দিয়েছে। পরোক্ষভাবে আমাদের কাফের বলা হয়েছে। তবে এর থেকে পরিত্রাণ পাবার কি কোনই উপায় আমাদেকে বলে দেওয়া হয়নি? আমাদের ভিত্তি যেন কেঁপে না উঠে। আমরা যাতে কাফের না হই তার জন্য অসাম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

আমরা অসাম্যের ভিত্তি যে গড়ে তাকে বলবো, আমাদের ঈমান ফিরিয়ে দাও। আমরা যাতে কাফের না হই তার ব্যবস্থা কর, না হয় অসাম্যের ভিত্তি গড়তে দেব না। আমরা আমাদের ধর্মের জন্য হাসতে হাসতে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে পারবো। আমরা আমাদের ধর্মের জন্য এক একটি ডিনামাইটের টুকরো। যখন কোটি কোটি ডিনামাইটের ভীষণ গর্জন হবে তখন অসাম্যের ভিতে গড়া প্রাসাদ ভেঙে খান খান হয়ে যাবে। আমাদের কাফের হবার ভয় হতে পরিত্রাণ পাবার ব্যবস্থা কর। আমাদের ঈমান আমানত রক্ষা করা না হলে কেউ তোমাদের অসাম্যের ভিত আর গড়তে দেব না। এই ধর্মীয় বিস্ফোরণ হবে ভয়াবহ ভীষণ। আমরা আমাদের ঈমান রক্ষার তরে বন্যার বাঁধভাঙ্গা পানির মতো হু হু করে তোমাদের অসাম্যের ভিত এবং তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাব। আমাদেরকে আর কতদিন ইসলামের উপর গড়মিল করে, 'দুই তিনে দশ হয়' বলে গোঁজামিল দিয়ে চোখে ঠুলি পরিয়ে রাখবে? ধুঁয়ো দেখতে পেলে সেখানে 'আগুন নেই, ঠাণ্ডা পানি আছে', বলে আর কতদিন প্রতারণা

করবে? আমরা জানি ধুঁয়ো থাকলে সেখানে আগুন থাকতে বাধ্য। এই সাম্যের অধিকার ইসলামের আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠা না করলে যে রসুলাল্লাহ (দঃ)-এর চরম হুমকি- 'কেহই মুসলমান হতে পারে না।' তার পরিণাম যে সুনিশ্চিত কাফের টাইটেল নিয়ে ইহকাল ত্যাগ করতে হবে তা আমরা ভাল করেই বুঝি। যেমন আমরা অতি সহজেই বুঝি, সব মানুষ মরবে। আমি একটি মানুষ, তারপর আমার কি হবে বলে কেউ প্রশ্ন করে, তা হলে আমরা ভাল করেই বুঝি যে, আমাকেও মরতে হবে। উপসংহারে এই বলা যেতে পারে যে, বিশ্বাসীরা সবাই মিলে একটি ভ্রাতৃসংঘ। এই সংঘ যদি সকল মানুষ তথা প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গী রক্ষা না করতে পারে তবে মুসলমানরূপে আখ্যায়িত হয়ে থাকাই যায় না।

আত্মকেন্দ্রিকতার উপরে এই হাদীস যে চরম আঘাত হেনেছে তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। 'ক্লাস প্রিভিলেজ ' অর্থাৎ শ্রেণীস্বার্থের উপর প্রবল আঘাত করে সাম্যের ভিত্তির উপর স্থাপন করা হয়েছে মানুষের চিন্তাধারা। বস্ত-বণ্টন, আধ্যাত্মিক অবস্থা, সুখ- দুঃখের অনুভুতি এবং মানবীয় সর্ব প্রকার শিক্ষা ও উৎকর্ষের উপরেও সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাই করা হয়েছে। শুধু মৌলিক প্রয়োজনের বিষয়েই প্রতিবেশীর অধিকার মেনে নেওয়া হয়নি, বরং ললিতকলা, শিক্ষা ইত্যাদি সকল বিষয়ই নিজের জন্য যা এবং যতটুক পছন্দ করা তা সকল ভাইদের জন্য পছন্দ করতে হবে। নতুবা সে বিশ্বাসী থাকতেই পারে না। ইহাই ঈমানদার মুসলমানের স্বরূপ। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলাল্লাহ(দঃ) বলেছেন, 'কসম আল্লাহর, সে ঈমান আনেনি। 'জিজ্ঞাসা করা হ'ল, 'কে সে রাসুলাল্লাহ(সঃ)?' তিনি বলেন, 'সে, যার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় তার অপকারিতা হতে।' *(বোখারী এবং মোসলেম শরীফ)* ।

বার বার সাবধান করে দিচ্ছেন রাসুলাল্লাহ(সঃ) প্রতিটি মানুষকে, যারা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান আনার দাবী জানায়। এই হাদীসটিতে হুজুর পাক (সঃ) আমাদেরকে প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের এমনভাবে তাগিদ দিচ্ছেন, যা পালন করতে না পারলে মহান আল্লাহকে সাক্ষী করে বলেছেন যে 'সে ঈমান আনে নি।' শুধু একবার? পর পর একই সাবধান বাণী তিনবার হুজুর পাক (সঃ) উচ্চারণ করাতে সাহাবীদের সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছে। ভয়ে ও বিস্ময়ে তাই সাহাবারা ভেবেছে যে, কি সেই কাজের দায়িত্ব যা পালন করতে না পারলে 'আমরা ঈমানই আনিনি' সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে যাব। তিন-তিনটি বার হুজুর পাক (সঃ)-এর পবিত্র মুখ হতে একই কথা উচ্চারণ হল- যিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও জীবনে উচ্চারণ করেননি। তাই সাহাবারা প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাঃ), কে সেই ব্যক্তি যে ঈমান আনে নি?' রাসুলল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'সেই ব্যক্তি, যে তার প্রতিবেশীর কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে না- অর্থাৎ প্রতিবেশী নিরাপদ থাকতে পারে না।' সেই নিরাপদ কি এবং নিরাপদ বলতে কি বোঝায়? প্রতিবেশীর সর্বপ্রকার অভাব-অভিযোগের কোন সমাধান যারা দিতে চায় না, প্রতিবেশীর এই সমস্ত অভাব-অভিযোগের সুষ্ঠু মীমাংসা জানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও যারা বিপদ হতে প্রতিবেশীকে নিরাপদ করলো না, তারা ঈমান আনেনি। অর্থাৎ বিশ্বাসীর প্রথম পর্যায়েও তাদের স্থান নেই। হুজুর পাক (সঃ)-এর শিক্ষা ও আদেশকে শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন বলেই অন্যতম সাহাবা হযরত উমর(রাঃ) উটের পিঠে যতটুকু বসে যেতেন ঠিক ততটুকু তার ভৃত্যকেও বসতে দিয়েছেন এবং উটের পিঠে বসিয়ে দিয়েই তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি, বরং নিজে সেই উটের রশি ধরে গরম বালুর উপর পায়ে হেঁটে উট বয়ে নিয়ে গিয়েছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে বলুন তো, এর চেয়ে চরম সাম্য আর কি হতে পারে? আরব জনসাধারণকে একবার হযরত উমর(রাঃ) কাপড় ভাগ করে দিলেন। জামা হোক বা না হোক সেই

প্রশ্ন না করে তিনি সকলকে সমান টুকরা করে দিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল কারো জামা হয়নি সেই ভাগ করা কাপড়ের টুকরা দিয়ে। সমান বণ্টনের কাপড় দিয়ে শুধু একজনের জামা হয়েছিল এবং যার হয়েছিল তিনি স্বয়ং হযরত উমর (রাঃ)। জুমার নামাজের পূর্বে খোৎবা-পাঠে উদ্যত হতেই আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) উমর (রাঃ)-কে বাধা দিলেন এবং বললেন, 'আমার কথার উত্তর দিতে হবে, না হলে আপনি খোৎবা পাঠ করতে পারবেন না।' হযরত উমর (রাঃ) উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রঃ) বললেন, 'আমাদের যে কাপড় সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন তাতে কারোরই জামা হয়নি, কিন্ত আপনার জামার কাপড়ে কি করে জামা হল?' উমর (রাঃ) বললেন 'আপনার প্রশ্নের উত্তর আমার ছেলে দিবে।' উমরের পুত্র দাঁড়িয়ে বললেন, 'একটুকরো কাপড় দিয়ে আমাদের কারো জামা হল না বলে আমার কাপড়ের টুকরোটি বাবাকে দিয়েছি। বাবার জামার মাঝে কাপড়ের তালির ভারও সইতে পারে না বলে চামড়ার তালি লাগিয়ে পরছেন।'

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ বলেন, 'সমস্ত দুনিয়ার সম্পদের দাম যদি একটি মাছির একটি ডানার সমান বলেও মনে হত তবে পথভ্রষ্টদের তথা কাফেরদেকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতাম না।' হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুজুর পাক (সঃ) একটি কানকাটা মৃত ছাগলের বাচ্চার কাছ দিয়ে চললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন (সাহাবাদের), 'তোমাদের মধ্যে কে চায় যে, ইহা এক দিরহাম দিয়ে কিনবে?' তারা বললেন, 'আমরা ইহা কিছু দিয়ে নিতে চাই না।' তিনি বললেন 'তবে কসম আল্লাহর, দুনিয়া তুচ্ছতর তোমাদের এই ছাগলের বাচ্চা হতেও।' *(মোসলেম শরীফ)।*

মুস্তাওরিদ- বিন- শাদ্দাত হতে বর্ণিত আছে , হুজুর পাক (সঃ) বলেছেন ,'কসম আল্লাহর দুনিয়ায় আখিরাতের (সঙ্গে তুলনায়) তেমনি, যেমন কেহ আঙ্গুল সাগরে ডুবিয়ে দেখে কতটা পানি এনেছে উহা।' *(মোসলেম শরীফ)।* হুজুর পাক (সঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ এমন কোন বস্তু সৃষ্টি করেননি যা তার দৃষ্টিতে দুনিয়া অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত এবং শত্রু।'

হুজুর পাক (সঃ) বলেছেন, 'ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠার সঙ্গে সঙ্গে যার আন্তরিক আকর্ষণ বেশির ভাগ উপার্জনের দিকে হয়, সে ব্যক্তি কখনো আল্লাহভক্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তার জন্য দোজখ অবধারিত।'

হুজুর পাক (সঃ) বলেছেন, 'কেয়ামতের মাঠে এমন কতগুলো লোক উপস্থিত হবে যাদের পুণ্য কার্যসমূহ 'তেহমা' পর্বতের মতো উঁচু হবে, তথাপি তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।' উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ (সঃ)! এরা কি নামাজী লোক নহে?' হুজুর পাক (সঃ) বললেন 'হ্যাঁ, তারা নামাজও পড়েছে। রোজাও রেখেছে। সারারাত জেগে নফল ইবাদতও করেছে। কিন্ত দুনিয়ার সুখ-সম্পদের মধ্যে মত্ত থাকার কারণে তাদের এই দুর্গতি হবে।' হুজুর পাক (সঃ) বলেছেন, 'হয়তো অচিরেই আল্লাহ তোমাদেরকে পার্থিব সম্পদ প্রচুর পরিমানে দান করবেন, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন এবং তারা যেরূপ সেই ধন-সম্পদ পেয়ে পরস্পর ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্ত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, আমার ভয় হয়, তোমরাও সেইরূপ ধন-সম্পদ পেয়ে পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হবে।' হুজুর পাক (সঃ) বলেছেন, 'কোনক্রমেই তোমরা দুনিয়ার চিন্তায় মগ্ন হয়ো না।'

হুজুর পাক (সঃ) বলেছেন, 'দুনিয়া তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তোমাদের ধর্মকে এমনভাবে খেয়ে ফেলবে যেমন আগুন শুকনো কাঠের টুকরোকে ছাই করে ফেলে।' হুজুর পাক (সঃ) বলেছেন, 'দুনিয়া হতে আত্মরক্ষা কর। ইহা হারুত-মারুত অপেক্ষাও অধিক যাদুকর।'

উপরের হাদীস কয়টির বিশদ বর্ণনা করতে গেলে আমরা দিবালোকের মত স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, দুনিয়ার সম্পদের কোন মূল্য নেই। এই মূল্যহীন পার্থিব সম্পদকে নিয়ে টানা-হেঁচড়ায় সচেষ্ট থাকলে আমরা যে কি করে মুসলমান বলে বিবেচিত হই তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। ভোগ-বিলাসের প্রতিই যদি ইসলামের দৃষ্টি প্রখর থেকে থাকে তবে কেন ভোগের উগ্রতাকে আল্লাহ-লাভের এত বড় অন্তরায় বলে ঘোষণা করা হল? পেট ভরে দুটো সমান বণ্টন করে খেলেই আর্দশের সৃষ্টি হয় না। দু' বেলা খাওয়াটাই আমাদের নজরে বেশি পড়ে বলে নৈতিক আদর্শ হারিয়ে শুধু 'আমরা খাব, আমরা খাব', বলে কোটি কোটি মানুষের গ্রাসকেও ছিনিয়ে নিতে দ্বিধাবোধ করি না। এই জঘন্য প্রথাকে চালু রাখার জন্য আমরা কতো রকম দোহাই না দিতে শিখেছি! অথচ ইসলামের নীতিতে মাছির একটি ডানার সমান মূল্যও নয় যে সম্পদ, একটি মরা কানকাটা ছাগলের বাচ্চার চেয়েও তুচ্ছতর যে সম্পদ, সেই সম্পদকেও ইসলাম-এর বুলি ঠুকে, টেরা চোখে সমান বণ্টন তথা সাম্যবাদ বর্জন করে, দানছত্র খুলে উদারনীতির ভেক ধরে, 'ইচ্ছাশক্তির' যাঁতাকলে ফেলে ভণ্ডের মত ইসলামের প্রকৃত আদর্শের মুখে অতি গোপনে কলঙ্ক লেপন করছি।

দুনিয়ার পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকা শকুনীরা আবার সম্মানের আশা করে! কতদিন আর মানুষের পাঁজর ভেঙ্গে খুন বের করে তোমার বিলাসিতার উপকরণ যোগাবার জন্য ঢেলে দেবে? এই মোহরের দাসদের, যারা মোহর জমা করার তরে মানুষের মানবতার পোশাক ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, এই দেরহামের দাস অর্থাৎ টাকার কুমীরেরা মানুষের বুকে যমদূত সেজে মানুষের রক্ত-মাংসের দেহের উপর রক্ত কণিকার স্রোতে রচনা করে দেশ ও জাতির স্থায়িত্ব আর উন্নতির জয়যাত্রা। এই বিলাসী ডোরাদার কাপড়ের দাসেরা নিরীহ জনসাধারণের উপর চালিয়ে যায় অত্যাচারের বিশ্রী স্টিম রোলার। কিন্তু কেন আমরা, খেতাবধারীরা, নীরবে এত অত্যাচার-অবিচার সহ্য করবো? নীরবে সহ্য করাটাও অন্যায়। তাতে অত্যাচারের সীমা পেরিয়ে ভয়াবহতার করুণ দৃশ্য ফুটে উঠে সমাজের প্রতিটি ভাঙ্গা কুটিরে। প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর দেওয়া এই বিধানকে সত্য জেনেও যদি আমরা কার্যে পরিণত না করি তবে আল্লাহ তাঁর পবিত্র কোরানে বার বার ঘোষণা করেছেন অভিশাপের হুমকি। বার বার আমাদেরকে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ না করে আমাদের ভাগ্যকে পরির্বতন করার তরে রুখে দাঁড়াতে বলেছেন, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সংগ্রাম করার কঠিন শপথ নিয়ে আমাদের জাতীয় ভাগ্যকে পরির্বতন করতে বলেছেন। যদি তা না করে শুধু হাঁ করে আহা-উঁহু করি আর কুঁড়ের মত দাঁড়িয়ে তামাশা দেখি তবে আল্লাহ আমাদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করবেন না। ইহা কোরানের স্পষ্ট আদেশ। আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে লাখো মানুষ বোবার মত জীবন দিতে পারি কিন্তু তবুও আল্লাহ এবং রাসুলাল্লাহ (সঃ)-এর অমৃতবাণীকে বুকে নিয়ে সংগ্রাম করার তরে ঐ মোহরের দাসদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাই না। আমাদের ধর্মীয় চেতনা আর দর্শনকে 'মনমে শেখ ফরিদ বোগল মে ইট'-এর ছাঁচে গড়ে নিয়েছি। তার জন্য আমাদের ভাগ্যে দিনের পর দিন ঘন অন্ধকারের মত নেমে আসছে অশান্তি আর অভিশাপ। আল্লাহ এবং রাসুলাল্লাহ (সঃ) বুঝতে পারেন আমাদের এই মরুভূমির তপ্ত বালুতে মরীচিকার বালুজলের উত্তাল তরঙ্গের ফসফসানি। আমাদের ধর্মীয়চেতনা আর দর্শন দূর হতে জলের উত্তাল তরঙ্গের শব্দ, কিন্তু তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে কাছে এগিয়ে এলে খৈ-ফোটা গরম চিক চিক করা বালি আর বালি।

আল্লাহ আহ্বান জানাচ্ছেন - কে আছ, কে মোহরের দাসদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নিজের ভাগ্যকে পরির্বতন করতে চাও? কিন্তু সমাজ-জাতি তো দূরের কথা, ব্যক্তি বিশেষও মোহরের দাসদের, যারা ধর্মের মুখোশ পরে লালন-পালন করছেন সেই প্রধান মোহরের দাসদের উচিত শিক্ষা দিয়ে হুজুর পাক(সঃ)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার তরে এগিয়ে আসতে দ্বিধাবোধ করছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুজুর পাক (সঃ) বলেছেন, 'ধ্বংস হোক দিনারের দাস, দেরহামের দাস আর ডোরাদার কাপড়ের দাস। যদি দেওয়া হয় তাকে, সে সন্তুষ্ট হয়, আর যদি না দেওয়া হয়, অসন্তুষ্ট হয়-ধ্বংস হউক সে, লাঞ্ছিত হউক সে।' *(বোখারী শরীফ)।*

ইসলাম মানুষকে তার দৈহিক সমান প্রয়োজনের মানদণ্ডের বিচার করে ঘোষণা করেছেন, রাষ্ট্রনায়ক খলিফা উমরের উটের পিঠে বসে যাবার যতটুকু অধিকার, ঠিক ততটুকু বসে যাবার অধিকার উট-চালকের আছে। উটের পিঠে কি রাষ্ট্রনায়কেরই বসার অধিকার? উট-চালক গরম বালুর উপর হেঁটে উট চালিয়ে যাবে? তার কি বসার অধিকার নেই? উট-চালক যতটুক উট চালাবে এবং উটের পিঠে বসবে ঠিক সেই পরিমাণ অধিকার রাষ্ট্রনায়কের আছে। ইসলাম বার বার ঘোষণা করেছে, খবরদার এই ইনসাফ, এই সাম্য, এই মানবতা, এই আর্দশ হতে ক্ষণিকের তরেও সরে দাঁড়িও না। তুমি শাহীখানা খাচ্ছ? খাও। কিন্তু তোমার দেশে লাখো ভুখা তোমারই মত মানুষ? তাদেরকে শাহীখানা খেতে দাও। লাখো মানুষকে খেতে দিতে পারছ না? তবে তুমিও শাহীখানা খেতে পারবে না। নিজে তো মিষ্টি খুব খাও। আর আমাদের বেলায় ভুখা থাকার উপদেশ দিচ্ছ। তুমি যতটুকু খাবে অন্যকেও ঠিক ততটুকু খাওয়াবে। দেবে না? রুখে দাঁড়াবো। দাঁড়াবো হুজুর পাকের (সঃ) আদর্শ বুকে নিয়ে। তোমার স্বৈরাচারিতাকে চিরতরে শেষ করে দেবার জন্য আমরা এগিয়ে আসবো। তোমার সাথে মানুষ খুন করার 'স্লো পয়জন' তথা মন্থর বিষ আছে। আর আমাদের সাথে আছেন হুজুর পাকের (সঃ) মানুষকে আমাদের মত মনে করে গ্রহণ করার অমৃত বাণী।

তুমি ডোরাদার বিলাসী পোশাক পরেছ। আমাদেরকে ঠিক সেই মূল্যের পোশাক পরতে দাও। মনে রেখ, তুমি যা খাবে এবং পরবে আমাদেরকেও ঠিক তাই দিতে হবে। ঐ দেখ হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ) যখন ভৃত্যকে গালি দিয়েছিলেন, হুজুর পাক (সঃ)তৎক্ষণাৎ হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, 'কেন ওকে গালি দিচ্ছ? তুমি কি ভুলে গেলে যে, সে তোমারই ভাই? তুমি যা খাবে এবং পরবে তাকে তাই দিতে হবে। আমি দেখছি এখনো জাহেলী যুগের প্রভাব তোমাদের ভেতর কাজ করছে।'

ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছে, 'ইসলামই দৈহিক ও মানসিক সর্বপ্রকার দাসত্ব হতে মুক্তিদানের বিধান।' দৈহিক দাসত্ব বলতে ধারণা করতে পারি যে দৈহিক দুঃখ-কষ্ট-যাতনা ইত্যাদি প্রধানত দাসত্ব। অভাবে-অনাহারে একটি মানুষ দিনের পর দিন ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে অথচ ভোগ-বিলাসে ডুবে থেকে অপর আর একটি তারই মত মানুষ জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। এই দুটো মানুষের দৈহিক জীবনধারার একটিও ইসলাম মেনে নেয়নি। তাই ইসলাম মানুষকে তার দৈহিক প্রয়োজনের উপযুক্ত মানদণ্ডে বিচার করে ঘোষণা করেছে, তোমার দৈহিক জীবনধারণের মুক্তির তরে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু অপর একটি মানুষের বেলাতেও প্রয়োজন। ইহাই ইসলামের সামাজিক আইন অর্থাৎ বিধান। উপসংহারে এই বলতে পারি যে, জাতীয় সম্পদকে সমানভাবে বণ্টন করে দিতে হবে। প্রতিটি মানুষ যাতে দৈহিক দাসত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্তি পেতে পারে তারই তরে আমাদেরকে আল্লাহ এবং হুজুর পাক (সঃ) বার বার স্পষ্ট ভাষায় সর্তক করে দিয়েছেন। মানুষের মাঝে যাতে দৈহিক মুক্তির তরে অসাম্য না দেখা দিতে পারে তারই জন্য দুনিয়ার পার্থিব সম্পদের যে কোন মূল্যই নেই সেই কথা কোরআন

এবং হাদীস শরীফে শত শত বার শত শত শৈলীতে প্রকাশ করে আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। এত সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও যারা মুসলমানের মুখোশধারণ করে জাতীয় জীবনে অসাম্য তৈরী করে জাতীয় দৈহিক ও মানসিক জীবনকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে দিচ্ছে সেই বক-ধার্মিক মুখোশ-পরা ভণ্ড মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে , প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করতে এবং সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে আল্লাহ এবং হুজুর পাক (সঃ) বহুবার ঘোষণা করেছেন।

একটা গোটা জাতির দৈহিক জীবনে অসাম্য তৈরী করে সামান্য মুষ্টিমেয় স্বার্থপর ব্যক্তি দৈহিক উপকরণ অর্থাৎ পার্থিব সম্পদ নিজেদের ভোগ-বিলাসে ঢেলে দিচ্ছে। ঐ স্বার্থপর মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ধর্মের নামে বড় বড় বুলি আউড়িয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে। তাদেরই উঁচু দালানের দ্বারে লাখো মানুষ কেঁদে বেড়ায় -আকুল আবেদন জানায়, কিন্তু তাদের মন থাকলেও কাতর কান্নাকে অনুভব করার শক্তি তারা হারিয়ে ফেলেছে। দৃষ্টিতে ঐ লক্ষ দীপ্তিহীন কালো বৃত্তের ভেতর চোখের তারাগুলো তারা দেখতে পায় না। হুজুর পাক (সঃ) আমাদেরকে এই সমস্ত স্বার্থপর ব্যক্তিদের স্বভাব বর্ণনা করে বলেছেন, 'তাদের মন আছে বটে, বুঝবার শক্তি নেই। তাদের কান আছে, শুনতে পায় না। তাদের চোখ আছে, দেখতে পায় না। তারা জানোয়ারের মত হয়ে গেছে, বরং তার চাইতে অধম। এরাই চরম ঔদাসীন্যে ডুবে আছে।'

এই মূল্যহীন পার্থিব সম্পদ ইসলামী রাষ্ট্রের সাম্যের ভিত্তি ও দর্শনে কেন যে প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না তা সত্যিই ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ভাবিয়ে তোলে। কান-কাটা মরা ছাগলের মূল্যও দুনিয়ার সম্পদ হতে তুচ্ছতর, আর সেই তুচ্ছতর সম্পদকে নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্র কেন অসাম্যের ভিত গড়ে? সমাজ এবং জাতির মেরুদণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় অসাম্য।

যে শাসনতন্ত্র বা আইন প্রথমেই রচনা করে রেখেছে অসাম্যের বীজ সেই শাসনতন্ত্রের প্রতিটি ধারায় আবার আমাদের রচনা করতে হবে সাম্য অর্থাৎ মানুষকে মানুষের মানদণ্ডে বিচার করে সমান অধিকার প্রদানের স্বীকৃতি। মানুষের সমান অধিকার হতে মানুষকে বঞ্চিত করে এক লোকমা খাদ্য, একখণ্ড বস্ত্র অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে মানুষের মানবিক সম্মানকে অন্যায় ও নিষ্ঠুরতায় পদদলিত করে যারা, আল্লাহ নিশ্চয়ই মহাবিচার দিবসে জাহান্নামের আগুনে তাদেরকে বিভিন্নরূপে কঠিন শাস্তি প্রদান করে তাদের তথাকথিত সম্মানকে নষ্ট করবেন। আল্লাহ পাক বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের এক লোকমা খাদ্য অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, মহান আল্লাহ ইহাদেরই ন্যায় জাহান্নামের এক লোকমা তাকে খেতে দেবেন। যে অন্যের একখণ্ড বস্ত্র অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, আল্লাহ ইহার ন্যায় জাহান্নামের একখণ্ড বস্ত্র তাকে পরাবেন। যে অন্যায়ভাবে অপরের সম্মান নষ্ট করে, আল্লাহ বিচারের দিন তার সম্মান নষ্ট করবেন।' *(আবু দাউদ শরীফ)।*

পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসতে হবে। ভালবাসার দাবী তখনই স্বীকৃত হয় যখন একে অপরের সুখ-দুঃখে সমানভাবে শরিক হতে পারে। তখনই হয় প্রকৃত সাম্যের প্রতিষ্ঠা। মানুষকে তার মৌলিক দাবী হতে বঞ্চিত করে, আমার মত সুখ-দুঃখের অনুভুতি যে তাদেরও সমানই আছে, আমার মুখে মরিচ ঝাল আর চিনি মিষ্টি অনুভব করার শক্তি যতটুকু আছে, তাদেরও সেই অনুভব করার সমান শক্তিই আছে। এইভাবে প্রত্যেক বিষয় হতে বঞ্চিত-অবহেলিত করে না রেখে আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসা দিয়ে মেকী কান্নার প্রীতি ছাড়ানো গোঁজামিল করে রাখা দেশের শাসনতন্ত্র বা আইনকে সম্পূর্ণরূপে ধুয়ে-মুছে সব মানুষের সমানভাবে বাঁচবার অধিকারের আইনে গড়ে তুলবো মানবতার খাঁটি তাজমহল। রক্তশোষক ভাইপারের পাঁজর নিঙড়ানো রক্ত-কণিকায় গড়া অভিশপ্ত

তাজমহল নয়। কালের অভিশপ্ত পাথরে তাজমহল ফিউড্যাল দর্শনে দর্শীয়ান কাগজের ব্যাঘ্রদের নীল আটা স্বর্ণালী চশমার ফ্রেমে অতি সুন্দর যৌন প্রেমের নগ্ন বিশ্রী গন্ধ সন্ধান করে।

যদি আমরা পরস্পরের প্রতি এই ভালবাসা প্রদর্শন করতে না পারি তবে আমাদের মাঝে কখনোই ঈমান আসতে পারে না। যদি ঈমান না আসে আমাদের মাঝে তবে বেহেশতে কি করে যেতে পারবো? ঈমানের প্রশ্ন তুললেই যেখানে বাদ পড়ে যাই সেখানে বেহেস্তের প্রশ্ন তো দূরের কথা। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলাল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বেহেস্তে যেতে পারবে না। এবং পরস্পরকে ভাল না বাসলে ঈমান আসতে পারে না। আমি কি তোমাদের এমন কার্যের সন্ধান দেব না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে? তোমাদের ভেতর শান্তি বিস্তার কর।'*(মোসলেম)।*

পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালবাসার মৌলিক দাবী দেশ ও জাতির বুকে প্রতিষ্ঠা করার তরে যদি আমরা বোবা দর্শকের মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকি, তার পরিণাম যে স্পষ্টভাবে কাফের টাইটেল নিয়ে জাহান্নামে যেতে হবে সে বিষয়ে হুজুর পাক (দঃ) স্পষ্ট ভাষায় আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। আমাদেরকে তাই 'কাফের হয়ো না' বলে তিনি সতর্ক করেছেন। মানুষের গ্রীবাদেশে আঘাত হেনে মৌলিক দাবী হতে মানুষকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে বারণ করে দিয়েছেন।

হযরত জোরাই (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলাল্লাহ (দঃ) বিদায় হজ্বে বলেছেন, 'আমার পরে তোমরা কাফের হয়ো না এবং পরস্পর পরস্পরের গ্রীবাদেশে আঘাত করো না।' *(বোখারী এবং মোসলেম শরীফ)*

মূল্যহীন পার্থিব সম্পদকে আত্মসাৎ করে অপর ভাইদের বঞ্চিত করে যারা সমাজের বুকে ভদ্র এবং ধনী সাজে তারা কাফের। শুধু কি কাফের? এরা মানব সমাজের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলে। এরা ভুলে গিয়েছে যে, সকল মানুষের প্রাণের মূল্য সমান। মানুষকে কৌশলে বাধ্য করে তাদের গোলাম বানিয়ে রেখে মানুষের প্রাণের সমান মূল্যবোধের সাম্যবাদকে নিষ্ঠুরের মত উপড়িয়ে ফেলে দিয়ে করুণ হা-হুতাশের বেদনার্ত ছবি মানুষের বুকে এঁকে দিয়েছে। মানুষ যে তাদেরই মত একই প্রাণের অধিকারী, তারা তা গর্বের সহিত অস্বীকার করে। তারা ভুলে গিয়েছে হুজুর পাকের (দঃ) আবেদন আর সতর্কবাণী। হুজুর পাক (দঃ) বলেছেন, 'সকল মুসলমানের প্রাণের মূল্য সমান।' আল্লাহ বলেন, 'বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভ্রাতা।' তারা অস্বীকার করে আল্লাহ এবং হুজুর পাকের (দঃ) দেওয়া সাম্যবাদ। তারা মানুষের বুকের উপর প্রকাশ্যে রচনা করে মানুষের রক্ত দিয়ে ভোগ-বিলাসের পাথর-প্রাসাদ। মানুষকে বোকা বানাবার জন্য, মানুষের চোখে কলুর বলদের ঠুলি পরিয়ে দিয়ে মসজিদ ঘরে মুসলমান সেজে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে। কিন্তু আফসোস! এই ভণ্ডদের সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য আমরা এগিয়ে আসি না। আমাদের এই দিনের পর দিন নীরবতার দরুন তারা তৈরী করে রাখে নিরাপত্তার লৌহপ্রাচীর।

আমাদের প্রাণের মূল্য যে তোমাদের প্রাণের মত সমান তা তোমরা উপহাসের হাসি তুলে উড়িয়ে দিয়েছ। আমাদেরকে দাসের আধুনিক সংস্করণ বানিয়ে তোমরা পশুর মত ব্যবহার করছ, কিন্তু তোমাদের বাইরের দিকটি এত চতুরতার নাগপাশে ঘিরে রেখেছ যার জন্য সহজে আমরা বুঝে উঠতে পারি না। মানুষ কোনদিন মানুষের দাস হতে পারে না। মানুষ আল্লাহর দাস। আল্লাহ আমাদের মালিক তথা প্রভু। আল্লাহ বহুবার ঘোষণা করেছেন যে, আসমান-জমিনের একমাত্র মালিক হলেন তিনিই, অন্য কেউ নয়।

হুজুর পাকের (দঃ) দেওয়া সাম্যবাদ মানুষকে দেয় মানুষের মানবিক দাবী প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান। মানুষ হয়ে মানুষের কাছে ছোট-বড় ভেদাভেদ নেই - সব মানুষের প্রাণের মূল্য সমান। নিজের জন্য যা পছন্দ অপরের জন্য তা করা মেনে না নিলে মুসলমান হতেই পারছি না। আমাদের প্রথমে তাই মুসলমান হবার সীমানাতে দাঁড়াতে হবে। তারপরের প্রশ্ন আসে আমিত্ব হারিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ প্রচেষ্টা তথা সালাত কায়েম করার কথা। যাঁরা আমাদের 'মুসলমান হতেই পারিনা'-কে স্বীকৃতি দেবার আমলটুকুও রাখে না, তারা কি শুধু কাফের? তারা তো আল্লাহ এবং রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। যারা আল্লাহ এবং রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তাদের বিরুদ্ধে কি আমাদের যুদ্ধ করতে বলা হয়নি? কিন্তু আমরাও তো রসূলের মহব্বত উপেক্ষা করে নিজেদের প্রাণের ভয়ে চুপ করে আছি।

হুজুর পাককে (দঃ) নিজের প্রাণ এবং সমস্ত কিছু হতে মহব্বত করতে হবে। হুজুর পাক (দঃ) বলেছেন, 'কেহই ঈমানদার হয় না যতক্ষণ না আমি তার নিকট প্রিয়তর হই তার পিতা এবং সন্তান হতে এবং সমগ্র মানবজাতি হতে।' *(বোখারী এবং মোসলেম শরীফ)*। কিন্তু আমরাও কি তা মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পেরেছি? যদি তাই পারতাম তবে হুজুর পাকের (দঃ) দেওয়া সাম্যবাদ এতদিনে নিশ্চয়ই সমাজের বুকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতো। আমরাও তো থুতনিতে দাড়ি, মাথায় টুপি, মুখে আল্লাহ রসূল এবং বগলে ইট লুকিয়ে রেখে হুজুর পাকের (দঃ) প্রতি মহব্বতের নহর জারি করতে চাই। দাড়ি রাখা একটি সুন্নত, কিন্তু নিজের জন্য যা পছন্দ করি অপরের জন্য তা করতে না পারলে কি সেই সুন্নতের দাবী এখনো করতে লজ্জা হয় না?

হুজুর পাক (দঃ) বলেছেন, 'মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যার রসনা এবং হস্ত হতে অন্যান্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।' *(বোখারী এবং মোসলেম শরীফ)*।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, 'আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী। আমাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিন যাহা হতে আমি উপকার পেতে পারি। তিনি বললেন, মুসলমানদের পথ হতে অনিষ্টকর পদার্থ দূরীভূত কর।' *(মোসলেম শরীফ)*।

হুজুর পাক (দঃ) বলেন, 'পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করো না। পরস্পর পরস্পরকে বিপদে ফেল না। আল্লাহর বান্দাগণকে ভ্রাতা বলে গণ্য করো।' *(বোখারী এবং মোসলেম শরীফ)*।

হুজুর পাক (দঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের হতে অপবাদ দূর করে, দোজখ হতে তাকে মুক্তি দেওয়া আল্লাহর কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।' *(বাইহাকী)*

হুজুর পাক (দঃ) বলেন, 'বেহেশেতে সূক্ষ্ম রেশম বস্ত্র আবৃত ইয়াকুতের স্তম্ভ আছে, ইহাতে খোলা দরজা আছে। দীপ্তিমান নক্ষত্রের মত ইহা আলো বিকীরণ করছে।' তারা জিজ্ঞাসা করল- 'হে আল্লাহর রসুল। কারা তাতে বসবাস করবে?' তিনি বললেন, 'যারা আল্লাহর জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে, যারা আল্লাহর জন্য মজলিসে বসে এবং যারা আল্লাহর জন্য পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাত করে।' *(বাইহাকী)*।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুজুর পাক বলছেন 'বেহেস্তে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে আছে বিন্দু পরিমাণ গর্ব।' এক ব্যক্তি বললেন, মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হয়, জুতা সুন্দর হয়। তিনি বললেন, 'আল্লাহ সুন্দর এবং পছন্দ করেন সৌন্দর্য। হচ্ছে হক অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।' *(মোসলেম শরীফ)*।

হযরত ইবনে মাসউদের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি অত্যন্ত সুন্দর, চাতুর্যপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত এবং বিজ্ঞানময় সার্বজনীন আহ্বান এবং বিশ্ববাসীকে ভীষণভাবে হুমকি প্রদান করছে তাদের পরকালভিত্তিক জীবনব্যবস্থার উপর। এত স্পষ্ট এবং সার্বজনীন হুমকির মানদণ্ড গোষ্ঠি বা বিশেষ

কোন সমাজকে উল্লেখ করে দেওয়া হয়নি। জগতের প্রতিটি অস্থি-মাংসে গড়া মানবদেহের অধিকারী মননশীলতার একমাত্র মূর্ত প্রকাশকের বাহক মানবজাতিকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে কোন মানুষের মনে একটি তিলের পরিমাণ মত গর্ব তথা অহঙ্কার ধারণ করে থাকলে তার জন্য বেহেস্তে প্রবেশ করা নিষেধ জারি করা হয়েছে। এত বড় হুমকি যে, ভয়ঙ্কর আরসেনিক বিষ মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে যেমন সজীব দেহটাকে মৃত্যুর কোলে চিরঘুমে ঘুমিয়ে রাখে, সেরকম একবিন্দু গর্ব যার মনে স্থান পাবে, জাহান্নাম অর্থাৎ নরকের আগুনে যে-কালের আর শেষ নেই সেই অনন্তকালের তরে বাসস্থান হবে।

এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে যে, সেই মারাত্মক গর্বটা কি এবং উহা কাকে বুঝানো হয়েছে? তাই একজন সাহাবা হুজুর পাক (দঃ)-কে প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছেন যে সুন্দর পোশাক এবং সুন্দর জুতা পরিধান করাই কি তবে গর্বের অন্তর্ভুক্ত? কিন্তু হুজুর পাক (দঃ) গর্ব কাকে বলে এবং গর্বটা কি তাহাই অতি সুন্দর এবং অতি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন। একটা মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন হয় ঠিক অপর একটি মানুষের জন্যও তাহাই প্রয়োজন হয়। প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার এই সমান প্রয়োজন যারা প্রকাশ্যে কি গোপনে অস্বীকার অর্থাৎ মেনে নিতে রাজি নন তাদের এই মেনে না নেওয়াকে গর্ব বলা হয়েছে। কারণ, এই মেনে না নেওয়াটাকেই মানব জাতির মানবীয় দাবীর হককে অস্বীকার করা বুঝায়। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে যে হাসি এবং কান্না জড়িয়ে হৃদয়খানা গড়ানো হয়েছে- পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার তরে সমান অধিকার রয়েছে- এরকমভাবে মানবের সার্বজনীন দাবীগুলোকে 'ইজমের' মুখোশ মুখে লাগিয়ে অস্বীকার করার নামই হল মানুষের হক অস্বীকার করা, আর এই হক অস্বীকার করাকেই হুজুর পাক (দঃ) আখ্যা দিয়েছেন গর্ব, এবং এরূপ গর্ব যে কোন মানুষের হৃদয়ে একবিন্দু পরিমাণ স্থান পেলে সে বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে না। অর্থাৎ তার জন্য বেহেস্তের দরওয়াজা বন্ধ। আবার হাদীসটির শেষে আরো অতি স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে, 'মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।' মানুষ যাতে সহজ-সরলভাবে এই কথা কয়টি মর্মে বুঝে নিয়ে ইসলামের পথ ধরে বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারে অর্থাৎ মানুষের দেহে মশার মত সঙ্গীত আর নৃত্যের তালে মানুষের হক অস্বীকার করে মানুষকে পশুর মত তুচ্ছজ্ঞান করে মৃদুভাবে হুল ফুটিয়ে স্বার্থপর মানুষেরা তাজা খুন পিয়ে যেন রচনা করতে না পারে বিভেদের পাষাণ প্রাচীর। এক হক অস্বীকার করা এবং তুচ্ছজ্ঞান করার অধিকার মানুষের প্রতি মানুষের নেই। ইহাই ইসলামের প্রকাশ্য ঘোষণা। তাই তো চিন্তাশীল মানুষগুলোকে হুজুর পাকের (দঃ) এই হুমকিতে ভাবিয়ে তুলে এক প্রকার পাগল করে তুলেছে। তারা অতি সহজেই বুঝে যে এই হুমকি হতে রেহাই পাওয়া বড়ই কঠিন। যদি দেশ ও জাতি এমন পথ তৈরি করে নিয়ে শাসনভার পরিচালনা করে যার মাধ্যমে অতি সহজেই মানুষের হক এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করার প্রশ্ন চিররুদ্ধ হয়ে যায়। আর যদি না হয় তবে নির্ঘাত প্রায় মানুষই আশ্রয় নেবে ও নিতে চলেছে জাহান্নামের ভয়ঙ্কর অগ্নিদাহে। তাই আমরা তথা প্রতিটি মুসলমান ভাইদের প্রথমে আকুল আবেদন, মুসলিম রাষ্ট্রশাসন পরিচালকদের কাছে যে, মুসলমান রাষ্ট্র ও সমাজকে কোরান এবং সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালনা করুন, আমরা যাতে ঈমানের আমানত রক্ষা করে যেতে পারি। প্রথমে আমরা চাই না সংহার। চাই গঠনমূলক স্থিতিশীল মানবধর্মের একমাত্র মূর্ত প্রতীক ইসলাম কায়েম করে ঈমানের আমানত রক্ষা করতে। মানুষের হক এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা হতে যারা মুক্তি দেবার তরে নির্ভীকের মত এগিয়ে আসে, তাদেরকে অন্যত্র হুজুর পাক (দঃ) দয়াল বলেছেন। ইহাই তো প্রকৃত দয়া। এই দয়া যারা মানুষকে দেখান না বা করেন না তারা আল্লাহর দয়া পাবে না। অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ দয়া করেন না। হযরত জরীর

বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুজুর পাক (দঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ দয়া করেন না তাকে যে দয়া করে না মানুষকে।' *(বোখারী এবং মোসলেম শরীফ)।*

হুজুর পাক (দঃ) বলেছেন, 'আগুন, পানি, খাদ্যদ্রব্য এবং পোশাক-পরিচ্ছদের উপর রয়েছে প্রত্যেকের সমান অধিকার।' হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ) যখন তার ভৃত্যকে গালি দিতেছিলেন তখনই হুজুর পাক (দঃ) তাঁকে সাবধান করে বললেন, 'কেন তুমি তাকে গালি দিচ্ছ? তুমি কি ভুলে গেলে যে সে তোমারই ভাই? তুমি যা খাবে এবং পরিধান করবে ঠিক তাই তাকে অবশ্যই দিতে হবে। আমি বুঝতে পাছি যে জাহিলিয়াত (অসভ্য) যুগের প্রভাব এখনো তোমার মধ্যে ক্রিয়া করছে।' এই দুটো হাদীসের প্রথমটিতে প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার যে সমান এবং সাম্যবাদই যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে তারই বার বার আবেদনের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। বেঁচে থাকার তরে প্রতিটি মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোর প্রয়োজন হয় অধিক। এই চাহিদাগুলোর যে কোন একটির অভাবে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যেমন পানির কথা ধরা যাক। পানির ব্যবহার ছাড়া মানুষ এক পা এগিয়ে যেতে পারে না। কারণ, বেঁচে থাকার জন্য পানি সবার তরে একইভাবে এবং একইরূপে সমান প্রয়োজন। তাই পানির উপর থাকবে জনগণের সমান অধিকার। এখানে ব্যক্তিমালিকানার (প্রাইভেট প্রোপারটি) কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি যেখানেই প্রচলিত প্রথা হিসাবে মানুষের মৌলিক দ্রব্যাদির উপর স্থান পেয়েছে সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে দানা বেঁধে উঠেছে অসাম্যের বিশ্রী কলহ। ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি স্থান পেয়ে পৃথিবীর বুকটার উপর যুগে যুগে যে বর্বর অত্যাচার-অবিচার এবং পাপাচার হৃদয়বিদায়ক বাস্তব ঘটনার অবতারণা হয়েছে তার কলঙ্কস্বাক্ষর বহন করে ইতিহাসের প্রতিটি কাগজের আঙ্গিনার বোবা বেদনার গুমরানো ছবি ফুটে উঠে। ব্যক্তিমালিকানার অভিশাপ মানব জাতির মানবতার উপর ভয়ঙ্কর আঘাত হেনে মানুষের মনকে বীভৎস ছবির কল্পনা করে গা শিহরিয়া উঠে। ব্যক্তিমালিকানার অভিশাপে মানুষের কোল হতে মানব শিশুকে মানুষ ছিনিয়ে নিয়ে মানুষের সবুজ মনটাকে কান্নার তীব্র বাণে শত শত ফুটো করে গেছে। হুজুর পাকের (দঃ) প্রেমিক মানব আপনি কল্পনার চোখে একবার কল্পনা করে দেখেন তো আপনার কোলের আদুরে পুত্রকে আপনারই কোল হতে আর একটি মানুষ চিরতরে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দাস বানিয়ে রাখার জন্য আর আপনি অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছেন আপনার আদুরে দুলাল 'বাবা-বাবা' ডাকে বোবা আকাশটায় বেদনার প্রতিধ্বনি করে চিরতরে আপনার ঘনুহেপাশ হতে বিদায় নিচ্ছে। জানো হে রসুল প্রেমিক মানব, কেন এই করুণ দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছে একই শরাব পুরনো বোতল হতে নুতন বোতলে ঢেলে রাখার মত? এর একমাত্র কারণ ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি। ইসলাম মানুষকে মালিক বলেনি। সুতরাং মালিকানার স্বীকৃতির প্রশ্ন কোথা হতে এল? ইসলাম মানুষকে মালিকানার দাবী করলে শেরেকের অর্থাৎ অংশীদারী তথা কাফের বলে স্পষ্ট ঘোষণা করেছে। সুতরাং মালিকানার দাবী করার স্বীকৃতির প্রশ্ন কোথা হতে এল? মালিক মানুষ হতে পারে না। মানুষ হতে পারে খাদেম অর্থাৎ সেবক। আসমান-জমিনের একমাত্র মালিক আল্লাহ। ইহাই ইসলামের প্রকাশ্য ঘোষণা। কিন্তু স্বার্থবাদী এবং দুনিয়াদার রাষ্ট্রপ্রধানগণ খাদেমের তথা সেবকের ভূমিকা নিয়ে খাদেমের মুখোশ পরে ষ্টিম রোলার চালিয়ে যাচ্ছে। তাই এই খাদেমের মুখোশে মালিকানার ষ্টিম রোলার যেন মানুষের বুকের উপর কৌশলে চালাতে না পারে তারই জন্য বার বার হুজুর পাক (দঃ) আমাদেরকে সাবধান এবং হুমকি প্রদান করে বলেছেন, এইরূপ মুখোশধারী রাষ্ট্রপ্রধান খাদেমদের, যারা মুসলমানের সিমেন্টেড ঐক্যকে ভেঙ্গে দিতে চায়, তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দাও। আমাদেরকে নীরব দর্শকের মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে অর্থাৎ তামাশা

দেখতে বলেননি। এভাবে তাকিয়ে থেকে আল্লাহর সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার তরে যদি জেনে-শুনে নীরব থাকি তা হলে আমাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে, তার ভবিষৎবাণী বহুবার বহু রকমে আল্লাহ এবং হুজুর পাক (দঃ) ঘোষণা করেছেন। আবার ব্যক্তিমালিকানার অভিশাপ যাদের উপর নেমে আসার দরুন দরিদ্র, বিধবার প্রতীকরূপে অর্থাৎ বেঁচে থাকার সমান মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত, অবহেলিত হয়ে সমাজে আখ্যায়িত হতে চলছে তাদের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করার তরে আমাদেরকে সংগ্রাম করে তাদের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হুজুর পাক (দঃ) এগিয়ে আসতে বলেছেন, 'যে সংগ্রাম করে বিধবা ও দরিদ্রের সাহায্যে, সে ঐ ব্যক্তির মত যে সংগ্রাম করে খোদার পথে।' এবং আমি মনে করি তিনি ইহাও বলেছেন, 'সে ঐ ব্যক্তির মত যে দাঁড়িয়ে থাকে (নামাজের জন্য) অনবরত এবং ঐ ব্যক্তির মত যে রোজা রাখে বিরামবিহীন একটানা।' *(বোখারী এবং মোসলেম শরীফ)।*

'বিধবা ও দরিদ্র' বলতে এখানে সমাজের বুকে সর্বহারা মানুষের সমান অধিকারীরূপে বেঁচে থাকার হক তথা অধিকার অস্বীকার করে এবং তুচ্ছজ্ঞান করে 'তুচ্ছ জ্ঞানের একটি লেবেল' মেরে দিয়েছে। তাদের এই তুচ্ছ জ্ঞান করার লেবেল চিরতরে মুছে ফেলবার জন্য যারা সংগ্রাম করে, অর্থাৎ তাদেরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য জেহাদ করে, তারা আল্লাহর পথেই জেহাদ করে। তারা ঐ সমস্ত মানুষের মত যারা অনবরত নামাজের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে এবং একটানা বিরামহীন রোজা রেখে যান। তা হলে সেবকের মুখোশ পড়ে ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতির প্রশ্ন কোথা হতে পেল?

খলিফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) কি তার উটচালককে বুঝিয়ে বলে দেননি যে, উট-চালনা এবং উটের পিঠে বসার অধিকার আমাদের উভয়ের সমান? উট-চালককে কি উমর (রাঃ) বলেননি যে, আমি মালিক নই, আমি খাদেম তথা সেবক মাত্র। এর বাইরে খাত্তাবের পুত্র উমর (রাঃ) কিছু দাবী করলে তাকে আল্লাহতালার কাছে জবাবদিহি করতে হবে-এবম্প্রকার সাবধান বাণী কি উমর (রাঃ) মুসলিম জাহান তথা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেননি? সুতরাং ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতির দাবী করার প্রশ্ন কোথা হতে এল? 'ব্যক্তি মালিক' অর্থাৎ মানুষ মালিক এই অংশীবাদ তথা কাফের হবার অভিশাপ হতে তথা ফিউড্যাল সিসটেম হতে হুজুর পাকের (দঃ) সাম্যবাদকে বুকে ধারণ করে যে কোন দেশ ও জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, তারা নিশ্চয়ই পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ সভ্য বলে প্রমাণিত হবেই। কারণ, তারা ব্যক্তিকে মালিক বলা তথা কুফুরী হতে মুক্তি দিয়ে আল্লাহকেই পরোক্ষভাবে মালিক বলে স্বীকার করে নেয়। আল্লাহ মানুষের মুখের স্বীকৃতি হতে বাস্তব স্বীকৃতি তথা হৃদয়ের স্বীকৃতিকেই মুমিনের লক্ষণ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মুখের স্বীকৃতি কি কোনদিন বাস্তব স্বীকৃতির সঙ্গে তুলনা হতে পেরেছে বা পারে? বাস্তব স্বীকৃতির চিহ্ন মুছে ফেলে মুখের স্বীকৃতির অপর নাম হল, 'মন মে শেখ ফরিদ বগল মে ইট'। মুখের স্বীকৃতির মুল্য অতি নগণ্য। কারণ, প্রায় ক্ষেত্রেই মুখের স্বীকৃতির সঙ্গে বাস্তব স্বীকৃতির মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন ধরুন, আমি যদি মানুষের সমাজে অত্যাচার, অবিচার করে মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক জিনিসগুলো সুযোগ পেলেই আত্মসাৎ করে যাচ্ছি অথচ আমি দাড়ি, জুব্বা, টুপী এবং তসবিহ্ তেলোয়াত করছি এবং হজ্ব করে হাজী হয়েছি অথচ সমাজ আমাকে ঘৃণা করে, আমাকে বোম্বাই হাজী, চোট্টা হাজী বলে গালি দেয় এবং তা সত্ত্বেও আমি মানুষের কাছে বলে বেড়াই, আমি মুসলমান, আমি মুসল্লী, মুমিন ইত্যাদি। আবার আমারই মত আর একটি মানুষ, হযরত সামনুন মোহেবের (রাঃ) মত সমাজের কাছে তথা মানুষের কাছে মোহেব অর্থাৎ প্রেমিক বলে পরিচিত অথচ হযরত সামনুন (রঃ)-কে মোহেব বলে ডাক দিলে তিনি নিজেকে কাজ্জাব অর্থাৎ মিথ্যাবাদী বলে দিতেন। আমি নিজেকে মুমিন, মুসল্লী বলে জাহির

করছি অথচ আমার ভাগ্যে কেন এত লাঞ্ছনা আর অপমান? কারণ, আমার মুখের স্বীকৃতি আছে কিন্তু বাস্তব স্বীকৃতি মোটেই নেই। অথচ হযরত সামনুন মোহেব (রঃ) নিজেকে কাজ্জাব তথা মিথ্যাবাদী বলে জাহির করেছেন অথচ তাঁর ভাগ্যে কেন এত ভক্তি আর শ্রদ্ধা? কারণ তাঁর মুখের স্বীকৃতি না থাকলেও আসল যে স্বীকৃতি সেই বাস্তব স্বীকৃতি আছে।

এখন পুনরায় সেই পানির উপর প্রতিটি মানুষের সমান অধিকারের কথা নিয়ে আলোচনা করবো। পানি ছাড়া মানুষ যেমন বাঁচতে পারে না, সেরকম খাদ্য তথা আহার ছাড়াও মানুষ বাঁচতে পারে না। সেরকম জীবনধারণের জন্য আগুনের প্রয়োজনও অত্যধিক। পোশাক-পরিচ্ছদ লজ্জা নিবারণ করার জন্য অতি প্রয়োজন এবং ইহাও মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক দাবী। শীতপ্রধান দেশে পোশাক-পরিচ্ছদ যে শুধু লজ্জাকে ঢেকে রাখার কারণ তাই শুধু নয়। তীব্র শীতের প্রকোপ হতে মানুষের বাঁচার প্রশ্নেও এই পোশাক-পরিচ্ছদ একটি বিশেষ স্থান দখল করে নেয়। তাই সার্বজনীন দাবীর মৌলিক স্বীকৃতি বলে পোশাক-পরিচ্ছদকে ঘোষণা করা হয়েছে। এই জন্যই 'আগুন, পানি, খাদ্য এবং পোশাক পরিচ্ছদের উপর রয়েছে প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার', বলে হুজুর পাক (দঃ) প্রকাশ্যে ঘোষণা করে গেছেন। সুতরাং ব্যক্তিমালিক হবার স্বীকৃতির প্রশ্ন কোথা হতে এল? পার্থিব জীবনে ইসলামের দৃষ্টিতে মুল্যহীন পার্থিব সম্পদকে যা প্রত্যেকের পার্থিব জীবনধারণের বেলায় অতিপ্রয়োজন তা ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ পার্থিব আইন অনুযায়ী প্রত্যেকের অধিকার সমান এবং এই সমান কথাটি যাতে পার্থিব জীবনব্যবস্থায় পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করে তারই জন্য হুজুর পাক (দঃ) বহুস্থানে বহুবার ঘোষণা করেছেন। কারণ, সমাজের বুকে, বিশেষ করে ইসলামিক শাসনব্যবস্থায়, মুষ্টিমেয় স্বার্থপর ব্যক্তি অসাম্যের বীজ যাতে ঢুকিয়ে দিতে না পারে তার জন্য প্রতিটি মুসলমানকে বার বার সাবধান করে দিয়েছেন। এই সাম্যবাদের শিক্ষাকেই কেন্দ্রবিন্দু ধরে নিয়ে ইসলামিক শাসনব্যবস্থা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্যথায় ইসলামিক শাসনব্যবস্থার নামে আত্মবিরোধীমূলক ভাবধারা, অরাজকতা এবং ভোগবিলাসের বেদীতে পুজা দেবার সামিলই হবে এবং সমাজ জীবনে নেমে আসবে আরো ভয়ংকর অভিশাপ। কারণ, ইহা হবে আল্লাহ এবং হুজুর পাক (দঃ)-এর উপর মোনাফেকি করা। মোনাফেকের শাস্তি কাফেরের চেয়ে ভয়ংকর। মোনাফেক ছদ্মবেশ ধারণ করে। তাই সমাজের মানুষ পানি মনে করে তৃষ্ণা নিবারণ করতে ছুটে যায়। মরীচিকার সন্ধান পেয়ে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ঘৃণা, মানুষের অমর্যাদা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি বহু দোষে দোষী আমাদের কুখ্যাত এই সামাজিক অসাম্য। তাছাড়া আরো একটি বড় দোষ এতে আছে। গুটিকতক লোক বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের কারণে নফস-পরস্ত হয়ে পড়ে। অপর দিকে বঞ্চিতের দল তাদের প্রাণটাকে কোনমতে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাতেই ব্যস্ত থাকে। আত্মার (রূহ) গবেষণা কাকে বলে তা দেখবার ও বুঝবার সুযোগই হল না তাদের। হুজুর পাক (দঃ) বলেন,'সব বিষয়ে মধ্যপথ উত্তম'। রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারেও এই উত্তম পথের ব্যবস্থা কেন আমরা নষ্ট হতে দেব? আর, স্বেচ্ছাচারীর ব্যবস্থাকে অপমানের বোঝাস্বরূপ কেনই বা মাথা পেতে নেব? যে জাতি প্রকৃতপক্ষে ইহকালও চাইলো না এবং পরকালের প্রতিও উদাসীন রইলো, তাদের অবস্থা? এরাই ইহকালে কাফেরের হাতে অপমানিত হচ্ছে দিনের পর দিন, আবার মৃত্যুর পর অপমানিত আর ধিক্কৃত হয় আল্লাহ এবং হুজুর পাকের (দঃ) নিকট। আমরা যাতে হুজুর পাকের (দঃ) 'পার্থিব সম্পদ সমান বণ্টন' এই নীতিকে সামনে রেখে দ্রুতগতিতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারি তার জন্য থাকতে হবে আন্তরিকতা এবং ত্যাগ। এই ইসলামিক ব্যবস্থা যখন সমাজে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করবে তখন দেখতে পাবো মানুষকে ঠিক মানুষের মানদণ্ডে বিচার করা

হয়েছে। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানবতা আর কি হতে পারে? তাই কি বলা হয় না যে, ইসলামের দৃষ্টিতে যে শ্রেষ্ঠ মানবতার আসন দেওয়া হয়েছে উহাই বিশ্বের বুকে প্রথম এবং শেষ? প্রথম এবং শেষ শ্রেষ্ঠ মানবতার শিক্ষা যাতে মুসলিম সমাজে দ্রুতগতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে তারই জন্য হুজুর পাক (দঃ) বহু বাণী এবং নিদর্শন রেখে গেছেন। হুজুর পাক (দঃ) বলেন, 'মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে উৎপীড়ন করে না অপর ভাইকে। বিপদে সে ত্যাগ করে না। ধর্মভীরুতা এখানেই।' *(বোখারী এবং মোসলেম শরীফ)।*

হযরত আবুজর গিফারী তার ভৃত্যকে গালি দিচ্ছে আর এমনি মুহূর্তে হুজুর পাক (দঃ) তাকে সাম্যবাদের অতুলনীয় কথা কয়টি মনে করিয়ে বললেন, ইহাই সভ্যতা এবং ইসলামের নীতি। আর শোষণের নীতিতে তৈরী মানুষের মাঝে বিভেদ গড়ানো একজন ধনী হয়ে দাতা সাজা আর একজন গরীব হয়ে তারই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার শাসনব্যবস্থা হল জাহেলী যুগের অর্থাৎ অসভ্য যুগের আচরণ। তার জন্য হুজুর পাক (দঃ) আবু জর গিফারীকে বলছেন, 'আমি দেখছি এখনো অসভ্য যুগের আচরণ তোমার ভেতর কাজ করছে।'

এখানে হুজুর পাক (দঃ) শুধু আবু জর গিফারী (রাঃ)-কেই চরম সাম্যবাদের কথা কয়টি জানিয়ে দিলেন না । যুগে যুগে যত উম্মতে মোহাম্মদীর আগমন হবে তাদের জন্যও এই সাম্যবাদের নীতিকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে নিতে বলছেন। এখানে শুধু একা আবু জর গিফারীকেই সাবধান করে দেননি। এই সাবধানবাণী সমগ্র মানবজাতিকে প্রদান করা হয়েছে। হযরত আবুজর তো একটি সামান্য উপলক্ষ মাত্র। বিশ্বমানব যাতে ভুলে না যায় যে, তারা সকলে একে অন্যের ভাই, অর্থাৎ সাম্যের মধুর প্রীতি-জড়ানো বন্ধনে বাঁধা পিতা-মাতার আদুরে সন্তানেরা যেমন পিতা-মাতার কাছে খাওয়া-পরা এবং ইত্যাদি বিষয়ে সমান অর্থাৎ সাম্যবাদের নীতিকে গ্রহণ করা হয় এবং প্রতিটি সন্তানও বুঝতে পারে যে তারা সবাই ভাই-ভাই। ঠিক সেরকমভাবে বিশ্বমানবকে একই পরিবার গোষ্ঠিভুক্ত মনে করে 'ভাই-ভাই' সাম্যবাদের নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে হুজুর পাক (দঃ) আমাদেরকে বসবাস করতে বলেছেন। তাই হযরত আবু জরকে উপলক্ষ করে হুজুর পাক (দঃ) সমগ্র মানবজাতিকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছেন, 'তুমি কি ভুলে গেলে যে সে তোমারই ভাই। তুমি যা খাবে এবং পরবে তাকে তাই দিতে হবে।' এই সাম্যবাদের নীতিতে যারা বিশ্বাসী নন অর্থাৎ 'মানুষ মানুষের ভাই', 'একটি মানুষের জীবনটা চালাতে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু প্রয়োজন অপর একটি মানুষের বেলাতেও' এই আদর্শকে যারা সমর্থন না করে মানুষের মাঝে অসাম্যের প্রবালপ্রাচীর তৈরী করে মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক দাবীগুলো হতে বঞ্চিত করে তাদেরকে হুজুর পাক (দঃ) অসভ্য, বর্বর বলছেন এবং এই অসভ্য বর্বরতাকেই জাহেলী যুগ বলে ঘোষণা করেছেন। তাই হুজুর পাক (দঃ) আবুজর গিফারী তথা সমগ্র বিশ্বমানবকে বলছেন, 'আমি দেখছি এখনো জাহেলী যুগের প্রভাব তোমার ভেতর কাজ করছে।'

'মানুষ মানুষের ভাই' - বিস্মিত নেত্রে বিংশ শতাব্দীর সাম্যবাদবর্জিত অবহেলিত কোটি কোটি মানুষের কাছে আজ ইহা শুধু মুখের কথা তথা মৌখিক স্বীকৃতির ভুমিতেও কেঁদে বেড়ায়। বাস্তব সাম্য-ব্যবস্থার কল্পনা করাটাও মানুষ ভুলতে বসেছে অর্থাৎ ঈমান হারাতে চলছে। 'ব্যক্তিমালিকানার' শেরেক হতে সাম্যের গান গাইতে গেলে 'ব্যক্তিমালিকানার' পুজারী মুসলমান নামধারী মোনাফেকের দল ধমক দিয়ে চমক খাইয়ে দেয়। হে নির্ভীক মুসলমান, তুমি 'ব্যক্তিমালিকানার' পুজারীকে কবে বলতে শিখাবে, আল্লাহ একমাত্র আসমান-জমিনের মালিক হলে তুমি কোন স্পর্ধাভরে নিজেকে মালিক বলে মুসলমান সমাজে মুসলমান বলে পরিচয় দাও? উত্তর দাও হে নির্ভীক মরদে মুজাহিদ। আর নীরব-নিথর থেকে কোটি কোটি অবহেলিত মানুষগুলোকে ভিক্ষাভাণ্ড হাতে 'ক্ষুধার জ্বালায় বুকটা

ফেটে যাচ্ছে' চিৎকার করে করুণ ফরিয়াদের করুণ কলঙ্ক ছবি আল্লাহর দেওয়া সবুজ মাটির দিগন্তে প্রতিফলিত হতে দিও না। তাদের উজাড় করা উদার প্রাণটা নবীউল্লাহ (দঃ)-এর ব্যাকুল কণ্ঠের আকুল আবেদন, তুমি যা খাবে এবং পরবে অপরকেও তাই দিতে হবে, না দিলে 'তুমি মুসলমান হতেই পারবে না।' -কে চিরসার্থক করে রাখার পথ তৈরী করে সেই পথের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে যাও। মুসলমান হুজুর পাকের (দঃ) সত্য প্রতিষ্ঠার তরে হাসতে হাসতে শহীদ হতে পারে। মুসলমান সিংহবিক্রমে বলীয়ান সৈনিক। 'মানুষ মালিক' বলে মেকী খোদা যারা সাজে তাদের শিক্ষা দিতে মুসলমান ভীরু সাজতে পারে না। ভীরু ফেরুপালের পংক্তিতে মুসলমানের নাম নেই। হুজুর পাকের (দঃ) দেওয়া সাম্য প্রতিষ্ঠা হলে মানুষের দুনিয়াদারির হতাশা মিশ্রিত চিন্তা ও শোক দূর হয়ে যায়। মানুষে মানুষে মেকী গড়া ভেদাভেদ চিরদিনতরে শেষ হয়ে যায়। মানুষের বাঁচার দাবি নিয়ে মানুষকে হাজার রকমে আর ব্যতিব্যস্ত করে তোলে না। দুনিয়ার কঠিন শৃঙ্খলরূপ গুরুদায়িত্বের বোঝা তার আপনা হতেই ভেঙ্গে যায়। কিন্তু কেন হুজুর পাকের (দঃ) সুন্দর সাম্যের বাণী আমাদের দ্বারপ্রান্তে এসে হুমড়ি খেয়ে স্তব্ধতায় বোবা কান্নায় কাঁদে? এর প্রধান কারণ হল দুটো। প্রথমত আমাদের মাঝেই কতক মানুষ স্বার্থপর এবং দয়া-মায়া বর্জিত নিষ্ঠুর। তারা চক্রান্ত আর ছলনার হীন প্রচেষ্টায় মালিক হয়। তারপর নিজেদেরকে সাজায় দাতার মহানরূপে। দাতার অবগুণ্ঠনে জঘন্য জিঘাংসার প্রেতদৃষ্টির কোণে অনাহারে কাতর জনতার জননেতার খুন-পিয়াসের বিশ্রী মত্ততা চিক চিক করে। দ্বিতীয়ত ঃ আমরা নীরবে মাথা হেঁট করে তাদের মালিক বলার দাবী মেনে নিচ্ছি। তাদের দাতা সাজার অবগুণ্ঠন দেখে দানবীর বলি। আমরা বিদ্রোহ করতে জানি না। বিষধর জাত সাপের আঘাত খাওয়া বিকট ফণা তুলে প্রতিবাদ করতে জানি না। মাথা উঁচু করা ঢেউ হয়ে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত হুমড়ি খেয়ে অতল তলে তাদের কুফুরী মতবাদকে হজম করতে পারি না। আমরা পোষা কুকুরের লেজগুটানো জীবনটা বাঁচিয়ে রাখি। তাই তো অপরের সুখ-দুঃখের প্রতি নজর করতে পারি না। পারি না মালিক আর দাতাজিদের শিক্ষা দিতে। আমরা ভুলে গেছি ঝরা-ধান ক্ষেতে পড়তে দিতে নেই। পড়তে দিলেই এরা বড় রকমে জোট বেঁধে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তাই ঝরা-ধানকে ক্ষেতের মাঝেই পুড়িয়ে মারতে হয়। আমাদের সমাজে, আমাদের দেশে তাই গড়ে উঠে বিশ্রী শ্রেণীস্বার্থের হীনপ্রচেষ্টা। একজন দৈনিক ত্রিশ টাকার সিগারেট ছাইয়ে পরিণত করে আর একজন চোখের সামনে পথের পাশে চার-পাঁচটা রোগা খিটখিটে ছেলে-পুলে নিয়ে দু'মুঠো ভাতও পায় না। প্রধান কারণ দুটোর দোষে দোষীরা পরকালে জাহান্নাম পাবে পুরস্কার। আল্লাহ এবং হুজুর পাকের (দঃ) তুলে দেওয়া প্রকাশ্য সত্যকে যারা দেশ ও জাতির বুকে প্রতিষ্ঠা না করে অর্থাৎ দেখেও না দেখার ভান করে, যারা নীরব দর্শকের অভিনয় করে তাদের যে জাহান্নামেই পুরস্কার হবে শুধু তাই বলা হয়নি- বরং তাদের উপর আল্লাহ এবং ফেরেস্তাদের অভিশাপ। তাই আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব হতে মুক্তি পাবার জন্য প্রতিবাদ করতে হবে। এভাবে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন করতে পারলে মালিক আর দাতা-সাজা মানুষগুলো 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলে মানে-মানে চিরবিদায় নিতে বাধ্য হবে। এবং যে পর্যন্ত দেশের শাসনব্যবস্থাকে সাম্যের পুর্ণ আদর্শ দিয়ে গড়া না হবে সে পর্যন্ত একটি দেশ ও জাতির বুকে মানুষের হাজার রকম ফরিয়াদ থাকবেই। তাই সর্বপ্রথম দেশের শাসনব্যবস্থা হতে শেরেক ও কুফরি 'ব্যক্তি মালিকানা' উচ্ছেদ করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশ ও জাতিকে সর্বপ্রথমে সবচাইতে বড় শেরেক ও কুফুরী 'মানুষ মালিক' সম্পূপর্ণরূপে উচ্ছেদ করে দিতে হবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুজুর পাক (দঃ) বলেছেন, 'মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে উৎপীড়ন করে না তাহাকে, ত্যাগ করে না তাহাকে বিপদে, তুচ্ছজ্ঞান করে না

তাহাকে, ধর্মভীরুতা এখানেই' এবং তিনি ইশারা করলেন নিজের বক্ষের দিকে তিনবার, 'মুসলমানের পক্ষে মন্দের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে ঘৃণা করে মুসলমান ভাইকে।' *(মোসলেম শরীফ)।* হুজুর পাক (দঃ) বলেছেন, 'হিংসা করো না পরস্পরকে, ঘৃণা করো না পরস্পরকে এবং হও খোদার বান্দা সব ভাই ভাই।' *(বোখারী এবং মোসলেম শরীফ)।*

এই দুটো হাদীসে রসূলুল্লাহ (দঃ) ঐ একই সাম্যের আদর্শকে বিশ্বমানবের কল্যাণের তরে প্রতিষ্ঠা করতে আহ্বান জানিয়েছেন। বার-বার একই সাম্যের কথা আমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন। যাতে আমরা বৈষম্যের প্রাচীর তৈরী করে বিশ্বমানবকে মানবতার আদর্শ হতে ফেলে দিয়ে অসহায় বেদনার্ত পরিবেশ দেশ ও সমাজের বুকে তৈরী করতে না পারি। প্রথম হাদীসটিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশ্ব মুসলিমকে একটি ভ্রাতৃসংঘরূপে বর্ণনা করে তার নীতি ও আদর্শ কিরূপ এবং নীতি ও আদর্শ বিরোধী কি হতে পারে তাই সুন্দর এবং অতি স্পষ্টভাবে মানবসমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় হাদীসটিতে উপদেশ রয়েছে যে এই ভ্রাতৃবন্ধনের আদর্শ ও রূপ 'সিমেনটেড ঐক্য' হবে। পাথরকণাগুলো যখন বালি এবং সিমেন্টের সঙ্গে মিশিয়ে জমাট করানো হয়, তখন পৃথক অবস্থায় থাকা কঠিন পাথরকণাগুলোও বালি এবং সিমেন্টের পরশ পেয়ে জমাট ঐক্যের আদর্শে রূপগ্রহণ করে। সেরকমভাবে প্রতিটি পৃথক অবস্থায় থাকা মুসলমান যখন পরস্পর হিংসা এবং ঘৃণা পরিত্যাগ করে তখন স্বাভাবিকভাবে পরস্পরের প্রতি দানা বেঁধে উঠে ভালবাসা এবং অটুট ভ্রাতৃবন্ধন। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদেরকে সর্বপ্রকার হিংসা, ঘৃণা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে 'হও আল্লাহর বান্দা সব ভাই-ভাই' বলে আহ্বান করছেন। আবার রসুলাল্লাহ (দঃ) আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন, জান ধর্মভীরুতা কোথায়? আর মন্দের জন্য যথেষ্ট কি তা জান? ধর্মভীরুতা হল বিশ্বমুসলিমকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে হলে প্রতিটি মুসলমানকে ভাই তথা একই পরিবারভুক্ত একই হাঁড়ির ভাত ভাই-ভাই মিলে প্রীতিসহকারে ভোজন করার মত মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে। তারপর মুসলমান ভাইকে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট দিয়ে যেন উৎপীড়ন করা না হয় তার দিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলেছেন। কোন প্রকার বিপদ-আপদ যদি মুসলমান ভাইয়ের উপর পতিত হবার সম্ভাবনা থেকে থাকে তা হলে বিপদের সম্মুখে তাকে ফেলে না দিয়ে তার বিপদভঞ্জন করার জন্য এগিয়ে আসতে আদেশ করেছেন। কোন মুসলমান ভাইয়ের যদি শারীরিক দুর্বলতা এবং অসুস্থতা অথবা ইত্যাদি কারণে অন্যান্য মুসলিম ভাইদের মত কর্ম করার মানসিকতা বা সুস্থতা না থাকে তার জন্য তাকে তুচ্ছজ্ঞান করতে বারণ করে দিচ্ছেন। এই তুচ্ছজ্ঞান করা একটি মারাত্মক রোগ । এই রোগটিই খান্নাসরূপে শয়তান হয়ে মানুষের মনে অলক্ষ্যে বাসা বেঁধে আছে। অন্যত্র হাদীসে আছে, তুচ্ছজ্ঞান এত মারাত্মক রোগ যা মানুষকে জান্নাত চিরতরে হারাম করে দেয়। সুতরাং ইহা হতে প্রত্যেকটি মানুষকে অতি সাবধানে চলতে হবে। তাই রসুলাল্লাহ (দঃ) পরিশেষে নিজের বক্ষের দিকে তিনবার লক্ষ্য করে বললেন, 'মুসলমানের পক্ষে মন্দের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে সে ঘৃণা করে মুসলমান ভাইকে।' এই তুচ্ছজ্ঞান তথা ঘৃণা পরিত্যাগ করতে না পারলে ধীরে ধীরে ইহা দানা বাঁধতে থাকে। পরে ইহা বিশ্বমানব-সমাজে এত মারাত্মক এবং ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়ায় যে, ভাই-ভাইয়ের মাঝে গড়ে উঠে বিভেদ এবং হিংসার প্রবাল প্রাচীর। বিশ্বমানব সমাজে তখন মানুষে মানুষে গড়ে উঠে রক্তক্ষয়ী বিশ্রী তুচ্ছজ্ঞান করা পাশবিক সংগ্রাম। একে অপরের উপর চালিয়ে যায় অত্যাচার আর শোষণের ষ্টিম রোলার। মানবতার বিচার, মানুষকে মানুষের ভাই মনে করার আর্দশ তখন বিশ্বের দুয়ারে আছড়িয়ে কাঁদে। এই চরম নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে নীরবতা প্রদর্শন করা আর আল্লাহ এবং রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর হুকুম এবং আদর্শকে প্রকাশ্যে অমান্য করা একই কথা। এরূপ নীরব হয়ে থাকার পরিণাম

সুনিশ্চিত 'অগ্নি' পুরস্কার । তাই মুক্তি নেই কারো, মুক্তি নেই যারা অত্যাচার-অবিচারের সামনে হাঁ করে তামাশা দেখে। অত্যাচারীর উৎপীড়নের প্রধান পরিচালনায় যারা আছে, যারা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অত্যাচার এবং উৎপীড়ন বন্ধ না করে অত্যাচার-উৎপীড়ন করার দৃশ্য নীরবে দেখে যায় তাদেরকে অত্যাচার-উৎপীড়ন বন্ধ করার আবেদন জানাও। যদি তোমার অথবা তোমাদের অত্যাচার বন্ধ করার আবেদনে সাড়া না পাও, যদি মনে কর তোমার অথবা তোমাদের চোখে কলুর বলদের ঠুলি পরিয়ে দিয়ে ভেল্কিবাজি দেখাতে চায় তবে প্রতিবাদের ঝড় তোল। মুসলমান সমাজ যদি সমবেতভাবে প্রতিবাদ না করে তবে তুমি একা প্রতিবাদ কর । সকলে জাহান্নামে গেলেও তুমি কিন্তু জাহান্নামের পথ তৈরী করে রেখ না। কারণ, মুক্তি নেই- অসম্ভব মুক্তির প্রশ্ন। রসূলাল্লাহ (দঃ)-র নয়নের অশ্রু ভেজা বাণী বাণের মত তোমার হৃদয়ে বার বার আঘাত করে যাচ্ছে। হে বীর মুজাহিদ, তুমি একাই কলম কাগজে কর প্রতিবাদ। তুচ্ছজ্ঞান, অত্যাচার এবং উৎপীড়কের প্রধান পরিচালকের আসল চেহারাটা তুলে ধর, হে বীর মুজাহিদ। বরণ করে নিও ইমাম হুসায়েনের মত মহান জীবন-উৎসর্গ। তোমার প্রাণপ্রিয় রসুলাল্লাহ (দঃ)-এর সজল চোখের বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ার দৃশ্য তুমি তোমার কল্পনার চোখে দেখে নাও, হে বীর মুজাহিদ। ঐ তো তোমার বরণীয়। ঐ তো তোমার প্রেমময় প্রেয়সীর বোবা ফরিয়াদে গড়ে উঠা ফেরদাউসের বুকে কৃষ্টির গণমহল।

মানুষের মাঝেই লুকিয়ে থাকে অদৃশ্য আম্মারা শয়তান। এই শয়তানকে যত ভোগবিলাসের উগ্রতা প্রদান করা হয় ততই সে বিশ্রী তৃপ্তির হীন সন্ধানে মত্ততা প্রকাশ করে। তাই রসুলাল্লাহ (দঃ) চরম সাম্যবাদের বাণী দু'চারবার বলেই শেষ করেননি। একই সাম্যবাদের আদর্শকে বহু রকমে অনেকবার বিশ্বমানবের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন যাতে আমাদের হৃদয়পটে দাগ লেগে থাকে। শুধু কি দাগ লেগে থাকার কথা? সাম্যের আদর্শ মনে-প্রাণে মেনে নিতে না পারলে মুসলমান হওয়া যায় না। আল্লাহ কি সুন্দর ভাষার শৈলীতে বিশ্বমানবকে জানিয়ে দিচ্ছেন-তুমি কি সেই লোকটিকে চেন বা দেখেছো যে দ্বীন অর্থাৎ ইসলামের উপর মিথ্যা আরোপ করে, তথা সোজাসুজি ইসলাম ধর্মকে অস্বীকার করে বসে? সেই লোকটি আর কেহই নয়, যে বঞ্চিত মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় দাবীগুলো দিতে অস্বীকার করে। বঞ্চিত মানুষগুলোকে তার মত বাঁচবার অধিকার দিতে চায় না। তোমাদের মত মানুষ তারা, অথচ তাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক জিনিসগুলো তথা খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর, আসবাবপত্র ইত্যাদি তথা এক কথায় মাউন দিতে চায় না। দুনিয়ার মূল্যহীন সম্পদগুলোকে আমিত্ব দিয়ে ঘিরে রাখে। এই আমিত্বের বিশ্রী বাঁধনে কোটি কোটি নিরীহ মানুষগুলোকে কত প্রকার যে দৈহিক দাসত্বের কঠিন শৃঙ্খলযাতনা উপভোগ করা ও তার বেদনাদায়ক আত্মবিলাপের ইতিকথা তোমাদের পাথর সিনাটাকে একমুঠো স্নেহ-প্রীতির পরশে সিক্ত করে তোলে না। আমিত্ব-গন্ধে পূর্ণ নীতির পূজারী হয়ে নামাজ-রোজা করাটা তো নিতান্ত রিয়া তথা লোক-দেখানো উপাসনা। তোমরা তো ভণ্ড। তোমরা লোক-দেখানোর তরে নামাজ-রোজা কর। তোমরা তো ধ্বংস হয়ে যাবে। যে দুনিয়ার প্রতি আমার এত ঘৃণা, যে দুনিয়া ত্যাগ করতে না পারলে মুসলমান হওয়াই যায় না, সেই দুনিয়ার পূর্ণমোহ হৃদয়ে জড়িয়ে উপাসনা করার ভণ্ডামি করে বেড়াচ্ছ। ইসলাম-ভূমির সীমানার কাছে দাঁড়াবার সম্বলটুকু নেই, তবু ইসলাম-ভূমির কেন্দ্রবিন্দুতে নিজেদের অবস্থানের গর্ব প্রকাশ করে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা আর লাম্পট্য দেখাতে তোমাদের লজ্জা হয় না? সেই লজ্জার শেষ চিহ্নটুকুর আখর তোমাদের হৃদয় হতে অপসৃয়মান হয়েছে। মুক্তির প্রশ্ন? এই সামান্য সীমিত ধরার বুকে চঞ্চল জীবনের তরে কতবার আকুলতা ভরে বললাম, দুনিয়ার মোহ-মায়া ত্যাগ কর। দুনিয়ার মোহ তো ভেল্কি মায়া। দুনিয়া তোমার নয়, তুমিও দুনিয়ার নও। তবু কেন ভেল্কি মায়ায় ঝিমিয়ে-পড়া

ভ্রান্ত আঁখির কোণে মরীচিকায় জলের প্রেতনৃত্য দেখ? আমি তোমাদের তরে আখেরাতে যে বিমলিন বিস্ময় জড়ানো নেয়ামত রেখেছি, সে তো মহাসাগর। সেই মহাসাগর তোমাদের তরে অপেক্ষায় রত। শুধু এক বিন্দু জলমায়ায় আমিত্বের বাঁধন দৃঢ় করার তরে হাত দুটো আর প্রসারিত করো না। একটি ইটের গা জড়িয়ে আর একটি ইট, এভাবে ইটগুলো নিবিড় ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রচনা করে প্রাসাদ। তোমরাও তোমাদের মাঝে নিবিড় ভ্রাতৃবন্ধনে গড়ে তোল ইসলামের চিরউজ্জ্বল বিস্ময়কর গণ-সাম্যবাদের গণ-মহল। সেদিন হবে তোমরা পৃথিবীর বুকে সভ্যমানব। ইসলামরূপে রূপসী গণ-সাম্যের সঙ্গীত বিশ্বমানবকে শুনিয়ে যাও। সুনিশ্চিত বিজয়ের দেদীপ্যমান স্বাক্ষর উদিত অরুণের আভার মত স্নিগ্ধ তাপ লুটিয়ে পড়বে।

ইসলামী দর্শনের দৃষ্টিতে সকল মুসলমান ভাই ভাই

আমরা সবাই একই পরিবারভুক্ত ভাই ভাই। ইসলামের এই আদর্শকে বিশ্বের দুয়ারে কায়েম করতে এরা কখনোই উৎসাহ দেয় না। এরাই ভ্রান্ত এবং ভণ্ড। নামাজ-রোজার মুখোশ পরা মুসলমান বিশ্বরঙ্গমঞ্চে মুখোশ নৃত্যের ঝংকারে ভণ্ডামি করে বেড়ায়। এরাই আল্লাহ এবং রসুলাল্লাহ (দঃ)-র সঙ্গে যুদ্ধ করে বিশ্বমানবকে উৎপীড়ন করে মুসলিম ঐক্যকে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেয়। তাই আল্লাহ এবং রসূলাল্লাহ (দঃ) বার বার বিশ্বমানবকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন আর বলছেন, 'নীরব-নিথর তোমরা থেক না যদি আমার উম্মত হয়ে থাক। যদি আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে থাক তবে এদেরকে শিক্ষা দিয়ে মুসলিম ঐক্যকে দৃঢ় করে তোল।' আজ আমরা ভীরু ফেরুপালের মত বেঁচে থাকতে চাই। রসুলের আদর্শে মুখে মুখে আমরা হাজার বার শহীদ হয়ে যাই। বাস্তব জীবনে আমাদের মাঝে একটিও বাস্তবরূপে শহীদ হতে পারি না। তাই আমাদের বেহেস্ত পাওয়াটা মুখে মুখেই থেকে যাবে। বাস্তবে মুখের কথাটির রূপ নেবে ভয়ংকর জাহান্নাম। কে আছ হে রসুল-আদর্শে গরীয়ান মুসলমান, ধর তোমার আদর্শের মশাল, আদর্শের মশালে মুখোশ-পরা মুসলমানের মুখোশ-নৃত্যকে চিরস্তব্ধ করে দাও একের পর একটি করে। মুসলিম ভ্রাতৃবন্ধন তোমার আদর্শ। জয়ের জয়টিকা তোমার ললাটে পরিয়ে দেবেন নবীউল্লাহ মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'বেহেস্তে প্রবেশ করবে না সে, যার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় তার অপকারিতা হতে।' *(মোসলেম শরীফ)।*

হযরত নূমান বিন বশির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'তুমি বিশ্বাসীদের দেখবে পরস্পরের প্রতি দয়া, প্রীতি ও সহানুভুতিতে একদেহের মত; যখন পীড়িত হয় এক অঙ্গ, অপর সমস্ত অঙ্গ পরস্পরকে ডাকে উহার সাথে সহানুভুতির জন্য জাগরণ ও তাপে।' *(বোখারী এবং মোসলেম শরীফ)।*

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলাল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে উৎপীড়ন করে না তাকে, অর্পণ করে না তাকে শত্রুর হাতে।' *(বোখারী এবং মোসলেম শরীফ)।*

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রসুলাল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, কোন বান্দা মুসলমান হয় না যে পর্যন্ত তার মন এবং তার রসনা মুসলমান না হয়; এবং কখনো বান্দা বিশ্বাসী হয় না যে পর্যন্ত তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ না থাকে।' *(আহমদ শরীফ)*

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো - 'হে আল্লাহর রসুল, নামাজ-রোজা এবং সাদকার জন্য অমুক স্ত্রীলোকের অধিক খ্যাতি আছে কিন্তু তার প্রতিবেশীগণকে তার রসনা দ্বারা কষ্ট দেয়।' তিনি বললেন 'স্ত্রীলোকটি জাহান্নামে যাবে।' সে বললো, 'হে আল্লাহর রাসুল, অমুক স্ত্রীলোকের নামাজ-রোজা ও সাদকার জন্য অতি অল্প নাম আছে, কিন্তু সে পনীরের অবশিষ্টাংশ দেয় এবং তার প্রতিবেশীগণকে তার রসনা দ্বারা কষ্ট দেয় না'। তিনি বললেন, 'স্ত্রীলোকটি বেহেস্তে যাবে।' *(আহমদ এবং বাইহাকি শরীফ)*

রসুলাল্লাহ (সঃ) বলেন, 'তোমরা প্রতিবেশীর উপকার করবে, তাহলে তুমি বিশ্বাসী হবে, তোমার জন্য যা ভালোবাস , মানবের জন্য তাই ভালোবাসবে, তাহলে মুসলমান হবে।' *(আহমদ এবং তিরমিজী শরীফ)*

হযরত আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে রসুলল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'প্রতিবেশীর কি হক তা কি তুমি জান? সে তোমার সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করবে, সে তোমার অভয় চাইলে তোমার অভয় দিবে, সে ঋণ চাইলে তাকে ঋণ দিবে, সে নিঃস্ব হলে তাকে দান করবে।' *(এবনে আদি)।* রসুলাল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'যখন তরকারী পাক করো, তার সুরুয়া বৃদ্ধি কর এবং তোমার প্রতিবেশীকে তা হতে কিঞ্চিৎ দিও।' *(মোসলেম শরীফ)*

রসুলাল্লাহ পাক (সঃ) বলেছেন, 'তোমাদের ভিতর কে ভাল কে মন্দ, আমি কি তা জানাবো না?' সাহাবীরা নীরব রইলো। তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন। এক ব্যক্তি বললো, 'হে আল্লাহর রসুল! আমাদের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ তার সংবাদ দিন।' তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তির উপকারের আশা করা যায় এবং যে ব্যক্তির অপকারিতা হতে নিরাপদ থাকা যায়, সে তোমাদের মধ্যে উত্তম, এবং যার উপকারের আশা করা যায় না এবং অপকার হতে নিরাপদ হওয়া যায় না, সে তোমাদের মধ্যে অধম।' *(তিরমিজী শরীফ)*

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক এল যার চক্ষু কোটরাগত, ললাট উন্নত, দাড়ি ঘন গজানো, গালের হাড় উচ্চ, মাথা মুড়ানো এবং বলল, 'হে মোহাম্মদ, ভয় করো খোদাকে।' রাসুলাল্লাহ (সঃ) বললেন, 'কে মানবে আমাকে, যদি খোদাকে না মানি? খোদা আমাকে বিশ্বস্ত করেছেন সমস্ত পৃথিবীর লোকের মধ্যে, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করো না আমাতে।' তখন উমর ফারুক হত্যা করতে চাইলেন তাকে, কিন্তু তিনি নিষেধ করলেন। যখন সে চলে গেল তিনি বললেন, এই ব্যক্তির দল হতে উৎপন্ন হবে এক জাতি যারা কোরআন পড়বে কিন্ত উহা তাদের গলার ভেতর ঢুকবে না, তোমাদের কেহ তুচ্ছ মনে করবে নিজের নামাজকে তাদের নামাজের সঙ্গে তুলনায়, নিজের রোজাকে তাদের রোজার সঙ্গে তুলনায়। তারা বাহির হয়ে যাবে ইসলাম হতে, তারা অত্যাচার করবে মুসলমানদের প্রতি আর ছেড়ে দিবে মুশরিকদের। যদি আমি (রাসুলাল্লাহ) (সঃ) তাদের পেতাম, হত্যা করতাম আদ জাতির মত। *(বোখারী এবং মোসলেম শরীফ)।*

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবিফারাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসুলল্লাহ (সঃ) একদিন অজু করার পর তাঁর সাহাবীগণ অজুর বাকি পানিটুকু মুখে ও দেহে মাখতে লাগল। রাসুলাল্লাহ (সঃ) তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা এরূপ কেন কর?' তারা বলল, 'আল্লাহ এবং তার রাসুলের

ভালোবাসার জন্য।' রাসুলাল্লাহ বললেন, 'যেআল্লাহ এবং তার রাসূলকে ভালোবাসতে চায় অথবা যাকে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ভালোবাসে সে যখন কথা বলে, সত্য যেন বলে, যখন বিশ্বাসের বিষয় তার উপর ভার দেওয়া হয়, তখন যেন বিশ্বাস রক্ষা করে এবং তার প্রতিবেশীগণের যেন উপকার করে।' *(বাইহাকী শরীফ)।*

এই এগারোটি হাদীসে রাসুলাল্লাহ (সঃ) আবার সেই একই গণসাম্যবাদের আদর্শ তুলে ধরেছেন। একই গণসাম্যবাদকে মানুষ যাতে কোন প্রকারেই মন হতে মুছে ফেলতে না পারে, তারই জন্য বার বার সাবধান করে দিচ্ছেন। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রাসূল (সঃ) জানান যে, নফসে আম্মারা অর্থাৎ শয়তান প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে প্রতিটি মানুষ মানুষের উপরে প্রভুত্ব করতে চায় অর্থাৎ মালিক বনে যেতে চায়। ইহাই প্রবৃত্তির সাধারণ গতিধারা। প্রবৃত্তির লোভনীয় বাঁধনের তীব্র অথচ সূক্ষ্ম আঘাতে মানুষ বিভিন্ন রূপের মাঝে কর্তৃত্বের প্রাধান্য বিস্তার করতে আগ্রহী। মালিক হবার উগ্র বিশ্রী কর্তৃত্বের পাঁকে হারিয়ে ফেলে নিজেকে। আল্লাহর গোলাম হবার অর্থাৎ আল্লাহকে সিজদা দিতে তথা আত্মসমর্পন করতে মোটেই চায় না। এইরূপ মালিকানার কর্তৃত্ব স্বয়ং ইবলিসের প্রতিরূপ ছাড়া আর কিছু নয়। ইবলিস নিজের ব্যক্তিত্বের মূল্য যাচাই করতে গিয়ে আল্লাহর আদেশটুকু অমান্য করতে মোটেই দ্বিধা করেনি। নিজের গর্বিত মনোভাবে ইবলিসের এত শত বছরের প্রাণঢালা সাধনা বিফলে পর্যবসিত হল। সে অহঙ্কারের আস্ফালনে আদমকে সিজদা করেনি। এই সামান্য ম্যাটির-তৈরী আদমকে ইবলিস সিজদা করবে! অসম্ভব। সে জাহান্নামে যেতে কুণ্ঠিত নয়, তবু তার ব্যক্তিত্বকে আল্লাহর আদেশের নিকট মাথা হেঁট করবে না। সেই কুখ্যাত ইবলিসই খান্নাস রূপগ্রহণ করে প্রতিটি মানুষের মাঝে জাগ্রত অথচ অদৃশ্যমান হয়ে আছে। এই ইবলিসের প্রভাবে মানুষ খাদেমের ভূমিকায় মালিক সেজে মানুষকে দেয় দুঃসহ বেদনার বহ্নিবাণ। ইবলিসের প্ররোচনায় মানুষ খাদেমের মুখোশে মানুষের মৌলিক দাবিগুলোকে বেমালুম হজম করে আমীর তথা বড়লোক সাজে। এবম্প্রকার বড়লোকদের জন্য বেহেস্ত হারাম। সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ অসম্ভব, কিন্তু তার চেয়ে বেশী অসম্ভব একজন এবং এবম্প্রকার বড় লোকের বেহেস্তে প্রবেশ করা।

সুচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করা অসম্ভব অর্থাৎ আমাদের কাছে অতি বিস্ময় জাগে, এত বড় প্রাণীটা কি করে সুচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করতে পারে? ইসলাম ঘোষণা করেছে, হ্যাঁ- তোমার কাছে খুবই অসম্ভব লাগছে, কিন্তু মনে রেখ এর চেয়ে অনেক বেশী অসম্ভব হবে এবম্প্রকার লোকদের বেহেস্তে প্রবেশ করা। আসলে তারা বেহেস্ত চায় না। তারা চায় খাদেমের মুখোশে মালিক হয়ে মানুষের পাঁজর-ভাঙ্গা খুন পিয়ে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে নগ্ন নৃত্যে মুসলিম ঐক্যকে শ্রেণীতে শ্রেণীতে টুকরো করে ফেলতে। তাই রসুলাল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে নীরবতা না দেখিয়ে এই সমস্ত ভণ্ডদের 'আদ জাতির মতো নিশ্চিহ্ন করে দাও' বলে আহ্বান জানাচ্ছে। আমাদের প্রত্যেকের এই দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে স্বাভাবিক মৃত্যু না হয়ে শহীদের মৃত্যুকে বরণ করে নেবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। সকলে মিলে শহীদী মৃত্যুকে বরণ না করলেও আমাকে যে করতেই হবে। কারণ, ইহা ছাড়া বেহেস্ত পাবার আর কোন সংজ্ঞা জানা নেই। আমি তো জাহান্নামের আগুনে চিরদিন জ্বলবো, চিন্তা করলে হৃদয় শুকিয়ে যায়। রাসুলাল্লাহর (সঃ) আকুল আহ্বানে সাড়া না দিলে যে আমি ঈমানদারই হতে পারছি না, অর্থাৎ বেঈমান হয়ে যাচ্ছি। আর বেঈমানের চিরকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে ইহা আমরা অতি সহজেই বুঝি। এই দুনিয়ার জীবন তো একটি নাটকের কয়টি পর্যায়। তার পর সব শেষ। তার পর যে-কালের আর শেষ নেই সেখানে কি সম্বলটুকু নিয়ে নবীর উম্মত বলে দাবি করবো? ঐ দেখুন রাসুলাল্লাহ (সঃ) আমাদের কি শুনাচ্ছেন। রাসুলাল্লাহ (সঃ) বলছেন, 'কেহই ঈমানদার হয় না

যতক্ষণ না আমি তার নিকট প্রিয়তর হই তার পিতা ও সন্তান হতে এবং সমগ্র মানবজাতি হতে।' *(বোখারী এবং মোসলেম শরীফ)*।

রাসূলাল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'সে পেয়েছে ঈমানের আস্বাদ যার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসুল প্রিয়তর অপরাপর সকলের চেয়ে।' *(বোখারী এবং মোসলেম শরীফ)*।

তাই রাসুলাল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে, যার অপকারিতা হতে প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে না, অর্থাৎ জাহান্নামের প্রজ্বলিত অগ্নি হবে তার মা। অন্তনকাল সেই অগ্নিমাতার কোলে থাকতে হবে। কি সেই অপকারিতা? অপকারিতা বলতে এখানে যত রকম অপকার হতে পারে তা-ই বোঝানো হয়েছে। একজন প্রসারিত জমি দখল করে মালিক সেজে দিব্যি আরাম-আয়েসে ঘর- বাড়ি তৈরী করে জীবন অতিবাহিত করছে, আর একজন তার মত দেহের অধিকারী মানুষ বঞ্চিত-অবহেলিত হয়ে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁইও পাচ্ছে না। দুনিয়ার জীবনটার উপর অভিশাপের দোহাই দিয়ে সরু ছোট্ট একটি ছনের চালার ঘরে ছেলে-পুলে নিয়ে কত কষ্টেই না জীবন কাটাচ্ছে। এই বৈষম্য ইসলামে নেই। এই বৈষম্য সম্পুর্ণরূপে দূর করার জন্য রাসুলাল্লাহ (সঃ) প্রশস্ত জমিতে বাস-করা লোকটিকে অভাবগ্রস্ত লোকটির সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট অর্থাৎ অপকারিতা দূর করার তরে সাবধান করে দিচ্ছেন। একটি মানুষ তিন শত টাকা খরচ করে দেহে গরম প্যান্ট-কোট লাগিয়ে শীত নিবারণ করছে অথচ তারই একজন প্রতিবেশী টুটা-ফাটা কাপড় কোমরে জড়ায়ে লজ্জা ঢাকতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্যান্ট পরা লোকটি কি মনে করছে না, সে তার প্রতিবেশী? সে কি ভুলে গেছে যে অপকারিতা দূর করতে না পারলে বেহেস্তে প্রবেশ করবে না? সে কি তবে বেহেস্ত চায় না, অবিশ্বাস করে? তবে সে কি করে নিজেকে মুসলমান বলে? কোন অধিকারে সে রসুলাল্লাহ (সঃ)-এর উম্মত বলে নিজেকে দাবি করে? এই দাবি করাটা কি নিতান্ত ভণ্ডামী নয়? এরকম মিথ্যা দাবি করে কি তবে এরাই মসুলমানের দৃঢ় ঐক্যের বন্ধন কাঁচ ভাঙ্গার মত চুরমার করে দিচ্ছে? এরাই কি মুখে শুধু কোরআন পড়ে কিন্তু অতিক্রম করে না গলদেশে? এরাই কি সেই নামাজী যাদের নামাজ পড়ার সঙ্গে তুলনা চলে না? এরাই কি তবে সেই রোজাদার যাদের রোজার সঙ্গে তুলনা দেওয়া চলে না? তবে কি রাসুলাল্লাহ (সঃ) এদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, এরা বাহির হয়ে যাবে ইসলাম হতে, যেমন তীর বাহির হয় ধনুক হতে? তবে কি রাসুলাল্লাহ (দঃ) এদেরকেই বলেছেন যে, যদি পেতাম তবে হত্যা করতাম আদ জাতির মত? হে বীর মোজাহিদ মুসলমান, তবে এখনো নীরবে কেন দাঁড়িয়ে থেকে এই করুণ দৃশ্য দেখছ? হে বীর মোজাহিদ, তোমার কাছে তো পিতা ও সন্তান হতে এবং সমগ্র মানবজাতি হতেও প্রিয় তোমার রাসুলাল্লাহ (সঃ), তবে কেন শহীদের দেদীপ্যমান বিক্রম তোমার বক্ষে উত্তাল তরঙ্গের চুরমার করা শব্দ আলোড়নে উতলা করে তুলে না? মৃত্যুকে না তুমি পূর্বেই সমাধির স্বাক্ষর করে রেখেছ? তবে কেন সমাধিকে দূরে ফেলে চুপ করে আছ? তবে কেন প্রতিবাদের মশাল পাশবিক শক্তিকে মিসমার করার তরে জ্বলে উঠে না? রাসুলাল্লাহর (সঃ) বলে দেওয়া ভণ্ড-বেঈমানেরা কি এখনো কালের কলঙ্ক-স্বাক্ষর হয়ে মর্ত্যমঞ্চের মত্ততায় মলিনতা ছড়াতে থাকবে? কোথায় তোমার প্রতিবাদের মশাল? কোথায় তোমার বজ্রকঠিন সংকল্পের প্রধূমিত পরিশীলন? কোথায় তোমার জীবন দিয়ে নবীউল্লাহর প্রেমে মাতোয়ারার চিহ্ন? লৌহ সংকল্পে তুমি অটল। তবু রাসুলাল্লাহ (সঃ)-এর আঁখির প্রবিত্র অশ্রু গড়িয়ে পড়তে দেখে মৌন হয়ে আছ! তুমি কি সেই মোজাহিদ নও যেদিন ওহোদ রণপ্রান্তে রাসুলাল্লাহ (সঃ)-কে নিজের বক্ষ তীরের মুখে তুলে দিয়ে নিরাপত্তার প্রাচীর গড়ে তুলে?

আমি আমার ছেলে-পুলে নিয়ে পোলাও-কোরমা খেতে বসেছি কিন্তু আমি কি একটিবার ভেবে দেখবো না যে, আমার প্রতিবেশীরা কি খাচ্ছে? আমারই প্রতিবেশী হয় তো দু-মুঠো ভাত ছেলে-পুলেদের নিয়ে খেতে পারছে না। অবুঝ ছেলে-পুলে ক্ষুধার জ্বালায় বাবা-মার কাছে প্রতিবাদ তুলে ধরছে আর কেঁদে উঠেছে। রাসুলাল্লাহ (সঃ)-এর আদেশ, আমিও যা খাব অপরকেও তাই খেতে দিতে হবে। না দিতে পারলে মুসলমান হতে পারবো না। তা-তো আমার জন্য অনেক দূরের কথা, কিন্তু একটিবারের তরেও কি সেই ভুখা প্রতিবেশীর খোঁজ নিয়েছি? তা হলে দেখতে পাচ্ছি ইসলামের সীমানাতেও দাঁড়াতে পারছি না। এই তো সমাজের কথিত মুসলমান আমরা। সেবকের ভূমিকায় আমারই প্রতিবেশীর কাছে আল্লাহ মালিক- তার সঙ্গে আমার মালিকানাটাও আঠা দিয়ে গোপনে লাগিয়ে দিচ্ছি। যদিও আমাকে কেউ মালিক বললে মৌখিক প্রতিবাদ করে বলি, আমি কিচ্ছু না- আমি তো আপনাদের খাদেম। আসমানের উপর ইঙ্গিত করে মুচকি হাসি তুলে বলি- মালিক তো আল্লাহ।

এই সমস্ত খাদেম যে দেশের শাসনব্যবস্থার পরিচালনার ধারায় গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং শাসন ব্যবস্থার প্রধান মুখোশধারী মুসলমানগুলোকে প্রাণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও, প্রতিবাদের মশাল বাহির কর, সবাই এক হয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাও। মনে রেখ, শাহাদাৎ বরণ করতে না পারলে ইসলামের গণসাম্য আসতে পারে না। শাহাদাতের রক্তে-রাঙ্গা ফোটায় ফোটায় প্রতিবাদের লিপি রচনা করতে হবে। সে রক্ত-রাঙ্গা ফোটায় আখরিত প্রতিটি লিপি ভণ্ড খাদেমদের পিলা চমকিয়ে দেবে।

আমার ছেলে-পুলেরা উঁচু ইটে গড়ানো ইমারতে গরম জামা পরে শীতের হিমেল হাওয়াকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে, আর আমারই প্রতিবেশীর ছেলে-পুলেরা ঠাণ্ডা মাটিতে খড় বিছিয়ে ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়িয়ে রাত কখন ফুরোবে ভাবছে। কে কার খোঁজ রাখে? এই দুনিয়ার মোহ-মায়া, আমার মানবতা আমার নবীউল্লাহর (দঃ) আবেদনকে বেমালুম ভুলিয়ে দিয়েছে। দুনিয়ার মেকী মায়াজাল আমার মৃত্যুঘটনা কোনদিন ঘটবে না বলে দিয়েছে। আমি তো আমার প্রিয় নবীউল্লাহ (দঃ)-কে বলতে শিখলাম না যে, আমারই তরে শুধু এই গরম জামা দিচ্ছ? কিন্তু আমার পেছনে যে আমারই মত ভাইয়েরা শীতে কাঁপছে, তাদের প্রত্যেককে যেদিন একটি করে গরম জামা দিতে পারবে সেদিন আমাকেও একটি দিও। সেদিন তোমার তুলে দেওয়া গরম জামা আমি আনন্দের সাথে গ্রহণ করবো। আমার প্রাণপ্রিয় মুহাম্মদ (দঃ), তুমি যে বলে দিয়েছ, 'বিশ্বাসীরা পরস্পরের প্রতি দয়া, প্রীতি ও সহানুভুতিতে একদেহের মত।' তবে আমি কি করে একা এই গরম জামা নিজের গায়ে তুলে নিয়ে বিশ্বাসী ভাইদের বঞ্চিত করবো? সেই বিশ্রী অধিকারের সংজ্ঞা যে তুমি দাওনি। তবে তোমার বলে দেওয়া 'পরস্পরের প্রতি দয়া, প্রীতি ও সহানুভুতিতে এক দেহের মত', -যে আমাকে প্রথমে অস্বীকার করতে হবে, তারপর তুলে নিতে হবে সেই গরম জামা। তাহলে কোন অধিকারে তোমার উম্মত বলে দাবী করবো? আমার অঙ্গে গরম জামা কিন্তু আমার বিশ্বাসী ভাইদের অঙ্গগুলো যে শীতে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তাদের অঙ্গগুলো যে আমার অঙ্গ। তাদের অঙ্গগুলো যে শীতে পীড়িত, তাই আমার অঙ্গ ডাকছে তাদের শীত নিবারণের জন্য। তুমি যে বলেছ, 'যখন পীড়িত হয় এক অঙ্গ, অপর সমস্ত অঙ্গ পরস্পরকে ডাকে উহার সাথে সহানুভুতির জন্য জাগরণ ও তাপে।'

বিশ্বমুসলিম একটি দেহ। সেই একটি দেহের তরে একটি জামার রূপটি কিন্তু বড়ই করুণ। তাই অবিশ্বাসীরা একটি দেহে একটি জামার রূপটি দেখে ঠাট্টা করে। বিশ্ব মুসলিম দেহের জামাটির একটি হাতা গরম কাপড় দিয়ে বানানো, অপর হাতাটি ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে বানানো, পিঠের অংশটুকুর

অর্ধেক ছালার চট আর অর্ধেক মারকিন কাপড়, বুকের অংশটুকু অর্ধেক ছিঁড়ে ঝুলে আছে আর বাকি অর্ধেক নানা রঙবেরঙ-এর তালিমারা। এই তো বিশ্বমুসলিম দেহের উপর জামার রূপটি। তাই তো অবিশ্বাসীরা মুখে রুমাল চেপে হাসে আর মনে মনে বলে, এরকম জোকার না থাকলে কি নাটকে টক হয়! কেউ হয়তো আমাদেরকে ইঙ্গিতে ঠাট্টা করে বলে, ধর্ম তো আফিম। সেই আফিমের নেশায় থাকলে নিজের জামার শ্রী দেখতে পাই না। এত অপমান সইতে পারছ, হে বীর মুজাহিদ? এখনো তুমি নীচে দাঁড়িয়ে আছ? কোথায় তোমার প্রতিবাদের মশাল? তুমি যে গরম জামা পরতে পারছ না, বিবেক যে শত বিষদাঁত বের করে তোমার বিবেককে ছেদা করে দিচ্ছে। অপর ভাইদেরও দেবার সামর্থ্য নেই। তবে কি করবে? নবীউল্লাহ (দঃ) যে তোমার নয়নের মণি। তাই শহীদ হবার প্রধূমিত বাসনা নিয়ে তাদেরকে রুখতে হবে যারা তোমার দেহে লোক-হাসানো জামা পরিয়ে দিয়ে ভণ্ডের মত পবিত্র কুরআন পড়ে কিন্তু গলার ভেতরে ঢুকে না, তোমাদের চেয়ে বেশি নামাজ পড়ে, তোমাদের চেয়ে বেশি রোজা রাখে। এই সব ভণ্ডদেরকে লক্ষ্য করে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলছেন, 'তারা অত্যাচার করবে মুসলমানদের। যদি আমি পেতাম তবে হত্যা করতাম আদ জাতির মত।' দিবালোকের মত স্পষ্ট করে তোমার প্রাণপ্রিয় রসুলুল্লাহ (দঃ) বলে দিচ্ছেন, তবু তুমি এখনো নীরব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে আছ, হে বীর মুজাহিদ মুসলমান? বিশ্বাসীরা একটি দেহ। মানবদেহের যে কোন একটি অংশ যদি পীড়িত হয়ে পড়ে তখন অন্য সমস্ত অংশগুলো তারই ব্যথায় ব্যথিত হয়ে সমবেদনা জানায়। এই পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের আদর্শে গরীয়ান যারা তারাই মুসলমান। ইহারই অপর নাম গণসাম্যবাদ। শোষণবাদের যে কোন স্বীকৃতিই ইসলামে নেই, ইহাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। সব মানুষ মরবে, আমি মানুষ, আমাকেও মরতে হবে, ইহা যে রকম জ্বলন্ত সত্য, বিশ্বাসীরা সবাই 'একটি দেহ' বলার মাঝেও সেই গণসাম্যের জ্বলন্ত সত্য উদ্ভাসিত হয়ে আছে। কিন্তু ঐ 'আদ জাতির মত খুন করতাম' নামধারী মুসলমান কোরান, নামাজ এবং রোজা রাখার ভেল্কিবাজি দেখিয়ে অসাম্যের গন্ধ ছড়িয়ে, বিশ্বমুসলিম ঐক্যকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দিচ্ছে। এই ভণ্ডদের রূপটি চিক চিক করা মরুভূমির উষ্ণ বালি। দূরে উত্তাল তরঙ্গ। নিকটে মেকী। আহত পাখির মত বিশ্বমুসলিম তেষ্টার জল খৈ ফোটা বালি দেখে ছটফট করে মরে পড়ে থাকে। হে মুজাহিদ মুসলমান, কোথায় ফেলে রেখেছ তোমার তৈরী করে রাখা প্রতিবাদের মশাল? কেন ভণ্ডের তাণ্ডব নৃত্য নীরব-নিথর করে দেয় না তোমার গর্জে উঠা ঘুমন্ত প্রতিবাদ? কেন তোমার সংগ্রামের সমবেত প্রতিবাদ মানুষের গ্রাস ছিনিয়ে নেওয়া গর্বিত বক্ষটাকে কাঁপিয়ে তোলে না? তুমি কি ভাগ্যটার উপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে মোজাইক করা পাষাণ নামধারী মসজিদটাতে নামাজ পড়তে যাও আল্লাহকে তুষ্ট করে বেহেস্ত আদায় করতে? এত বড় বোকাই আল্লাহকে ভেবে নিতে পারলে! ইট দিয়ে তোলা মসজিদটার সরু জুতো রাখার পথটা ঘিরে কুকরো হয়ে পড়ে আছে খাঁটি মসজিদের অধিকারী নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, পদদলিত, তোমারই মুসলমান ভাইয়েরা। মায়ের ছেঁড়া শাড়িতে শীত ঢাকতে পারেনি। হাড়-উঠা দুটো শুকনো স্তনের বোঁটায় মুখ লাগিয়ে শিশু আহত পাখির মত ছটফট করে কাঁদছে। ছোট ছোট ছেলে-পুলেগুলো না খেতে খেতে পিঠটা বাঁকা হয়ে গেছে। শীতে জামা নেই, হাত দুটো জড়ো করে বুকটায় লাগিয়ে রেখেছে। কোথায় দিয়েছ রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর দেওয়া সমান অধিকার? কোথায় তোমার ভ্রাতৃবন্ধনের চিহ্ন? এই ভণ্ড নামাজের বিড়বিড়ানিতে ভণ্ড নামাজির পরিণাম কি সেটা তুমি জান না? তবে জেনে শুনে কেন ভণ্ডামি করছো? প্রতিবাদ করবে? প্রতিবাদের জ্বালা দাবদাহের মত ফুটিয়ে তুলবে কাগজের পাতায়? কিছু হবে না। কোন ফল ফলবে না। সংগ্রাম আর প্রতিবাদের মশাল হল এর যোগ্য প্রতিবাদ। দল বেঁধে পার - না হয় কয়জন মিলে পার -না হয় একা পার - গোপনে পার - সংগ্রাম

আর মশালের প্রতিবাদে নবপুস্তক রচনা করতে থাক। প্রকাশক পাবে নবপুস্তক প্রকাশ করতে। গ্রাহক পাবে নবপুস্তক কিনে নিতে। মুদ্রণের পর মুদ্রণ চলবে নবপুস্তকের। রসুলুল্লাহর (দঃ)-এর দেওয়া গণসাম্যের নবোদিত সূর্যের সাত ঘটিকার এক ঝলক সাম্যের আলো লুটিয়ে পড়বে। নবপুস্তক রচনায় মোনাফেক তোমায় মৃত্যুদণ্ড দেবে? সেই ভয়ে বুঝি ভিজে বেড়াল হয়ে আছ? ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারিতে মৃত্যুদণ্ড বরণ করে নিতে পারছ সিনেমার টিকেট কাটার মত কিউ দিয়ে। হাজার হাজার রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর দাবীওয়ালা গোলাবী মুসলমান তবু নবপুস্তক রচনা করবে না। সাদা কাগজে কালা কালিতে কান্নাকাটি করতে পটু কিন্তু নতুন পুস্তকের কথা বললেই সব ভীতু। এতই সহজ জান্নাত? ছেলের হাতের টেডি আচার আর আল্লাহর জান্নাতের যেন কোনই ফারাক নেই। বাঃ বাঃ চমৎকার বুদ্ধির বহর। ফাঁকি দিয়ে বি, এ, পাশ করতে চাও? একি বাপ-দাদার দেওয়া কলেজ পেয়েছ নাকি, যে বইটা খুলে লিখে দিলেই পাশ? না দিলে প্রফেসরকে ছোরার ভয় দেখিয়ে... তুমি কি জান না যে নিজেদের ভাগ্য আল্লাহ আমাদেরকে পরিবর্তন করতে বলেছেন। একটা জাতির ভাগ্য আল্লাহ কখনোই পরিবর্তন করান না যতদিন না তারা নিজেদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করেন। ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনের প্রধান শিক্ষাই দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছে, লাখো মানুষ যদি জাহান্নামে যায় তবে তুমিও কি যেতে চাও? তোমার ব্যক্তিগত যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে সেটুকু কেউ পালন না করলেও তুমি পালন কর। কারণ অন্যের আমলনামা তোমার ভাল-মন্দের কোন ধার ধারবে না। তুমি বিশ্বাস কর ভাই, জান্নাত তোমার জন্য স্পষ্ট হারাম হয়ে আছে। মৃত্যু-ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে অনুশোচনায় কেঁদে উঠবে। দেখবে অনন্তকাল ব্যাপ্ত শুধু জাহান্নাম আর জাহান্নাম। কালি আর কাগজে তুমি তোমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব হতে মুক্তির তরে একটি প্রতিবাদের পুস্তক রচনা করে রেখে যাও, তা হলে তুমি ঈমানভূমির সীমানাতে দাঁড়াবার হয়তো স্বীকৃতি পাবে। আল্লাহ এবং রসুলুল্লাহ (দঃ)-কে সাক্ষী করে বলছি, কোরান-হাদীস শরীফ পড়ে প্রতিবাদের পুস্তক রচনা ছাড়া বর্তমানে পরকালে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভের আর কোন সহজ পথ খুঁজে পাই না। কারণ, এই পথকে ঈমানভূমির সীমানাতে দাঁড়াবার স্বীকৃতি বলা হয়েছে। তারপর হল আধ্যাত্মিক জগত। প্রেমলীলার অশেষ সৌন্দর্যের বিজ্ঞানময় রহস্য। সেই রহস্যই প্রকৃত শান্তি এবং ইসলাম। এখন আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা অনেকটা নদীর কিনারায় কুয়ো খুঁড়ে পানি বিতরণ করার মত।

বস্তুপ্রীতি এবং বস্তুর উপর নির্ভর করে জড় চাহিদার বিভিন্নতাকে দ্রুতগতিতে বাড়িয়ে দিয়ে পার্থিব সুখ-সম্পদে গা ভাসিয়ে বিলাসিতায় জীবনটাকে মুখরিত করে রাখাকে ইসলাম মানবজীবনের জীবনমান (স্টানডার্ড অব লিভিং) বলে মেনে নেয়নি। এরকম জীবনমান উন্নয়নকে ইসলাম আমিত্ব ধ্বংস না করে বরং বাড়িয়ে যাওয়া বলে ঘোষণা করেছে। আমিত্বের গন্ধ সাম্যের দুয়ারে বিশ্রী গন্ধ ছড়ায় বলে ইসলাম আমিত্বকে তাড়াবার সাধনা করতে বলেছে। তাই ঈমানকেই মানবজীবনের একমাত্র জীবনমান বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে। যার যতটুকু ঈমানের গভীরতা পাওয়া যাবে তার ততটুকু জীবন মান উন্নত -এটাই বলেছে ইসলাম। ' ইজ্জত একমাত্র আল্লাহর, আল্লাহর রসুলের এবং মোমিন মানুষদের।' (কোরান)। এই সীমার বাইরে আল্লাহ কারো জন্য কোন প্রকার ইজ্জত নেই বলেছেন। তা হলে বর্তমান দুনিয়ার 'জীবনমান'-এর স্থান ইসলামে রইলো না বলে প্রমাণিত হল। তথাকথিত জীবনমান কেবল ধন-সম্পদ শোষণ করে নফসের ভোগের বিশ্রী উগ্রতা বাড়ানো এবং দুনিয়ায় ধনস-ম্পদে নিজেকে বাড়িয়ে অপরকে তাড়িয়ে দিয়ে ধনের শৃঙ্খলে দাস হয়ে থাকা। এবং ইসলাম এরকম জীবন ব্যবস্থাকে কুফুরী জিন্দেগী বলেছে। কারণ ইহা ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেস্তে ঢুকতে পারবে না এবং পরস্পর

পরস্পরকে ভাল না বাসলে ঈমান আসে না।' এখন অতি সহজেই বুঝতে পারা যায় যে ঈমান ইসলামের গোড়া বা মূল। তাই ইসলামের মূল ঈমান না আসলে কেহই বেহেস্তে যেতে পারবে না। ইহা রসুলুল্লাহ (দঃ) অতিস্পষ্ট করে বলে দিলেন এবং এটাই ইসলামের প্রকাশ্য এবং গোপন ঘোষণা। এখন আমাদের কাছে প্রশ্ন হয়ে রইল, কি সেই কাজ যা করতে পারলে ঈমান আসে এবং ঈমানের পরিবর্তে বেহেস্ত পাবে? কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজেই ঈমান কি করতে পারলে আসে এবং বেহেস্তে যেতে পারবে এবং ঈমান কি করতে না পারলে আসে না এবং বেহেস্তে যেতে পারবে না তাহাও অতি সহজ এবং সরল ভাষায় বলে দিলেন, যেন বিষয়টি আমাদের নিকট ধোঁয়াটে বা কুয়াশার মত মনে না হয়। তিনি আমাদের জানিয়ে দিলেন যে, পরস্পর পরস্পরকে ভালো না বাসলে ঈমান আসে না। সেই ভালোবাসা বলতে কি বোঝান হল? শুধু মুখের কথা দিয়ে ভালোবাসা? না মুখ ও অন্তর উভয় দিয়ে ভালোবাসা ফুটিয়ে তোলা? অপরের দুঃখ-কষ্ট মোচন করে নিজের মত করে গড়ে তোলাটাই ভালোবাসা। কারণ, মানুষ তার নিজের বেলাতে বেশ বুঝে, কিন্তু অপরের জন্য উদাসীন, অমনোযোগী থাকে। এই হীন পশুর স্বভাব ছেড়ে দিয়ে অপরকে নিজের বেলাতে যতটুকু বুঝি ততটুকু বুঝবার নাম হল পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা। পাঁচ রাকাত নামাজ পড়ার চেয়ে দশ রাকাত নামাজ পড়াটাও একজন মানুষের পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ নয়, কিন্তু আশ্রয়হীন অসহায় মানুষকে নিজের মালিকানায় রাখা বিশাল বাড়ীটার মাঝে আশ্রয় দেওয়া বড় কঠিন কাজ। পথের পাশে পড়ে থেকে শীতে কাঁপছে আর মৃত্যুর পথযাত্রী সাজতে শুরু করেছে। কিন্তু দশ রাকাত নামাজ পড়নেওয়ালা তথাকথিত আল্লাহ-রসুলের মহব্বত কপচানো মুসল্লি সাহেব তার বিশাল বাড়ীখানা থাকা সত্ত্বেও এই শোচনীয় অবস্থা দেখে এক পা এক পা করে ইনশাল্লাহ কেটে পড়েন। এরকম শোচনীয় দৃশ্য সমাজে অহরহ ফুটে উঠবে জেনেই রসুলুল্লাহ পৃথিবীর মানুষকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালবাসতে আদেশ দিয়েছেন এবং এই আদেশ অমান্যকারীকে ঈমান আনেনি বলে বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে না তথা জাহান্নামের আগুন সাথী হয়ে থাকবে বলে সাবধান করে দিয়েছেন। সাম্যবাদ সমাজে পরস্পরের প্রতি ভালবাসাকে সুন্দর এবং প্রীতিকর করে তোলে বলে ইসলাম পৃথিবীর মানুষকে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে বার বার আদেশ দিচ্ছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'আগুন, পানি, খাদ্যদ্রব্য এবং পোশাক-পরিচ্ছদের উপর রয়েছে জনগণের প্রত্যেকের সমান অধিকার।'

বস্তুসৃষ্টির উদ্দেশ্য হল আল্লাহকে পাবার যে সাধনার পথ সেই পথে মানুষের সেবার উপকরণ ও সাথী হিসেবে মানুষের দাসত্ব করা। কিন্তু বস্তুরই দাস হয়ে গেল মানুষ, এটাই মানুষের জঘন্য দাসত্ব ও শেরেক। এই দাসত্ব হতে উদ্ধার করে আল্লাহর দাসত্ব শিক্ষা দেবার তরে আল্লাহ তাঁর রসুলকে পাঠিয়ে থাকেন। বস্তুর দাস হয়ে অধ্যাত্ম-শক্তির সম্মুখীন মোটেই হওয়া যায় না। কেননা, অধ্যাত্ম-শক্তি অর্থাৎ খোদার প্রতিনিধিরূপে খোদায়ীশক্তি বস্তুশক্তির উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। আপসোস! এই আস্থা ও সত্যবোধ আমাদের মাঝে আর কখনো ফিরে আসছে না। আল্লাহ প্রেরিত বিধান, নবী ও রসুলদের পাঠিয়েছেন যেন মানুষ তার কর্মবাদ বস্তুভিত্তিক না করে পরকালভিত্তিক করে গড়ে তোলে। কারণ ইহকাল অনন্ত পরকালের শস্যক্ষেত্র ও শিক্ষানবিসী জীবন মাত্র। আজকের সউদী আরবের বাদশাগণ দাবী করেন যে, পৃথিবীতে একমাত্র তাদের দেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক ইসলামী শাসনব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে যা জগতের আর কোন মুসলিম দেশ রক্ষা করতে পারে নাই। ইহা কেবল তাদের মিথ্যা দাবীই নয়, তাছাড়া একথা বললেই ন্যায়সঙ্গত হবে যে, তাদের শাসনব্যবস্থা অন্যান্য দেশের শাসনব্যবস্থা হতে অনেক বেশি ইসলামবিরোধী। 'শরিয়তের আইন'-এর নামমাত্র একখানা মুখোশ লাগিয়ে কোরান-হাদিসের সত্যকে ঢাকবার চেষ্টা করলে চলবে না। ইসলামের তথা ঈমানের প্রথম

এবং প্রধান শর্ত সাম্যবাদ আরব জনসাধারণের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার কোন উৎসাহই আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। ইসলামবিরোধী আত্মকেন্দ্রিকতা আরব বাদশাদের প্রবল হতে প্রবলতর হতে চলছে। মানবিক দাবী এবং সাম্যই ইসলামের প্রথম ঈমানের শর্ত হওয়া সত্ত্বেও শরিয়তের কতগুলো হালকা বিধানের উপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কোমরের কাপড় খুলে মাথায় পাগড়ি বেঁধে ভণ্ডের মত রসুলের শরিয়ত রক্ষা করছেন আরব বাদশারা। যদিও তারা মোটেই লক্ষ্য করছে না যে, তাদের লজ্জাস্থানটুকু প্রকাশিত হওয়ার দরুন বিশ্বজনতা হাসছে। বেঈমান বিশ্বাসঘাতক ঘৃণিত ইয়াজিদ যেরকম ইসলামের গড়ে তোলা জনসাধারণের বাইতুল মালকে জনসাধারণের মাল বলে অস্বীকার করলো আর প্রতিষ্ঠা করলো বিশ্রী হীন স্বৈরতন্ত্রের বীজ, সে রকম ছাঁচে গড়া আজকের ভণ্ড আরব বাদশাদের শাসনতন্ত্র।

মানবসমাজে বস্তুবাদকে কোন পথে কেমন করে গড়ে তুলতে হবে এসমস্ত কথা কোরআন-হাদীসে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আফসোস, কোরআন হাদীসের কথা বুঝবার এবং বরণ করে নেবার মানুষ কোথায়? আর একটি অসুবিধা হয়েছে এখানে যে, ইসলাম বস্তু-নিয়ন্ত্রণ ও-বণ্টন ব্যবস্থার পরিপূর্ণ আদর্শ রসুলল্লাহ (সঃ)-এর শাসনকালে ক্ষুদ্র মদিনাতে সীমাবদ্ধ ছিল এবং উহা কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠিত আদর্শ হিসাবে পূর্ণতা পাবার পথে এগিয়ে চলছিলো। তারপর চার খলিফার আমলে ইসলামি উৎপাদন, বণ্টন ও কর্মব্যবস্থার প্রয়োগ সমাজে প্রতিষ্ঠা করার সময় তাঁরাও পাননি। কারণ, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আক্রমণ প্রতিহত করা, আপন রাষ্ট্রকে রক্ষা করার দায়িত্ব, রাজ্যের প্রসারতার দরুন বিভিন্ন চিন্তা এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ইত্যাদি কর্মের ভিতর তাদের চিন্তা ও শক্তি নিয়োজিত হয়েছিল অধিক। কিন্তু তবু ইসলামী সাম্যের আদর্শকে তারা অনেকখানি উঁচিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন এবং নিজেদের জীবনধারণের প্রতি পদে পদে শিক্ষার দৃষ্টান্তস্বরূপ সাম্যের অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পৃথিবীর বুকে রেখে গেছেন। রাষ্ট্রপ্রধানরূপে ভোগবিলাস তো দূরের কথা, যতটুকু ন্যায়সঙ্গতভাবে জীবনধারণের প্রয়োজন তাহাও তারা গ্রহণ করেননি। তাই দেখা গিয়েছে, ইসলামী বিশাল সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রনায়ক জনসাধারণের চেয়ে অতি নিম্নমানের পার্থিব জীবনটা অতিবাহিত করতেন। বিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি আমিরুল মুমিনীনের গায়ে দেবার মাত্র একটি তালি-মারা কুর্তা ছিল। অনশনে পেটে পাথর বেঁধেছেন, পানির সঙ্গে সামান্য মধু মিশিয়ে খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে পান করতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গলায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে দিয়ে বললেন, 'আবু বকর পান করবে মধু!' খলিফা হযরত আলী (রাঃ) নিজের সন্তান ইমাম হাসান ও হুসাইনের ক্ষুধা নিবারণের তরে আপন বর্মটি রাত্রের আঁধারে অপরের নিকট রেখে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আসতেন। তবু বিশাল রাষ্ট্রের নায়ক জনসাধারণের বাইতুল মালের উপর হাত দিলেন না। এরকম হাজার হাজার আদর্শের দৃষ্টান্ত তাঁরা রেখে গেছেন। সাম্যের প্রতিষ্ঠিত আদর্শ পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে কিন্তু চার খলিফার তিরোধানের পর বিশ্বাসঘাতক ইয়াজিদ সমাজ হতে সাম্যের আদর্শকে মুছে দিয়ে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলো। শুধু কি তাই? সাম্যের আদর্শ যারা তুলে ধরেছেন মানুষের কাছে, মোনাফেক ইয়াজিদ তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। লৌহকে স্বর্ণ বলে কেউ ভুল করে না। ভুল করে নিকেলে মোড়ানো স্বর্ণালী মেকীরূপ দেখে। সেই স্বর্ণালী নিকেল করা মেকী সোনা হল মোনাফেক ইয়াজিদ। তাই আজো অনেকে খাঁটি সোনা বলে মোনাফেক ইয়াজিদকে ভুল করে মুসলমান বলে। কাফেরকে চেনা যায়, কিন্তু মোনাফেকের নিকেলে মোড়ানো কাফেরকে চিনে নিতে অনেক বেগ পেতে হয়। আনি চেনা যায়, কিন্তু আনি-কাটা সিকি সহজে চেনা যায় না। তখনই ধরা পড়ে যখন চুম্বক আর সিকির বুকটাতে 'ওয়ান আনা' লিখা থাকে। তাই যার কাছে চুম্বক আছে আর পড়তে জানে তাদের চোখে আনি-কাটা সিকি চোখে ধুলা দিতে পারে না। তারা মোনাফেক বেঈমান সিকি বলে মানুষের

সমাজ হতে বেঈমান সিকিটাকে চিরতরে নষ্ট করে দেয়, যেন আর কেউ আসল সিকি বলে ভুল না করে।

পুঁজিবাদ ও ইসলামের প্রভেদভিত্তিক আলোচনা

অতএব আমরা দেখতে পাই 'বস্তুবাদ'-এর ইসলামী ব্যবস্থাপনাকে জগতের বুকে প্রত্যক্ষ সামাজিক আদর্শরূপে কোনকালেই প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। যদিও কোরান-হাদীস পথের সন্ধান দিয়ে দিয়েছে, তবু লিখিত আদর্শে লোকে বিশ্বাসী নয়। আর সেই যুগে লিখিত কথার মাধ্যমে প্রচার করা একপ্রকার ছিল না বললেই চলে। আরবের অল্প সংখ্যক লোক দিয়ে বিরাট সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা সে যুগে প্রথম অবস্থায় সহজসাধ্য ছিল না। কাজেই তাদের শাসিত বিরাট ভূখণ্ডে সেই আদর্শবাদ সম্পূর্ণ করে রেখে যেতে পারেননি। লিখিত আদর্শ হিসাবে ইসলামের বস্তুনিয়ন্ত্রণবাদ পূর্ণতাপ্রাপ্ত থাকা সত্ত্বেও উহার প্রয়োগপদ্ধতির পূর্ণ প্রকাশ তখনো সমাজে প্রতিষ্ঠা করবার সুযোগ ও সময় পাননি। অন্ধ, বর্বর এবং পাপে-ভরা ছন্নছাড়া যুগের এত শত বছরের সমাজ জীবনের ধারা এত ক্ষুদ্র সময়ের ভেতর সম্পূর্ণরূপে বদলিয়ে ফেলা সহজসাধ্য নয় এবং তা কোনকালেই সম্ভবপর নয়। তাই যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা রসুলুল্লাহ (দঃ) রেখে গেলেন উহা চার খলিফার রাজত্বকাল পর্যন্ত অগ্রসর হতেছিল, কিন্তু সেই অগ্রসরের গতি মোনাফেক ইয়াজিদ রাজতন্ত্রের সাগরে ডুবিয়ে দিল। আর কখনো তার প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করা হয়নি। ফলে নামমাত্র ইসলাম শরীয়তের মুখোশে আবদ্ধ হয়ে রইলো।

কেউ হয়তো ইয়াজিদকে মোনাফেক ইয়াজিদ বলাতে নিতান্ত ভাবাবেগের পরিচয় দেবার কথা বলবেন। কিন্তু ইহা ভাবাবেগ নয়, কোরান-হাদীসের মানদণ্ডে ইয়াজিদের যে বিশ্রী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইতিহাসে ফুটে উঠেছে তারই সত্যিকার রূপ।

পুঁজিবাদ এবং বস্তু-মোহ ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য মনোবৃত্তি। পুঁজিপতির জন্য বেহেস্ত শুধু হারামই করা হয়নি, তাছাড়া পুঁজিবাদের নীতি ইসলামে যেন কোন ক্রমেই আসন নিতে না পারে তার জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদেরকে ভীষণভাবে সাবধান করে দিয়েছেন। ধনের প্রতি লোভ এবং কর্তৃত্বের বিশ্রী বাসনা মানুষের মনে ও চিন্তাধারায় এমনভাবে প্রতারণা এবং মানবতাবিরোধী মনোভাব তৈরী করে, যেরকম শুকনো দুর্বাদলের উপর পানি দিলে সজীব হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদেরকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'ধনাসক্তি ও প্রভুত্বের মোহ মনের মধ্যে এমনভাবে মোনাফেকী উৎপন্ন করে যেমন পানি ঘাস উৎপন্ন করে থাকে।'

ধনের অহংকার এবং মান-মর্যাদার মোহ মানুষের ধর্মভাবকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। অনেক দিনের ভুখা বাঘের সামনে একটি বকরীকে ফেলে দিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তার চেয়েও অনেক বেশি মারাত্মকভাবে মানুষের ধর্মভাবকে ধ্বংস করে দেয় এই অহংকার আর মোহ। তাই পুনরায় রসুলুল্লাহ (দঃ) সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'ধনৈশ্বর্য ও মান মর্যাদার মোহ মানবহৃদয়ে প্রবেশ করে তার ধর্মভাবকে যেরূপ সাংঘাতিকরূপে বিনষ্ট করে দেয়, বকরীর পালের মধ্যে দুটো ক্ষুধার্ত বাঘ প্রবেশ করেও ততদূর সাংঘাতিক ক্ষতি করতে পারে না।'

ধনবান লোকেরাই ধনের উগ্র নেশায় মানুষের সহজাত দাবী-প্রীতি এবং সাম্যবাদ কাঁচ ভাঙ্গার মত চুরমার করে দেয়। মানুষের প্রতি মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ ধনের নেশায় ধনী লোকদের মন হতে ব্রাশ

দিয়ে মুছে ফেলে দেয়। তাই বিশ্বমানব সমাজে এই ধনীলোকেরাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে ইসলাম ঘোষণা করছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই কথাটুকু বুঝাবার তরে কতরকম উপমা দিয়েই না আমাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। যেন ধনের মোহে ধনীলোক হয়ে সাম্যবাদের আদর্শকে তথা ঈমানের প্রথম শর্তের সীমানা হতে সরে না পরি। একদিন উপস্থিত সাহাবীরা রসূলাল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি আপনার উম্মতীদের মধ্যে সবচাইতে নিকৃষ্ট?' তিনি বললেন, 'ধনবান লোকেরাই সবচাইতে নিকৃষ্ট।'

পুঁজিবাদের হীনস্বার্থ মানুষের সমাজ হতে জঘন্য পাশবিক উপায়ে উদ্ধার করে ধনীলোকেরা নিজেদের আপ সে আপ মনে করে। কিন্তু এই সমস্ত ধনীলোকেরা বুঝতে পারে না যে সমাজের সহজ-সরল মানুষেরা কোন দিন তাদের অন্তর হতে ক্ষমা করবে না। একদিন তারা ধনীদের হীন প্রচেষ্টাকে চিরতরে বিশ্বসমাজ হতে উপড়িয়ে ফেলবেই। ধনীলোকেরা তথা পুঁজিবাদের সমর্থকদের দল যত অহঙ্কার আর আস্ফালনই মানব সমাজের বুকে করুক না কেন, কিন্তু অবহেলিত মানবসমাজ সহজেই বুঝতে পারে যে তারা সবাই কাগজের বাঘ। এই সমস্ত কাগজের বাঘদের মানব সমাজ কোনদিন ক্ষমা করতে পারে না। কতবড় জঘন্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন হতে পারলে এই সমস্ত পুঁজিপতিরা রসুলাল্লাহ (দঃ)-এর মহান আদর্শের উপর পুঁজিবাদের কিছুটা সমর্থন আছে বলে প্রচার চালায়। কতবড় বেঈমান হতে পারলে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রসুলাল্লাহ (দঃ)-এর উপর পুঁজিবাদের সমর্থনের বোঝা চাপিয়ে দেয়। অথচ ইসলাম ধনদাসদের জানাযা পড়া হারাম করে দিয়েছে। শুধু কি জানাযা পড়তে বারণ করেছে ইসলাম? ধন-দাসদের পীড়াকালে সেবাটুকু পর্যন্ত করতে কঠোরভাবে মানা করা হয়েছে। ধন-দাসেরা রোগশয্যায় ছটফট করছে–করতে দাও–তারা জানোয়ারের চেয়ে অধম–তাদের জন্য অবহেলিত মানুষ করবে সেবা! অসম্ভব-ইসলাম বজ্রকঠিন কণ্ঠে ঘোষণা করছে। ইসলাম বলেছে, সাবধান, অবহেলিত বিশ্বমানবের সন্তানেরা যেন ধন-দাসদের সালাম না করে, সম্মান না দেখায়, ইসলাম ঘোষণা করছে, হে বিশ্বের অবহেলিত জনতা – তোমাদের সন্তানরা যেন ধন-দাসদের সামান্য সহানুভূতি প্রদর্শন না করে। যদি ধন-দাসদের সহানুভূতি ও সম্মান তোমাদের সন্তানদের প্রদর্শন করার প্রশ্রয় দান কর তবে মনে রেখ, তাদেরকেও ইসলামকে বিনাশ করার কাজে ধন-দাসদের সাহায্যকারী ও সহায়করূপে ধরা হবে। কারণ, এই শ্রেণীর ধনদাসেরা ইসলামকে বিনাশ করার কাজে লিপ্ত থাকে।

রসুলাল্লাহ (দঃ) এই শ্রেণীর পুঁজিবাদীদের সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমার পরে মুসলমানদের মধ্যে এমন একদল লোক উৎপন্ন হবে যে, তারা নানাবিধ খাদ্য আহার করবে, নানা বিচিত্র কারুকার্যপূর্ণ বহু মুল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করবে, মনোমোহিনী সুন্দরী মেয়েলোক রাখবে, মুল্যবান ঘোড়া গৃহদ্বারে বাঁধবে। অল্পাহারে তাদের ভোজন প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হবে না। অনেক পেলেও তাদের আকঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হবে না। তাদের সমস্ত শক্তি কেবল সংসার-অর্জনেই ব্যয়িত হবে। দুনিয়াকেই তারা প্রভু বলে মনে করবে। যা কিছু করবে দুনিয়া হাসিলের জন্যই করবে। আমি যে (মোহাম্মদ) (দঃ), তোমাদের প্রতি আমার আদেশ, তোমাদের সন্তানেরা তাদের যেন সালাম না করে। তাদের পীড়াকালে যেন তাদের সেবা না করে। তাদের জানাযার অনুগমন যেন না করে। এই শ্রেণীর ধনী লোকেরা ইসলামকে বিনাশ করবে। তোমাদের সন্তানগণ যদি তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে তবে তারও ইসলামকে বিনাশ করার কাজে তাদেরকে সাহায্যকারী ও সহায়ক হবে।' (*হাদীস* এবং *কিমিয়ায়ে সাআদত* তৃতীয় খন্ড)। আল্লাহ বলেন, 'যে সকল লোক সোনা-রূপা জমা করে অথচ আল্লাহর পথে খরচ করে না, (হে মোহাম্মদ), তুমি তাদের ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। কেয়ামতের দিন এই সোনা-রূপা দোজখের আগুনে গরম করে তার দ্বারা তাদের

কপালে, পাঁজরে এবং পিঠে দাগ দেওয়া হবে। ইহাই তোমাদের সঞ্চিত সোনা-রূপা, যা আমার রাস্তায় খরচ না করে তোমরা নিজের জন্য জমা করে ছিলে। আজ ইহার আস্বাদ গ্রহণ কর।'

আল্লাহর পথে খরচ করার অর্থ কি? মানুষের প্রকৃত সেবার তরে মানুষের সুখ-সুবিধার প্রতি মানুষের সমান বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করা কি ন্যায়-বিচার এবং আল্লাহর পথে খরচ করাই বুঝানো হয়নি? রাসুলাল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'অন্যের জন্য তাহাই পছন্দ কর, যা নিজের জন্য পছন্দ কর। তাহলে তুমি সবচেয়ে ন্যায়বিচারক হতে পারবে।' রাসুলাল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'সর্বোৎকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যে পরের উপকার করে, সুতরাং তুমি পরের উপকার করে সবচেয়ে ভাল মানুষ হয়ে ওঠ।' পরের উপকার করে দ্রুত সমবণ্টনে সাম্যবাদ পৃথিবীর বুকে যেদিন প্রতিফলিত হবে, সেদিন গণসমাজ সবচেয়ে ভালো মানুষ হবার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে নিজেদের মুখমণ্ডলে। রাসুলাল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'কারো প্রতি জুলুম করো না, তাহলে নূর বেষ্টিত অবস্থায় পুনর্জীবিত হবে ।'

পুঁজিপতিদের পরিণাম যে শুধু ধ্বংসের বীভৎস বিভীষিকায়, তারই কথা বলতে গিয়ে রাসুলাল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'তোমরা কি সেই জানোয়ারকে দেখনি? যে বসন্তকালে লতা-পাতা ও ঘাস সারাটি দিন পেট পুরে খেয়েছে। এমনকি অরুণের আভা নিভে যাবার পরও বিরত হয় নি। জানোয়ারটি এত বেশি খেয়েছিল যে ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সেরকম সম্পদও লোভনীয় বস্তু। হয়তো তোমরাও প্রচুর সম্পদের লোভে পড়ে নিজেদের 'দ্বীন' সম্পর্কে অলস হয়ে পড়বে এবং ধন-সম্পদের মোহে এরূপ লিপ্ত হয়ে পড়বে যে পরিণামে তোমরাও (জানোয়ারের মত) ধ্বংস হয়ে যাবে।'

রাসুলাল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'দুনিয়া তারই বাড়িঘর যার আর কোনই বাড়িঘর নেই। এবং উহা তারই সম্পদ যার আর কোন সম্পদ নেই। দুনিয়ার সম্পদ জমা করে একমাত্র সে-ই যে মুর্খ এবং বুদ্ধিহীন, সেই সম্পত্তির বিরাট বিরাট অংশ নিজেদের কর্তৃত্বে রেখে ভোগ-বিলাসে ডুবে থেকে মুসলমান বলে শুধু দাবী নয়, দাতা ও দানবীর সেজে আছে। তবে কি এরা ইসলামের মানদণ্ডে মুসলমান? তাদের ভোগ-বিলাসের রক্তিম আঁখির ঝিমিয়ে-পড়া উদ্ধত কথার পাশে পাশে লাখো কোটি মিসকিন, ফকির আর বেকার যে ক্ষুধার জ্বালায় নিজেদেরকে ভিখারী, লম্পট এবং চোর ও ডাকাতে পরিণত করতে বাধ্য করছে। তার জন্য দায়ী কে? ইসলাম? না এই ভণ্ডের দল? তবে কি এদের নির্মূল করা মুসলমানদের অবশ্যকর্তব্য নয়? তবে কি এদের শাস্তি দেবার জন্য ইসলামের সত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে প্রকাশ্য প্রতিবাদ করার কথা ইসলামের বিধানে নেই? এই জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো কি জিহাদ নয়?

রাসুলাল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'যে কেউ উম্মতের মধ্যে ভাঙ্গন ধরানোর চেষ্টা করবে তখন তাকে যেখানে পাও তরবারীর আঘাত হান।' রাসুলল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, 'জুলুমকারীর জুলুম বন্ধ কর।' রাসুলল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'কসম আল্লাহর, তোমরা কখনো নাজাত পাবে না, যে পর্যন্ত তোমরা জালীমকে জুলুম থেকে বিরত না রাখ।' রাসুলাল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'যদি কোন জাতি বা দলের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় এবং সেই জাতি বা দল থাকা সত্ত্বেও তাকে বাধা প্রদান না করে, তবে মৃত্যুর আগে দুনিয়াতেই তাদের উপর আল্লাহর আযাব আসবে।'

যারা ইসলামের এই সত্যকে বুঝেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলো তবে কি তারা আল্লাহর দেওয়া সত্য প্রকাশ্যে প্রচার করার আদেশ হতে বিরত রইল? যারা সত্য প্রচার হতে বিরত রইলো তাদের ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা কি সালাত পালন করার কথা বিরাশি বারের আদেশ হতে বেশি বলে নি?

যে শাসনব্যবস্থার ভেতরে গোপনে লুকিয়ে থাকে অন্যায়, অবিচার, অসাম্য আর এই শাসনব্যবস্থায় যে মুষ্টিমেয় অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয় তাদের এবং তাদের শাসনব্যবস্থা

দেশ হতে চিরতরে মুছে ফেলার সম্পূর্ণ দায়িত্ব জনগণের। যে শাসনব্যবস্থা জনগণকে পাঁকে ফেলে চোর, ডাকাত আর প্রতারকে পরিণত করতে বাধ্য করে সেই শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ করার অপর নামই জিহাদ। যে শাসনব্যবস্থা জনগণের মধ্যে গুটি কতককে বিলাসিতায় ডুবিয়ে রাখে আর কতককে ভিক্ষাভাণ্ড হাতে দোরে দোরে ভিক্ষা করায় সেই শাসনব্যবস্থা কখনোই ইসলামী শাসনব্যবস্থা নয়। যে শাসনব্যবস্থায় ধনীর হাতে দেশের পার্থিব সম্পদের চাবিকাঠি দেওয়া হয় আর কোটি জনগণের ভাগ্যে কানা কড়ি দিয়ে 'আল্লাহ আল্লাহ কর গিয়ে' নির্দেশ দেয় উহা ইসলামী শাসনব্যবস্থা নয়। উহার বিরুদ্ধে জনগণের প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে ইসলামের সাম্য ফিরিয়ে আনতে হবে এবং এর জন্য মৃত্যুবরণকে বলে জিহাদ। এই প্রকাশ্য সত্য জনগণ বুঝেও যদি নীরব দর্শকের মতো হাঁ করে থাকে তবে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর অভিশাপ।

মানবতার মরা সম্বলটুকু ছিনিয়ে মানুষের ম্লান হাতে যে রাষ্ট্রনায়ক তুলে দেয় ভবিতব্য ভিক্ষাভাণ্ড সে তো নায়করূপী নিহন্তা নারকী - তাকে সমুচিত শিক্ষা দাও হে মরদে মুজাহিদ -ইহা জিহাদে কবীর। ইসলাম-শিশুকে যারা আমানতের অঙ্গীকারে দু হাতে কোলে তুলে পুঁজিবাদীদের অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিয়ে অসহায় আর্তনাদ শোনে তারা মোনাফেক -তারা জননীর মুখোশে নরপিশাচ- ধন-দাসদের ধাবমান কুকুর- তাদের সমাধির উপর ইসলাম-শিশুর গণকুটির রচনা কর, হে মুজাহিদ। এটা জিহাদে সগীর।

ইসলামী শরিয়তে কোরানভিত্তিক কোরবানীর আলোচনা

কোরবানী পশুর গলায় ছুরি বসিয়ে দেওয়া নয়। কোরবানী নিজের আমিত্বের গলায় তথা 'আমি'-কে সরিয়ে ফেলতে হয়। নিজের 'আমি'-কে কেটে ফেলতে পারলেই হয় কোরবানী। তখন মানুষ মরার আগেই মরে যায়। তাই রাসুলাল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ***'মুতু কাবলা আন তামুত'*** অর্থাৎ, মরার আগে মরে যাও। এই জীবিত থেকে মরণকে বরণ করে নিলে হয় কোরবানী অর্থাৎ স্রষ্টার নৈকট্য লাভ তখনই হয়। তাই কোরবানীর শাব্দিক অর্থ হল ত্যাগের মধ্যে নৈকট্য লাভ করা। কোরবৎ অর্থ হল নৈকট্য এবং কোরবৎ শব্দ থেকে কোরবানীর উৎপত্তি। এই কোরবানী প্রত্যেকের জন্য অবশ্য পালনীয় তথা ফরজ। পশুর গলায় ছুরি বসিয়ে দেওয়াকে রাসুলাল্লাহ (সঃ) কোরবানী বলে মোটেও স্বীকার করেন নি। আল্লাহ বলেছেন, 'পশুর মাংস অথবা রক্ত কখনই আমার নিকট উপনীত হয় না বরং তোমাদের তাকোয়াই আমার নিকট উপনীত হয়ে থাকে।' (কোরআন)।

রক্ত-মাংস আল্লাহ গ্রহণ করেন না। তিনি গ্রহণ করেন মানব মনের 'তাকওয়া' অর্থাৎ মানবীয় ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া এবং তাতে করে মানবীয় আমিত্বের তথা 'আমি'র লোপ সাধন করা। জীবিত থেকে মরণের যে স্বাদ তা উপলব্ধি করার চেষ্টা অর্থাৎ যাকে বলে মরার আগে মরে যাওয়া, তারই অনুশীলন হল কোরবানী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ কোরবানী গরীব সাধারণকে নিয়ে শুধু মাংস খাবার উৎসবে পরিণত হয়েছে। এর কারণ হল ধর্মের অনুষ্ঠান পালন করতে আমরা অতিমাত্রায় পল্লবগ্রাহী (সুফারফিসিয়াল) হয়ে উঠেছি। বাইরের অনুষ্ঠান নিয়েই সন্তুষ্ট। কিন্তু উহার ভেতরের সত্য ও সৌন্দর্য বুঝে নিবার দরকার মনে করি না। এর ফলে কোরবানীর এই দুর্দশা।

আচার যখন উহার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে তখন তা অনাচারে পরিণত হয়। কোরবানীও ঠিক সেই অবস্থাতে এসে দাঁড়িয়েছে।

লাইলাতুল কদরের সাথে কোরবানীর রাতগুলোকে হাদীস শরীফে তুলনা করেছে । তাই কোরবানী সাধনা তাকেই বলে, যেখানে মনের কুয়াশারূপ আবরণ তথা দুনিয়ার (পৃথিবী নয়) মায়াটুকু ত্যাগের মাধ্যমে বিশ্বরবের সাথে নৈকট্য লাভ করা হয়। আমার 'আমি'-কে নফসের (ফ্যাকালটিস এন্ড সেনসেস) সিংহাসন হতে টেনে এনে কোরবানী করে দিতে হবে। তারপর নফসের সিংহাসনে বিশ্বরবকে 'আসুন, এই সিংহাসনে উপবেশন করুন, বলে আহ্বান জানাতে হবে। ইহাই কোরবানী। ইহাই নিজেকে ত্যাগের মাধ্যমে দূরে ফেলে দিয়ে বিশ্বরবের নৈকট্যের চরম প্রচেষ্টা। এই দশদিনের যে কোন একটি দিনের ত্যাগ-সাধনা আল্লাহর পথে জেহাদ করার চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি পছন্দনীয়। কারণ, ইহা হল নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ। যাকে বলা হয় জেহাদে আকবর।

হাদিস শরীফ অনুযায়ী চাঁদের প্রথম দশদিন হতে পশু জবাই করা পর্যন্ত কোরবানীকারীর দাঁড়ি চুল, নখ ইত্যাদি না কাটার আদেশ পালন করার উদ্দেশ্য কি? মন ত্যাগের মাধ্যমে নৈকট্যের বাসনায় উদগ্রীব হয়ে আছে তাই দুনিয়ার প্রতি তাকানো তো দূরের কথা আপন দেহের সাধারণ যত্ন নেবার প্রতি মনোযোগ দেবার অবকাশও তার নেই। যদি এগুলোর দিকে মনোযোগ দেয় তা হলে ত্যাগের মাধ্যমে নৈকট্যের পথে খানিকটা বাধা পড়বে এবং সেটুকু সময় নৈকট্যের বিপরীত দুনিয়ামুখী হবার ভয় রয়েছে। কেউ হয়তো মনে করতে পারেন নখ, চুল ইত্যাদি কাটা তো 'মোস্তাহাব' অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় নয়। এরও কারণ আছে। এমন মহাপুরুষও থাকতে পারেন যিনি আমিত্ব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে নৈকট্য লাভ করেছেন। যার ফলে সংসার-কাজে থাকলেও মন তার উহা হতে নির্লিপ্ত থাকার শক্তি অর্জন করেছেন। ত্যাগের মাধ্যমে নৈকট্য লাভের তথা কোরবানী করতে না পারলে চুল, নখ ইত্যাদি না কাটার কোনই অর্থ থাকতে পারে না। আসল বিষয় ছেড়ে দিয়ে অন্ধ অনুকরণ করলে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়ার দিকে ষোলআনা নজর রেখে শুধু নখ-চুল না কাটার কি তাৎপর্য হতে পারে? তাই দেখা যায়, ত্যাগের মাধ্যমে নৈকট্যের ভাব ক্ষুণ্ন না হবার জন্যই এসব কাজে মনোযোগ দিতে বারণ করা হয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (দুঃ) বলেছেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কোরবানী করলো না, সে যেন আমার ঈদগাহের কাছেও না আসে।' *(আবু দাউদ, ইবনে মাযা)*।

অর্থাৎ সে কি কোরবানীকে দু'রাকাত নামাজ মনে করেছে? সে কি কোরবানীর মূল্য দু' রাকাত নামাজ বুঝতে চায়? না, কোরবানী এত তুচ্ছ নয়। কোরবানী দু' রাকাত নামাজও নয় এবং পশু-হত্যাও নয়। এই হাদীস হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পশু-জবাই করা রসুলুল্লাহ (সঃ) কোরবানী বলে মোটেই স্বীকার করেননি। যদি জবাই করাকে কোরবানী বলে স্বীকৃতি দিতেন তা হলে কেন কোরবানীকারীকে কেবল ঈদগাহে যাবার অনুমতি দিচ্ছেন? অথচ তখনো জবাই কাজ তার করা হয় নি। তাছাড়া পশু-জবাই করা ঈদের নামাজের আগে করতে রসুলুল্লাহ (সঃ) বারণ করেছেন। এর দ্বারা কি স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে না যে, পশুকে জবাই করা মোটেই কোরবানী নয়?

হাদীস শরীফে এই দশ দিনের রোজা রাখার ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এক দিনের রোজা রাখা একটি বছরের রোজা রাখার সমতুল্য। কারণ, ইহা ত্যাগের মাধ্যমে বিশ্বরবের নৈকট্যলাভের প্রচেষ্টা। এই নৈকট্যলাভের রহস্যই বিশ্বরবের প্রধান উদ্দেশ্য। এই জন্যই তিনি মানবকে দুনিয়া দিয়ে তৈরি করেছেন। তিনি দেখতে চান যে মানব কি তাঁর দুনিয়া নিয়েই থাকে, না

দুনিয়া ত্যাগ করে তাঁর নৈকট্য কামনা করে। এই সীমিত ইচ্ছাশক্তি মানবকে তিনিই সীমিত সময়ের জন্য দিয়েছেন। মৃত্যু-ঘটনার মাধ্যমে এই সীমিত ইচ্ছাশক্তি তিনি নিয়ে নেন। এখন কথা হল, দশ দিনের জন্য দুনিয়া ত্যাগ করার চেষ্টা করতে গেলে দিন-মজুরের উপর নির্ভরশীল সন্তানদের ভয়ঙ্কর কষ্টের কারণ হতে পরে। আবার পক্ষান্তরে কোরবানী করা অবশ্য পালনীয়। এ কি রকম কথা? পার্থিব সম্পদ সমান বণ্টনব্যবস্থা হলে, তথা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে, গরীবের কোরবানী না করার প্রশ্ন উঠাই অবান্তর, সুতরাং অবশ্য পালনীয় আদেশ যাতে বিশ্বসংসার ঠিক থাকে তারই জন্য বহুবার বহুরকমে মানবকে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে আবেদন জানিয়েছেন এবং সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার তরে যারা যারা বাধা প্রদান করতে চাইবে তাদেরকে অসৎকার্য করছে বলে অত্যাচারী বলেছেন। মানবের মানবতার সম্বলটুকু ছিনিয়ে নিতে যারা চায়, তারা তো অসৎকার্য করার প্রধান উপদেষ্টা, তারা তো জঘন্য অত্যাচারী, মানুষ খুন করার উগ্র আর্সেনিক। মানবতাকে একেবারে খুন না করে এই অসৎ কার্য করার প্রধান উপদেষ্টাগণ মানবতা খুন করার অসহায় করুণ অবস্থা মানব সমাজে তৈরি করে রাখে। তাই এই সব অত্যাচারীর দলকে সমূলে উৎপাটিত করার আদেশ দান করা হয়েছে। কারণ, এরা মানবরূপী কালসাপ, জাত কেউটে। কালসাপকে রাখতে নেই। সুযোগ পেলেই এরা ফণা তুলে ছোবল মেরে বসে। তাই তো রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'যেখানে যে অবস্থায় পাও, তরবারির আঘাত কর।' রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'শেষকালে এমন লোক আসবে যাদের বাণী নবীদের মত হবে এবং যাদের কাজ বাঘের মত হিংস্র হবে।' রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'যখন পৃথিবীতে কোনও পাপ কাজ করা হয়, যে তা দেখে নাই কিন্তু তা শুনে খুশি থাকে, সে ঐ ব্যক্তির মত যে তা দেখেছে।' রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'যদি কোন সম্প্রদায়ের কোন লোক পাপ করতে থাকে এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা তাকে পাপ কাজ হতে নিবারণ না করে, আল্লাহ তাদের মৃত্যুর আগেই তাদের সকলকে তার জন্য শাস্তি দেবেন।' *(আবু দাউদ এবং ইবনে মাজা)।*

রসুলাল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'জনসাধারণের নেতার বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে আর অত বড় বিশ্বাসঘাতকতা নেই। তার নিশান তার পায়খানার রাস্তা দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।' *(তিরমিজী শরীফ)।*

রসুলাল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ব্যক্তিবিশেষের পাপের জন্য জনসাধারণকে শাস্তি দেন না। কিন্তু যখন তারা তাদের চোখের সামনে অন্যায় কাজ হতে দেখে এবং তাদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা তা নিবারণ না করে, তখন আল্লাহ ব্যক্তিবিশেষকে ও জনসাধারণকে শান্তি দেন।' *(শর হি সুন্নত)।*

রসুলাল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'জিব্রীল বললেন, আপনার উম্মতের মাঝে এরা এমন ধর্মউপদেশ দানকারী যারা যা বলতো তা করতো না এবং সত্যকে চাপা দিয়ে কোরানের আয়াত পাঠ করে শুনাতো।' *(বাইহাকী)।* যেখানে শাস্তির প্রয়োজন সেখানে কি করুণা দেখাতে হবে? কখনো নহে। পবিত্র কোরান বলে, তাদের উপর করুণা যেন ধর্মের নামে তোমাদেরকে অভিভূত না করে। *(কোরআন ২৪ঃ২)।*

রসুলাল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'যে মানবতার গুণে বঞ্চিত সে সমস্ত মঙ্গল হতে বঞ্চিত।' *(মোসলেম শরীফ)*। রসুলাল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'মানবতার গুণ গ্রহণ কর। কঠোরতা এবং অশ্লীলতা বর্জন কর।' *(মোসলেম শরীফ)।* রসুলাল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ হতে সর্বাপেক্ষা অধিক দূরবর্তী কঠিন হৃদয়।' *(তিরমিজী শরীফ)।* রসুলাল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'যে অত্যাচার করে অর্ধ হাত ভূমিও গ্রহণ করে, বিচারের দিন তাকে সপ্ত পৃথিবীর নিচে নিক্ষেপ করা হবে।' *(বোখারী এবং মোসলেম শরীফ)।*

রসুলাল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'যে মানবতার গুণ হতে বঞ্চিত সে দুনিয়া এবং আখেরাতের মঙ্গল হতে বঞ্চিত।' *(শরহি সুন্নত)*। রসুলাল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'যে অত্যাচারীকে অত্যাচারী জেনেও তাকে শক্তিশালী করার জন্য তার সঙ্গে চলে সে ইসলাম হতে বাহির হয়ে যায়।' *(বাইহাকী)*। রসুলাল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি দয়ালু হও, তাহলে যারা আকাশে আছে তারাও তোমাদের প্রতি দয়ালু হবে।' *(আবু দাউদ ও তিরমিজি)*। রসুলাল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। সমগ্র সৃষ্টির ভেতর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ঐ ব্যক্তি, যে তার পরিবারের প্রতি দয়ালু। *(বাইহাকী)*। রসুলাল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মাঝে কেহই যে পর্যন্ত নিজের জন্য যা ভালো মনে করে পরের জন্যও তা ভালো মনে না করবে, সেই পর্যন্ত সে ঈমানদার হতে পারবে না।' *(বোখারী শরীফ)*। আল্লাহ বলেছেন, 'এই পৃথিবী আমি প্রসারিত করেছি সকল সৃষ্ট জীবের জন্য।' (কোরআন)

আমার নিজের জীবনকে সুন্দর করে পরিচালনা করার যতটুকু ইচ্ছা করবো ততটুকু তো অন্য একটি মানুষের বেলাতেও করতে হবে। নিজে মিষ্টি খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করতে না পেরে অপরকে কি করে মিষ্টি না খেতে উপদেশ দেব? সে আদর্শ কি সুন্দর নয় যে আদর্শ স্পষ্ট ঘোষণা করে, আগে তুমি মিষ্টি খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ কর তারপর অপরকে বারণ কর? যে শাসনব্যবস্থার মাঝে মানুষরূপী পরগাছা ও রক্তশোষণকারী সুবিধাবাদীর দল মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ ও অবকাশ থাকে, তা ইসলামী শাসনব্যবস্থা নয়। যে শাসন ব্যবস্থার মাঝে দেশের জনগণ নিঃস্ব রিক্ত। দেশের কোটি কোটি মানুষের বঞ্চনা ও নিঃস্বতার বিনিময়ে গড়ে উঠেছে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি ও ধনদাসদের মুনাফা ও সম্পদের পাহাড় তা কখনোই ইসলামী শাসন ব্যবস্থা নয়। তিনি যদি উটের পিঠে নিজেই শুধু বসে যেতেন তাতেও ইতিহাস কোন মন্তব্য করতো না। কিন্তু ইতিহাস বিস্ময়ে প্রচার করে, সেই অধিকার হতে উট-চালক বঞ্চিত হয়নি। তিনি ক্ষণিকের তরেও ভেবে নিতে পারেননি, আমাতে আর উট-চালকের তথাকথিত অনেক প্রভেদ।

আমি আমার মত একটি মানুষকে ভেবে নিতে পারি না। একটি মানুষকে আমার মত ভাবতে ঘৃণা জাগে। অবজ্ঞার সুরে আমার দেহ-মন কেঁপে উঠে। তখন তো আমাকে ইসলামী বিধান হতে একেবারে হারিয়ে ফেলবো। আমাকে ঈমান আনিনি বলে দেবে। ঈমান তো ইসলামের ভিত্তি। ঈমান না থাকলে আমি তো পথভ্রষ্ট। তবে তা দেখছি, মানুষের বাঁচার দাবিতে সকলে সমান। আমার মত অন্যকে ভাবতে পারবো না বলে আমাকে এত বড় শাস্তি। নামাজ-রোজা না করলেও তো আমার শেষ সম্বল ঈমানকে নিয়ে টান দেওয়া হয়নি, কিন্তু মানুষের বাঁচার দাবিতে মানুষকে নিজের মত না ভাবলে আমার ঈমান নিয়ে টানাটানি করা হয়। আমার ভিত্তি কেঁপে উঠে। এ যে ভীষণ শাস্তি। কঠোর আঘাত। তারপর? স্পষ্ট করে বললেন মানুষের নবী। ব্যক্তিমালিকানার অভিশাপ হতে সাবধান করে দিলেন। মালিকানার অর্থই হল ভোগ ও অপচয়ের জঘন্য সর্বময় অধিকার। পুঁজিবাদীরা মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে। তাই আল্লাহর সম্পদ মওজুদ ও জমা করাকে কোরানে কঠোরভাবে নিন্দা করেছে। স্বার্থবাদীর দল যাতে আর ফতোয়ার আঘাতে মানবের রক্তকণিকায় ব্যাক্তিমালিকানার বিষ মিশিয়ে দিতে না পারে তারই জন্য নবীজি সহজ-সরল ভাষায় বলেছেন, 'আগুন, পানি, খাদ্যদ্রব্য এবং পোশাক-পরিচ্ছদের উপর রয়েছে প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার।' এবং সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে বলেই তো কোরবানীকে করা হয়েছে অবশ্য কর্তব্য।

মানুষকে বাঁচার দাবীর উপর অর্থাৎ খেয়ে-পরে পার্থিব জীবন পরিচালনা করার বেলায় মানুষকে ইসলাম ভীষণ সমতার আসনে বসিয়েছে। পার্থিব সম্পদের উপর কঠোর ব্যবস্থা করে মানুষকে উঁচু-

নিচুর পর্যায়ে ফেলা ইসলামের বিধানে নেই। কারণ, পার্থিব সম্পদের দাম ইসলামের দৃষ্টিতে একটি কানাকড়িও নয়। বিশ্বরবের নৈকট্য লাভের বেলায় কে কতখানি অগ্রসর হতে পেরেছে সেখানেই উঁচু-নিচু লক্ষ্য করি। ঠুনকো ভোগ্য সম্পদ যদি ইসলামের দৃষ্টিতে স্বত:সিদ্ধ সত্য হত তবে খলিফা উমরের আঁখিতে অশ্রুর বন্যা লুটিয়ে পড়তো না। এতদিনের গতিধারায় ইসলামের ইতিহাসে অন্যস্রোত প্রবাহিত হত।

মানুষ আজ ক্ষুধার অগ্নিতে জ্বলছে। তাই তার বিবেক প্রথমে ছুটে চলে ক্ষুধার অগ্নিকে নিভাতে। সমাধানের বহু নীতি প্রচারিত হয়। বিবেক তখন সত্যতে আশ্রয় নিতে চায় না। ইহা একান্ত স্বাভাবিক। সত্যের যে সুর বাজে সে সুর বিবেক সেতুকে পেরিয়ে যেতে পারে না। যদি এই পার্থিব অসাম্য অনেকদিন বিরাজ করে তবে ক্ষুধার অগ্নিদাহ নিভানোর কর্তব্যই হবে মানুষের নিকট সব চাইতে বড় সত্য। স্রষ্টার নৈকট্যের কথা তখন বললে মানুষ হাসবে। বেশি চাপ দিলে অস্বীকার করে বসবে। না হলে বলবে, ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনেকে বলবে অপ্রয়োজনীয়। কারণ, মানুষের ভাবধারায় শুধু একটি ভাবনা, এই ক্ষুধার অগ্নিদাহ কি করে চিরতরে নিভানো যায়।

ধন-সম্পদ মোহের প্রতি শুধু ঘৃণা সৃষ্টি করেই কোরান এবং হাদীস ক্ষান্ত হয়নি। উহার সমবন্টনের কথাও কোরানে এবং বিশেষ করে হাদীসে বহুল পরিমাণে রাখা হয়েছে। কিন্ত আক্ষেপ, আমরা কোরান-হাদীসকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করে নিতে পারিনি। ইসলামের আদর্শে রাষ্ট্রগঠন করলে সে রাষ্ট্রে বস্তুবণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে রাষ্ট্রীয় অন্যায় ও অসাম্য দেখা দেবে না। ক্রমে স্বভাবতই উহা সমবন্টনের দিকে ছুটে চলবে। কিন্তু এরূপ স্বাভাবিকভাবে সাম্যের দিকে ছুটে চলার সুযোগ মুসলিম জগত কখনো পায়নি। কারণ, মধ্যযুগীয় শাসকগণ ধর্মের নামে শোষণ ব্যবস্থাকেই চালু রেখেছিল।

ইজম বা ধর্তব্য মতবাদ হিসেবে বস্তুবাদকে ইসলামে মোটেই অগ্রাহ্য করা হয়নি। বরং বস্তুবাদ নিয়ন্ত্রণ ইসলামের দৃষ্টিতে কোন পথে গ্রহণযোগ্য এবং কোন পথে পরিত্যাজ্য তা কোরানের প্রায় সর্বত্রই আলোচিত হয়েছে, যেহেতু ইহাই সংসার-জীবনে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ক্ষেত্র। রাতারাতি বণ্টন-সাম্য প্রতিষ্ঠা কোনকালেই কোন দেশের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়।

আল্লাহকে পাবার পথে ধন-সম্পদ কঠোর প্রতিবন্ধক। সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে আল্লাহ ও পরকালে অবিশ্বাস স্থাপন করাই স্বাভাবিক গতি হয়ে দাঁড়ায় বলে পুঁজিবাদ তথা ধনবাদকে ইসলাম সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেছে। ইসলাম ক্রীতদাস প্রথাকে অন্যায় বলে ঘোষণা করেছে। ক্রীতদাস-মুক্তি বিশেষ একটি পুণ্যের কাজ বলে পরিগণিত হয়েছে অথচ প্রচলিত দাসপ্রথাকে সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছেদ করা হয়নি। রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সময়ে মদিনা রাষ্ট্রে তখনো দাসপ্রথা প্রচলিতই ছিল। ঠিক সেরকমভাবে সমবন্টন হবার দিকে সকল প্রকার ব্যবস্থাই করা হল। অনেক রকম আদেশ-নিষেধ সুনির্ধারিত করে রাখা হল। কিন্তু প্রচলিত অসাম্যকে একেবারে তুলে দেবার কাজ সঙ্গে সঙ্গে করা হল না। রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় মদীনাতে সাম্য স্বীকৃত ছিল এবং যথাসম্ভব প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশ্য উহা ছিল সেই যুগের উপযোগী একপ্রকার ব্যবস্থা। এই প্রয়োগব্যবস্থা পরিবর্তন করা যেতে পারে, অর্থাৎ ব্যবস্থা করার পদ্ধতি অনেক রকম হতে পারে সময় ও যুগের ধারা উপযোগী, কিন্তু বণ্টন বিষয়ক সাম্য ও ন্যায়নীতির মূল কথা কখনোই পরিবর্তন করা চলবে না। ইহার নিয়ন্ত্রণ সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে জনকল্যাণকর ব্যবস্থার জন্য যে কোন দিকে নিয়ে যেতে পারবে, তাতে ইসলামের কোনই রদবদল বা লাভ-লোকসান নাই। কারণ, ইসলামের আসল রূপটির প্রকৃত পরিচয় ইহার বহু উর্ধে। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির রহস্যে আবৃত প্রেমলীলার বিজ্ঞানময় মিলনের চরম আনন্দ আর আত্মসমর্পন হল বহু উর্ধ্বের ইসলাম। বিরহী প্রেমিক অচঞ্চল দৃষ্টিতে পরম প্রেমিকের মিলন বাসনায় উদগ্রীব। দুইয়ের আকাঙ্ক্ষিত

মিলনে দুই নেয় তখন বিদায়। আত্মপ্রকাশ করে তৌহিদ । দুনিয়ার কুয়াশা ছুটে যায়। তাগুত তখন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। সৃষ্টি ও স্রষ্টা তখন এক সূত্রে গাঁথা এবং সবকিছু আয়াতরূপে দৃশ্যমান হয়। কিন্তু আপসোস! ঈমানের প্রথম সিঁড়িতে এখনো যেখানে পা রাখতে গেলে পিছলিয়ে পড়ে যায়, সেখানে পরের সিঁড়িগুলোর কথা আলোচনা করা?

অনেকের চিন্তাধারায় একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সময়ে অর্থাৎ সেই যুগে মদীনাতে যে অর্থনীতি চালু ছিল তার কোনই পরিবর্তন ইসলামী রাষ্ট্রে করা চলবে না। ইহা একটি মারাত্মক ভুল এবং পাগলামী করা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরস্পর সুবিচার ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করার বিষয়ে ইসলামে জোর তাগিদ রয়েছে। এই নীতিতে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারেও সাম্যের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। সাম্যের আদর্শের প্রয়োগব্যবস্থার পদ্ধতি যে রকমই হোক না কেন তাতে ইসলামের কিছুই আসে যায় না এবং উহাতে ইসলামের আঙ্গিক বিকাশের মাধুর্য কখনোই ম্লান হবে না। ইসলামের আঙ্গিক বিকাশ তখনই ম্লান হতে চলে যখন অসাম্যের বিশ্রী প্রবাহ হুমড়ি খেয়ে ইসলামে লুটিয়ে পড়তে চায়।

কোরআনভিত্তিক যাকাত ও সালাতের আলোচনা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের তথা ক্রমবিকাশের সাথে উৎপাদনের পদ্ধতি এবং বণ্টনব্যবস্থার প্রয়োগ অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ মূলনীতি সাম্যবাদ অক্ষুণ্ন রাখতেই হবে। যেমন ধরুন প্রকৃত যাকাতের নামকরণ করে 'যাকাত' নামক রাষ্ট্রীয় কর। প্রকৃত যাকাতের সংজ্ঞা কখনই 'যাকাত' নামক করটির ভাব কোরানে বহন করতে পারে না। কারণ, কোরান হল মূলনীতি। সেই জন্যই 'যাকাত' নামক করটিকে হাদীসে যাকাত শব্দে ব্যবহার করা হয়নি। হাদীস পড়ার সময় লক্ষ্য করবেন 'যাকাত' নামক করটির ভাব যখনই বহন করছে তখনই উহাকে সাদকা নামকরণ করা হয়েছে। শতকরা আড়াই টাকার সাদকার 'যাকাত' নামক কর আর কোরানের যাকাত কখনোই একভাব বহন করতে পারে না। যেমন ধরুন ইফতারের কথা ধরা যাক। প্রকৃত ইফতার এবং আনুষ্ঠানিক ইফতার কখনোই এক হতে পারে না। কিন্তু আমরা আনুষ্ঠানিক ইফতারের সঙ্গেই পরিচিত। ইফতার বলতে আমরা রোজা রেখে নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী দিয়ে উপবাসব্রত-ভাঙ্গা বুঝি। রোজা-ভাঙ্গা হাকীকতে ভুল, তাই উপবাসব্রত-ভাঙ্গা লিখলাম। কিন্তু প্রকৃত ইফতার উপবাস-ভাঙ্গার খাদ্যসামগ্রী মোটেই নয়। তবে প্রকৃত ইফতার কি? *মারেফতের গোপন কথা* বইতে বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক হলেও অনেকগুলো হাদীস হতে মাত্র একটি হাদীস তুলে দিলাম। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, 'আল্লাহ বলেছেন, 'আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ইফতার করে।' এখন আপনারাই বলুন এই ইফতার কি ডালের ফুলুরি খাবার তাড়াহুড়া করা?

যাকাত কথার অর্থ হল আল্লাহর দেওয়া সমস্ত ধন-সম্পদ ও শক্তি এবং চিত্তবৃত্তি তথা নফসের সমগ্র অভিব্যক্তি চোখ, কান, নাক, বুদ্ধি, ভাষা ইত্যাদি সবকিছু তারই সেবার জন্য তাকে দান করে দেওয়া। এক কথায় নফসের সামগ্রিক অভিব্যক্তিগুলো নিজ ইচ্ছায় ব্যবহার না করে যাঁর দান তাঁকেই

ফিরিয়ে দিয়ে তাঁরই ইচ্ছামত প্রয়োগ ও ব্যবহার করে চলা। এটাই কোরান-হাদীসের যাকাত। আমি আপনাদের কেবল একটি কথাই চিন্তা করতে বলবো যে, বিশ্বাসীর সংজ্ঞার মধ্যে ইহাও একটি শর্ত যে বিশ্বাসী যাকাতের জন্য কর্মতৎপর থাকে। (কোরান)। যাকাত অর্থ যদি উদ্বৃত্ত আয়ের শতকরা আড়াই ভাগ দরিদ্রকে দান করা অর্থে হয়ে থাকে তা হলে এটার জন্য কর্মতৎপর থাকার কোন প্রশ্নই আসে না। বছরের আয়ের হিসেবটা পাঁচ মিনিটে চুকিয়ে দিয়ে দান করলেই হয়ে গেল। আর সারা বছরের বাকী সময়টুকু তার জন্য কর্মতৎপর থাকার দরকার হয় না।

যাকাত নামক রাষ্ট্রীয় খাজনাকেই যদি কোরানে 'যাকাত' বলা হত তা হলে গরীব জনসাধারণ যাকাত-দানের মহাকল্যাণ হতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, আত্মগ্লানির ম্লান ছায়ায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া ইসলামের সাম্যবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হলে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দানের কথা তো সেখানে মোটেই থাকে না। আর যাকাতের কথা কোরান শরীফে বহুবার ঘোষণা করার প্রয়োজনও হত না। ঠিক যেমন কোরান এবং হাদীস শরীফে দাসপ্রথা বিলোপ করার উদ্দেশ্যে বহু আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং দাসপ্রথা সমাজ হতে উচ্ছেদ করা মহাপুণ্যের কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যখন দাসপ্রথা সমাজ হতে সম্পুর্ণরূপে উচ্ছেদ হয়ে যাবে তখন দাসপ্রথা আর থাকে কোথায়?

সেই যুগে ইসলামী রাষ্ট্রে নিঃসম্বল দরিদ্রের সাহায্যের জন্য 'সাহেবে নেসাব'-এর উপর অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদশালী ব্যক্তির উপর তার উদ্বৃত্ত আয়ের শতকার আড়াই ভাগ বাধ্যতামূলক কররূপে ধার্য করা হত। এই খাজনার নামকরণ করা হয়েছিল যাকাত। কোরানের যাকাত অর্থ এই কর অথবা এই পরিমাণ দান করা নয়।

সালাতের সঙ্গে বেশিরভাগ যাকাতের কথা একত্রে দেখা যায়। তার কারণ, সালাত করতে চাইলেই অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে সংযোগের চেষ্টা করতে গেলেই নিজের যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করার প্রশ্ন আসে। পক্ষান্তরে নিজের যথাসর্বস্ব সাময়িকভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাকতে গেলে আল্লাহতে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হতে পারে না। এই জন্য সালাত করতে গেলেই যাকাতের কথা এসে পড়ে এবং যাকাত দিতে চাইলে সালাত করতেই হবে। উভয়ে পরস্পর অঙ্গাঙ্গী।

সালাত একটি অখণ্ড সংযোগ প্রচেষ্টা। ইহা সময় দ্বারা খণ্ডিত নয়। যদিও পাঁচবার আনুষ্ঠানিক সালাত পালন করা শরীয়তে বাধ্যতামূলক বিধান রাখা হয়েছে। কোরান পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা উল্লেখ করেনি। কারণ উহা মূলনীতি নির্ধারক। কোরান বলছে, 'আকিমুস্ সালাত' অর্থাৎ সংযোগ প্রচেষ্টা কায়েম কর। কায়েম অর্থে স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন 'সালাত' করতে থাকা বুঝায়। শরীয়তে দিনে পাঁচ বার সালাত পালনের যে পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে তাও স্থায়ী সংযোগ তথা সালাত সৃষ্টির পথে অগ্রসর হবার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। ঠিক সেরকমভাবে ইসলামের সাম্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করার তরে 'যাকাত' নামক কর দেওয়া এবং দরিদ্রকে দান করার নানা প্রকার উৎসাহমূলক এবং সতর্কতামূলক উপদেশ রাখা হয়েছে যাতে বিশ্বমানব সমাজে সাম্যবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

সালাতের সাথে যাকাত জড়িত। সুতরাং সমগ্র চিত্তবৃত্তি এবং পার্থিব সম্পদ যাকাত করবার জন্য অর্থাৎ আল্লাহর নিকট যাকাতরূপে উৎসর্গ করবার জন্য সদা কর্মতৎপর থাকতে হবে। যাকাত না করলে সালাত হবে না। কারণ, নফসের বৃত্তিগুলো নফসকে তার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে দিলে ঐ সমস্ত দ্বারা সে দুনিয়ার সঙ্গে (পৃথিবীর সঙ্গে নয়। কোরান-হাদীসের পরিভাষায় দুনিয়া এবং পৃথিবী এক নয়। কারণ, পৃথিবী দুনিয়াতে বাস করে না। পৃথিবী আল্লাহর দ্বীনে বাস করে। দুনিয়াতে বাস করে শুধু মানুষ এবং জ্বিনের মনটুকু। এমনকি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও আল্লাহর দ্বীনে বাস করে।

ইত্যাদি) সংযোগ স্থাপন করবে এবং দুনিয়ার সঙ্গেই সে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হবে। ক্রমে 'সালাত' অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে সংযোগের চেষ্টাও তার থাকবে না। চিত্তবৃত্তির সামগ্রিক অভিব্যক্তি আল্লাহর দাসত্বে তাঁরই ইচ্ছামত ব্যয় করতে গেলে ঐগুলির ব্যবহার সম্পুর্ণ তাঁরই নিকট ছেড়ে দিতে হয়। এভাবে আপনাকে ছেড়ে ব্যস্ত হয়ে থাকলে বাজে কথা বলার সময় কোথায়? আল্লাহর দেওয়া সমস্ত শক্তি ও সম্পদ আল্লাহকে যাকাত দেওয়া সোজা কথা নয়। তার জন্য তাকে সবচেয়ে তৎমুখাপেক্ষী এবং উদগ্রীব হয়ে নিজের চিন্তাশক্তিগুলোকে উৎসর্গ করবার কাজে সবচেয়ে কর্মতৎপর থাকতে হয়। আল্লাহর দিক হতে মুখ ফিরিয়ে যতটুকু দুনিয়ার দিকে নজর দেওয়া হয় ততটুকু যাকাত দেবার অবস্থা ছুটে যায়। যাকাত করতে চাইলে সর্বদাই কর্মতৎপর থাকতে হয়।

এখন আমরা সেই 'যাকাত' নামক করটি নিয়ে আলোচনা করবো। যাকাত এবং 'যাকাত' নামক কর এই দুটোর পার্থক্য এখন সহজেই বুঝা যাবে। ধরুন, একটা খুব বড় জাহাজের নাম রাখা হল পাকিস্তান। তাহলে পাকিস্তান এবং পাকিস্তান-নামক জাহাজ দুটো কি একই বলতে পারেন? না পারেন না। কারণ, দুটোর নাম এক হলেও দুটো এক জিনিস নয়। এই 'যাকাত' নামক করটি রসুলাল্লাহ (সঃ) চালু করেছিলেন দরিদ্রের সাহায্য ইত্যাদি কয়টি নির্দিষ্ট কাজের জন্য। যখন সাম্যবাদ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন 'যাকাত' নামক করটি আর থাকে না। উহা আপনা হতেই উঠে যায়। ক্রীতদাসীর উপর স্ত্রীর মত যৌন-অধিকারের কথা কোরান ও হাদীস শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আবার ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদ করার ব্যবস্থাও রয়েছে। যখন দাসপ্রথা সমাজ হতে উচ্ছেদ হয়ে যাবে তখন ক্রীতদাসীর উপর অবাধ যৌন-অধিকারের আইন থাকে কোথায়? তাই অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে ইসলামকে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাই বুঝে নিতে হবে। আপন যুক্তিতর্ক দিয়ে নিজের ইচ্ছামত বুঝতে ও বুঝাতে চাইলে চলবে না। তাই জনৈক ব্যক্তি মুচকি হেসে কাঠ মোল্লাকে বলেই ফেললেন, 'মাওলানা সাহেব, আপনার ইসলাম যন্ত্রে কি সুর বাজে আর আপনি কি গান গাহেন!' এই কাঠ মোল্লাদের বেসুরা গানের আওয়াজে বিশ্বমানবের দুয়ারে ইসলাম বোবা হয়ে আছে। এই বেসুরা গানের জোর করে গাওয়া দেখে কোটি কোটি দেশপ্রেমিক নাস্তিকে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু তার জন্য দায়ী কারা? কাঠমোল্লারা? না দেশপ্রেমিকেরা? না উভয়েই?

মূলনীতি ফেলে দিয়ে শুধু পুর্ববর্তীদের প্রয়োগব্যবস্থা অন্ধের মত অনুকরণ করলে ভুল হবে। ইহা ইসলামের অনুসরণ না হয়ে অনেক ক্ষেত্রে বিরুদ্ধাচরণরূপে কাজ করবে। ইসলামের মূলনীতির পরিচয়ের অভাবে এবং পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার উপর উহা প্রবর্তন করার সুষ্ঠু জ্ঞানের অভাবে আধুনিক যুগে ধর্মকে একদল লোক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অপ্রযোজ্য মনে করে থাকেন। তাদের মতে ধর্ম নাকি একেবারেই ব্যক্তিগত বিষয়। তাই ধর্ম 'মধ্যযুগের' অপবাদে তাদের কাছে এক প্রকার কলুষিত হয়ে গেছে।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন ব্যক্তিমালিকানাকে সমাজ ব্যবস্থার একটি ভিত্তিরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বলেই কোরান শরীফে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, সুতরাং সেখানে সমবণ্টনের কোন স্থান হতে পারে না। উত্তরঃ– ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি কোরান কখনো দেয়নি। উহা আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম হয়ে দড়িকে সর্প মনে করে নিচ্ছি। হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) তৈরী করা রাজতন্ত্রের বিরাট পাথরখানা তের শত বছর ধরে সাম্যের আদর্শকে চাপা দিয়ে রেখেছে। সেই পাথরে চাপা সাম্যকে আর উঠিয়ে আনা যাবে না ভেবে পাথরটাকেই ইসলামের আদর্শ বলে ধীরে ধীরে আমাদের মনে দানা বেঁধে উঠেছে। যার ফলে ইসলামের নীতিটাকে সমাজে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে বলেছে তা একপ্রকার নেশাখোরের মত ভুলেই আছি। ইসলামের বস্তুবণ্টন ব্যবস্থার মৌলিক

নীতির আলোতে বিচার করলে সম্পত্তির মালিকানা ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। আল্লাহর উপরই এই মালিকানা (ওনারশিপ) দেওয়া হয়েছে। নিজের খেয়াল-খুশী মত ভোগ ও অপচয়ের অধিকার তখনই একটু না একটু মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেই যখন মানুষকে মালিকানার অধিকার দেওয়া হয়। তাই কোরানে বহুবার আমাদেরকে শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে, মালিক একমাত্র আল্লাহ অর্থাৎ মানুষ মালিক নয়।

ইসলামের প্রথম যুগে ছিল একান্তভাবে পরিবারকেন্দ্রিক সমাজ। পিতা-মাতাই ছিলেন এক একটি পরিবারের প্রধান উপদেষ্টা এবং চালক। তারা ভক্তির পাত্র ও গুরুজনরূপে বিরাজ করতেন। তারা অভিজ্ঞ চালক এবং যোগ্য উপদেষ্টা এবং তার সাথে পারিবারিক আয়-ব্যয়ের অধিকারীও তারাই হতেন। তাদের মৃত্যু হলে তাদের অধিকারভুক্ত সম্পত্তির বণ্টনব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনব্যবস্থার কথা কোরান শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা একথা বুঝায় না যে, ব্যক্তিমালিকানা রাখতেই হবে। দাসপ্রথার স্বীকৃতি কোরানের কোথাও নেই, বরং দাসপ্রথা উচ্ছেদ করার আহ্বান কত সুন্দর করেই না বলা হয়েছে। কিন্তু সেই যুগের সেই অবস্থাতে দাসপ্রথা রয়ে গেল। এর দ্বারা একথা বুঝায় না যে, দাসপ্রথা রাখতেই হবে। কোরান যেমন মৃতব্যক্তির সম্পত্তির বণ্টনব্যবস্থা প্রদান করেছে, আবার তার সঙ্গে সাম্যের অজস্র বাণীও প্রচার করেছে। 'পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ তোমাদের মঙ্গলের জন্যই সৃষ্টি করেছেন'। (২ঃ২৯)। তাই আমরা দেখতে পাই, সেই যুগে সেই পরিবেশে যদিও সাম্যের রোলার চালানো হয়নি, কিন্তু সাম্যের দিকে ধাবিত হবার সাবধান বাণী ও উপদেশের রোলার কম চালানো হয়নি। আমরা খোৎবাতে শুনে আসছি ***'আসসুলতানু জিল্লুল্লাহ'।*** আল্লাহ যেখানে সোজাসুজি মানুষের রাজা সেখানে সুলতানের অস্তিত্ব কোথায়? 'সুলতান' কেমন করে আল্লাহর ছায়া হল এটা বিশেষভাবে বুঝে নেবার প্রয়োজন আছে। ইসলামী রাষ্ট্রে সুলতান তিনি যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসুল কর্তৃত্বের আসনে বসিয়েছেন তাদের প্রতিনিধিরূপে। 'সুলতান' অর্থ হল ক্ষমতার অধিকারী । এই ক্ষমতা জাহের ও বাতেনের মিলিত ক্ষমতা। এরূপ সুলতান নিজের ইচ্ছায় রাষ্ট্রের চালকরূপে অধিষ্ঠিত নন। আপসোস, সুলতান শব্দটির অপপ্রয়োগ করে আত্মকেন্দ্রিক দুনিয়াদার রাজাগণ নিজের শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য খোৎবার মধ্যে মসজিদ ঘরে আমাদেরকে তাদের পক্ষে এই নেশা পান করিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে। এই ভুলের নেশায় আর কতকাল আমরা মাতাল থাকবো? খেলাফত ভেঙ্গে যাবার পর খলিফা নামধারী রাজারা কোন আলেমকে স্বাধীনভাবে খোৎবা পাঠ ও প্রচার করতে দেয়নি। তাই সত্যিকার আলেম প্রায়ই নির্যাতিত ও নিহত হয়েছে এই সমস্ত খলিফা নামধারী রাজাদের হাতে। খেলাফত ভেঙ্গে যাবার পর হতে আজ পর্যন্ত মুসলিম জাহান রাজতন্ত্রের এই কালিমা বহন করে চলছে। শাসকগণ তথাকথিত কাষ্ঠ আলেমদের সমর্থনের সাহায্য নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা কায়েম করে চলেছে।

মুসলিম রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করা একটি আপদবিশেষ। এখানে না আছে আমিত্ব জড়ানো কর্তৃত্ব আর না আছে অন্য কোনরূপ ব্যক্তিস্বার্থ। এখানে শুধুই সেবা আর সার্বিক জনকল্যাণ। এই কল্যাণ আমিত্ব প্রতিষ্ঠার পথে নয় বরং আমিত্ব ধ্বংসের পথে। জেহাদ ইহার মূলমন্ত্র। এই জেহাদ ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সমাজকেন্দ্রিক। শাসক আর সৈনিক রাষ্ট্রের শত্রুর বিরুদ্ধেই শুধু জেহাদে রত নয়, তারা নিজের আমিত্বের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত। তাই তাদের সামরিক শিক্ষা ধর্মভিত্তিক, বস্তুভিত্তিক নয়। তারা যোদ্ধা হিসেবে যেমন অসীম সাহসী, অতুলনীয় বীর, তেমনি আবার দয়ায় বিগলিত প্রেমিক। নীতিবাদ তাদের মূলমন্ত্র। স্বার্থবাদ তাদের পরিত্যক্ত। প্রেম ও মনোবল তাদের বিজয়ের মূলমন্ত্র। কারণ, প্রেমের সঙ্গেই আল্লাহ আছেন। অস্ত্রবল উপলক্ষ মাত্র।

হযরত শাকীক বলখী (রাঃ) মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তা বর্ণনা করছেন। তিনি মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে নদী-নালার উৎস ঝরণারূপে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, উৎসরূপ ঝরণার পানি যদি নির্মল না হয়ে সংক্রামক রোগ-জীবাণু মিশ্রিত পচা দুর্গন্ধময় পানি হয়, তবে সেই ঝরণার পানি বহনকারী নদী-নালাও তা বহন করবে। সেরকমভাবে মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান যদি মন্দ এবং স্বেচ্ছাচারী হয় তা হলে সংক্রামক রোগের মত সেই ব্যাধি সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এরূপ বিপথগামী রাষ্ট্রপ্রধানকে 'যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে সেখানে সেই অবস্থায়' তাকে হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ঈমান ও ইসলাম রক্ষার খাতিরে এরূপ শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, যেন অন্যায় ও অসাম্য সমাজে প্রশ্রয় লাভ করতে না পারে। মোট কথা, দুনিয়ার জীবনে মানুষ কোন কিছুরই মালিক হতে পারে না। সর্বমালিকানা আল্লাহর এবং তাঁর রসুলের। ইসলাম এই সত্যের উপলব্ধি মনের মধ্যে সদাজাগ্রত রাখার মত অনেক ব্যবস্থাই দান করেছে। সেই জন্য সত্যিকার মুসলমানের কথা আলাদা। তিনি আল্লাহর প্রতিনিধিরূপেই বস্তু জগতে হস্ত সঞ্চালন করে থাকেন। তিনি নিজেকে উহার মালিক মনে করে অংশীবাদীরূপে পরিগণিত করতে রাজি নন। যদিও আদর্শকে লক্ষ্য করেই ধর্মীয় বিধান রচনা করা হয়ে থাকে, তথাপি পরিণামে আদর্শবাদ ও বাস্তব নিয়ন্ত্রণ সমাজে একরূপ থাকতে পারছে না। মূলের দিকে লক্ষ্য রেখে বুঝতে চেষ্টা না করলেই চিন্তার গোলযোগ এবং মতভেদের উদয় হয়ে থাকে।

ইসলামের সাম্যবাদের নীতি ও আদর্শ বিকৃত ভাবধারার অবগুণ্ঠনে ঢেকে পড়ার অনেক কারণ আছে। সবগুলো বর্ণনা করা এতটুকু পুস্তকে সম্ভব নয় বলে দু' চারটা কথা আবার না বললে একেবারেই ধোঁয়াটে থেকে যায়। সবচাইতে ছোট করে যদি রসুলুল্লাহর (সঃ) তথা ইসলামের সমস্ত নীতি ও আদর্শবাদকে একটি টেবলেট করে দেখানো যায় তবে সেই টেবলেটটি হল 'তারকে দুনিয়া' অর্থাৎ দুনিয়াকে পরিত্যাগ করা। দুনিয়াকে পরিত্যাগ করাই যদি ইসলামের একটি মাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সেখানে অপরকে ছোট করে , বঞ্চিত-রিক্ত করে নিজে কি করে শোষণ-করা ধনের পাহাড় বানাতে পারে? আমিত্বের প্রশ্ন তোলাটাই যেখানে অবান্তর সেখানে সাম্যবাদের আদর্শ কি করে শতছিন্ন মলিন বসনে আর অনাহারে হাড়-উঠা দেহে কবরের চিরশয্যার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে?

ইসলামের উপর বিকৃত ব্যাখ্যা দেবার কারণে আল্লাহর রেজেক কথাটিও আমাদের নিকট বিকৃত আকারে মনে ধারণ করে আছে। যাকে আমরা রেজেক বলে ধরে নেই, দুনিয়ার এই রেজেককে কোরানের একটি লাইনেও 'আল্লাহর রেজেক' বলে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ হল এই যে, কাফেরগণও তা হলে দেখতে পাচ্ছি আল্লাহর রেজেক ভোগ করে আসছে। আল্লাহর রেজেক ভোগ করার অধিকার কাফেরের নেই। কেননা, কোরান স্পষ্ট বলছে, 'হে মোমিনগণ, মৃত্যুর আগে আল্লাহর রেজেক হতে ব্যয় করে মর।' কাজেই বলা যায়, কেবল মোমিনদের পক্ষেই আল্লাহর রেজেক হতে ব্যয় করার চেষ্টা করা সম্ভবপর হতে পারে। আমরা যাকে আল্লাহর রেজেক বলছি তা নয়। বরং উহা সকলের জন্য সাময়িক উদ্দেশ্যমূলক একটি সাধারণ দান।

নফস যখন আপন খেয়াল-খুশীমত উৎপাদন বা উপার্জন করে নেবে তখন সেটাকে 'আল্লাহর রেজেক' আর বলা যাবে না। আল্লাহর অখণ্ড দ্বীনে প্রবেশ করে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর গুণাবলী হতে নির্গত বস্তু আপনা আপনি তৈরি হয়ে মোমিনের চাহিদামত এসে হাজির হবে, উহাকেই আল্লাহর রেজেক বলে কোরান শরীফ ঘোষণা করেছে। একমাত্র রবের ইচ্ছার মাঝে আপন ইচ্ছাটিকে মিশিয়ে একাকার করে সমগ্র সৃষ্টির আইনের উপর অর্থাৎ 'কেতাব'-এর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব আসতে পারে। কেতাব বলতে কোরানে বইকে বুঝানো হয়নি। যদি কেতাব অর্থ বই ধরে নেওয়া যায় তা হলে

কোরানের ভাবধারাতে আপনি কোথাও মিল খুঁজে পাবেন না। ছোট করে বলতে গেলে, কেতাব হল আল্লাহর জাত হতে যে রূপান্তর ও বিবর্তনের (ট্রানসফরমেশন) দ্বারা তিনি তাঁর সেফাত প্রমাণ করছেন এবং তাঁর সেফাত হতে সর্বসৃষ্টি প্রকাশ করে চলেছেন, সেই রহস্যময় সৃষ্টি-বিধান। অন্যভাবেও বলা যায়, তিনি প্রথম হতে নিজেকে অনেক রূপে, রসে, বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে চলছেন এবং এই প্রকাশের ধারাকেই (ডিভাইন মেনিফেস্টেশন) বলা হয়েছে কেতাব।

বিবর্তন ও রূপান্তর কথাটিতে সাধারণতঃ যা বুঝানো হয় আল্লাহ সম্বন্ধে তা বুঝাবে না। কারণ, তার রূপান্তর বস্তুর রূপান্তরের মত নয়। কোন বস্তু রূপান্তরিত হলে আগের মত আর থাকছে না। আল্লাহর প্রথম এবং পূর্বের অবস্থা অথবা যে কোন অবস্থা অপরিবর্তিত থেকেও তাহা হতে তাঁর সেফাতের উদ্ভব হয় এবং সেসব সেফাত হতে অসীম রূপান্তর হয়ে থাকে। 'তিনি নব নব জালুয়া ও শানের মধ্যে সর্বদা নব নবরূপে বিকশিত হয়ে থাকেন।' (কোরান)। অর্থাৎ তিনি যে নিজেকে প্রকাশ করে ছুটে চলছেন, সেই ছুটে চলার গতির একটি সেকেন্ডের কোটি বিলিয়ন ভাগ করা সময়টুকুতে যে কোটি বিলিয়ন নতুন নতুন রূপ দেখিয়ে যাচ্ছেন, সেই রূপবৈচিত্র আর তিনি কোনদিনও দেখাবেন না। এখানেই তার নব নব রূপে বিকাশ হবার স্বাক্ষর।

নফসের আমিত্বহারা অবস্থায় যে রেজেক নফস উপভোগ করে উহাকেই বলা হয়েছে আল্লাহর রেজেক। আল্লাহর উপর চরম নির্ভরের দ্বারাই কেবল আল্লাহর রেজেক পাবার অবস্থা হতে পারে। একই আল্লাহর রেজেকের আবার দুটো রূপ। একটি হল আল্লাহর গুণাবলীই আল্লাহর রেজেক এবং অপরটি সেই গুণাবলী হতে নির্গত বস্তুও আল্লাহর রেজেক। অবশ্য মূলে দুটোই এক। শুধু প্রকাশে দুই। এ যেন একই আল্লাহর রেজেকের জাহের ও বাতেন। আল্লাহ নিজেই রেজেক। কারণ, তাঁর গুণাবলী হতে তিনি পৃথক নন। এই নিজে বলতে আল্লাহ মানুষের কাছে আল্লাহরূপী নিজে নয় বরং রবরূপী নিজে। কারণ, রবরূপে তিনিই মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধযুক্ত এবং অঙ্গাঙ্গী। তৌহিদের স্বরূপ বুঝতে না পারলে ইহা বুঝা কঠিন। আল্লাহর রেজেক ছাড়া আর বাকি সকল পার্থিব জীবনের জন্য তাঁর সাধারণ সাময়িক ও নগণ্য দান। এই সাধারণ দান তিনি সৃষ্টি বিধানের মধ্যে সবার জন্য সমভাবে রেখেছেন। এই দান মৃত্যুঘটনার পূর্ব পর্যন্ত থাকবে মাত্র। পরপারে প্রবেশের অধিকার বা শক্তি তার নেই।

আল্লাহর রেজেক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অধিকাংশ কোরানের অনুবাদকারী বলেন, 'অন্যের অধিকারে হাত না দিয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে উপার্জন করে উহা হতে ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যয় করার নাম আল্লাহর রেজেক হতে ব্যয় করা বুঝায়।'

কোরানের অনুবাদকারীদের প্রচলিত এই মতের অর্থ যদি মেনে নেওয়া হয় তবে স্বীকার করে নিতেই হবে যে, দুনিয়ার কাফের, অংশীবাদী ইত্যাদি সবাই মিলে আল্লাহর দেয়া রেজেক থেকে ব্যয় করছে। এমনকি কমিউনিষ্ট দেশগুলো তাদের সমাজ হতে আল্লাহর রেজেক ব্যয় করার যে প্রয়োজনীয়তা আছে উহা উচ্ছেদ করে দিয়ে তার চেয়ে অনেক উন্নত অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। সুতরাং কোরানের আইন মোতাবেক যিনি মোমেন, সেইরূপ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে আল্লাহর রেজেক হতে ব্যয় করার আদেশ দেবার কোন মানেই হয় না।

আরো মজার বিষয় হল, কোরানের অনুবাদকারীগণ কোরানে উল্লেখিত 'ব্যয় করা' কথাটিকে অনেকটা হাতিকে নদীতে ফেলে নদীর রচনা লিখার মত অর্থ করেন, দান খয়রাত করা। কিন্তু আপসোস, এই ক্ষেত্রেও অনুবাদকারীদের মুক্তি নেই। কারণ, কমিউনিষ্টগণ গরীবদেরকে এমন সুন্দরভাবে দান করার ব্যবস্থা করেছে যে, দান করার প্রশ্নই সমাজ হতে উঠিয়ে দিয়েছে। দান বলতে

যা বুঝি তা পুঁজিবাদীদের জন্য একটি বিলাসিতা। এর কোনই স্থান ইসলামে নেই। অতি দুঃখের সাথে বলছি, কোরানের শব্দকে কোরানের পরিভাষার অর্থের বাইরে এনে নিজের খেয়াল-খুশি মত অর্থের মিল খুঁজলে চলবে না। ভুল হবে। এবং এই মারাত্মক ভুলের বিশ্রী রূপ দেখে আরবী ভাষা না জানা কত প্রেমিক স্রষ্টার আস্থাতে ভারসাম্য রাখতে পারছে না।

পার্থিব জীবনে আল্লাহর সন্তোষের মাধ্যমে কেতাবকে হস্তগত করে বেহেস্তের খানা খাওয়া এবং বেহেস্তের সম্পদ ব্যয় করার নাম হল আল্লাহর রেজেক খাওয়া এবং আল্লাহর রেজেক হতে ব্যয় করা। পার্থিবজীবনে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আল্লাহর রেজেক হতে ব্যয় করা অসম্ভব। কারণ আল্লাহর দ্বীন অক্ষয়। দুনিয়া ধ্বংসশীল। আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করার পর যে জীবন, ইহা অক্ষয় অমর জীবন। দুনিয়ার জীবন জরা-মৃত্যুর অধীন। মরার আগে মরে যাবার অর্থই হল দুনিয়া হতে ছুটে আল্লাহর দ্বীনে আশ্রয় নেওয়া। উপভোগ্য সামগ্রী ও বিষয়গুলো হতে যখন তদনুরূপ পর্দাটি মানব-মন উঠিয়ে ফেলতে পারে তখনই ঐ সকল আল্লাহর রেজেকে পরিণত হয়। সুতরাং তাগুত ও আল্লাহর রেজেকের মাঝখানে যে প্রভেদ উহা সৃষ্টির কোন বস্তুর মধ্যেই অবস্থান করে না। উহা অবস্থান করে মানুষের মনে। মানুষের এই অবস্থানরূপ মনটির পরিবেশকেই বলা হয় দুনিয়া। ইহাই মানব মনের আমিত্বের আবরণ। এই আবরণ ছিন্ন হয় বলে জাহের ও বাতেন একাকার। সকলই আল্লাহর নিদর্শন তথা আয়াত। সকলই একক অখণ্ড অস্তিত্বের সঙ্গে নূরে মোহাম্মদীর আলোয় একসূত্রে সংযুক্ত। দুই তখন বিদায়। তৌহিদ তখন প্রতিষ্ঠিত। এই পর্যায়ের মানুষের মাঝে তখন দুই সমুদ্র সম্মিলিত। সৃষ্টি ও স্রষ্টা একসূত্রে গাঁথা।

ইসলাম ধনদাস, পুঁজিবাদী তথা বুর্জোয়াদেরকে যতটুকু ঘৃণা এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে ততটুকু ঘৃণা এবং অবজ্ঞা দুনিয়ার আর কোন ইজম করেনি। সেই জন্যই সোনা-রূপার লোভী ধনদাসদের পুতুল পুজা করছে বলে কোরান ঘোষণা করছে। (রূরা ইব্রাহীম ঃ রুকু ৬)।

ইসলাম মাটির পুতুল তৈরি করে দেবতার আসনে পুজো করাটাকে যতটুকু ঘৃণা করেছে ঠিক ততটুকু ঘৃণা করেছে সোনা-রূপার বিশ্রী মোহে পড়ে তারই প্রতি লালায়িত থাকাকে। সোনা-রূপার এই বিশ্রী মোহকে কোরান পুতুল তৈরী করে দেবতার আসনে পুজো করা বলে ঘোষণা করেছে।

এখন প্রশ্ন হল, শুধু কি পুঁজিবাদের উপরই ইসলাম ঘৃণা প্রদর্শন করছে? ইসলাম দরিদ্রতা তথা অভাবকে ঘৃণা করছে। কারণ, এই দারিদ্রতা মানুষকে কুফুরীর দিকে ধাপে ধাপে নামিয়ে ছাড়ে। তাই রসুলাল্লাহ (সঃ) বজ্রকঠিন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, ***'কাদাল ফাকরু আইয়াকুনা কুফরা'*** অর্থাৎ, 'অভাব কাফেরীর কারণ হবার উপক্রম হয়ে দাঁড়ায়।' এর কারণ হল মানুষ যখন নিজেকে একমুঠো ভাতের মুখাপেক্ষী দেখতে পায়, জীবনদীপ চিরতরে নিভে যাবার যে কাতর গোংড়ানির অসহ্য যন্ত্রণা সে তখনই মর্মে মর্মে অনুভব করে যখন অভাবের তাড়না তার কাছে এসে দাঁড়ায়। ছোট ছোট ছেলে-পুলে ক্ষুধার তীব্র যন্ত্রণায় অসহায় আহত পাখির মত ছটফট করে মানুষের পিতার পানে যখন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, যুবতী কন্যার দেহ ছড়ানো লজ্জার আল্পনা যখন এক টুকরো শতছিন্ন শাড়ি আর ঢেকে রাখতে না পেরে মানুষ পিতার কাছে ফরিয়াদ জানায়, মানুষ পিতা তখন হাড় উঠা বুকটা উঁচিয়ে ছুটে দু'মুঠো খাদ্যের জন্য কাজের খোঁজে, কিন্তু সারাটি দিনের অক্লান্ত চেষ্টা করেও যখন দু'মুঠো খাদ্যের যোগাড় করতে পারলো না অথচ পৃথিবীর বুকে রাশি রাশি ধনসম্পদ চারিদিকে ধনদাস আর বুর্জোয়ারা আঁকড়িয়ে ধরে সর্বময় ভোগবিলাসে নিজেদেরকে ডুবিয়ে রেখেছে, ধনদাসদের বিলাসবহুল হোটেলগুলোতে স্তূপীকৃত খাদ্যদ্রব্য পড়ে রয়েছে, কিন্তু মানুষ পিতা তার পুত্র-কন্যার জন্য দু' মুঠো খাদ্য সংগ্রহ করতে পারলো না। তখন মানুষ পিতার পক্ষে স্রষ্টার ঘোষণা 'আমার কাছে সব

সমান' আত্মবিরোধী তথা গোঁজামিল বলে মনে হয় এবং মানুষ পিতা যখন দেখতে পায় ঐ ধনদাসেরা মাথায় টুপী আর তথাকথিত ইসলামের পোশাক পরে তাড়াতাড়ি অজু করে মিলাদ ও ধর্মসভায় যোগ দিয়ে আল্লাহ-রসুলের প্রতি বিগলিত প্রেমের ধারা ছুটায়, তখন সে অবিশ্বাসীর নীতির সোপানে ধাপে ধাপে নেমে পড়ে।

মানুষের সমাজে এই সকল করুণ দৃশ্য অহরহ ফুটে উঠে এবং উঠবে যদি পুঁজিবাদ এবং ধনদাসদের সর্বময় ভোগবিলাসের ক্ষমতা মানুষের সমাজপথ তৈরী করে দেয়। তাই ইসলাম পুঁজিবাদ এবং অভাব তথা দারিদ্র উভয়কে ঘৃণা করেছে। এই দুটোর প্রতিই যখন ইসলাম ঘৃণা প্রদর্শন করেছে তখন স্বাভাবিক ভাবেই মনে করা যায় যে, ইসলাম সাদর আহ্বান জানিয়েছে সাম্যবাদকে। সাম্যবাদ গণসমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই ইসলামের পার্থিব সম্পদবণ্টনের মূলনীতি। মানুষের মানবিক মূল্যকে রক্ষা করতে গিয়ে সাম্যবাদকে মূলনীতিরূপে গ্রহণ করে মানুষের পৃথিবীর যে কোন অংশ যদি প্রতিষ্ঠিত করতে এগিয়ে আসে তবে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, পদদলিত পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ তাদের জানাবে আন্তরিক শ্রদ্ধা আর সালাম এবং একদিন তারা পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী পুঁজিবাদী, ধনদাস আর জমিদারদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দেবে, পাথরের গড়া মেকী প্রাসাদ আর সর্বময় ভোগবিলাস সভ্যতা নয়, সভ্যতা হল মানুষের সমাজে সাম্যবাদ তথা রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর আকুল আহ্বান 'মানুষ মানুষের ভাই'-কে প্রতিষ্ঠিত আদর্শরূপে মানুষের সমাজে প্রতিষ্ঠা করা। কোটি কোটি অবহেলিত মানুষ সেদিন দিবালোকের মত স্পষ্ট বুঝতে পারবে যে, দেড় পয়সা দামের কাঠমোল্লা আর তিন পয়সা দামের পুঁজিবাদীদের কেঁচি কলে যাঁতা খাওয়া পি এইচ ডি ডিগ্রীধারীরা আর কিছুই নয়, তারা ধনদাসের মুখোশ পরে মানবতার সোসিয়াল ওয়েলফেয়ার তথা শিয়ালপণ্ডিতের কাছে কুমিরের ছানাদের বর্ণমালা শিখানোর মানুষ খেকো পি. এইচ. ডি পণ্ডিত।

রসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁর উম্মতের মধ্যে পাঁচ শত বছর আগে বেহেস্তে প্রবেশ করবে বলে যাদের সুসংবাদ জানিয়েছেন তারা কি রকম গরীব ইহার কিছুটা আভাস না দিলে হয়তো বিষয়টা ঘোলাটে হয়ে থাকতে পারে। তারা সেই সমস্ত গরীব যারা পূর্ণ যৌবনেও নফসে আম্মারাকে সম্পূর্ণরূপে আপন কর্তৃত্বের মাঝে রেখে স্রষ্টার নৈকট্য এবং দর্শন লাভের বাসনায় কঠোর সাধনায় সদা লিপ্ত থেকে সর্বদা স্রষ্টার প্রতি তৎগত এবং তৎমুখাপেক্ষী তথা তাকোয়ায় থাকে। সৃষ্টি এবং স্রষ্টার যে গভীর একটি রহস্য লুকিয়ে আছে সেই রহস্যের ঢাকনা খুলতে তারা আপ্রাণ চেষ্টা ও সাধনাতে লিপ্ত থাকে। তারা স্রষ্টার দর্শনকেই জীবনের মূলমন্ত্র করে নিয়েছে। স্রষ্টার রহস্য তারা দেখবে, স্রষ্টার দর্শন এবং স্রষ্টার বিজ্ঞানের অধিকারী তারা হবে, এই মরণপণ নিয়ে সাধনাতে ধ্যানমগ্ন রয়েছে। তাদেরকে স্রষ্টা যতরকম ব্যথা বেদনার জ্বালা দিয়েই পরীক্ষা করুন না কেন তারা তাদের সংকল্পে থাকে অটল। তারা প্রথমে সংসার বিরাগী। তারা আমিত্ব ত্যাগের সাধনায় যোগী। যদিও তারা জানে গৃহ ত্যাগ করলেই বৈরাগ্য হয় না, আমিত্ব তথা অহম তথা খুদী তথা হাস্তী ত্যাগ করতে পারলেই হয় প্রকৃত বৈরাগ্য, তবু তারা রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নির্জন হেরা পাহাড়ের গুহায় একাকী ধ্যানমগ্ন জীবনকে প্রথমে নেয় বরণ করে, নির্জনে একাকী ধ্যানমগ্ন থেকে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের ইশারা তারা হেরা পাহাড়ের গুহা হতে সন্ধান পায়। তাই তারা প্রথমে সংসার বিরাগী। স্রষ্টার দর্শন পেলে স্রষ্টার আদেশেই তারা সংসারে প্রবেশ করে। তাই সংসারে থেকেও তারা যোগী। কর্মে লিপ্ত থেকেও তারা নির্লিপ্ত। তারা তাদের নফসকে সম্পূর্ণরূপে লোভমুক্ত করে সংসারকে তাদের দাস করে নিতে পেরেছে। তারা নিঃশঙ্ক ও মুক্ত। দুনিয়া তাদের পরিত্যক্ত। স্রষ্টার একক অখণ্ড দ্বীনে তাদের বাসস্থান। তাই তারা সংসারের দাস নয়। তারা ধ্যানী ও কর্মবীর। তাই বিশুদ্ধ কর্মযোগে দুনিয়াকে তারা মসজিদ বানিয়ে

নিয়েছে। কর্ম হয়েছে তাদের ধ্যান। আবার ধ্যান হয় কর্মে রূপান্তর। বাতেন হয় জাহেরে আত্মপ্রকাশ। কারণ ইহকাল এবং পরকালের ভেদ তাদের ভেঙ্গে গিয়েছে। এরাই রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর বর্ণিত পাঁচ শত বৎসর আগে বেহেস্তে প্রবেশ করার সুসংবাদপ্রাপ্ত গরীবের দল। এরা তথাকথিত দুনিয়ার বিচরণকারী বানিয়ে-নেওয়া দারিদ্র-পীড়িত গরীব নয়। তথাকথিত বানিয়ে-দেওয়া গরীবদের লক্ষ্য হল যাদের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আছে তাদের সেরকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া হবে না বা পেতে পারে না। আমাদের মত গরীবদের দাবী হল, যাদের আছে তাদের সঙ্গে নিজেদেরও সমান আছে বলে স্বীকৃতি দেওয়া। আমরা 'নাই'- এর লাইনে থাকবো কেন? তাই 'আছে' আর 'নাই' নিয়েই দুনিয়ার প্রায় সকল মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব আর ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। তাই এই 'আছে' আর 'নাই'-এর দ্বন্দ্ব-বৈষম্য আর ঝগড়ার চিরসুন্দর সমাধান ইসলামে দিয়ে রেখেছে সাম্যবাদের মাধ্যমে। সবাই সমানভাবে ভোগ করবে আল্লাহর দেওয়া এই পৃথিবীর সমস্ত ভোগ সম্পদ। তাই কিছু সংখ্যক আছে-ওয়ালাদের যেমন ইসলাম ঘৃণা করেছে তেমনি আবার নাই- ওয়ালা তথা বানিয়ে-দেওয়া গরীবদেরকে ঘৃণা করেছে। কারণ, দুটো পরস্পর বিরোধী নীতির বৈষম্য পৃথিবীর বুকে কখনোই সাধারণ শান্তি দিতে পারে না। এই দুটো শ্রেণীর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম যুগে যুগে মহাকালের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে রাখে বলে ইসলাম ঘোষণা করছে সাম্যবাদ তথা মানুষ একে অপরের ভাই। ইসলামের পার্থিব সম্পদবন্টনের বেলায় কেউ বড়ও নয় কেউ ছোটও নয়। সবাই সমান। উটের পিঠে মানুষ উমর ফারুক শুধু বসে যাবে না। রশি ধরে উট টেনে নিয়ে যাবে যে মানুষ তারও উটের পিঠে বসে যাবার সমান অধিকার আছে। এই গণসাম্যবাদই ইসলামের বজ্রকঠিন কণ্ঠের দৃপ্ত ঘোষণা। তাই ইসলাম পৃথিবীর অভাবী জনসাধারণকে সতর্ক করে দিয়েছে, তোমরা প্রথমে যারা অভাবী নয় তাদেরকে, তোমাদের অভাব ঘুচিয়ে দিয়ে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানাও এবং তাতে যদি সাম্যপ্রতিষ্ঠার সাড়া তাদের কাছ থেকে না পাও তবে জোর করে তোমাদের হক আদায় কর তথা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা কর। কারণ, তারা পৃথিবীর বুকে অভাবী মানুষকে ভাই বলে এক সারিতে দাঁড়াতে চায় না। তাই হে পৃথিবীর অভাবী জনতা, তোমরা জোর প্রতিবাদ কর, কঠিন হস্তে চেপে ধর লৌহ শপথ। সমুচিত শিক্ষা দাও ধনদাস, ধনলোভী আর পুঁজিবাদীদের। প্রতিবাদের রক্তপুস্তক রচনা করে যাও, তবেই প্রতিবাদের প্রতিফল সাম্যবাদ প্রভাতের নবোদিত সূর্যের আলো ছড়ানো মুখমণ্ডল নিয়ে উঁকি দেবে। প্রতিবাদের কাগজ-পুস্তক রচনা করলে সাম্যবাদ শুধু কেঁদেই যাবে। বাস্তব পৃথিবীতে ফল হবে কাঁচকলা।

ইসলাম সতর্ক করে দিচ্ছে, শুধু কলম দিয়ে কাগজের পাতায় ইটের প্রাসাদ বানালেই চলবে না। কারণ, কাগজে আঁকা ইটের প্রাসাদে চোখের ক্ষুধা মেটানো যায় কিন্তু তাতে থাকা যায় না। থাকার প্রাসাদ বানাতে হলে ইট-বালি-সিমেন্ট ইত্যাদি নিয়ে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি দিয়ে সরজমিনে প্রাসাদ বানাতে হবে। না হলে প্রাসাদে থাকা স্বপ্নই থেকে যাবে। বাস্তবে আর তার রূপ নেবে না। ঠিক সেরকম কাগজের বই দিয়ে প্রতিবাদ করে সাম্য আসতে পারে না। কোরান শরীফে আল্লাহ আমাদেরকে যে সর্তক করে দিয়েছেন, আমরা যদি আমাদের জীবনব্যবস্থার পরিবর্তন করতে শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে মানুষের মানবিক শাসন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার তরে এগিয়ে না আসি, সংগ্রাম যদি না করি, জেহাদী মনোবল নিয়ে মানুষের গড়া মেকী বৈষম্যের প্রাচীর লাথি মেরে ভেঙ্গে না দেই তবে আল্লাহ আমাদের জীবনব্যবস্থার কোনই পরিবর্তন করবেন না। আল্লাহকে অপবাদ দেবার সুযোগ আর এখানে রইলো না। আল্লাহ আমাদেরকে পরোক্ষভাবে পাশবিক শক্তিকে সমাজ হতে নির্মূল করার তরে আপন পায়ে দাঁড়াতে বলেছেন। সমাজের মেকী বৈষম্য উচ্ছেদ করে সাম্য প্রতিষ্ঠার আশা আর

কল্পনা নিয়ে বোকার মত হাঁ করে থাকলে বৈষম্যের বিশ্রী কলহের অবসান হবে না। আর আল্লাহও সাম্যবাদ দাওয়াত খাওয়া মিষ্টির বাসনখানা হাতে তুলে দেবেন না। কোরানের তফসীর শুধু কালির আঁকা কাগজে রেখে দিলেই তফসীর হয় না। কোরান তফসীর তখনই হয় যখন মানুষ তার নিজের জীবনটাকে তফসীর করতে পারে।

যখন মানুষ অন্যায়-শোষণ-জুলুমের মূল ভিত্তিগুলোকে কেটে ফেলার তরে জেহাদী মনোবল, জেহাদী ঐক্যের আদর্শে অটুট ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হানবে আঘাতের পর আঘাত। যখন ধনদাসদের নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতিবাদের অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। যখন মানুষ কারবালার হযরত হুসায়েনের আদর্শকে বুকে ধারণ করে শোষক আর শোষণের বিরুদ্ধে বিরামবিহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে, সেদিন পৃথিবীর বোবা ভাষা শোষিতদেরকে বলে দেবে, এরই নাম শোষণের বিরুদ্ধে ইসলামী জেহাদ। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তব প্রতিফলন হল একটি অবশ্য পালনীয় খণ্ড অঙ্গ অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সব কয়টি অঙ্গের মধ্যে একটি অঙ্গ অর্থাৎ পুরোটা নয় তথা অখণ্ড নয়। যদিও ইসলামের মূল দৃষ্টিভঙ্গির দর্শনে বস্তুবাদের স্থানকে অতি তুচ্ছরূপে পরিগণিত করেও তুচ্ছতার মামুলি লেবেল এটি দেয়নি। তার প্রধান কারণ হল, মানুষকে যত উপদেশ আর আদেশই দেওয়া হোক না কেন, মানুষ স্বভাবতই বস্তুবাদের সঙ্গে সাংঘাতিকভাবে জড়িয়ে আছে। বস্তুর মাঝেই মানুষের বিচরণ, স্থিতি এবং অবগাহন। তাই তাহার প্রতি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি প্রদর্শনের উপদেশগুলো প্রায়ই বেকার হয়ে পড়ে। বস্তুর ঊর্ধে বস্তুতে বাস করে চিন্তা করা প্রায় বেশিরভাগ মানুষের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব, তাই ইসলামের দেওয়া বস্তুবণ্টনের সঙ্গে নিজের চিন্তাধারাকে রাঙ্গিয়ে নিতে বলা হয়েছে। একটি উপদেশ চরম এবং অপরটি হল মধ্যম এবং সাধারণটি হল সবার জন্য দলগতভাবে প্রযোজ্য। আসলে সত্যি বলতে কি ইসলামের দর্শন এসবের অনেক ঊর্ধ্বে। মানুষ কি করে স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করতে পারে এবং এই নৈকট্য লাভই হল চরম পাওয়া এবং ইহাই ইসলাম। এই নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তাদের চিন্তাধারা ধরে বস্তুবাদের চিন্তা এমনভাবে অবহেলিত হয়েছে যে, উহার অনেকে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পীর-অলীদের জীবনী পড়লে জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়। কারণ, বস্তুর ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে মানুষ এত উৎসাহ আর উদ্দীপনা প্রদর্শন করে যে, শত উপদেশের মাঝেও উহার গতি কলুষতার দিকে গড়িয়ে যেতে চায় জলের ধর্মের মত। প্রবৃত্তির ধর্ম আর জলের ধর্ম প্রায় একই ধারার মত, যদিও দৃশ্যত দুইটি পৃথক মনে হয়ে। বস্তুর প্রাচুর্যতায় প্রবৃত্তির বন্ধনগুলো দৃঢ়তা প্রকাশ করে এবং ইহা নানারকম সামাজিক রোগের জন্ম দেয়। সেই রোগগুলোর কয়টির নাম হলো স্বার্থপরতা, আমিত্বের দৃঢ়তা প্রকাশ, অহঙ্কার, তুচ্ছজ্ঞান করার পাশবিক প্রবৃত্তি, শোষিত মানুষের ফরিয়াদে পাথরের মত চরিত্রের কঠিনতা প্রকাশ পাওয়া, প্রতারণার চালবাজি উদ্ভব, অপরকে কি করে ঠেকানো যায় তার চিন্তা মনে মনে তৈরী করা। বন্যশক্তির প্রচণ্ড ঝড়ে কোমলতার গাছগুলো ভেঙ্গে পড়া ইত্যাদি যত রকম ভাষার গাঁথুনিতে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া হোক না কেন তবু প্রবৃত্তির চাওয়ার শেষ হয় না। অনেকে মৃত্যুশয্যায় অবধারিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও 'আরো চাই, আরো যদি হত' এই আক্ষেপ আর হতাশা নিয়ে পৃথিবীর থেকে নেয় চিরবিদায়; যে চাওয়া চাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েও চাওয়ার হাজার জিহ্বাগুলো লক লক করে গজিয়ে উঠে এবং মৃত্যুই ইহার উপসংহার টেনে দেয় আপসোসের ভাষায়। ইহাকেই কোরান হাবিয়াতে স্থিতিলাভ করবে বলেছে। কারণ, হাবিয়ার বৈশিষ্ট্য হল যে, এই জাহান্নামের তলা নেই অর্থাৎ ফেলে দিলে কেবল পড়তেই থাকবে। তলাতে অবশেষে আশ্রয় নিতে পারে না। কারণ, ইহার তলা থাকলে তো তলায় আশ্রয় নেবে। চাওয়ার যেমন তলা থাকে না, হাবিয়ারও তেমন তলা নেই। আক্ষেপের

আর্তনাদের নাম রাখা হয়েছে ওয়াইল নামক জাহান্নাম। জাহান্নাম বাহিরে আছে কিনা জানি না, তবে থাকলেও থাকতে পারে। তবে জাহান্নাম যে আমাদের অভ্যন্তরে অবস্থান লাভ করছে ইহাতে কি এ বর্ণনা দেবার পরও প্রশ্ন করার মত কিছু থাকতে পারে? জাহান্নামের আগুন দেখতে কেমন? জাহান্নামের আগুন কি কি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়? জাহান্নামের আগুন কি তা কি তোমরা জান? জাহান্নামের আগুন এমনই এক আজব আগুন যা সাধারণ আগুনের মত ঘর-বাড়ি জ্বালায় না, কাপড়-চোপড়, পোশাক-পরিচ্ছদ জ্বালায় না, এমনকি মানুষের দেহটিকেও জাহান্নামের আগুন জ্বালায় না বা জ্বালাতে পারে না। জাহান্নামের আগুন কেবলমাত্র একটি জিনিস জ্বালায় এবং জ্বালাতে পছন্দ করে আর সেটিই হল মানুষের অন্তর। অন্তরের জ্বালার দহনের তীব্রতা কত ভয়াবহ, কত মারাত্মক, কত বেদনাদায়ক এবং কত প্রচণ্ডরূপ নিতে পারে তা সমাজ জীবনে আমরা অহরহ দেখতে পাই। এই অন্তরের প্রচণ্ড দহনে মানুষ কতটুকু দিশেহারা হলে নিজেকে নিজে খুন করে ফেলে, যাকে বলা হয় আত্মহত্যা। পৃথিবীর বড়বড় প্রাচুর্যতার দেশের বড়বড় ধনীরা, যাদের বৈষয়িক অভাব-অনটনের প্রশ্নই উঠে না, তবু কোন দহনে কোন জ্বালায় আত্মহত্যা করে। এই অন্তর্জ্বালার বোবা দহনে কত মানুষকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পাগলা গারদে যেতে হয় তার রিপোর্ট পেশ করতে গেলে এদের সংখ্যা হবে ভয়াবহরূপে অনেক। এই আগুনের দাহ কিন্তু বাহির হতে কিছুই বুঝা যায় না। দেখলে মনেই হবে না যে এর ভেতর দহনের প্রচন্ড জ্বালা দাউ দাউ করে জ্বলছে বোবার মত।

শরীয়ত ও মারেফতের মধ্যে প্রভেদ

শরিয়ত সমাজকেন্দ্রিক, কিন্তু মারেফত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। বিজ্ঞান শিক্ষা সমাজকেন্দ্রিক, কিন্তু বিজ্ঞানী হওয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক। বিজ্ঞানের বড় বড় ডিগ্রী নিলেই যেমন বিজ্ঞানী হওয়া যায় না, সেরকম শরিয়ত-মারেফতের উপর পড়াশুনা করলেই অথবা বড় বড় ডিগ্রী নিলেই মারেফতের অধিকারী অলী-দরবেশ, পীর-ফকির হওয়া যায় না। বিজ্ঞানী হবার যেমন কোন প্রকার শর্ত থাকে না, সেরমকম আল্লাহর অলী হবার মধ্যে কোন শর্ত নেই। সেজন্য কোরান পাকের সমস্ত কথা আর আইনের ধারাবিবরণী বর্ণনা করতে গিয়েও মাঝে মাঝে পাঠকদের চমকে যেতে হয় একটি আয়াত পাঠ করে। সেই আয়াতটি হল ***'ইউতিহু মা ইয়াশাউ'*** অর্থাৎ দান করা হয় যাকে খুশি তাকেই। আল্লাহর রহমতের রহিমরূপী দান তিনি যাকে খুশি তাকেই দান করেন এবং এই বিশেষ দানের প্রশ্নে কোন প্রকার ধরা-বাঁধা আইন ও শরিয়ত নেই। বিদ্যার কচকচানির বাহার থাকতে পারে এবং এই বিদ্যার বাহার দেখে অনেককেই অলী-দরবেশ বলে সমাজে ভুল করা হয়েছে এবং এখনো করা হচ্ছে, অলী-দরবেশ হবার রহমত আল্লাহর এমন একটি দান যার মধ্যে কোন প্রকার নিয়মের বালাই নেই। তাই কোরানের ভাষাটি হল, যাকে খুশি তাকেই দান করা হয়। পীর-ফকির হবার রহমত বিদ্যা অর্জন-বিবর্জনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় না। তা হলে প্রত্যেক নবীকে মাদ্রাসায় পাশ করিয়ে নবী হবার শর্তটি জুড়ে দেওয়া হত। তা হলে কোরানকে ঘোষণা করতে হত না যে, প্রতিটি নবীই হলেন উম্মী তথা নিরক্ষর। যারা কোরানের *তফসীরে জালালাইন* এবং হাদীস-ফেকা একজন পীর-অলীকে 'অবশ্যই জানতে হবে' শর্তটি জুড়ে দিয়েছেন তাদের পীর-অলীরা আসল পীর-অলী নয়। তারা হলেন ওস্তাদ মার্কা পীর-

অলী। এরকম ওস্তাদ মার্কা পীর-অলী বাজারের যেখানে, সেখানে হর-হামেশা পাওয়া যায়। আসলে এরা অহাবী মতবাদের গুপ্তচর বললেই ভাল মানায়। আহলে সুন্নাতুল জামাতের ভেতর গুপ্তচরের মত গোপনে প্রবেশ করে আহলে সুন্নাতুল জামাতের দর্শনকে হালকা ও খেলো করে দেবার একটি প্রচেষ্টা বলা যায়। তবে এদের আসল চেহারা ও রূপ ধরা পড়ে যেতে আর বেশি বাকী নেই। কারণ, ঢাকা ও চট্টগ্রামে আহলে সুন্নাতুল জামাতের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তবে সংখ্যায় অতি নগণ্য।

আল্লাহর পীর-অলীরা যেহেতু আল্লাহর বিশেষ রহমতপ্রাপ্ত রহীমরূপী দান করেন এবং এই দানের যেহেতু কোন শর্ত নেই, যেহেতু এই দান আল্লাহ যাহাকে খুশী তাহাকেই করেন সেই হেতু আল্লাহর পীর-অলীরা আমাদের মত দশের মধ্যে একজন নন। তাঁরা হলেন আমাদের মত দশের বাহিরে সম্পূর্ণ আলাদা এগারো। সেরকম বিজ্ঞানের বেলাতেও ঐ একই কথা খাটে। এডিসন, আইনস্টাইন আর বিয়ার্ড বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও তারা দশের বাহিরে এগারো। কারণ, পৃথিবীর কথা বাদই দিলাম আমাদের অতিক্ষুদ্র বাংলাদেশেই বিজ্ঞানের ছাত্র অনেক আছে, কিন্তু বিজ্ঞানী কয়জন পাওয়া যায়।

রূপ-দর্শনে বিভিন্নতা থাকবেই। কারণ, রূপ মূলে এক হলেও স্তরভেদে অনেক। এক এক রূপের স্তরে এক-একজন অবস্থান করার দরুন ভাবের বিভিন্নতা লাভ করা অতি সাধারণ কথা, কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যেই মারেফতপন্থীরা অনেক সময় খেই হারিয়ে ফেলে এবং ভাবের ভাষাগুলোর মধ্যে এমন তালগোল পাকিয়ে ফেলে যে এর গোলকধাঁধা হতে বেরিয়ে আসা অনেকের পক্ষে হয়ে পড়ে কষ্টকর এবং ইহাও নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ, মানুষের স্বভাবও অনেকটা তাই। একটু ভাব যদি তার ,নোমত পছন্দ হয়ে যায় তবে আর যত সুন্দর ভাবই হোক না কেন অথবা তার ভাব হতে অনেক উঁচুস্তরের ভাবই হোক না কেন, উহা গ্রহণ করা অথবা উহা কেমন সেই প্রশ্ন এবং উত্তর খোঁজার আগ্রহটুকুও অনেক সময় দেখা যায় না। কারণ, তার ভাবের একটা মিলানো হিসাবের অঙ্ক অনেক আগেই করে রাখা হয়েছে এবং সেই হিসাবের অঙ্কটি বাদ দিয়ে আর একটি হিসাবের নতুন অঙ্ক করতে ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রায় লোকেরই থাকে না। বরং সেই নতুন উন্নতমানের হিসাবের অঙ্ককে ভুল প্রমাণিত করার জন্য উঠে-পড়ে লেগে যায় এবং এরই ফলে তৈরী হয় নিজেদের মধ্যে মতভেদ এবং এই মতভেদ অবশেষে জন্ম দিয়ে ফেলে মনের অজান্তে বিভিন্ন দল। ইহা এক ধরণের নোংরামি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, এই নোংরামিটাকেই প্রচার করা হয় সার্বজনীনতার নামে। উনারা কত বড় সার্বজনীন উহা ইনাদের ভেতরে ঢুকলেই দেখতে পাবেন নোংরামির দুর্গন্ধ। এরা অনেক সময় এমন ভয়ঙ্কর স্পর্ধা করে থাকে যে, তাদের হিসাবের অঙ্কটিতে যদি কোরান-হাদীসের বাণীগুলোর সঙ্গে অমিল দেখা দেয় তখন মহাচিন্তায় পড়ে যায়। হিসাব মিলানোর জন্য চলে গোঁজামিল। গোঁজামিল যাতে ধরা না পড়ে তার জন্য কতরকমের যে ব্যাকরণের মার প্যাঁচের দোহাই দেওয়া হয় তা দেখলেই আপনি রীতিমত হিমশিম খেয়ে যাবেন। যদি ব্যাকরণেও মিলাতে না পারে তা হলেও রেহাই নেই। হিসাব তার মিলাতেই হবে। তাই কোরানে উল্লেখিত কোরান শব্দটি কোরান অর্থে না ধরে সালাত অর্থ করতে হবে। কি চমৎকার আবিষ্কার। কোরানকে বুঝতে হবে সালাত। পানিকে দুধ মনে করার মত। না হলে উনাদের হিসাব মিলে না। পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চের সব স্থানে সব বিদ্যায় মনে হয় এরকম হিসাবের বাহার কম-বেশি দেখা যায়। কোরানের হিসাব মিলাতে গিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় একান্ত বাধ্য হয়ে। কারণ, কোরানকে তো গালাগালি দেবার কোন উপায় নেই। কিন্তু যত গালাগালি হজম করতে হয় হাদীসের। হাদীস বেচারাকে যে কত প্রকার কুৎসিত গালাগালি সহ্য করতে হয় তা বোধ হয় অনেকেরই জানার কথা। হিসাবের অঙ্কে হাদীসটি না মিললে

আর যায় কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা হাদীস বলে মন্তব্য করে হাদীসের গালে এক চড় বসিয়ে দেয়। হায়রে বিদ্যার কচকচানি। একবার ভুলেও বলতে শিখেনি যে, আমি এই হাদিসটি বুঝতে পারিনি অথবা এই হাদীসটি অতি সাধারণের অবগতির জন্য বলা হয়েছে। কারণ, ইনারা তো বিদ্যার সাগর। পচা ডোবা মার্কা হাদীস উনাদের বিদ্যার সাগরকে বানচাল করে দেবে। সবার জন্য যেখানে নীতির প্রয়োগ থাকবে সেখানে ভাবের এবং ভাষার উঁচু-নীচু এবং রূপকতার মাধ্যম নিতে হবেই। ইনারা সার্বজনীনতার নামে দুর্গন্ধ বমি লিখনি প্রকাশ করে যে খানে দজ্জালও বোধ হয় চমকে যায়। হাদীসবেত্তা, রসুলে পাকের এক অতি উঁচু মহান সাহাবী, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর উপর অনেক হিসাব মিলানো লেখকেরা সাংঘতিকভাবে ক্ষেপে গেছেন। এক লেখক তো রাগে গরগর করে 'কাজির গরু কেতাবে আছে'-র মত বিরাট এক গবেষণার ঐতিহাসিক মার্কা ফল বা রেজাল্ট জনতাকে উপহার দিলেন। কেতাবের হিসাব এতই নিখুঁত যে, গরু কয়টি অবশ্যই থাকার কথা। কিন্তু গোয়াল ঘরে গেলে আর হিসাব মিলে না। উনি হিসাব করে অপূর্ব গবেষণার বমি জনতাকে উপহার দিয়ে জান্নাতবাসী হয়েছেন। উনার হিসাবখানার চেহারা তুলে দিতে বাধ্য হলাম। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) মোট ঊনষাট বছর জীবিত ছিলেন। অবশ্য উনার মতে, রসুলে পাকের ইন্তেকালের পর উনি একান্ন বছর জীবিত ছিলেন এবং রসুলে পাকের সঙ্গে ছিলেন মাত্র তিন বছর। সুতরাং উনার হিসাব অনুযায়ী একান্ন এবং তিন বছর বাদ দিলে মাত্র ছয় বছরের বালকরূপে রসুলে পাকের সঙ্গে ছিলেন। কি অপূর্ব অঙ্কের হিসাব। ময়লা খাওয়া আস্ত পাগলও এ কথা শুনলে হি হি করে হাসবে। হযরত আবু হোরায়রার উপর মুসলমান নামধারী দুইটি দলের প্রচণ্ড গোস্বা। প্রথম দলটির নাম অহাবী এবং দ্বিতীয় দলটির নাম হল শিয়া। এর কারণটি কিন্তু খুবই সুন্দর। অহাবীদের গোস্বা হল যত আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রায় হাদীসই তাঁর মাধ্যমে পাওয়া গেছে। কারণ, অহাবীরা আধ্যাত্মবাদকে অস্বীকার তো করেনই এবং প্রচণ্ড ঘৃণাও করেন। আর শিয়াদের গোস্বা হবার কারণ হল আর একটি। সেটি হল হযরত আবু হোরায়রার মাধ্যমে সেই সব সাহাবাদের মর্যাদার কথা জানতে পারি যাদের মর্যাদার কথা শুনলে শিয়াদের শরীরে ভাল্লুকের জ্বর আসে। শিয়ারা এমনই অদ্ভুত হিংসুটে যে বিদ্যার প্রশ্নে ইনারা অনেকটা সর্বজ্ঞানী হরিদাস পালের মত। ইনারা ইসলামের বিস্ময় আমীরুল মোমিনীন খলিফা উমর ফারুকের উপর যা-তা মন্তব্য করতেও জিহ্বা কেঁপে উঠে না। শিয়াদের সবচাইতে বড় শত্রু হল খলিফা উমর ফারুক। হায়রে বিদ্যার কচকচানি। কত বড় জাননেওয়ালাদের দল! উমরকে গালাগালি দিয়ে আলীকে উঁচুতে উঠানোর চমৎকার ফন্দি। আসলে আলীকে খাটো করার সূক্ষ্ম কু-মতলব। আলী জাহেরী সুরতে জীবিত থাকলে এসব বিদ্বানদের ভুল ঝুঝিয়ে দিতেন। এরা প্রশংসার চাতুর্যে আলীকে ডুবিয়ে দেবার নতুন ফন্দি আবিষ্কার করেছেন। অনেকটা গণচীনের লীন পিয়াওর মত। প্রশংসার মধ্য দিয়ে মাওকে ডুবিয়ে দাও। লিন পিয়াওর দর্শনটি এত বেশি নতুনত্ব বহন করে যে পৃথিবীর প্রায় দার্শনিকেরা অবাক হয়েছেন। দর্শনের ভাষাটি কত ছোট এবং চাতুর্যতার রহস্যে কত বড় ব্যাপকতায় পরিপূর্ণ। বুঝাই যায় না বাক্যটি কত মারাত্মক অস্ত্র। ধীরগতিতে মধুতে স্লো পয়জন মিশিয়ে মেরে ফেলার মিষ্টি অস্ত্র। স্বয়ং মাও সেতুং তো দূরের কথা গণচীনের প্রায় লোকেরাই এই দর্শনটির গভীরতা বুঝতে পারেনি, যদি না লিন পিয়াওর মেয়ে এসব দর্শনের গোমর ফাঁক করে দিতেন। শিয়ারা সেই লিন পিয়াওর থিওরী গ্রহণ করেছেন। এই শিয়ারা জঘন্য ভাষায় হযরত আবু বকর, উমর এবং উসমানকে যে সব অকথ্য গালাগালি দিয়ে যায় তা শুনলে মানুষ তো দূরের কথা পশুরাও এদের দেখতে পারে না। শিয়াদের দুই চোখের বিষ হলেন আবু হোরায়রা। শিয়ারা আবু হোরায়রার অনেক

হাদীস হাসিমুখে গ্রহণ করেন কিন্তু মাওলা আলী বাদে অন্য তিন খফিলার মর্যাদার হাদীসগুলো গ্রহণ করতে রাজি থাকা তো দূরের কথা কল্পনা করাটাও পাপ মনে করেন।

কেবল ধর্ম-দর্শনের প্রশ্নেই চিন্তাধারার একটা মিলানো হিসাবের অঙ্কটি একতরফাভাবে চাপিয়ে দিয়ে বাহবা কুড়ালে কিন্তু অন্যায় হবে। যে কোন ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ঐতিহাসিক তথা রাজনৈতিক ভাষ্য তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ে মিলানো হিসাবের অঙ্কটির আগমন অবশ্যই পাবেন। আত্মবিরোধের ঝুড়ি বলেও যদি আপনি অন্যের মিলানো হিসাবের অঙ্কটিকে গাল দেন অথবা বুঝিয়ে দেন তবু সে তা মেনে নেবে না এবং এক কথায় সবাই মানতে চাইবে না। এদের সবাইকে গালে চড় মেরে বুঝিয়ে দিতে পারে মাত্র দুটো বিষয়। একটি হল বিজ্ঞান এবং ইহাই সর্বপ্রধান এবং অপরটি হল মারেফতের গোপন জ্ঞান অর্জনকারী পীর-ফকিরেরা। কিন্তু এঁদের প্রভাবটা সবার উপর ছায়াপাত করতে চাইলেও গ্রহণ করার সাহস থাকে হাতে গোণা কিছু লোকের মধ্যে। কারণ, এরা মাছ ধরার আগ্রহ দেখায়, কিন্তু যদি মাছ না ধরা যায় অথবা না পাওয়া যায় তার জন্য পানিতে নামতে চায় না। ফটকা বাজারের মাল কেনা-বেচার মত এরা পীর-ফকিরদের বিশ্বাস করে। আকাঙ্ক্ষিত কিছু না পেলে সার্বজনীন একটি বিশেষণ জুড়িয়ে দিতে কার্পণ্য করে না আর সেই বিশেষ বিশেষণটির নাম হল ভণ্ড তথা অণ্ডতে ভ নেই তথা ডিমটি ভাঙলে কিছু পাবেন না। দেখতে আপনি ডিম কিন্তু ভেতরে কিছু নাই। মানে আপনি তখন ভণ্ড অমুক ভণ্ড তমুক। একটু যদি তলিয়ে দেখি তবে কি এই পৃথিবীতেই বাস করা মানুষগুলোর বেশীরভাগই সেরকম ডিম নয়, যাদের ভাঙবার সাহস নেই। আমি অধম লেখক সাহেব যে একেবারে তুলসীপাতা ধোয়া জল সেটা কুক্ষণেও বলতে চাই না, তবে হিসাব মিলানো একটি অঙ্কের ডিম যে এতে কি সন্দেহ আছে? আর সেই ডিমটি না ভাঙ্গার অনুরোধ রইলো। কারণ, কি যে পাবেন তা তো বুঝাই যায়।

খৃষ্টান ধর্মের অনুসারীদের মাঝে ধর্ম-দর্শনের বেশ কয়টি অঙ্ক আছে। একটি অঙ্কের যোগফল হল যত নবী-রসুল এসেছেন তাদের মধ্যে যীশু তথা ঈসা নবী হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবাইকে বাদ দিয়ে একমাত্র তাকেই মেনে নিতে হবে এবং ইহার অন্যথা হলে পাপ হবে। এখন যিনি খৃষ্টানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সেই জন্মসূত্রে পাওয়া মতবাদই গ্রহণ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সাধারণ কথা। অন্য ধর্মের বিচার বিশ্লেষণ করতে গেলেও নিজের হিসাবের মিলানো অঙ্কটি কিন্তু ‘মন মে শেখ ফরিদ বগল মে ইট’ এর মত বহাল তবিয়তে থাকতেই হবে। আপনি ইহুদি, বৌদ্ধ, হিন্দু অথবা মুসলমান বলে খৃষ্টানদের উপর লিখিত কথা কয়টি পড়ে দাঁত বার করতে চাইবেন অথবা মুচকি হাসতে চাইবেন, কিন্তু ভুলেও এমন মহান কাজটি করে বসবেন না। কারণ, আমাদের এই মুচকি হাসাহাসির মধ্যে সত্য নামক মহাপুরুষটিকে ধরতে ভীষণ কষ্ট হয়, বিশেষ করে এ বিংশ শতাব্দীর যুগে এই ভীষণ কষ্টের সুযোগটিকে কোলে তুলে নিল একমাত্র ধূর্ত শিয়াল পণ্ডিত। সেই ধূর্ত শিয়ালের অপর নামই হল কমিউনিজম, যাকে আমরা বলি মানুষকে জানোয়ার বানানোর সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। আমরা লাফালাফি করে ধর্মে পরীক্ষার পানিকে এমনই ঘোলা করে ফেলেছি যে, জানোয়ার বানাবার বিদ্যা কমিউনিজম ইনটেলেকচুয়াল মানুষগুলোকে ধরে জানোয়ারের পোশাক পরিয়ে দিচ্ছে, আর তারই পরিণতি এই বিংশশতাব্দী। একটি কথা এই অধম লেখক ঘোষণা করতে চায় আর সেটা হল, কমিউনিজম আজ হয়তো নতুন পোশাকের ফ্যাশনের মত লোভনীয়, কিন্তু ছুঁড়ে ফেলে দিতে বেশি সময় লাগবে না। কারণ, একটি ইতিহাস তৈরী হতে সময়ের প্রয়োজন এবং সময়ই একদিন এর অসারতার গোমর ফাঁক করে দেবেই। কারণ কমিউনিজমের ভেতর অভ্যন্তরীণ কোন সত্য নেই এবং এই নেইটার ধরা পড়তে সময়ের ইতিহাস একদিন জানিয়ে দেবে সবাইকে।

পীর-ফকিরদের দর্শনজনিত প্রভেদ

আমাদের ধর্ম-দর্শনের মধ্যে যারা মারেফতপন্থী তাদের মাঝেও আপনি অনেক প্রকার অঙ্কের মিলানো হিসাব অবশ্যই পাবেন। যেমন ধরুন, মারেফতপন্থীদের মধ্যে একটা অতি সাধারণ অঙ্কের মিলানো হিসাব দেখতে পাই। একদল মারেফতপন্থীরা গান-বাদ্যকে ইবাদতের একটি বিশেষ মাধ্যম হিসাবে তাদের হিসাবের অঙ্কে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে। যেমন ধরুন চিশতীয়া তরিকার বেশিরভাগই, তবে সবাই নয়। অনেক চিশতীয়া তরিকার অনুসারীরা গান বাদ্যকে তাদের হিসাবের অঙ্কে অপছন্দ করেন এবং ইহাকে গ্রহণযোগ্য নয় বলে ঘোষণা করেছেন। অথচ চিশতীয়া তরিকা বলতেই সঙ্গীতের মাধুর্যের খসবু পাবার কথা। বাংলাদেশে এবং এর বাইরে অনেক চিশতীয়া তরিকার অনুসারী পাবেন যারা গান-বাদ্যকে মোটেই পছন্দ করেন না। আবার যে তরিকায় গান-বাদ্যের প্রশ্নটি অবান্তর করে রাখা হয়েছে সেই সব তরিকার অনেক অনুসারী পাবেন যারা গান বাদ্যকে ইবাদতের একটি সর্বপ্রধান অঙ্গরূপে মনে করেন। যেমন ধরুন, বিখ্যাত সুরেশ্বরের ওরশে গেলেই বুঝতে পারবেন যে তারা নকশেবন্দীয়া এবং মুজাদ্দেদীয়া তরিকার অনুসারী হয়েও গান-বাদ্যকে ইবাদতের একটি অংশরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। অধম লেখকের জানামতে পৃথিবীতে যত ওরশ পালন করা হয় তার মধ্যে সুরেশ্বরের ওরশটিতে পাবেন একটি আশ্চর্য রকম ব্যতিক্রম, আর সেটি হল অবাক করে দেওয়া পাঁচটি অপূর্ব খুব বড় বড় অতি পুরাতন কারুকার্য খচিত আশা, যাকে আমরা লাঠি বলি। সেই লাঠিগুলোর পা হতে মাথা পর্যন্ত বিভিন্ন ধাতুতে তৈরী অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যে পরিপূর্ণ এবং প্রধান ওরশের দিনে মাগরিবের আজানের পর পরই বের করা হয়। এত লম্বা এত অদ্ভুত সুন্দর পাঁচটি আশা তথা লাঠি আমার জীবনেও দেখিনি। আজমীরে খাজাবাবার মাজারে দুইটি আশা দেখার ভাগ্য আমার হয়েছে, কিন্তু লম্বায় এবং কারুকার্যের মহিমায় এই পাঁচটির সঙ্গে জাগতিক দৃষ্টির মাপকাঠিতে তুলনা হয় কিনা উহা চোখে দেখলেই পাঠক পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।

সুরেশ্বরের আদি পীর যিনি, তিনি হলেন বাবা জান শরীফ। অবশ্য এই নাম তাঁর পীর সাহেব দিয়েছেন। উনার আসল নাম হল হযরত আমদ আলী। উনার পীর সাহেব কলিকাতার মানিকতলার বিখ্যাত হযরত সুফি ফতে আলী শাহ। হযরত সুফি ফতেহ আলী শাহ সাহেবের অনেক খলিফা ছিলেন। তার মধ্যে অপর দুজন বিখ্যাত খলিফার নাম উল্লেখ করলাম। একজন হলেন ফুরফুরা শরীফের হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক এবং অপরজন হলেন পাবনার এনায়েতপুরের হযরত মাওলানা ওয়াজেদ আলী শাহ। হযরত ওয়াজেদ আলী শাহ-এর খলিফা হযরত ইউনুস শাহ সাহেব এবং উনার দু জন বিখ্যাত খলিফাদের মধ্যে একজন হলেন আটরশীর পীর সাহেব এবং চন্দ্র পাড়ার পীর সাহেব। এতগুলো কথা বলার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে বলেই বলতে হল। আর সেই বিশেষ উদ্দেশ্যটি হল, এঁদের ওরশে অথবা এঁদের যে কোন মাহফিলে গান-বাদ্য করা হয় না এবং গান-বাদ্যকে ইনারা ইবাদতের একটি বিশেষ অঙ্গ বলে হয়তো মেনে নেন না অথবা জায়েজ তথা বৈধ বলে হয়তো গণ্য করেন না। অথচ একই তরিকার একই পীরের মুরীদ হয়েও বাবা জান শরীফ শাহ সাহেব গান-বাদ্যকে খুবই পছন্দ করতেন। যার দরুন অনেক আরবী ভাষা জানা পণ্ডিতেরা সব পীর সাহেবদের সমালোচনা করলেও সুরেশ্বরের ওরশের কথা শুনলে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেন। এখানে বিশেষ করে বাংলাদেশে অনেক আরবীজানা পণ্ডিতেরা গান-বাদ্যকে হারাম মনে করেন এবং যারা গান-বাদ্য করেন অথবা শোনেন তাদের বিবি তালাক হয়ে যাবার ফতোয়াও মাঝে মধ্যে শোনা যায়

এবং এই বিশেষ বিষয়টি নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্কযুদ্ধ অনেক হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। জানি না কালের ইতিহাস একদিন 'ইংরেজী পড়া হারাম', 'ফটো তোলা হারাম', 'মাইকে কোরান পড়া হারাম' এরকম ফতোয়ার মত পুরাতন ফতোয়া হয়ে যায় কিনা। 'ইহা হারাম' বলা এবং 'ইহা পছন্দ করি না' বলার মাঝে কিন্তু বিরাট পার্থক্য থেকে যায়। পছন্দ হয় না তাই করিনা বলার মাঝেও একটি নমনীয় ভাব থেকে যায়, কিন্তু একদম হারাম বলার মাঝে থাকে কঠিন নিষ্ঠুরতা। কারণ, সমস্ত কোরানের মধ্যে গান-বাদ্যের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলা হয়নি। পক্ষ এবং বিপক্ষের কিছু হাদীসের দ্বারা কি এরকম কঠিন হয়ে যাওয়া মানায়? হয়তো এমনো তো হতে পারে যে, রেডিও, টেপ, টেলিভিশন আর ভি সি আর-এর যুগে বসে আপনার প্রিয় ছেলে-মেয়েরা আপনার ফতোয়া শুনে চুপ করে নাও থাকতে পারে।

একটা সুন্দর কথার প্রচলন আছে। সে কথাটি হল, যে গাছে ফল ধরে সে গাছেই বাচ্চারা ঢিল ছুঁড়ে আর যে গাছে ফল ধরে না সে গাছ যত সুন্দরই হোক না কেন বাচ্চারা ঢিল ছুঁড়ে না। আটরশির পীর সাহবের নাম খুব বেশি হয়েছে এবং ভক্তের সংখ্যাও বেশি এবং এত বড় আকারের ওরশ বোধহয় বাংলাদেশে তো দূরের কথা এক আজমীর ছাড়া আর পৃথিবীর কোথাও হয় কিনা অধম লিখকের জানা নেই। তাই কিছু বাচ্চামার্কা আরবী জানা পণ্ডিতদের গোস্বাটা আটরশির পীর সাহেবের উপর একটু বেশি। তারা অনেক ধরনের ঢিল ছুঁড়তে শুরু করেছেন অনেক আগেই। অনেকে আবার নুতন ধরনের একটি গালি আবিষ্কার করেছেন। অথচ সেই আবিষ্কারের অসারতা যে কত খেলো ধরনের! আর সেটি হল যে, আটরশির পীর সাহেব অনেক জ্বীন পালন করেন। যদি অধম লিখক প্রশ্ন করে যে, ধরে নিলাম আট রশির পীর সাহেব জ্বীন পালন করেন, তাহলে কি এমন দোষটা তিনি করে ফেললেন। যদি বলি যে হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) অনেক জ্বীন পালতেন এবং এই বিষয়টি সবারই জানা থাকার কথা। তাহলে এত বড় বড় দুইজন নবীর জ্বীন পালন করার বিষয়টি হাসিমুখে মেনে নিতে পারছেন আর আটরশির পীর সাহেবের বেলায় যত গোস্বা আর অপবাদ। আটরশির পীর সাহেবকে পছন্দ হয় না ভাল কথা, তাই বলে কি তার নামে মিথ্যা অপবাদ ছড়ানো উচিত মনে করেন। আপনার মিলানো হিসাবের অঙ্কটিতে আটরশির পীর সাহেবকে মিলাতে কষ্ট হচ্ছে বলে বুঝি যা-তা মন্তব্য করে বসবেন? পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে যারা নিজের ভাল ছাড়া আর কারো ভালোটা দেখতে পারে না। আপনি একটু লক্ষ করলে এরকম মানুষ অনেক পাবেন। অধম লিখকের গ্রামে বাস করেন একজন ভদ্রলোক। আমি তাকে জীবনেও কাউকে ভাল বলতে শুনিনি। খুব লক্ষ্য করে কৌতুহল নিয়ে বসে বসে তার কথা শুনতাম। অনেক সময় শরীর রি রি করে উঠতো। একদিন সহ্য করতে না পেরে বলেই ফেললাম, আপনার চোখে কি ভাল মানুষ ধরা পড়েনি? সোজা উত্তরটি হল, হ্যাঁ ধরা পড়েছে মাত্র একজন, আর সেটা হল আমি নিজে। পরে জানতে পারলাম উনার এক নিকট আত্মীয়ের জমি জাল দলিল করে উনি হজম করে ফেলেছেন এবং সেই আত্মীয় লজ্জায় আর আদালতের দরজায় পা রাখেননি। তাই বলতে ইচ্ছে করে, ভবের নাট্যশালায় মানুষ চেনা যত সহজ তত সহজ নিজেকে চেনা নয়। বাক্যটি যদি এরকম হত, 'ভবের নাট্যশালায় নিজেকে চেনা দায়'রে তাহলে কেমন হত?

আপনাদেরকে একটি মজার খবর শুনাতে চাই। অনেকেই হয়তো জানেন এবং বলতেও শুনেছেন যে, মানুষের দ্বারা রচিত হয়েছে আর একটি কোরান। আল্লাহর বাণী কোরানের নাম সবাই জানেন, কিন্তু মানুষের রচিত কোরানের নামটি কিন্তু সবাই একবাক্যে মেনে নিয়েছেন এবং বিশেষ করে আহলে সুন্নাতুল জামাতের মুসলমানরা। আর দুনিয়ার প্রায় বারআনি মুসলমানই হল সুন্নি জামাতের আর বাকি

বাহাত্তর ফেরকায় মিলেও চার আনি হয় কিনা সন্দেহ। সেই মানুষটির নাম হল মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী, আর সেই স্বরচিত কোরানের নাম হল *মসনভী শরীফ*। তিনি নিজেই মসনভী শরীফকে বলেছেন ফার্সী ভাষায় রচিত কোরান, *হাস্তে কোরান দার জোবানে পহলভী*। মজার বিষয়টি হল, সবাই এক বাক্যে এই কথা মেনে নিয়েছেন। রেয়ন্ড. এ. নিকলসন সাহেব মসনভী শরীফের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন কিতাব আর কেউ লিখতে পারেনি, পারে না এবং ভবিষ্যতেও লিখতে পারবে না। অথচ দুঃখের বিষয় এত বড় কিতাবটি আজো পর্যন্ত কোন ধারাবাহিক অনুবাদ হয়নি। যা-ও কিছুটা হয়েছে উহা নিজেদের মন মত অর্থকে বিকৃত করে করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিখ্যাত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি কিন্তু এ ধরনের কেতাবগুলোর অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে এখনো করেননি। কারণ সৌদী আরবের শ্রদ্ধেয় অহাবী ভাইদের প্রভাবটিকে নীরবে হজম করতে হচ্ছে। কারণ, এ ধরনের কিতাবের ধারাবাহিক অনুবাদ করতে গেলে অহাবী এবং অন্যান্য ফেরকাগুলোর মৃত্যুঘণ্টা আপসে বেজে উঠবে। সুতরাং এদের মৃত্যুঘণ্টা জেনে-শুনে বাজুক এটা কি তারা চাইবে, অথবা আশা করতে পারেন? বিশ্ববিখ্যাত ওলীয়ে কামেল বাবা সামসেত্তাব্রীজের *দিওয়ানে সামসেত্তাব্রীজ* কিতাবটির অনুবাদ তো দূরের কথা নাম শুনলেই অহাবী ভাইয়েরা ভূত দেখার মত ভয় করেন। সুতরাং এই ফার্সী ভাষায় রচিত বিরাট দিওয়ানটির আজো কোন অনুবাদ বাংলা ভাষায় বাহির হয়নি। এরকমভাবে বহু মূল্যবান কেতাবের অনুবাদ করা হয়নি। সে সব কিতাবগুলো বিখ্যাত অলী-দরবেশ, পীর-ফকিরেরা ফার্সী ভাষায় লিখে গেছেন এবং আজো খুঁজলে সে সব মূল্যবান কেতাব পাওয়া যায়। যেমন *দিওয়ানে বু আলী শাহ কলন্দর*, *দিওয়ানে বাবা ফরিদ*, *দিওয়ানে কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী*, *দিওয়ানে আমীর খসরু*, *দিওয়ানে ওয়ায়েসী*, *দিওয়ানে হাফিজ সিরাজী* ইত্যাদি অনেক মারেফতের গোপন কথার কিতাব।

সত্যকে ধরতে হয় অনুমান এবং সম্ভাবনার উপর দাঁড়িয়ে। যদিও অনুমান চিরদিনই অনুমান এবং সত্য চিরদিনই সত্য। সত্য কি? সত্য কাহাকে বলে? সত্য বলতে কি বুঝায়? সত্যের সংজ্ঞা কি? ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নে অনেক মতবিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু মোটা কথায় সত্য বলতে যা বুঝা যায় তা হল, সত্যের গায়ে কোন জামা-কাপড় থাকে না তথা সত্য চিরদিনই পা হতে মাথা পর্যন্ত থাকে উলঙ্গ। একদম উলঙ্গ সত্যের দর্শন ক'জনার ভাগ্যে হয়েছে তা বলতে পারবো না। কারণ, যারা উলঙ্গ সত্যের রূপটি দেখেছে তারা নিজেরাই উহার রূপের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা ভাষার মাধ্যমে পরিপূর্ণরূপে দিয়ে যেতে পেরেছেন বলে তো মনে হয় না। কারণ, সীমিত ভাষার শব্দমালায় এক একটি বাক্য তৈরী করে উলঙ্গ সত্যের বর্ণনা দিতে গেলে ভাষাগুলো সহজ শব্দের মধ্যেও হয়ে পড়ে কঠিন এবং বুঝে নিতে রীতিমত হিমশিম খেতে হয়। যেমন ধরুন কোরান পাকের প্রথম বাক্যটির সত্যিকার মর্মার্থ আজো কেউ ভাষায় লিখে যেতে পারেননি। ***আলিফ লাম মিম*** কোরান পাকের তিনটি অক্ষরের অবশ্যই অর্থ আছে যা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। কারণ, কোরান নিজেই তাঁর দর্শনে কোন কিছুই নিরর্থক করে তৈরী করেননি বলে বার বার সহজ ভাষায় ঘোষণা করেছেন। এরকমভাবে অনেক কথাই বড় বড় মনীষীরা বলে গেছেন খুবই সহজ ভাষায়, কিন্তু, এর সত্যিকার অর্থ কি হতে পারে এ নিয়ে লেগে যায় মতবিরোধ। যেমন ধরুন একটি বাক্য, 'যাহা দেখতে খুবই সহজ উহাই ধরে রাখতে খুবই কঠিন।' বাক্যের শব্দগুলো কত সহজ কিন্তু ভাবধারাটি কত কঠিন মনে হয়। যেমন আর একটি বাক্য 'যে জিনিসের দাম খুব বেশি হয়ে যায় সেই জিনিসের আর কোন দামই থাকে না।' যখন একটি সত্যকে পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও অনুমানের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যেতে হয়, অবশ্য সেই অনুমানগুলো এক একটি সাজানো হিসাব। অনুমানের এই সাজানো হিসাবগুলো সত্যকে ধরার পথে

কিছু বাতিল এবং কিছু যোগ দিতে হয় মাঝে মধ্যে। আবার কখনো সম্পূর্ণটাই বাতিল বলে প্রমাণিত হয়। মানুষ এভাবেই যুগে যুগে সত্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাই একটি সত্যকে ধরতে গিয়ে অনেক পরিশ্রম, অনেক ত্যাগ-সাধনা হাসিমুখে বরণ করে নিতে হয়েছে।

আমার লিখিত বইটির ভাষা কতটুকু ভাবের বাহন হতে পেরেছে তা বলতে পারবো না। তবে এটুকু বলতে চাই যে, আল্লাহকে পাবার পথে ভাষার মাধ্যমে ভাবটি হয়তো অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে অথবা একেবারে কাছাকাছি এগিয়ে গেছে, অথবা এমনো হতে পারে যে মাঝামাঝি পথে এসে থেমে গেছে অথবা এমনও হতে পারে যে সামান্য কিছু দূর অগ্রসর হয়েছে, অথবা এমনও হতে পারে যে, আল্লাহকে পাবার পথে কেবল যাত্রা শুরু করেছে অথবা এমনও হতে পারে যে, আল্লাহকে পাবার পথের ধারে কাছেও যেতে পারিনি। সুতরাং আমার রচিত বইটির মুল্যায়ন করে যেতে পারলাম না এবং এজন্য পাঠক সমাজের কাছে ক্ষমা চাইছি। ম্যাটার তথা বস্তু যখন এ্যনার্জি তথা শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং সেই রূপান্তরিত শক্তির মহাসাগরে বিজ্ঞানীরা খেই হারিয়ে ফেলে এর ব্যাপকতার দর্শনে। তাই বিজ্ঞানীরা একবাক্যে সবাই বলে উঠে যে, আধুনিক বিজ্ঞান হয়তো অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে এবং এমনও হতে পারে যে আমরা মাঝামাঝিতে অবস্থান করছি অথবা এমনও হতে পারে যে, সত্যের প্রথম সিঁড়িতে কেবলই পা রাখতে চেষ্টায় রত আছি। অসীমের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সসীমের পক্ষে বাস্তবিকই কঠিন এবং দুরূহ হয়ে পড়ে এবং ইহা সমীমের পক্ষে স্বাভাবিক। বিজ্ঞানীদের কথাগুলোতে মনে হবে আত্মবিরোধ আছে আসলে ইহা মোটেই আত্মবিরোধ নয়, ইহা হল অসীমের সাগরে সসীমের পক্ষে আত্মহারা হয়ে তিলে তিলে এগিয়ে যাবার সঠিক বাস্তব পদক্ষেপের সমষ্টিগত দর্শন মাত্র।

এই নয়জনের কাছে চোখ বুজে মুরিদ হতে পারেন

১. শাহ সুফি পীর বাবা কেবলায়ে কাবা আজম শাহ আল সুরেশ্বরী, ফরিদপুর।
২. শাহ সুফি পীর বাবা কেবলায়ে কাবা সৈয়দ তারিক আল সুরেশ্বরী, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা।
৩. শাহ সুফি পীর বাবা কেবলায়ে কাবা মোহাম্মদ ময়েজ উদ্দিন আবদুর রশিদ আল সুরেশ্বরী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
৪. শাহ সুফি পীর বাবা কেবলায়ে কাবা ডা. মোহাম্মদ আলী আল সুরেশ্বরী, ভালুকা, ময়মনসিংহ।
৫. শাহ সুফি পীর বাবা কেবলায়ে কাবা আনোয়ার মুন্সী আল সুরেশ্বরী, ভোলাহাট, চাপাই নবাবগঞ্জ।
৬. শাহ সুফি পীর বাবা কেবলায়ে কাবা শাহ আলম মোল্লা রিপন আল সুরেশ্বরী, সদর রোড, জয়পুর হাট।
৭. শাহ সুফি পীর বাবা কেবলায়ে কাবা খোরশেদ আলম আল সুরেশ্বরী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।
৮. শাহ সুফি পীর বাবা কেবলায়ে কাবা ক্বারী মোহাম্মদ সুলতান আল সুরেশ্বরী, পবা, রাজশাহী।
৯. শাহ সুফি পীর বাবা কেবলায়ে কাবা আলী হোসেন আল সুরেশ্বরী, মতলব, চাঁদপুর।

সাধক খলিফাদের নামের তালিকা

১. সাধক নজিবর রহমান আল সুরেশ্বরী, কাহালু, বগুড়া।
২. সাধক আলাউদ্দিন আল সুরেশ্বরী, মানিকগঞ্জ।
৩. সাধক মাওলানা আনোয়ার হোসেন আল সুরেশ্বরী, টেকের হাট, মাদারীপুর।
৪. সাধক বশির উদ্দিন আল সুরেশ্বরী, জিঞ্জিরা, ঢাকা।
৫. তাপসী তাহমিনা বেগম আল সুরেশ্বরী, চারঘাট, রাজশাহী।
৬. সাধক মেহেদী মাসুদ আল সুরেশ্বরী, বাড্ডা, ঢাকা।
৭. সাধক গোলাম মোস্তফা আল সুরেশ্বরী, বাড্ডা, ঢাকা।
৮. তাপসী মরিয়ম উম্মে কুলসুম আল সুরেশ্বরী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

যাদের আর্থিক অনুদানে বইগুলি ছাপাতে পারলাম তাদের নামের তালিকা

১। মোঃ ইস্রাফিল মিয়া, পিতাঃ মন্তাজ মিয়া, গ্রামঃ লক্ষ্মীপুর, ফরিদপুর।
২। মোঃ শাহ আলম মোল্লা রিপন, পিতাঃ আবু হোসেন মোল্লা, সদর রোড, জয়পুরহাট।
৩। রাফিউল করিম, পিতাঃ আবদুর রশিদ মোল্লা, ৪৮০/১ পশ্চিম শ্যাওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা।
৪। মোঃ আবু তাহের, পিতাঃ আক্কাস আলী, গ্রামঃ ধন্যপুর, পোঃ বড়ইতলা, লক্ষ্মীপুর।

৫। শামসুদ্দীন সরকার, পিতা: ইয়ার মোহাম্মদ সরকার, ৪৫০ পশ্চিম ভূরুলিয়া, গাজীপুর।

৬। আনোয়ার হোসেন ঢালী, পিতা: শফিউদ্দীন ঢালী, গ্রাম: কালীপুর, থানা: মতলব, চাঁদপুর।

৭। শামসুদ্দীন ফকির, পিতা: রমজান ফকির, গ্রাম: গূহ লক্ষ্মীপুর, ফরিদপুর।

৮। আয়শা আক্তার, স্বামী- কাজী আফাজউদ্দীন, গ্রাম: চুনকুটিয়া মুহূরি পাড়া, শুভাঢ্যা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

৯। কাজী আফসারউদ্দীন, পিতা: কাজী বদরুদ্দীন, গ্রাম: চাকুলিয়া, পো: নগরকুন্ডা, থানা: সাভার, ঢাকা।

১০। শাহিদা বেগম, স্বামী: আকরামুল ইসলাম, গ্রাম: কুমাইগাড়ী, নওগাঁ।

১১। নাজমা পারভীন, স্বামী: ইস্রাফিল মিয়া, লক্ষ্মীপুর, ফরিদপুর।

১২। সোফিয়া রুমী, স্বামী: মনজুরুল হক, গ্রাম: ছাতড়া, থানা: নিয়ামতপুর, জি: নওগাঁ।

১৩। আলী আশরাফ, পিতা: শেখ ইউনাছার রহমান, গ্রাম: নাকনা, থানা: আশাসুনী, সাতক্ষীরা।

১৪। ইব্রাহীম হোসেন, পিতা: হাজী ছলিম উদ্দীন, গ্রাম: নৌবাড়িয়া, থানা: ভাঙ্গুরা, পাবনা।

১৫। আবুল হোসেন, পিতা: নিজামুদ্দীন মোল্লা, গ্রাম: বিছপাড়া, রামেশ্বরপুর, বগুড়া।

১৬। মাসুদ মেহেদী, পিতা: বারী কবির, চ-১৩৯ গোপীপাড়া, উত্তর বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা।

১৭। এমদাদুল হক, পিতা: মকবুল হোসেন, গ্রাম: নাখেরাজপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

১৮। ডা: ইউসুফ হোসেন, পিতা: মোঃ চাঁন মিয়া, গ্রাম: পালতি, পো: মতইন, থানা: সেনবাগ, নোয়াখালী।

১৯। অধ্যাপক আবদুল হালিম মিয়া, পিতা: মুজাফ্ফর হোসেন মিয়া, গ্রাম: ভেওয়ামারা, সিরাজগঞ্জ।

২০। ময়েজ উদ্দীন মোহাম্মদ আবদুর রশিদ, পিতা: আবদুল হাই, গ্রাম: পশ্চিম ঘাটলা বড়বাড়ী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

২১। গোলাম মোস্তফা, পিতা: নূরু মিয়া, গ্রাম: হাজী পাড়া, বাড্ডা, ঢাকা।

২২। মোফাজ্জল হোসেন সুধন, পিতা: মোঃ সরদার খান, গ্রাম: দক্ষিণ শিমুলিয়া, মেঘুলা, দোহার, ঢাকা।

২৩। সৈয়দ ফরহাদ নাসিম সজল, পিতা: মনসুর আলী দেওয়ান, গ্রাম: কানুপুর, থানা: আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

২৪। ফয়েজ আহমদ, পিতা: মহিউদ্দীন আহমদ, গ্রাম: মুন্সিকান্দা, থানা: দোহার, ঢাকা।

২৫। আবদুল করিম, পিতা: আবদুল বারেক, গ্রাম: সোনাকান্দা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

২৬। ইমাম হোসেন দেওয়ান, পিতা: শাহেদ আলী দেওয়ান, গ্রাম: চরবুজিরা, মূলফৎগঞ্জ, নড়িয়া, শরিয়তপুর।

২৭। সালেহা খাতুন, পিতা: চাঁন মিয়া, গ্রাম: কালীপুর, থানা: মতলব, চাঁদপুর।

২৮। রফিকুল ইসলাম, পিতা: হাজী নূরুল ইসলাম, গ্রাম: মৌগাছি, বানেশ্বর, থানা: পুঁটিয়া, রাজশাহী।

২৯। আহসান হাবীব, পিতা: আবদুর রহিম, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

৩০। সিরাজুল ইসলাম সরকার, পিতা: সাইজুদ্দীন সরকার, গ্রাম: টেঙ্গুরিয়াপাড়া, থানা: সিরাজদিখান, রাজশাহী।

৩১। আবদুল মান্নান, পিতা: হাজী আকরাম আলী, গ্রাম: জয়পাড়া, থানা: দোহার, ঢাকা।

৩২। মোহাম্মদ আলী মাষ্টার, পিতা: আলীমউদ্দীন, গ্রাম: পীরজপুর, থানা: চারঘাট, রাজশাহী।

৩৩। অধ্যাপক সিরাজউদ্দীন ভূঁইয়া, পিতা: মফিজ উদ্দীন ভূঁইয়া, গ্রাম: চর সুজাপুর, থানা: শিবপুর, নরসিংদী।

৩৪। এনায়েত হোসেন শুকুর আলী, গ্রাম: হাটাবো, থানা: রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৩৫। মো. মাসুদুর রহমান, পিতা- হাবিবুর রহমান, গ্রাম- পূর্ব নেপালপুর, ডাক- আমাইড়, থানা- পত্নীতলা, নওগাঁ।

৩৬। খেজের আহম্মদ, গ্রাম- কয়ড়া, থানা- উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

৩৭। আবদুল হালিম মিয়া, গ্রাম- ঝিকিড়া উত্তর পাড়া, থানা- উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

৩৮। খাদিজা বেগম, গ্রাম+ডাক- হাজিপুর, থানা- বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

৩৯। জহুরুল ইসলাম, গ্রাম- ছোট তারা, থানা- কালাই, জয়পুর হাট।

৪০। মোশারফ হোসেন, (ঠিকানা দেয় নাই)

৪১। রইস উদ্দিন (ঠিকানা দেয় নাই)

৪২। আফরোজা মালিক, স্বামী- আতিয়ার রহমান মালিক, ৩৪৮, আকবর রোড, বসুন্ধরা, ঢাকা।

৪৩। ডা. শাহ সূফী মোহাম্মদ আলী, পিতা- ফজর আলী, গ্রাম- নিঝুরি, ডাক- বরাইদ বাজার, ভালুকা, ময়মনসিংহ।

৪৪। এডভোকেট বাছির উদ্দীন আহমদ মীর্জা, পিতা- মো. শাহেদ আলী মীর্জা, মীর্জাবাড়ি, শুভাঢ্যা উত্তর পাড়া, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

৪৫। সো. সালাহ উদ্দীন, পিতা- মো. সুলতান উদ্দীন, গ্রাম- পাঁচুলী, ডাক- পাগলা বাজার, থানা- গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

৪৬। আনোয়ার হোসেন, পিতা- আবুল কাশেম, গ্রাম- দুর্গাপুর, ডাক- ছালিয়াকান্দি বাজার, থানা- তিতাশ, কুমিল্লা।

৪৭। মো. সেলিম, পিতা- মোসলেউদ্দীন, গ্রাম- কাশিপুর, ডাক- পাঁচ পুকুরিয়া, থানা- তিতাশ, কুমিল্লা।

৪৮। সৈয়দ তারিক, পিতা- সৈয়দ ওয়ারিস হোসেন, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা।

৫৯। মো. নাজমুল হক, পিতা- মো. ফয়জুল হক, গ্রাম- আশকোনা, থানা- উত্তরা, ঢাকা।

৫০। এডভোকেট আসাদোজ্জামান, পিতা- চাঁন মিয়া, গ্রাম- ঠিকাদী, হাতিরদিয়া, মনোহরদী, নরসিংদী।

৫১। আবদুল খালেক, পিতা- মো. ইসহাক আলী সরকার, গ্রাম- চর পুকুরিয়া, ডাক- উদয়কাঠি, পিরোজপুর।

৫২। নাতেক আহাম্মেদ ইনশা, পিতা- জামাল উদ্দীন, গ্রাম- ভি টি ঝগড়ার চর, পোঃ+ থানা- বাঞ্ছারামপুর, জেলা- বি. বাড়িয়া।

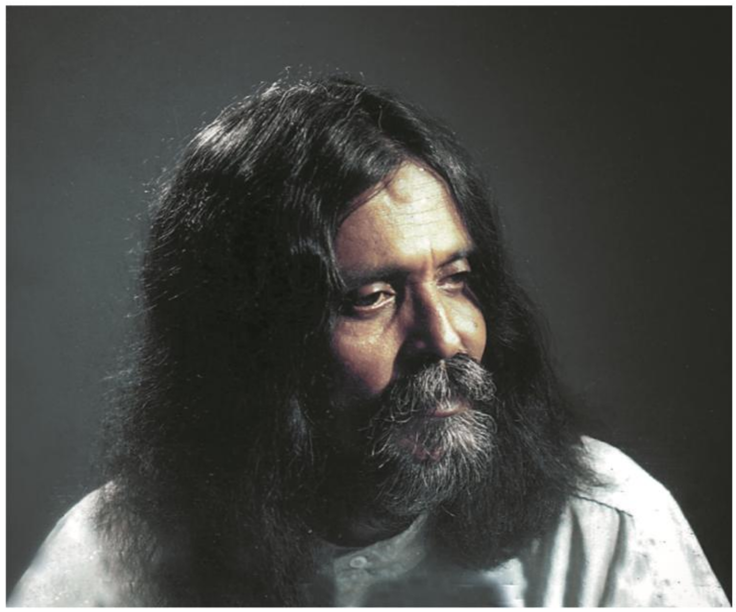
যারা কোরবানীর চামড়ার টাকা দান করেছেন তাদের নামের তালিকা

১. মো. শামসু সরকার, পিতা- ইয়ার মোহাম্মদ সরকার, ৪৫০ পশ্চিম ভুরুলিয়া, গাজীপুর।
২. নাজমুল হক, পিতা- আবদুল লতিফ, গ্রাম- মেজভালাম, থানা- পবা, রাজশাহী।
৩. মো. ইব্রাহীম হোসেন, পিতা- হাজী সেলিম উদ্দীন সরদার, গ্রাম- নওবাড়ীয়া, থানা- ভাংগুড়া, পাবনা।
৪. রফিক মোক্তার, পিতা- মধু হাজী, গ্রাম- নৌকাঘাটা, থানা- শিবপুর, নরসিংদী।
৫. আসাদুজ্জামান, পিতা- চাঁন মিয়া, হাতীর দিয়া, মনোহরদী, নরসিংদী।

অমর হয়ে থাক এই ছোট বইটিতে আমার বাবাজান বানেশ্বরের রফিক

স্কুল, কলেজ বা গোরস্থান দান করলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অমর হয়ে থাকে। কিন্তু এই বইটিতে ছবিসহ নাম-ঠিকানা দিয়ে তার নজরানার কথাটি পাঠকদের কাছে জানিয়ে দিলাম। চলমান বইটি কেবল বাংলাদেশেই নয় বরং বিদেশেও অনেক পাঠকের হাতে যাবে। সুতরাং পৃথিবীর যে কোন স্থানে পাঠকের হাতে বইটি পড়লে তার এই নজরানার কথাটি জানবে এবং জানিয়ে দেওয়াটা গুরু হয়ে কর্তব্য মনে করলাম।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আল-আমীন তার পারিবারিক জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবন সুন্দর, সার্থক ও মহীয়ান করে তুলুন এই দোয়া করছি।



চেরাগে জান শরীফ

ডাঃ বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল-সুরেশ্বরী

[২৫ শে আগস্ট ১৯৩৮ – ২০ শে মে ২০২০]